ইসলাম ও খিলাফত

ডঃ মফীজুল্লাহ্ কবীর
অধ্যক্ষ ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নওরোজ কিতাবিস্তান
বাংলা বাজার ॰ ঢাকা

প্রকাশক :
কাদির খান
নওরোজ কিতাবিস্তান
বাংলাবাজার
ঢাকা—১

প্রথম সংস্করণ ১৯৭০,

মুদ্রণে :
এম. আলম
ইডেন প্রেস
৪২/এ, হাটখোলা রোড,
ঢাকা—৩

ভূমিকা

নানা ঘাত প্রতিঘাত ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বহুদিন পর অবশেষে আমার ইসলাম ও খিলাফত বইটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এ বইর পাণ্ডু-লিপি তৈরী হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। তারপর বইটি থেকে থেকে থেমে থেমে বিভিন্ন সময়ে ছাপা হচ্ছিল। এর ফলে বানানের ও আঙ্গিকের আনুপূর্বিক সঙ্গতি রক্ষিত হয়নি। শেষের দিকে প্রুফ সংশোধনের দায়িত্বও আমি নিতে পারিনি। এ সব কারণে যথেষ্ট মুদ্রন প্রমাদ ঘটেছে।

পঁচিশ বছরের শিক্ষকতা প্রসূত অভিজ্ঞতার আলোকে পরিচ্ছন্ন ঐতি-হাসিক দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টির প্রয়াসে বইটি রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলাম। এ জন্য বিদেশী ভাষায় লিখিত বহু বই পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করেছি। কিন্তু ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে বাজারে প্রচলিত বহু নোট ও সাহায্য পুস্তক যে ভাবে পরীক্ষা পাশের রক্ষা কবচ হিসাবে কাজ করছে তাতে এ বইয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি কতখানি আকৃষ্ট হবে জোর করে বলতে পারিনা। তথাপি শিক্ষার মান উঁচু করতে হলে এ ধরণের পাঠ্যবইয়ের বহুল প্রচার অত্যাবশ্যক। যতশ্রীঘ্র আমাদের তরুণরা পরীক্ষার্থীর দৃষ্টি-ভঙ্গী পরিবর্তন করে শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে পাঠ্যপুস্তক পাঠে এগিয়ে আসবে ততই মঙ্গল। স্বাধীনতা উত্তর কালে স্বল্প সময়ের মধ্যেই বাংলায় লিখিত একাডেমির ইতিহাস বিষয়ক পুস্তক সমূহ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় এ সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট আশাবাদী।

ডিগ্রী ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে বাংলা একাডেমির বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পরিকল্পনাধীনে বইটি লিখিত হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস অনার্স শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাও এর সাহায্যে যথেষ্ট উপকৃত হবে। বইটির রচনা ও মতামতের জন্য আমিই দায়ী। পাঠকদের কাছ থেকে বইটির ভ্রম সংশোধন ও উন্নয়নের জন্য সকল উপদেশ ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। যদি কখনও উন্নততর পরিবেশে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তবে একে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করবনা।

অধিক বিলম্বে হলেও বইটির প্রকাশনার জন্য বাংলা একাডেমি ও নওরোজ কিতাবিস্তানকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় — মফীজুল্লাহ কবীর

২৮শে জুলাই ১৯৭০

সূচীপত্র

আব্বাসীয় যুগ

উৎসর্গ

স্নেহময়ী মায়ের

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

রাশিয়া
জার্মানী
পোল্যান্ড
ফ্রান্স
ইতালী
গ্রীস
কৃষ্ণ সাগর
কাস্পিয়ান সাগর
স্পেন
ভূমধ্য সাগর
তুরস্ক
সিরিয়া
লেবানন
বাগদাদ
ইসরাইল
জর্ডান
ইরাক
কুয়েত
মরক্কো
তিউনিসিয়া
আলজিরিয়া
লিবিয়া
মিশর
সৌদি আরব
ইয়ামন
এডেন
সুদান



ইসলাম ও খেলাফত

১

আরবদেশঃ ভূপ্রকৃতি ও অধিবাসী

আরবদেশ এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি বৃহৎ উপদ্বীপ। ইহার আয়তন প্রায় সাড়ে বার লক্ষ বর্গমাইল; পাকিস্তানের সাড়ে তিনগুণ; পূর্ব পাকিস্তানের তেইশগুণ। অর্থচ দ্বীপাঞ্চলসহ সমগ্র উপদ্বীপের জনসংখ্যা দেড় কোটির বেশী নহে। তন্মধ্যে সৌদী আরবের লোকসংখ্যা প্রায় পঁচাত্তর লক্ষ এবং ইয়ামনের লোকসংখ্যা ন্যূনাধিক সত্তর লক্ষ। আরব দেশের উত্তরে ইরাক, জর্ডন ও ফিলিস্তিন; পশ্চিমে লোহিত সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও পূর্বদিকে পারস্যোপসাগর অবস্থিত। এই বিরাট ভূ-খণ্ডের প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক বিভাগগুলির সহিত আমাদের পরিচয় আবশ্যক। আরবদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ইয়ামন ব্যতীত সমস্ত উপদ্বীপই উচ্চ অনুর্বর মালভূমি ও মরুভূমি। ভূতাত্ত্বিকগণের মতে আরব উপদ্বীপ সম্ভবতঃ এককালে আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। পরবর্তীকালে ভৌগোলিক পরিবর্তনের ফলে নীল নদীর উপত্যকা অঞ্চল ও লোহিত সাগর দ্বারা সাহারার সহিত ইহার সংযোগ ছিন্ন হইয়াছে।

উপদ্বীপটি পশ্চিম দিক হইতে পূর্বদিকে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া গিয়াছে। আরবের পশ্চিমাঞ্চল জুড়িয়া উত্তরে মিদয়ান হইতে দক্ষিণে ইয়ামন পর্যন্ত একটি পর্বত-শ্রেণী লোহিত সাগরের সহিত সমান্তরালভাবে বিদ্যমান। এই পর্বতের উচ্চতা স্থানে স্থানে ৯০০০ ফুট হইতে ১২০০০ ফুট পর্যন্ত উঠিয়াছে। এই পর্বত-শ্রেণী হইতে পশ্চিমে লোহিত সাগরের দিকে ভূ-ভাগ খাড়াভাবে নীচু হইয়া গিয়াছে; অপরপক্ষে পূর্বদিকে ভূ-ভাগ ক্রমশঃ ঢালু হইয়া পারস্যোপসাগরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। আরবের দক্ষিণ-দিকের নিম্নভূমিকে 'তিহামা' বলা হয়। এই তিহামা অঞ্চল হইতে আবার পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্বদিক দিয়া ছোট ছোট পর্বত-শ্রেণী উপরে উঠিয়া আসিয়াছে। পার্বত্য-অঞ্চল ও সমুদ্রকূলবর্তী নিম্নাঞ্চল ব্যতীত

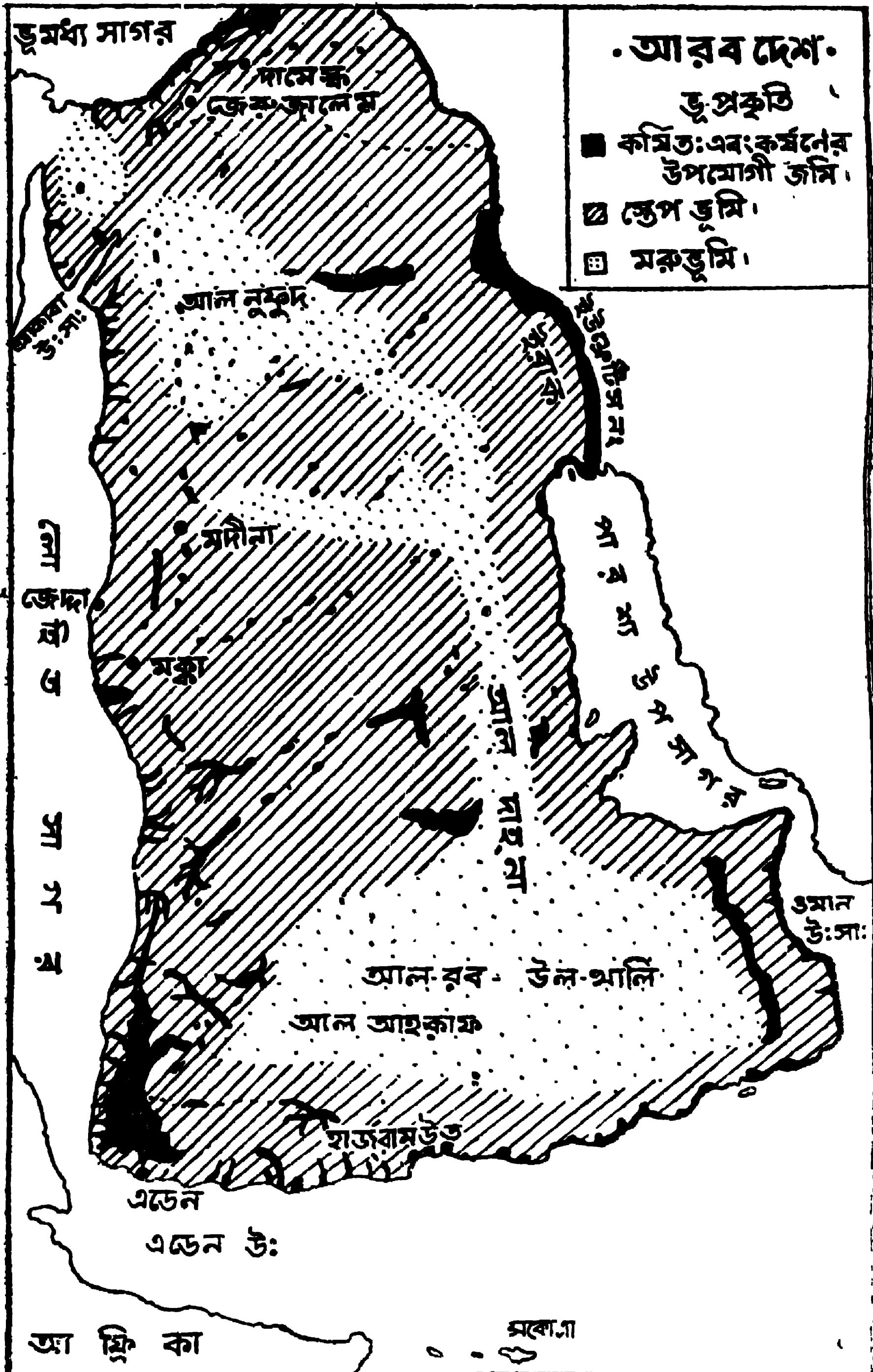
আরবের অভ্যন্তরে একটি মালভূমি অঞ্চল রহিয়াছে,—উহার নাম নাজ্‌দ্। এই নাজ্‌দ্ আরবের বর্তমান সউদী রাজপরিবারের মূল আবাসভূমি।

উপরোল্লিখিত পর্বত ও উচ্চভূমি ব্যতীত আরবের বাকী অংশ প্রায়ই মরুভূমি। এই মরুভূমিকে আরবগণ মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে। এইগুলি যথাক্রমে নুফুদ, দাহনা ও হাররা। উত্তর-আরবের সাদা বা লালচে বালুর মরুভূমিকে 'নুফুদ' বলা হয়। এই অঞ্চল শুষ্ক হইলেও শীতকালে এখানে প্রচুর বারিপাত হয় বলিয়া এখানে মেষাদির চারণোপযোগী ঘাস জন্মিয়া থাকে। লালবালির মরুভূমিকে 'দাহনা' বলা হয়। উত্তরে নুফুদের প্রান্তসীমা হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণের 'রাব'-উল-খালী' (শূন্যগৃহ) নামে পরিচিত অঞ্চল পর্যন্ত দাহনা অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চল সম্পূর্ণ বাসের অনুপযোগী। তবে মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত হইলে এখানেও গবাদি পশুর আহার্য-ঘাসের অভাব ঘটে না। আরবের পশ্চিম ও মধ্যভাগে অবস্থিত আগ্নেয়গিরির লাভা মিশ্রিত বালি পাথরে গঠিত অঞ্চলগুলিকে হাররা বলা হয়। এইগুলি বহুকাল পূর্বে অবস্থিত আগ্নেয়গিরির চিহ্ন-বিশেষ। অধুনা আরবদেশে কোন সজীব আগ্নেয়গিরির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

মরুভূমির শ্রেণী-বিভাগ

রাজনৈতিক বিভাগগুলির মধ্যে আরব উপদ্বীপের বিশাল অংশ ব্যাপিয়া অবস্থিত সউদী আরব রাজনৈতিক গুরুত্ব ও আন্তর্জাতিক খ্যাতির জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সউদী আরবের পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে ঐতিহাসিক হিজায ও উহার প্রধান নগরী মক্কা, মদীনা ও জিদ্দা অবস্থিত। হজরত মুহম্মদের (দঃ) জন্মভূমি ও ইসলামের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে হিজায ও মক্কা-মদীনা বিশেষ প্রসিদ্ধ। সউদী আরবের রাজধানী রিয়াজ। সউদী আরবের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত হাসা প্রদেশ তৈল-সমৃদ্ধ। আরব-মার্কিন তৈল কোম্পানী শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দাহরান নগরীতে থাকিয়া আরবের তৈল সম্পদ আহরণ করিতেছে। পারস্যোপ-সাগরের উত্তর-পশ্চিমে তৈল-সমৃদ্ধ কুওয়াইত রাষ্ট্র অবস্থিত। কুওয়াইতের দক্ষিণে কুওয়াইত নিরপেক্ষ এলাকা রহিয়াছে। দাহরান হইতে পূর্বদিকে পারস্যোপসাগরে বৃটিশ আশ্রিত বাহরাইন দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। এই দ্বীপপুঞ্জ মুক্তার জন্য বিখ্যাত। বাহরাইনের দক্ষিণে রহিয়াছে বৃটিশ আশ্রিত কাতার উপদ্বীপ। পারস্যোপসাগরের দক্ষিণে অর্ধচক্রাকারে বিস্তৃত রহিয়াছে বৃটিশ সরকারের সহিত চুক্তিবদ্ধ উমানের সাতটি উপকূলবর্তী

রাজনৈতিক বিভাগ


আরব দেশ
ভূ-প্রকৃতি
কর্ষিত:এবং:কর্ষণের উপযোগী জমি।
স্তেপ ভূমি।
মরুভূমি।
ভূমধ্য সাগর
দামেস্ক
জেরুজালেম
আল নুফুদ
মদীনা
জেদ্দা
মক্কা
পারস্য উপসাগর
ওমান উঃসাঃ
আল-রব-উল-খালি
আল আহকাফ
হাজরামউত
এডেন
এডেন উঃ
আফ্রিকা

রাষ্ট্র। আরবের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে মস্কতের সুলতানের রাজ্য অবস্থিত। আরবের দক্ষিণ উপকূলে বৃটিশ আশ্রিত আদন রাজ্য অবস্থিত। ইহার পশ্চিমে বৃটিশ আদন-উপনিবেশ ও আদন-উপনিবেশের উত্তরে স্বাধীন ইয়ামন গণতন্ত্র অবস্থিত।

আবহাওয়া

আরবের আবহাওয়া শুষ্ক ও অত্যন্ত উষ্ণ; পশ্চিমে ও দক্ষিণে সমুদ্রবেষ্টিত হইলেও এই উষ্ণতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। দক্ষিণের সমুদ্র হইতে উত্থিত আর্দ্র বাতাসে মাঝে মাঝে দক্ষিণাঞ্চলে বারিপাত হয়; কিন্তু এই বাতাস যতই অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, ততই ইহার আর্দ্রতা হ্রাস-প্রাপ্ত হয়। 'সাবা' নামে অভিহিত মৃদুমন্দ পুবালী বাতাস আরব কবিগণের রচনায় বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। উপকূল অঞ্চলের উর্বর ভূমি ব্যতীত আরবের অন্যত্র মরুদ্যানগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই মরুদ্যানগুলিই মরুভূমির ভয়াবহতাকে কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস করিয়াছে। ইসলামের জন্মভূমি হিজাযের অধিকাংশই মরুভূমি। কেবলমাত্র ইহার উত্তরাঞ্চলে কতগুলি মরুদ্যান রহিয়াছে। হিজাযে একদিকে যেমন কোন কোন সময় দুই তিন বছর ধরিয়া কোন বৃষ্টিপাত হয় না, অন্যদিকে আকস্মিক বৃষ্টিঝড়ের দৃষ্টান্তও বিরল নহে। উপকূলবর্তী ইয়ামন, হাজরা-মাউত ও উমানে প্রচুর বারিপাত হয় বলিয়া এই স্থানগুলি উর্বর ও চাষোপযোগী। আরবদেশে একটি উল্লেখযোগ্য নদীও নাই; কিন্তু নদীর বদলে এখানে রহিয়াছে অনেকগুলি উপত্যকা-পথ (ওয়াদী); আকস্মিক বন্যার সময় এই সকল পথে পানি নিষ্কাশন হয় এবং অন্য সময় এইগুলি উটের কারাভাঁর যাতায়াতের পথ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইসলাম-পূর্ব যুগ হইতে এই সকল পথের সাহায্যে স্থলপথে বহির্বিশ্বের সহিত আরবের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়া আসিতেছে।

উদ্ভিদ ও প্রাণী

উপরোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, আরবের আবহাওয়া উদ্ভিদাদি জন্মাইবার অনুকূল নহে। তথাপি আরবের স্থানে স্থানে বিশেষ করিয়া হিজাযে প্রচুর খেজুর গাছ জন্মে। ইয়ামনেও মরুদ্যান অঞ্চলে গম এবং উমান ও হাসায় চাউল জন্মে। তায়িফে আঙ্গুর ও কোন কোন মরুদ্যান অঞ্চলে ডালিম, আপেল, বাদাম, কমলালেবু, তরমুজ এমন কি কলাও কিছু কিছু জন্মে।

আরবের নানা রকমের পাখীর মধ্যে ঈগল, বাজ, শ্যেন, বুলবুলি, কাক, কবুতর, পেঁচা ইত্যাদি প্রধান। বন্য জন্তুর মধ্যে চিতাবাঘ, নেকড়ে বাঘ, শৃগাল, বানর ও হরিণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গৃহপালিত পশুর মধ্যে উট, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর কুকুর, শিকারী-কুকুর (সালুকী), মেষ ও বিড়াল প্রধান। ইহাদের মধ্যে আরব-জীবনে উট ও ঘোড়ার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। উট মরুভূমির জন্য অত্যাবশ্যকীয় প্রাণী। উট ব্যতীত মরুভূমির জীবন কল্পনা করা যায় না। সাধারণ কথায়, উটকে 'মরুভূমির জাহাজ' বলা হয়। কিন্তু মরুবাসীর জীবনে উটের ব্যবহার

উট

বহুবিধ। মরুভূমির ভয়াবহ বালুকাপথে উটই একমাত্র বাহন। মরুবাসীরা উটের মাংস খায়; উটের দুধ পুষ্টিকর পানীয়। উটের চামড়া দিয়া পোষাক ও অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিস প্রস্তুত হয়। উটের গোবর জ্বালানীর কাজ করে। উটের পশম দিয়া তাঁবু তৈয়ার হয়। এমন কি উটের প্রস্রাব পর্যন্ত মরুবাসীরা ঔষধ হিসাবে সেবন করিয়া থাকে। উটের কষ্ট-সহিষ্ণুতা সর্বজন বিদিত। মরুভূমিতে ইহা বহুদিন যাবৎ পানাহার ব্যতীত টিকিয়া থাকিতে পারে। উটের গতিও অন্যান্য ভারবাহী পশুর তুলনায় বেশ দ্রুত। আরবী সাহিত্যে উটের প্রয়োজনীয়তা ও জনপ্রিয়তার প্রভূত নিদর্শন রহিয়াছে। আরবী ভাষায় বিভিন্ন জাতের ও বয়সের উটের জন্য সহস্রাধিক শব্দ প্রচলিত রহিয়াছে। উট মরুবাসীর জন্য আল্লার বিশেষ দান। উত্তম জাতীয় উট উমান ও পূর্ব উপকূলে জন্মে। ইহাদিগকে 'উমানিয়া' ও 'বাতিনিয়া' বলা হয়। হাসার উটও বিশেষ প্রসিদ্ধ। আরবের অশ্ব উহার ক্ষিপ্রগতি ও প্রভুভক্তির জন্য বহু গল্পে ও জনশ্রুতিতে স্থান লাভ করিয়াছে। আরবের নাজ্দ প্রদেশ উৎকৃষ্ট জাতীয় ঘোড়ার জন্য বিখ্যাত। অষ্টম শতাব্দীতে আরবগণ

অশ্ব

স্পেনে আরব-অশ্ব আমদানী করে। ভাল জাতের ঘোড়াকে আরবগণ 'আসিল' বলিয়া অভিহিত করে। যুদ্ধ-বিগ্রহ, শিকার ও খেলাধূলার কাজে অশ্ব ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল বা উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই ঘোড়ার লালন-পালন করিয়া থাকে। তাই উটের ব্যবহার যেমন সার্বজনীন ঘোড়ার ব্যবহার তেমন নহে। আরবের সর্দার শ্রেণীর লোকেরা ভাল জাতের ঘোড়া জন্মাইবার জন্য যত্নের সহিত ঘোটক ও ঘোটকী পুষিয়া থাকে। ঘোড়ার প্রভুভক্তি ও কষ্ট সহিষ্ণুতাও বিশেষ প্রসিদ্ধ। উটের মত ঘোড়াকেও বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়া থাকে। ঘোড়ার

সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে আরবদের মধ্যে অনেক লোকাচার প্রচলিত আছে। কথিত আছে, হজরত মুহম্মদের (দঃ) জীবদ্দশায় তাঁহার মোট পনরটি অশ্ব ছিল। শিকারের জন্য বিশুদ্ধ জাতের কুকুর ব্যবহার আরবদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। এইসব কুকুরকে 'সালুকী' বলা হয়। ইহাদের সাহায্যে খরগোস, হরিণ ইত্যাদি শিকার করা হয়। প্রসিদ্ধ আরব সর্দারগণ শিকারের জন্য সালুকী কুকুর, ও বাজপাখী পুষিয়া থাকেন।

কুকুর

আরবের অধিবাসী

আরবের ভূপ্রকৃতি ও আবহাওয়া অধিবাসীদের জীবন-যাত্রায়, দৈহিক ও মানসিক গঠনে, চরিত্র রূপায়নে ও সামাজিক আচার ব্যবহারে বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অধিবাসীরা প্রধানতঃ দুই প্রকার, স্থায়ী বাসিন্দা ও বেদুঈন। যাহারা শহরে বা লোকালয়ে স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করিয়া বসবাস করে, তাহারাই স্থায়ী বাসিন্দা। আরব-দেশে এই জাতীয় লোকের সংখ্যা নগণ্য। আরবের বর্তমান সউদী সরকার বহু বেদুঈন আরব-পরিবারকে স্থায়ী বসবাস স্থাপনে উৎসাহদান ও সহায়তা করিতেছে। সমগ্র আরব দেশে আধুনিক কালেও শহরের সংখ্যা খুবই কম। শহরের অল্পসংখ্যক স্থায়ী বাসিন্দা ব্যতীত আরবের সকল অধিবাসীকেই বেদুঈন বলিয়া অভিহিত করা হয়। বেদুঈনগণ কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে পারে না। গৃহপালিত পশুর ঘাস ও পানির সন্ধানে বেদুঈনগণকে স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। বেদুঈনের জীবন যাযাবরের মত উদ্দেশ্যহীন ঘোরাফেরা নয়; মরুভূমির জীবন-যাত্রায় ইহা একটি বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি। "মরুভূমির সকল জীবিত বস্তুর উপর বেদুঈন, উট ও খেজুর গাছ—এই ত্রি-শক্তি সর্বময় কর্তৃত্ব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে; আর তাহারা মরুভূমির বালুর সহিত একত্রে জীবন-নাট্যের চারিটি প্রধান অভিনেতা বিশেষ"। মরুভূমির উগ্র কঠোর প্রকৃতি, পানির স্বল্পতা, অসহ্য উত্তাপ, অনুর্বরতা ও খাদ্যাদির অভাব ইত্যাদি প্রতিকূল শক্তির সহিত বেদুঈনকে আজীবন সংগ্রাম করিতে হয়। মনে, প্রাণে, দেহে ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে প্রতিটি বেদুঈন যেন মরুভূমির রুদ্র ও বিভীষণ মূর্তিরই এক একটি প্রতীক। অসীম ধৈর্য ও কষ্ট সহিষ্ণুতা তাহার চরিত্রের প্রধান অঙ্গ। জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা বেদুঈনকে

বেদুঈন

অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক করিয়া তুলিয়াছে। জীবন-ধারনের প্রশ্নই তাহার কাছে সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন। রুদ্র-কঠোর প্রকৃতি তাহাকে অবসর ও বিলাসের সুযোগ দেয় নাই। এই আত্মকেন্দ্রিকভাব অন্যদিকে উচ্ছৃঙ্খলতা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় রূপ লাভ করিয়াছে।

বেদুঈনকে অধিকাংশ সময়ই অভুক্ত, অর্ধভুক্ত ও সামান্য পোষাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। তাই আপনার চেষ্টায় জীবিকার্জন সম্ভব না হইলে তাহাকে লুন্ঠন ও অপহরণের আশ্রয় লইতে হয়। বর্তমান সউদী সরকার লুন্ঠন ও অপহরণ প্রতিরোধ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত। বছরের পর বছর ধরিয়া বেদুঈন এক বেলা পর্যাপ্ত পরিমাণে খাইতে পায় না। উটের দুধ ও কিছু খেজুর তাহার দৈনন্দিন খাদ্য। তাহার খাদ্যের মত তাহার পোষাকও স্বল্প। একটি বড় কুর্তা, একটি 'আবা ও শিরস্ত্রাণ (কুফিয়া) বেদুঈনের সাধারণ পোষাক। এতদসত্ত্বেও বেদুঈনকে কখনও খাদ্যাভাবে প্রাণ হারাইতে হয় নাই। কারণ তাহার পরিবার ও গোত্র তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী। আরবের চিরাচরিত আতিথেয়তাও অনাহার মৃত্যুর বিশেষ প্রতিবন্ধক। বেদুঈন তাহার অতিথির জন্য শেষ উষ্ট্রটিকেও জবেহ করিতে দ্বিধাবোধ করিবে না। এই অতিথি সৎকারের বেলায় তাহাদের নিকট আরব অনারব সকলেই সমান।

প্রত্যেক বেদুঈন গোত্রের এক একটি নির্দিষ্ট এলাকা রহিয়াছে। ইহাকে জিরা' (ذراع) বলা হয়। বেদুঈনগণ তাহাদের উট, মেষ ও পশু লইয়া শরৎ-হেমন্ত, শীত ও বসন্তকালে এই এলাকায় ঘুরিয়া বেড়ায়। এই এলাকায় তাহাদের কূপসমূহ থাকে। এক একটি জিরা' দৈর্ঘ্যে ১৮০ মাইল এবং প্রস্থে ১২০ মাইল অথবা বেশী কমও হইতে পারে। ইহাতে কূপের সংখ্যা পাঁচ হইতে পঞ্চাশ পর্যন্তও হইতে পারে। বৃষ্টিপাত ভাল হইলে এবং ঘাস পানির প্রাচুর্য হইলে গোত্রের লোকেরা আপন আপন এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু অনাবৃষ্টি হইলে তাহারা চারণভূমির সন্ধানে প্রতিবেশী এলাকায় ভিড় জমায়। অবশ্য কোন শত্রু এলাকায় যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব। সেজন্য আরবের গোত্রগুলি পরস্পরের সহিত মিত্রতা স্থাপন করে এবং মিত্রতাবদ্ধ গোত্রগুলি পরস্পরকে তাহাদের এলাকায় বিপদের দিনে গো-চারণের সুযোগ দেয়। এই পারিবারিক গোত্রীয় মিত্রতা শতাব্দীর পর শতাব্দী চালু থাকে এবং অনাবৃষ্টি, যুদ্ধ ও অন্যান্য বিপদাপদে এই গোত্রীয় সঙ্ঘগুলি মিত্রতাবদ্ধ

বেদুঈন গোত্র

পরিবারের সহায়তার জন্য আগাইয়া আসে। যখন দেশীয় সরকার শক্তিশালী থাকে, তখন এই গোত্রীয় সঙ্ঘগুলি শান্তিতে থাকে কিন্তু রাষ্ট্রীয় শাসন শৃঙ্খলা শিথিল হইলে, গোত্র ও গোত্রসঙ্ঘগুলি পরস্পরের বিরুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়ে। এইরূপ অরাজকতাই বেদুঈনের কাম্য; কারণ এই অবস্থায় লুঠপাট ও অপহরণ অবাধে চলিতে পারে।

গ্রীষ্মকালে বেদুঈনগণ নিজ নিজ এলাকার কূপসমূহের চারিপাশে পরিবার-পরিজন ও গবাদি পশু লইয়া তাঁবু পাতিয়া বসবাস করে। স্বল্প-পরিসর স্থানে গ্রীষ্মকালে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে ও পরিবারের উট, ঘোড়া, মেষ এইখানে দলবদ্ধ হইয়া অতি কষ্টে দিন কাটায়। এই সময় তাপমাত্রা ১২৫ ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠে; খাদ্যাদি কমিয়া আসে। অন্যপক্ষে বেদুঈনের জানমাল শত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা এই সময়ই সমধিক। জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত বেদুঈনের জীবন-যাপন মোটামুটি এইরূপ। কাতিক মাস হইতে বারিপাত আরম্ভ হয়। তখন হইতে বেদুঈনের প্রকৃত জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়। তাহারা দলে দলে বৃষ্টি-বিধৌত অঞ্চলে পানি ও ঘাসের সন্ধানে বাহির হইয়া যায়। তখন হইতে আগামী গ্রীষ্মের প্রারম্ভ পর্যন্ত তাহারা এইভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রায় প্রতি দশদিন অন্তর বেদুঈনদের তাঁবু স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু এই গতি ধীর, মন্থর ও আরামদায়ক। বছরের এই সময় সকলের জন্য আনন্দের সময়।

গোত্রের বাৎসরিক জীবন

আরবের প্রতি গোত্রে একজন নির্বাচিত শায়খ থাকেন। শায়খের পদ কোন পরিবারে বংশানুক্রমিক নহে। তিনি সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ও বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি। কিন্তু কাহারও সহিত আলাপ-আলোচনা না করিয়া তিনি কোন কাজ করিতে পারেন না। অপরপক্ষে তাঁহার সকল কাজে তিনি গোত্রের জনমতকে প্রাধান্য দান করেন। তাই কোন বিষয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণের পূর্বে তিনি গোত্রের বয়োজ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ লোকদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া লন। একবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে নেতৃত্ব শায়খের হাতে ন্যস্ত হইবে। তখন সকলে তাঁহার আদেশ বিনা বাক্য ব্যয়ে শিরোধার্য করিবে। অপরাপর ব্যাপারে শায়খ তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকদের পিতার সদৃশ। তিনি প্রতিটি পরিবারের সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ খবর লইয়া থাকেন; সকল বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসার

গোত্রের প্রধান: শায়খ

জন্য তাঁহার নিকট নীত হয়। তাঁহাকে সদাশয় ও অতিথিপরায়ণ হইতে হয়। আরবরা কখনও 'বখীল' বা কৃপণ শায়খের আনুগত্য স্বীকার করে না। অভুক্ত ও অর্ধভুক্ত বেদুঈনগণকে তাঁহার গৃহে মাঝে মাঝে ভোজে আপ্যায়িত করিতে হয়। তিনি সম্প্রদায়ের লোকজনকে নানা উপাচারে পরিতুষ্ট রাখেন।

গোত্রীয় সংস্থা

রক্ত-সম্পর্ক ভিত্তিক পরিবার ও বংশগুলি লইয়া আরবের সমাজ-জীবন গঠিত। এই রক্ত-সম্পর্ক বাস্তব অথবা কাল্পনিক হইতে পারে। এক পরিবারের লোক একই তাঁবুতে বাস করে। কয়েকটি তাঁবুর সমষ্টি লইয়া একটি 'কওম' ও কয়েকটি কওমের সমষ্টি লইয়া একটি 'কবিলা' (গোত্র) গঠিত হয়। স্থান ও কাল বিভেদে গোত্রের শাখা উপশাখাগুলি বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। গোত্র বা গোত্রের লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য গোত্রের নামের সাথে 'বনু' শব্দ যোগ করা হয়। যেমন বনু-কুরাইশ, বনু-হাশিম ইত্যাদি। আরবের সমাজ জীবনের বৈশিষ্ট্য এই যে, এক পরিবারের লোক আপন পরিবারের স্বার্থরক্ষার খাতিরে অন্য পরিবারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়; যদিও তাহারা একই কওমের অন্তর্ভুক্ত এবং কওমের স্বার্থরক্ষার জন্য তাহারা আবার সঙ্ঘবদ্ধভাবে অন্য কওমের বিরুদ্ধে লড়িতে প্রস্তুত থাকে, যদিও উভয় কওম একই কবিলার অন্তর্ভুক্ত হয়। আবার বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়িবার সময় কবিলার সমস্ত লোক বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে অগ্রসর হয়। আরবে প্রচলিত একটি প্রবাদ বাক্য হইতে এই সম্পর্ক বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। "আমি ও আমার ভাই আমার চাচাত ভাইয়ের বিরুদ্ধে; আমি ও আমার চাচাত ভাই অপরের বিরুদ্ধে।"

কবিলার সকল লোক ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে প্রত্যেকটি লোকের জান, মাল ও ইজ্জত রক্ষার জন্য দায়ী। হত্যার বদলে সাধারণতঃ হত্যাই কাম্য। কোন এক গোত্রের লোক অন্য গোত্রের একজন লোককে হত্যা করিলে, উহাদের মধ্যে লড়াই বাধিয়া উঠে। কোন কোন সময় প্রাণের বদলে অর্থের (দিয়াত) দ্বারাও এই বিবাদ মীমাংসা হয়। আরবের গোত্রভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থায় কোন লোক গোত্র-সম্পর্ক ছাড়া বাঁচিতে পারে না। গোত্রহীন লোকের রক্ষার দায়িত্ব কেহই গ্রহণ করে না। তাই রক্ত-সম্পর্কহীন ব্যক্তির গোত্রভুক্তির জন্য কতকগুলি প্রথা আরবদেশে প্রচলিত রহিয়াছে। যেমন কোন ক্রীতদাস তাহার প্রভু কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত হইলে, সে যদি উক্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিতে চায়, তবে তাহাকে

পরিবারের 'মাওলা' বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। এই প্রথা মধ্যযুগে বহুল প্রচলিত ছিল। একজন সম্পূর্ণ নবাগত ব্যক্তিও কোন পরিবার বা গোত্রের আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া পরিবারের "আশ্রিত" (দাখিল) হিসাবে গণ্য হইতে পারে। এই প্রথা অনুসারে একটি গোটা পরিবার বা পরিবার গোষ্ঠি অন্য গোষ্ঠি বা গোত্রের আশ্রিত হইতে পারে। আরবদের এই প্রথার সুযোগ গ্রহণ করিয়া যে কোন অপরাধী ব্যক্তিও "আমি আপনার আশ্রিত" এই কথা বলিয়া কোন পরিবারের বা গোত্রের আশ্রয় ভিক্ষা করিতে পারে। আশ্রিত ব্যক্তিকে নিরাপদ স্থানে পেঁাছাইয়া না দেওয়া পর্যন্ত সে পরিবারের রক্ষণাধীন থাকে।

গোত্রীয় চেতনা, গোত্রের জন্য মমত্ববোধ, ও গোত্রের জন্য জানমাল উৎসর্গ করার প্রস্তুতিকে আসাবিয়া বলা হয়। বেদুঈনের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার চরম অভিব্যক্তির নামই আসাবিয়া। এই অনুভূতি

গোত্রীয় চেতনা: আসাবিয়া

পরবশ হইয়া আরবগণ গোত্রবহির্ভূত সকল কিছুকে বিজাতীয়, ঘৃণার পাত্র ও শত্রুভাবাপন্ন বলিয়া মনে করে। এই গোত্রীয় চেতনা একদিকে যেমন গোত্রীয়-সংহতিকে সযত্নে রক্ষা করে, অন্যদিকে পুরুষানুক্রমে গোত্রে গোত্রে শত্রুতা ও কলহ সঞ্জীবিত রাখে।

বিস্তারিত পাঠ্য-তালিকা

১. পি. কে. হিট্টি: হিস্ট্রি অব দি এরাব্স্, মেকমিলান এণ্ড কোং লিঃ, পঞ্চম সংস্করণ, লণ্ডন, ১৯৫১।

২. এইচ. আর. পি. ডিক্সন: দি এরাব অব দি ডেজার্ট, এল্যান এণ্ড আনউইন, লণ্ডন, ১৯৪৯।

৩. রিচার্ড এইচ. সাঙ্গার: দি এরাবিয়ান পেনিনসুলা, কর্নেল ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৪।

৪. রয়্যাল ইনস্টিটিউট অব ইন্টারনেশানেল এফেয়ার্স: দি মিডল ইস্ট, সম্পাদক: রিডার বুলার্ড
৩য় সংস্করণ, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৮।

২

প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যে সেমিটিক সভ্যতা

আধুনিক গবেষকগণের মতে আরবগণ শুধু যে সেমিটিক জাতির অন্তর্ভুক্ত তাহা নহে বরং আরবদেশই সমগ্র সেমিটিক জাতির লালনভূমি ছিল। প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যের সভ্যতায় যে সকল সেমিটিক জাতির দান অপরিসীম তাহারা সকলে 'উর্বর অর্ধ-চন্দ্র ভূমি'তে (Festile Crescent) আধিপত্য বিস্তারের পূর্বে আরবদেশেই এক অভিন্ন মহাজাতি হিসাবে বহুকাল যাবৎ লালিত-পালিত হইয়াছিল। ইহারা ব্যাবিলনীয়, আসিরীয়, ফিনিসীয় ও হিব্রুজাতি নামে ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই মতবাদ অনুসারে সেমিটিক ও হেমিটিক জাতি যুক্তভাবে প্রথমে সম্ভবতঃ পূর্ব আফ্রিকায় বসবাস করিত। সেখান হইতে সেমিটিক জাতি আরব উপদ্বীপে চলিয়া আসে। অতঃপর আরব দেশে ভৌগোলিক কারণে অথবা জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য একাধিকক্রমে সেমিটিক জাতির উল্লিখিত শাখাগুলি 'উর্বর অর্ধ-চন্দ্র' এলাকায় বাসস্থান পরিবর্তন করে। সর্বশেষে ইসলাম-প্রচারের পর বর্তমান ইতিহাসের আরবগণও অনুরূপভাবে উক্ত এলাকায় সাম্রাজ্য বিস্তার করে। এই মতবাদের সমর্থনে পণ্ডিতগণ ভাষা-তাত্ত্বিক যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ব্যাবিলনীয়, হিব্রু, আরামীয়, আরবী ও ইথিওপীয় ভাষার সৌসাদৃশ্য উহাদের উৎপত্তিগত ও মৌলিক ঐক্য সূচিত করে। এতদ্ব্যতীত এই সকল জাতির সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও দৈহিক গঠন তুলনা করিয়া দেখিলেও এই সাদৃশ্য বিশেষ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কাজেই এই সকল জাতি ঐতিহাসিক কালে বিভিন্ন সভ্যতার জনক হিসাবে পরিচিত হওয়ার পূর্বে নিশ্চয়ই একক ও অভিন্ন জাতি হিসাবে কোন এক দেশে বসবাস করিত। এই মতবাদের ফল এই দাঁড়ায় যে, প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যের সভ্যতা প্রধানতঃ সেমিটিক জাতির সৃষ্টি এবং উক্ত জাতির নবীনতম ও সর্বশেষ শাখা হিসাবে ইতিহাসের আরবগণ তাহাদের স্বগোত্রীয়গণের প্রদর্শিত পথে 'উর্বর অর্ধ-চন্দ্র' এলাকায় রাজ্য-বিস্তার করিয়া সেমিটিক জাতির সামগ্রিক সভ্যতার উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত হয়। এই কারণে আমরা প্রাচীন মধ্য-প্রাচ্যের বিখ্যাত সেমিটিক জাতিগুলির নাম ও সভ্যতায় তাহাদের বিশেষ দান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

সেমিটিক জাতির লালন ভূমি: আরব দেশ

'উর্বর অর্ধচন্দ্র' অঞ্চলের সেমিটিক সভ্যতায় উৎপত্তি ও বিকাশের যুগ মোটামুটি খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ সাল হইতে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই যুগে আক্কাদীয়, আমোরীয়, আসিরীয় ও কালদীয় শাখার সেমিটিকগণ উক্ত অঞ্চলে বিশেষ করিয়া নিম্ন মেসোপটেমীয় অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তার করে। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ সাল হইতে উর্বর অর্ধচন্দ্রের পশ্চিমাঞ্চলে সিরিয়া-ফিলিস্তিনে আরও কয়েকটি সেমিটিক জাতি সভ্যতা বিকাশে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। ইহারা কানানীয় (ফিনিসীয়), আরামীয় ও হিব্রু নামে খ্যাত। মোটামুটিভাবে পূর্বাঞ্চলের সেমিটিকগণ রাজ্য শাসনে ও সাম্রাজ্য বিস্তারে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করে আর পশ্চিমাঞ্চলের সেমিটিকগণ ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ধর্ম-দর্শনে নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দেয়। সেমিটিক সভ্যতার এই গৌরবময় যুগে বিভিন্ন রাজ্য বা সম্রাট কর্তৃক আরবের অংশ বিশেষ দখলের চেষ্টা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

প্রাচীন মধ্য-প্রাচ্যে সেমিটিক সভ্যতা

পূর্বাঞ্চলের সভ্যতা

নিম্ন মেসোপটেমীয় অঞ্চলের প্রথম সেমিটিক জাতি আক্কাদীয় নামে পরিচিত। প্রায় এক হাজার বছর ধরিয়া ক্রমান্বয়ে আরব ও সিরিয়ার মরুভূমি হইতে বেদুঈনগণ নিম্ন মেসোপটেমীয় অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করিতে থাকে। ঐ অঞ্চলে তখন বিখ্যাত সুমেরীয় জাতি রাজত্ব করিত। সেমিটিকগণ সুমেরীয়দের নিকট হইতে গৃহনির্মাণ, ভূমিকর্ষণ, লিখন-পদ্ধতি ও নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করে। সেমিটিকদের রাজা সারগন সুমেরীয় ক্ষমতাকে পর্যুদস্ত করিয়া আক্কাদীয় বংশের প্রতিষ্ঠা করে।

নারাম-সিন (খ্রীঃ পূঃ ২২৭০—২২৩৩) উত্তরে আসিরিয়া ও পূর্বে পারস্যের লুরিস্তান ও খুজিস্তান পর্যন্ত সাম্রাজ্যের সীমানা বর্ধিত করিয়া "পৃথিবীর চারিপ্রান্তের রাজা" উপাধি গ্রহণ করেন। নারাম-সিন 'মাগান' নামক একটি স্থানও জয় করেন। ইহাকে পূর্ব ও মধ্য-আরবের কোন স্থান বলিয়া মনে করা হয়।

আক্কাদীয়গণের পতনের পর আমোরীয় সেমিটিকগণ সিরিয়ার দিক হইতে দাজলা-ফোরাত উপত্যকা অঞ্চলে আগমন করিয়া ব্যাবিলনে একটি রাজ্য স্থাপন করে। এই বংশের ষষ্ঠ রাজা হম্মুরাবি (খ্রীঃ পূঃ ১৭২৮—১৬৮৬) ভূমধ্যসাগরের তীর পর্যন্ত রাজ্যের সীমানা বর্ধিত করেন। তিনি "সুমের

ও আক্কাদের রাজা এবং পৃথিবীর চারিপ্রান্তের রাজা" উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি বহু জনহিতকর কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিভিন্ন প্রচলিত আইনের সঙ্কলন। "হম্মুরাবি-বিধি" নামে প্রসিদ্ধ এই আইন হইতে প্রাচীন ব্যাবিলনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানিতে পারি। পরবর্তী ইহুদী আইনের (Mosaic Law) সাথে ইহার যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। সমাজের লোকেরা উচ্চ অভিজাত শ্রেণী, মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী, শিল্পী ও সাধারণ লোক এবং দাসশ্রেণী—এই তিনভাগে বিভক্ত ছিল। ফৌজদারী দণ্ডবিধি কঠোর ছিল। "চক্ষুর বদলে চক্ষু ও দাঁতের বদলে দাঁত" এই আইনের ভিত্তি ছিল। এই আইনে নারীর অধিকার মোটামুটি সংরক্ষিত ছিল। এই আইনে বিশেষ বিশেষ অপরাধের জন্য বিশেষ বিশেষ দণ্ড বিধিবদ্ধ ছিল। অসাধু ঠিকাদার ও হাতুড়ে ডাক্তারের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। এই আইন মূলতঃ সুমেরীয় আইনের সংশোধিত ও পরিবর্তিত রূপ। হম্মুরাবির সময় ব্যবসা বাণিজ্যের বহুল প্রসার ঘটে এবং ব্যবসায়-সংক্রান্ত চুক্তি-পত্র, দলীল-দস্তাবেজ, সাক্ষ্য-প্রমাণাদি ও প্রমিসারী নোটের (অর্থের অঙ্গীকার পত্র) প্রচলন হয়। ব্যাবিলনীয় সেমিটিকগণ সাহিত্য-ক্ষেত্রেও বিশেষ উন্নতি লাভ করে। অবশ্য সাহিত্যে তাহাদের কোন মৌলিকতা বা স্বকীয়তা ছিল না। সুমেরীয় সাহিত্যের বিষয়বস্তুকে তাহারা নূতন রূপ দান করে। এই সাহিত্যের মধ্যে "গিলগামেশের কাহিনী" ও তথাকথিত "ব্যাবিলনীয় জবের" কাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত কাহিনীতে একজন দুঃসাহসিক বীরের অমরত্ব লাভের ব্যর্থ চেষ্টা ও দ্বিতীয়টিতে একজন ধার্মিক প্রবরের শোচনীয় দুঃখ দুর্দশার কথা বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত কাহিনীতে এক প্রলয়ঙ্করী বন্যারও বর্ণনা রহিয়াছে। এই যুগে বিজ্ঞানে কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয় নাই।

প্রাচীন ব্যাবিলনঃ হম্মুরাবির আইন

আসিরীয় সভ্যতা

দাজলা-ফুরাত উপত্যকার উত্তরে অবস্থিত পার্বত্য অঞ্চল আসিরিয়া নামে অভিহিত হইত। সেমিটিকদের যে শাখা এই অঞ্চলে বসবাস করিতে আরম্ভ করিল, তাহারা সমভূমির সেমিটিকগণ হইতে ভিন্ন প্রকৃতির হইয়া উঠিল। সমভূমির অধিবাসীরা শান্তিপ্রিয় ছিল।

আসিরিয়ার অধিবাসীরা পার্বত্য-অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত অনুর্বর ও শীতল আবহাওয়ায় বসবাস করিয়া দৈহিক গঠনে ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে শক্তিশালী ও কষ্ট-সহিষ্ণু হইয়া গড়িয়া উঠিল। এই জন্য তাহারা রোমানদের পূর্বে প্রাচীন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সামরিক জাতি। ইহাদের সূর্যদেবতা আশুরের নাম হইতে দেশ ও জাতির নামকরণ করা হইয়াছে।

আসিরীয়গণের প্রথম প্রসিদ্ধ রাজার নাম প্রথম তিগলাথ-পিলেসার (খ্রীঃ পূঃ ১১১৬—১০৯৩)। রাজা আশুর-নাসির-পালের সময় (খ্রীঃ পূঃ ৮৮৪—৮৫৯) তাহারা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়। তিনি উত্তর সিরিয়া জয় করিয়া ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত রাজ্যসীমা বর্ধিত করেন। আশুর-নাসির-পালের পুত্র তৃতীয় শালমানেজারের সময় কারকার নামক স্থানে তিনটি রাজার মিলিত শক্তির সঙ্গে আসিরীয়গণকে যুদ্ধ করিতে হয়। জুনদুবের আরব শায়খ ইহাদের অন্যতম। আসিরীয়গণের সহিত আরবদের এই প্রথম যোগসূত্র। রাজা তৃতীয় তিগলাথ-পিলেসারের সময় আরামীয় শহর দামিস্ক ও হিব্রুদের ইসরাইল অধিকৃত হয়। তিনি জাবিবী ও শামসী নামক দুইজন আরব রানীকে করদানে বাধ্য করেন। দ্বিতীয় সারগনের (খ্রীঃ পূঃ ৭২২—৭০৫) সময় আসিরীয় সাম্রাজ্য গৌরবের উচচ শিখরে আরোহণ করে। তিনি সামুদ জাতির আরবগণকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন এবং একজন সাবায়ী রাজাও তাহাকে করদানে বাধ্য হয়। সম্রাট সারগনের বংশধরগণ মিসর পর্যন্ত নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেন। তাহারাও আরবদেশের অংশ বিশেষ দখল করিয়া আরবদের নিকট হইতে কর আদায় করেন এবং সিরিয়ায় বেদুঈন উপদ্রব দমন করিবার জন্য বার বার অভিযান প্রেরণ করেন। এই যুগে আসিরীয়গণের নূতন রাজধানী নাইনিভা (Nineveh) "পশ্চিম এশিয়ার রানী" বলিয়া স্বীকৃত হয়।

আসিরীয় সভ্যতার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় তাহাদের সামরিক সাজ-সজ্জা ও যুদ্ধ কৌশল। অন্যপক্ষে তাহাদের ইতিহাস অকুণ্ঠ নরহত্যা, অবাধ লুটতরাজ ও নির্মম ধ্বংসকার্যের কলঙ্ক কালিমায় মসীলিপ্ত। তাহাদের সমাজে পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্ত্রীলোকদের জন্য অন্তঃপুর প্রথার সূত্রপাত হয়। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে তাহারা বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করে। তাহারা বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদাদি নির্মাণ করে। তাহারা প্রাসাদ-দ্বারে ও নগরদ্বারে মানুষের মস্তক বিশিষ্ট পক্ষযুক্ত প্রকাণ্ড ষাঁড়ের মূর্তি স্থাপন করিয়া মানব-মনে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিল। প্রাসাদের

অভ্যন্তরের প্রাচীর-গাত্রে যুদ্ধ ও শিকারের দৃশ্যাদি সমন্বিত নানা চিত্র শোভা পাইত। তাহারা সাম্রাজ্য-শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভাবক। বিজ্ঞানকে যুদ্ধবিগ্রহের কাজে ব্যবহার করিয়া তাহারা চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতি বিধান করে। বিভিন্ন রোগের কারণ সম্বন্ধে পঠন-পাঠনের ফলে এই সময় পাঁচ শতাধিক ঔষধ আবিষ্কৃত হয়। সম্রাট আশুর-বানি-পাল (খ্রীঃ পূঃ ৬৬৮—৬২৬) সাহিত্য ও শিল্পকলার একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজধানী নাইনিভায় তিনি যে পাঠাগার নির্মাণ করিয়াছিলেন, বিগত শতাব্দীতে তাহা ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করা হয়। এই পাঠাগারে ন্যূনাধিক ২৫000 মাটির চাকতি পাওয়া গিয়াছে। এইগুলিতে তাঁহার লিখিত হাজার হাজার পত্র, ব্যবসায়-সংক্রান্ত দলীল ও অন্যান্য মূল্যবান তথ্যাদি লিখিত রহিয়াছে। কোন কোন লিপিতে সামরিক বিজয় ও যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনী সালঙ্কারে ও সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। উত্তর আরবের তায়মা নামক স্থানে সর্বশেষ কালদীয় রাজার একটি প্রাদেশিক আবাস ছিল।

হম্মুরাবির পর প্রায় এক হাজার বৎসর পর্যন্ত ব্যবিলনের খ্যাতি লুপ্তপ্রায় হইয়া থাকে। আসিরীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর কালদীয়গণের অভ্যুত্থানের ফলে ব্যবিলনের নূতন যুগের সূচনা হয়। কালদীয় রাজা দ্বিতীয় নেবুকাদ নেজার (খ্রীঃ পূঃ ৬০৫—৫৬২) ব্যবিলনকে নূতন খ্যাতি ও সমৃদ্ধি দান করেন।

নূতন ব্যবিলন: কালদীয় সভ্যতা

তিনি মিসরের রাজাকে পরাজিত করিয়া সিরিয়ায় মিসরের কর্তৃত্ব লোপ করেন। তিনি ৫৮৬ (খ্রীঃ পূঃ) সালে ইহুদী রাজ্যের রাজধানী জেরুজালেমের ধ্বংস সাধন করেন। তিনি ব্যবিলন নগরীকে পুনরায় নির্মাণ করিয়া ইহার সৌন্দর্য বিধান করেন। স্থাপত্য-শিল্পে তাঁহার অপরিসীম অনুরাগ ছিল; তিনি বহু জনহিতকর কাজও করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কাজের মধ্যে পানিসেচের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, মন্দির ও প্রাসাদ নির্মাণ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার নির্মিত ব্যবিলন নগরের প্রাচীরটি এত প্রশস্ত ছিল যে, উহার দুই পার্শ্বে ছোট ছোট দুই সারি বাড়ী ছিল ও মধ্যে ঘোড়ার গাড়ী যাইবার পথ ছিল। নগরের মন্দিরগুলির মধ্যে কালদীয় দেবতা মারদুকের মন্দিরটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। নেবুকাদনেজারের প্রাসাদের রমণীয় 'শূন্য-উদ্যান' গ্রীকদের নিকট প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের এক আশ্চর্য বস্তু বলিয়া আখ্যায়িত হয়। কালদীয়গণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষ করিয়া অঙ্ক ও খগোল-বিজ্ঞানে, পারদর্শিতা অর্জন করে। তাহারা সাতদিনের একটি সপ্তাহ গণনা করিয়া

এক একটি দেবতার নামে এক একদিনের নামকরণ করিয়াছিল। এই সাতটি দেবতা ছিল আকাশের সাতটি গ্রহ। সপ্তাহের সপ্তম দিন বিশ্রামের জন্য ধার্য ছিল। কালদীয়গণ গ্রহ উপগ্রহ পর্যবেক্ষণ করিয়া বারটি রাশিচক্র (Signs of Zodiac) আবিষ্কার করে। তাহারা গ্রহানাদি (সূর্য ও চন্দ্র) সম্বন্ধে নির্ভুল পূর্বাভাস দিতে পারিত। কালদীয় বৈজ্ঞানিকগণ বৎসরের দৈর্ঘ্য নিরূপণে প্রায় নির্ভুল ছিল। গ্রহ-নক্ষত্রের নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ফলে কালদীয়গণ জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে। তাহারাই সর্বপ্রথম মানুষের ভাগ্য ও অদৃষ্ট গণনা করার জন্য এই জ্যোতির্বিদ্যার প্রচলন করে। এইভাবে অংশতঃ বিজ্ঞান ও অংশতঃ কুসংস্কারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জ্যোতিষ মানুষের জীবনে এক অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, কালদীয়গণ তাহাদের সাতজন দেবতাকে সাতটি গ্রহের সঙ্গে এক ও অভিন্ন করিয়া দেখিয়াছিল। তাহাদের বিশ্বাস, স্বর্গে এই গ্রহের গতিবিধি মর্ত্যে মানুষের কর্ম ও অদৃষ্টকে প্রভাবিত করে। তখন হইতে মানুষ বিশেষ করিয়া রাজা বাদশাহগণ জ্যোতিষীর সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কাজে হাত দিতেন না। কুরআনে বাবিল (ব্যাবিলন) শহরের জ্যোতিষীদের উল্লেখ রহিয়াছে।

পশ্চিমাঞ্চলের সভ্যতা

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ফোরাত উপত্যকায় যেমন সেমিটিক জাতির কয়েকটি দল পর পর সভ্যতা গঠনে ও পরিবর্ধনে সহায়তা করিয়াছিল, সেইরূপ উর্বর অর্ধচন্দ্র এলাকার পশ্চিমাংশে বর্তমান সিরিয়া-প্যালেস্টাইনেও সেমিটিকগণের কয়েকটি শাখা অনুরূপ সভ্যতা বিস্তারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। সেমিটিকগণের এই শাখাগুলির নাম কানানীয় (ফিনিসীয়), আরামীয় ও হিব্রু। কানানীয়গণ বা ফিনিসীয়গণ ভূমধ্য সাগরের পূর্ব উপকূলে খ্রীঃ পূঃ ৩000 সাল হইতে অনেকগুলি নগর-রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করিত। মাঝে মাঝে কোন কোন নগর-রাষ্ট্র অন্যান্য নগর-রাষ্ট্রের উপর প্রাধান্য বিস্তারের প্রয়াস পাইত। উত্তরে, পূর্বে ও দক্ষিণে বড় বড় শক্তিশালী সাম্রাজ্য দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা ও ঐক্য বরাবর বিপন্ন ছিল। তাহা ছাড়া ফিনিসীয়গণ স্বভাবতঃই শান্তিপ্রিয় জাতি ছিল। রাজ্যজয়ে বা যুদ্ধবিগ্রহে তাহাদের আগ্রহ ছিল না। তাই

কানানীয় বা ফিনিসীয় সভ্যতা

কোন সাম্রাজ্য কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহারা প্রচুর অর্থ দিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করিত এবং নিবিষ্ট মনে আপন আপন ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপৃত হইত। বাণিজ্যে ও শিল্পকলায় তাহাদের চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়। গ্রীকদের পূর্বে তাহারাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী, নৌ-চালনায় পারদর্শী ও ঔপনিবেশিক সম্প্রদায় ছিল। পরবর্তীকালে তাহারা কিছুদিন গ্রীকদের প্রতিদ্বন্দ্বীও ছিল। ফিনিসীয়গণ ধাতবশিল্পে ও কাচশিল্পে পারদর্শিতা অর্জন করে। তাহারা বয়নশিল্পে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। তাহাদের তৈয়ারী বেগুনী রংয়ের কাপড় (Purple) পৃথিবীবিখ্যাত ছিল। প্রাচীন রাজা-বাদশাহ্গণ ও পুরোহিতগণ এই রংয়ের পোশাক পরিধান করিতেন। ক্যাথলিক পুরোহিতগণ ও প্রাচ্যদেশীয় গীর্জার পাদরীগণ আজিও ঐ রংয়ের পোশাক পরিয়া থাকেন। ফিনিসীয়গণ তাহাদের বিভিন্ন পণ্য বোঝাই জাহাজ লইয়া সমুদ্র-পথে প্রথম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আরম্ভ করে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। ফিনিসীয়গণের নৌচালনা ও শিল্পোন্নয়নে বিশেষ মৌলিকতা ছিল না, কিন্তু তথাপি সভ্যতার ইতিহাসে ইহাদের একটি অতি উল্লেখযোগ্য ও স্থায়ী অবদান রহিয়াছে। তাহারা প্রাচীন মিসরীয় লিখন-পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়া একটি সহজ লিখন-পদ্ধতি উদ্ভাবন করে। তাহারা ২২টি ব্যঞ্জন বর্ণ আবিষ্কার করে এবং বর্ণমালার Alphabet নাম তাহাদের প্রথম দুই অক্ষর Aleph ও Beth হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। ফিনিসীয়গণ বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। তন্মধ্যে ভূমধ্য সাগরে অবস্থিত সাইপ্রাস, সিসিলি, সার্ডিনিয়া প্রভৃতি দ্বীপ, মিসর, ফ্রান্স ও স্পেনের দক্ষিণ উপকূল অঞ্চল ও উত্তর আফ্রিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহারাই সর্বপ্রথম আট-লান্টিক মহাসাগরে সমুদ্রযাত্রা করে ও আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করে।

আরামীয় সভ্যতা

আরামীয় সেমিটিকগণ কানানীয়গণের (ফিনিসীয়গণের) মতই আরবের মরুভূমি হইতে আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ সালে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। ইহার পর তাহারা সিরিয়া অঞ্চলে চলিয়া যায়। আমোরীয় ও কানানীয় সভ্যতায় প্রভাবিত হইয়া তাহারা দামিস্কের আশে পাশে অনেকগুলি নগররাষ্ট্র স্থাপন করে। তন্মধ্যে আরাম বা দামিস্ক প্রধান। ফিনিসীয়গণ

যেমন বাণিজ্যের জলপথ নিয়ন্ত্রণ করিত, তেমনি আরামীয়গণ স্থল-ভাগের বাণিজ্য-পথের পুরোভাগে অবস্থিত থাকিয়া যাবতীয় স্থল-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিত। এইজন্য তাহাদিগকে "আভ্যন্তরীণ এশিয়ার ফিনিসীয়" বলিয়া অভিহিত করা হইত। খ্রীঃ পূঃ ৭৩২ সালে আরামীয়গণ আসিরিয়ার হাতে স্বাধীনতা হারায়। ইহার পরেও বহুদিন যাবৎ বাণিজ্য ক্ষেত্রে আরামীয়গণের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। তাহাদের সাহায্যে ফিনিসীয় বর্ণমালা সমগ্র 'উর্বর অর্ধচন্দ্র অঞ্চলে' ছড়াইয়া পড়ে। আরামীয় ভাষা কিন্তু অন্যান্য সেমিটিক ভাষা হইতে পৃথক ছিল। যীশু খ্রীস্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্বে আরামীয় ভাষাই সমগ্র উর্বর অর্ধচন্দ্র অঞ্চলের ভাষা বলিয়া পরিগণিত হয়। এই ভাষাই যীশু খ্রীস্টের মাতৃভাষা ছিল।

হিব্রু সভ্যতা

হিব্রুগণ (ইসরাইল বংশীয় বা ইহুদীগণ) দুই দলে পরপর কানান রাজ্যে প্রবেশ করে। প্রথম দল আরামীয়গণের সহিত খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ সালে আরবের মরুভূমি হইতে আসে। হিব্রু কিংবদন্তী অনুসারে তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষ আব্রাহামের (ইব্রাহীমের) নেতৃত্বে শত শত বৎসর ধরিয়া একটি বাসস্থানের অনুসন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে কানানে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে মিসর হইতে দ্বিতীয় হিব্রু দল হজরত মুসার নেতৃত্বে সিনাই উপদ্বীপ হইয়া প্যালেস্টাইনে আসে। তখন হইতে তাহাদের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হয়। সিনাইয়ে অবস্থান কালে হজরত মুসা মিদয়ানের একজন ধর্মনেতার কন্যার পানিগ্রহণ করেন। ইহুদীগণ সিনাইয়ে চল্লিশ বৎসর অবস্থান করে। এখানে অবস্থানকালে হজরত মুসার আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটে। প্যালেস্টাইনে ইহুদীগণের বারটি সম্প্রদায়কে একক অদ্বিতীয় যিহোভার বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ দেখা যায়। সেখানে স্থানীয় কানানীগণ ব্যতীত 'ফিলিস্তাইন' নামক এক জাতির লোক তাহাদের বৈরী হইয়া দাঁড়ায়। হিব্রুগণ তাহাদের নেতা ড্যাভিডের (দাউদ আঃ) নেতৃত্বে ফিলিস্তাইনীগণকে পরাজিত করিয়া খ্রীঃ পূঃ ১০০০ সালে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী সলমনের (সুলায়-মান আঃ) সময় হিব্রু রাজ্য উন্নতির সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করে। জলপথে ও স্থলপথে এক সুদূরপ্রসারী ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁহার আয়ের

প্রধান উৎস ছিল। আকাবা উপসাগরে তাঁহার একটি বিরাট নৌবহর ছিল। তিনি জেরুজালেমে একটি জমকালো উপাসনালয় নির্মাণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে 'শেবার রানী' নাম্নী এক আরব রানী তাঁহাকে মূল্যবান উপঢৌকন পাঠান। আরবের সিনাই অঞ্চল তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুলায়মানের (আঃ) মৃত্যুর পর হিব্রু রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। উত্তরাঞ্চলের রাজ্যের নাম ছিল ইসরাইল আর দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যের নাম ছিল জুদা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কালক্রমে রাজ্য দুইটি আসিরীয় ও কালদীয় সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। খ্রীঃ পূঃ ৭২১ সালে সম্রাট দ্বিতীয় সারগন ইসরাইল অধিকার করেন। খ্রীঃ পূঃ ৫৮৭ সালে সম্রাট নেবুকাদনেজার জেরুজালেম শহর ধ্বংস করেন। খ্রীঃ পূঃ ৫৩৮ সালে পারস্য সম্রাট কুরুস (Cyrus) কালদীয়গণকে পরাজিত করিয়া ইহুদীদেরকে জেরুজালেমে ফিরিয়া আসিবার অনুমতি দান করেন।

বিশ্বসভ্যতায় হিব্রুদের দান

হিব্রুগণ অপরাপর প্রাচীন সেমিটিকগণ হইতে ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। যুদ্ধবিগ্রহ, কূটনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান বা শিল্পকলায় তাহারা কোন স্বকীয়তা বা মৌলিকতা প্রদর্শন করিতে পারে নাই, কিন্তু বিশ্বসভ্যতায় তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী দান তাহাদের ধর্ম ও নীতি-জ্ঞান। তাহারা সমগ্র মানবজাতির ধর্ম ও নীতি-জ্ঞানের প্রথম শিক্ষক। ওল্ড টেস্টামেন্ট এই নীতি-জ্ঞানের অনবদ্য ও চিরন্তন উৎস। ধর্মের ক্ষেত্রে একত্ববাদের উদ্গাতা ইহুদীগণই। যুগে যুগে সাধক, কবি, লেখক ও বক্তা 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' হইতে অপূরণীয় অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে। তাহাদের ধর্মবিশ্বাসের সহিত 'নবুয়তের' ধারণা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অধ্যাপক হিট্টি বলেন, "এই নবুয়তবাদের ভিত্তির উপরই খ্রীস্ট (তাঁহার ধর্ম) গড়িয়াছেন এবং সম্মিলিত ইহুদী-খ্রীস্টান কাঠামোর উপরেই মুহম্মদ (দঃ) তাঁহার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।" ইহুদীগণের একত্ববাদ প্রচারে আমস, ইসাইয়া, জেরেমিয়া, এজেকিল ও হোসিয়া প্রভৃতি ধর্মনেতাগণ বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন।

মিসরের প্রাচীন সভ্যতা

রাজনৈতিক ইতিহাস

মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন সেমিটিক সভ্যতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সেমিটিক জাতি ও ইহাদের স্বগোত্রীয় হেমিটিকগণ প্রথমে এক মহাজাতি হিসাবে আফ্রিকায় বসবাস করিত। হেমিটিকগণ মিসরে এক উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি করে। মিসরের ইতিহাসে মোটামুটি দুইটি যুগ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটি হইল অতি প্রাচীন যুগ; দ্বিতীয়টি বিভিন্ন রাজবংশের যুগ। খ্রীঃ পূঃ ৩৪০০ সাল পর্যন্ত অতি প্রাচীন যুগ ধরা হয়। রাজবংশের যুগ ৩৪০০ সাল হইতে আরম্ভ হইয়া ৫২৫ সালে শেষ হইয়াছে। প্রথম যুগে মিসর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং ক্রমান্বয়ে ইহারা নিজেদের স্বাধীন সত্তার বিলোপ করিয়া দক্ষিণ ও উত্তর মিসরে দুইটি বড় রাজ্যের সৃষ্টি করে। কালক্রমে এই দুইটি রাজ্যও একটি বৃহৎ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। সমগ্র মিসর এক রাজার দ্বারা শাসিত হওয়ার পর হইতে মিসরের রাজবংশের যুগ আরম্ভ হয়। এই যুগে মিসরের রাজাকে ফের'আউন বলা হইত। এই যুগকে আবার প্রাচীন রাজবংশের যুগ, সামন্ত-যুগ, মধ্য-রাজ্যের যুগ, হিকসস অধিকারের যুগ ও সাম্রাজ্যের যুগ এই পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রাচীন রাজবংশের যুগে মিসরের বিখ্যাত পিরামিডগুলি নির্মিত হয়। তন্মধ্যে ফের'আউন খুফুর পিরামিড সর্ববৃহৎ। কথিত আছে, এক লক্ষ লোক বিশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া এই পিরামিড নির্মাণ করিয়াছিল। এই যুগের পর অন্তর্কলহের ফলে বিভিন্ন সামন্ত রাজ্যের উদ্ভব হয় এবং মিসরের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হয়। মধ্য রাজবংশের যুগে মিসরের রাজনৈতিক ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং অর্থসম্পদে, সাহিত্যে ও শিল্পকলায় মিসরের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। মধ্যবর্তী রাজবংশের যুগের পর দুই শতাব্দী পর্যন্ত মিসরে হিক্‌সস নামক বিদেশী আক্রমণকারী যোদ্ধ-সম্প্রদায় রাজত্ব করিতে থাকে। ইহার পর মিসরে সাম্রাজ্যের যুগ আরম্ভ হয়। খ্রীঃ পূঃ ১৫৮০ সাল হইতে ৫২৫ সাল পর্যন্ত এই যুগ স্থায়ী হয়। এই যুগের ফের'আউন তৃতীয় তুতমোসিস সিরিয়া, ফিনিসিয়া, প্যালেস্টাইন ও ব্যাবিলনিয়া জয় করেন। মিসরের রাজধানী থীব্‌স্ (Thebes) পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হয়। এই যুগের শেষের দিকের তুতনখামেন নামক ফের'আউনের সমাধি ১৯২২ সালে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় রামসেসের আমলে ইহুদী নির্যাতনের ফলে হযরত মুসার নেতৃত্বে ইসরাইলগণ মিসর ত্যাগ করে। ইহার পর কিছুকাল মিসর আফ্রিকার রাজাদের শাসনাধীনে থাকে। খ্রীঃ পূঃ ৫২৫ সালে পারস্য সম্রাট ক্যাম্বিসেস নীলনদের উপত্যকা অধিকার করেন।

সভ্যতায় মিসরের দান

প্রাচীন যুগে মিসরে কৃষির উন্নতি সাধিত হয়। সেচ-ব্যবস্থা উন্নত হয়। মিসরবাসিগণ এই যুগে এক প্রকার চিত্রলিপির প্রবর্তন করে। তাহারা প্রথম পঞ্জিকা আবিষ্কার করে। পুরাতন রাজবংশের যুগে রাজা একক ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া ফের'আউন বা ফারাও নামে অভিহিত হন। ফারাও শব্দের অর্থ "বৃহৎ গৃহ"। তিনি রাজপুরুষ ও দেবতা উভয় গুণে গুণান্বিত হন। সমাজে শ্রেণী-বিভাগ ছিল—উচ্চ অভিজাত-সম্প্রদায়, মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায় ও দাস। জল ও স্থলপথে মধ্যপ্রাচ্যের যাবতীয় বাণিজ্যে মিসরের প্রাধান্য ছিল। মিসরীয়গণ অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিল। মৃত্যুর পর অমরত্ব লাভের ঐকান্তিক ইচ্ছা তাহাদিগকে ধর্মকর্মে অনুপ্রাণিত করে। নীলনদের দেবতা ওসিরিসকে কেন্দ্র করিয়া একটি উপাখ্যানের সৃষ্টি হয়। ওসিরিস তাহার কুমতি ভ্রাতা সেঠ কর্তৃক নিহত হন। তাঁহার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া দেশের নানাস্থানে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। তাঁহার বিধবা পত্নী আইসিস শরীরের টুকরাগুলিকে একত্র করিয়া তাঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এইভাবে ওসিরিসের অমরত্ব লাভ ঘটে। তাঁহাকে মিসরে প্রথম মমী বলা হয়। তখন হইতে মৃতদেহকে মমী করিয়া কবরে রাখার প্রথা চালু হয়। ফের'আউনকে মমী করিয়া বিরাট সমাধিতে রাখা হইত। এইগুলির নাম পিরামিড। ওসিরিস ব্যতীত মিসরবাসীদের আরও অন্যান্য দেবতা ছিল। সূর্যদেবতার নাম ছিল রা; এটন নামেও এই দেবতা পরিচিত হইত। আমুন-রা নামক এক মহান দেবতার নামও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মিসরীয়গণের চিত্রলিপির কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহারা পাপাইরাস নামক এক প্রকার পাতায় লেখা শুরু করিয়াছিল, উদ্ভিজ্জ আঠার সহিত প্রদীপের কালি মাখাইয়া কালি প্রস্তুত করিয়াছিল। প্রাচীন মিসর সাহিত্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। তাহাদের ধর্মীয় সাহিত্যই এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ফের'আউন

শিল্প
সংস্কৃতি ও
সাহিত্য

মৃত-দেহের সহিত রক্ষিত বিস্তারিত লিপিতে মৃতের বিচার ও কঠোর পরীক্ষার বিষয় বর্ণিত আছে। ইহাকে 'মৃতের পুস্তক' নামে অভিহিত করা হয়। মৃত ব্যক্তি পরকালে বিচারের জন্য যাত্রা করিলে তাহাকে বিচারকদের সম্মুখে নতজানু হইয়া প্রথমে বিভিন্ন পাপ হইতে নির্দোষিতার কথা ঘোষণা করিতে হয়। যেমন "আমি চুরি করি নাই", "মিথ্যা কথা বলি নাই", "পরচর্চা করি নাই"। তারপর একে একে নিজের সৎকর্মের তালিকা আওড়াইতে হয়, যেমন "আমি পবিত্র, আমি ক্ষুধার্তকে অন্নদান করিয়াছি, তৃষ্ণার্তকে পানি দিয়াছি, বিবস্ত্রকে বস্ত্র দিয়াছি, নৌকাহীনকে পার করাইয়াছি!" এইভাবে বিচারকদের সম্মুখে কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মৃত ব্যক্তি ওসিরিসের সম্মুখে নীত হয় এবং অনন্ত জীবন লাভ করে। মধ্যরাজ্যের যুগ মিসরীয় সাহিত্যের চরমোৎকর্ষের যুগ। এই সময় সাহিত্যের বিভিন্ন দিক উন্নত হয়। জনপ্রিয় সাহিত্যের মধ্যে "দুই ভ্রাতার গল্প" বাইবেল ও কুরআনের ইউসুফ (আঃ) ও তদীয় ভ্রাতাগণের কাহিনীর অনুরূপ। প্রাচীন মিসরীয় সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা সুন্দর, মহীয়ান ও ভাবগম্ভীর সাহিত্য ফের'আউন ইখনাটনের "সূর্যদেবতার প্রশস্তি"। ইহাতে তিনি সর্বশক্তিমান, মহানুভব এক স্রষ্টার উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন:

তুমি সুন্দর ও মহান
সকল দেশের উপর তুমি আলোর মহিমায় উজ্জ্বল;
তোমার কিরণ পরিব্যাপ্ত চরাচরে,
ব্যাপ্ত তোমার সকল সৃষ্টিতে;
বহুমুখী তোমার কীর্তি
আমাদের দৃষ্টিসীমা বহির্ভূত;
হে একক স্রষ্টা, 'তুমি অদ্বিতীয় ক্ষমতাবান।
আপনার মনে তুমি পৃথিবী সৃষ্টি করেছ
যখন তুমি ছাড়া আর কেউ ছিল না।

সাহিত্য ছাড়া মিসরীয়গণ বিজ্ঞানেও বিশেষ উন্নতি লাভ করে। তন্মধ্যে জ্যোতিষ ও অঙ্ক প্রধান। তাহারা সৌর-গণনা পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া তিরিশ দিনের এক মাস ও বার মাসের এক বৎসর নির্ধারিত করে। পিরামিড নির্মাণে ও ভূমির সীমানা নির্ধারণে তাহাদের জীবনে জ্যামিতি

ও গণিতের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয়। অঙ্কের যোগ, বিয়োগ ও ভাগ তাহাদের জানা ছিল। কিন্তু গুণন-পদ্ধতি তাহাদের জানা ছিল না। দশমিকের অঙ্ক সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান ছিল, কিন্তু ভগ্নাংশ সম্বন্ধে তাহারা অজ্ঞ ছিল। চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও মিসরীয়গণ উন্নতি লাভ করে। তাহাদের মধ্যে চক্ষু ও দন্ত-চিকিৎসক, অস্ত্র-চিকিৎসক ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ছিল। এই চিকিৎসা-বিজ্ঞান গ্রীক পণ্ডিতগণের মাধ্যমে প্রথমে আরব ও পরে ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রসারলাভ করে।

বিস্তারিত পাঠ্য-তালিকা

১. হিট্টি: দি নিয়ার ইস্ট ইন হিস্ট্রি,
ভ্যান নস্ট্রাণ্ড কোম্পানী, ১৯৬০ খ্রীঃ।

২. ওয়াল ব্যাঙ্ক ও টেইলার: সিভিলাইজেশন—পাস্ট এণ্ড প্রেজেন্ট, ১ম খণ্ড,
স্কট, ফোরসম্যান এণ্ড কোম্পানী, ১৯৪৯ খ্রীঃ।

৩. বার্নস্ এণ্ড রাল্ফ: ওয়ার্ল্ড সিভিলাইজেশন্‌স্,
অক্স্‌ফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পাকিস্তান ব্রাঞ্চ,
১৯৬১ খ্রীঃ।

৩

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রথম সংযোগ

মধ্যপ্রাচ্যে ইউরোপীয় অধিকার

মাসিডনের বিশ্ববিশ্রুত বীর আলেকজাণ্ডার একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া খ্রীঃ পূঃ ৩৩৪ সালে দার্দানেলিস প্রণালী পার হইয়া ইউরোপ হইতে এশিয়ায় পদার্পণ করেন। পারস্য সম্রাট দারায়ুসের সুবিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত খ্রীঃ পূঃ ৩৩৩ সালে তাঁহার যুদ্ধ হয়। এশীয় বাহিনী সংখ্যায় তিনগুণ অধিক হইলেও ইউরোপীয় বাহিনীর উন্নততর যুদ্ধকৌশল ও নিয়মানুবর্তিতার সহিত তাহারা পারিয়া উঠিল না। পারসিকগণ পরাজিত হয়, সমগ্র সিরিয়া গ্রীকদের পদানত হয়। বর্তমান আলেকজান্দ্রেটা (ইস্কান্দারুন) উক্ত বিজয়ের স্মৃতি বহন করিতেছে। সিরিয়া বিজয়ের পর এই দিগ্বিজয়ী বীর মিসর জয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মিসরের উত্তরাঞ্চল দখল করার পর আলেকজাণ্ডার আলেকজান্দ্রিয়া (আল-ইস্কান্দারিয়া) শহরের পত্তন করেন। মিসর জয় সমাপ্ত করিয়া তিনি আবার পারস্য সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং পারসিক রাজধানী পার্সিপলিস জ্বালাইয়া দেন। অতঃপর অক্ষু (Oxus) নদী অতিক্রম করিয়া তিনি সোগদিয়ানা (বুখারা) দখল করেন। তারপর আফগানিস্তানের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া পাক-ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দখল করেন। খ্রীঃ পূঃ ৩২৩ সালে ব্যাবিলনে এই দিগ্বিজয়ী বীরের মৃত্যু হয়। আলেকজাণ্ডারের মধ্যপ্রাচ্য আক্রমণের ফলে গ্রীক ও মধ্যপ্রাচ্যদেশীয় ভাবধারা ও রীতি-নীতির সংমিশ্রণের সুযোগ হয়। পশ্চিম এশিয়া ও মিসরে এক সহস্র বৎসরের জন্য ধারাবাহিকভাবে ইউরোপীয় প্রভাব অনুভূত হইতে থাকে। একাধিক্রমে মাসিডনীয়, গ্রীক, রোমান ও বাইজান্টাইন শাসন ও সংস্কৃতি এই অঞ্চলে স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া যায়। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার চারিজন সেনাপতি, সেলিউকাস ব্যাবিলনিয়ায়, টলেমী (tolemy) মিসরে, এন্টিগোনাস এশিয়া-মাইনরে ও এন্টিপেটার মাসিডনিয়ায় শাসন করিতে থাকে।

হেলেনিস্টিক সভ্যতা

আলেকজাণ্ডারের মধ্যপ্রাচ্য অধিকারের পর গ্রীক ও প্রাচ্যদেশীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফলে একটি নূতন সভ্যতার উদ্ভব হয়. ইহার নাম হেলেনিস্টিক সভ্যতা। বিশুদ্ধ গ্রীক বা হেলেনিক সভ্যতা হইতে ইহা পৃথক। এই সভ্যতার বাহন গ্রীক ভাষা হইলেও, ইহা ছিল একটি আন্তর্জাতিক সভ্যতা এবং ইহার উপর প্রাচ্যের প্রভাব অত্যন্ত পরিস্ফুট। সিরিয়া, মিসর ও ইরানে এই সভ্যতা বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। জিনো নামক একজন ফিনিসীয় স্টয়িক দার্শনিক মতবাদ প্রবর্তন করেন। এপিকিউরিয়ান মতবাদের উপরেও ফিনিসীয় প্রভাব রহিয়াছে। হেলেনিস্টিক সভ্যতার সর্বপ্রধান কেন্দ্রগুলি ছিল উত্তর সিরিয়ার এন্টিয়কে ও মিসরে আলেকজান্দ্রিয়ায়। শেষোক্ত স্থানে গ্রীক শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি বিখ্যাত কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। আলেকজান্দ্রিয়ার পাঠাগার বিশ্ববিশ্রুত। এখানকার অধ্যক্ষ এরাটস্থিনিস্ ভূগোল বিজ্ঞানে সুদক্ষ ছিলেন। তাহার লেখা হইতে পৃথিবীর গোলত্ব ও বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের নামকরণ সম্পর্কে জানা যায়। তিনিই সর্বপ্রথম অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা বিশিষ্ট মানচিত্র অঙ্কন করেন। এরিস্টফিনিস নামক আর একজন পাঠাগারের অধ্যক্ষ সাহিত্যে সুখ্যাতি লাভ করেন। ইউক্লিডের জ্যামিতি আজিও পৃথিবীর সর্বত্র স্কুলপাঠ্য হিসাবে পঠিত হইতেছে। হিপারকাস (Hipparchus) নামক বৈজ্ঞানিক সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত জ্যোতির্বিদ্যার প্রবর্তন করেন। তিনি নক্ষত্রাদির উচ্চতা নির্ণয়ের জন্য Astrolabe আবিষ্কার করেন। রোমানদের বিজয়ের পরেও আলেকজান্দ্রিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়ার বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে সর্বশেষ টলেমী জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে Almagest নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এরিস্টার্কাসের মতবাদ উপেক্ষা করিয়া তিনি "ভূকেন্দ্রিক মতবাদ" (অর্থাৎ পৃথিবী স্থির এবং সূর্য উহার চারিদিকে ঘুরিতেছে) প্রচার করেন। তাঁহারই প্রভাবে ষোড়শ শতাব্দীতে কোপার্নিকাসের সময় পর্যন্ত এই ভ্রান্ত মতবাদ ইউরোপে প্রচলিত থাকে। টলেমী অনেকগুলি মানচিত্র অঙ্কন করেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত পর্যটক ও অভিযাত্রীদল তাঁহার মানচিত্রের ব্যবহার অপরিহার্য বলিয়া মনে করিত।

মধ্যপ্রাচ্যে রোমান শাসন

রোমানগণ খ্রীঃ পূঃ ৬৪ সালে সিরিয়া ও ৩০ সালে মিসর জয় করে। ইহার পূর্বে এশিয়া-মাইনরও রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। রোমান শাসনের ফলে এই সকল অঞ্চল ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। সর্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধি লাভ করে সিরিয়া। এন্টিয়ক শহর সিরিয়ার রাজধানী হিসাবে আলেকজান্দ্রিয়ার সমপর্যায়ভুক্ত হইয়া উঠে। এখানে রোমানদের যাবতীয় আনন্দোৎসব যেমন ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা, নৃত্য, কুস্তীযুদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইত। গ্রীক হেলিওপলিস শহরটি রোমানদের সময় উহার ধর্মমন্দিরের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। বেরিটাস (Berytus : অধুনা বাইরুত) শহর জ্ঞান-সাধনার কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখানে রোমান আইন অধ্যয়নের একটি কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। রোমানদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া উত্তর-আরবে ও সিরিয়ার মরু অঞ্চলে পর পর দুইটি নগর-রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে। ইহার একটি পেট্রা, অপরটি পামীরা। ইহাদের বিষয় পরে আলোচনা করা হইবে। রোমানদের আমলে প্যালেস্টাইনে জুদাইয়া নামে একটি রাজ্য গড়িয়া উঠে। হিরড (Herod) নামক একজন রাজার শাসনকালে এই রাজ্যের সীমানা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সম্রাট টিটাসের সময় রোমানগণ ৭০ খ্রীস্টাব্দে জেরুজালেম নগরীর ধ্বংস সাধন করে।

রোমান শাসনকালে মিসরও সমৃদ্ধির উচ্চ সোপানে উন্নীত হয়। রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়াকে পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত নগরী হিসাবে গণ্য করা হইত। নগরীর এক চতুর্থাংশ নানা সুরম্য অট্টালিকা ও মন্দিরে শোভিত ছিল। এখানে বহুসংখ্যক ইহুদী বসবাস করিত। এই যুগে উন্নত সেচ-ব্যবস্থার ফলে মিসরের কৃষিকার্যে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। দেশ শিল্পায়িত হয়। বয়নশিল্পে, কাঁচ ও ধাতব শিল্পে মিসর আগেকার মতই তাহার সুনাম ও সুখ্যাতি বজায় রাখে। রোমান সভ্যতা নগরভিত্তিক ছিল; সেজন্য দেশের অভ্যন্তরে গতানুগতিক জীবনধারা অপরিবর্তিতই থাকিয়া যায়।

রোমান শাসনামলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা খ্রীস্টান ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ। খ্রীস্টান ধর্ম মূলতঃ একটি সেমিটিক ধর্ম। স্রষ্টার ভালবাসা ও মানুষের ভালবাসা ইহার মূল বিষয়বস্তু। রোমান সম্রাটগণ প্রথমে এই

ধর্মাবলম্বীগণকে নির্যাতন করিতেন। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের বিশালত্ব ও ঐক্য খ্রীস্টধর্মের সার্বজনীনতা ও উদারতার পথ প্রশস্ত করে, সমগ্র রোমান সাম্রাজ্য খ্রীস্টধর্মের প্রচার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। বলা বাহুল্য, গ্রীক-দর্শন, রোমান রাজনৈতিক সংস্থা, প্রাচ্যের ধর্মপ্রবণতা, হিব্রু ন্যায়নিষ্ঠা ও খ্রীস্টীয় ভালবাসা প্রভৃতির সমন্বয়ে খ্রীস্টধর্ম পরিপূর্ণতা লাভ করে। গ্রীক-প্রভাবিত হেলেনিস্টিক দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা রোমান আমলেও মধ্যপ্রাচ্যে অব্যাহত থাকে। দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্যালেন তাঁহার বিখ্যাত চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার টলেমী গাণিতিক জ্যোতির্বিদ্যায় বিশিষ্টতা অর্জন করেন। স্ট্রাবো ভৌগোলিক বিশ্বকোষ প্রণয়ন করেন। নও-আফলাতুনবাদ মধ্যপ্রাচ্যীয়গণেরই সৃষ্টি। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্ল্যাটো ও এরিস্টটলের দর্শন ও প্রাচ্যদেশীয় ভাবধারার সমন্বয় সাধন। আলেকজান্দ্রিয়া এই নূতন দার্শনিক মতবাদের কেন্দ্রস্থল ছিল। ইহা ছাড়া এখানে নূতন খ্রীস্টান দর্শনেরও উৎপত্তি হয়। খ্রীস্টধর্মের এ্যারিয়ান ও উহার বিরোধী এথেনেসিয়ান শাখা একত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদের বিতর্ক লইয়া প্রথম আলেকজান্দ্রিয়ায় উদ্ভূত হয়। এস্লনী নামক একজন সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীও এই সময় আলেকজান্দ্রিয়ার নিকটে বসবাস করিতেন। সন্ন্যাসবাদেরও প্রথম উৎপত্তি মিসরেই হইয়াছিল। সিরিয়া ও পারস্যে এই সময় কয়েকটি মিস্টিক মতবাদ গড়িয়া উঠে।

বাইজান্টাইন আমলে মধ্যপ্রাচ্য

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর মধ্যপ্রাচ্যে বাইজান্টাইন অধিকার প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সভ্যতার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাই মধ্যপ্রাচ্যে বাইজান্টাইন শাসনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। রোমান সম্রাট কনস্টান্টাইন ৩২৭ খ্রীস্টাব্দে ইউরোপ ও এশিয়ার সংযোগস্থলে পুরাতন গ্রীক শহর বাইজান্টাইনে একটি নূতন রাজধানীর পত্তন করেন। নূতন রোম (Nova Roma) নামক এই নগরী তাঁহার নামানুসারে শীঘ্রই কনস্টান্টিনোপল নামে অভিহিত হয়। ৩৯৫ সালে সম্রাট থিওডোসিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র সাম্রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমাংশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। এইভাবে স্বতন্ত্র পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য বা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের উৎপত্তি হয়। ৪৭৬ সালে বর্বর জার্মান সম্প্রদায়-

সমূহের প্রচণ্ড আক্রমণে রোমের পতন হয়, পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য শুধু জার্মান আক্রমণ হইতেই রক্ষা পায় নাই বরং পরবর্তী কালে মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিয়া বহুকাল যাবৎ খ্রীস্টধর্ম ও সভ্যতার প্রধান ঘাঁটি হিসাবে বাঁচিয়া থাকে। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য একদিকে যেমন রোম-গ্রীক সভ্যতার উত্তরাধিকারী হইয়া পড়ে, অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক ভাবধারা কন্স্টান্টিনোপলকে প্রভাবিত করে।

তাই রোমান, গ্রীক ও প্রাচ্যদেশীয় উপকরণের সমন্বয়ে গড়িয়া উঠিল বাইজান্টাইন সভ্যতা। কালক্রমে রোমের খ্রীস্টধর্ম ও কন্স্টান্টাইনের খ্রীস্টধর্মের মধ্যে মতবিরোধ ও মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। কনষ্টান্টিনোপলের ধর্ম 'গ্রীক সনাতনধর্ম' (Greek Orthodox Church) নামে পরিচিত হয়।

বাইজান্টাইন শাসনামলে সিরিয়া ও মিসরে সর্বপ্রথম বিজাতীয় শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দানা বাঁধিয়া উঠে। বাইজান্টাইন শাসকগণ রোমানদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্বৈরাচারী, অত্যাচারী ও পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু ছিলেন। বাইজান্টাইন শাসনের বিরুদ্ধে সেমিটিক ও হেমিটিক জাতির রাজনৈতিক অসন্তোষ স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করে। এই স্বাতন্ত্র্যবোধ সিরিয়া ও মিসরে ধর্মের ক্ষেত্রেও বিভিন্নতার সৃষ্টি করে। কন্স্টান্টিনোপলের সরকার ও ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ এই সকল স্বতন্ত্রবাদকে স্বীকৃতি না দেওয়ায় এই বিরোধ ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করে। সিরিয়ায় পঞ্চম শতাব্দীতে স্বতন্ত্র ধর্মমত গড়িয়া উঠে। সিরিয়ার ধর্মের ভাষা হইল আরামীয়। এখানে দুইটি মতবাদ পর পর প্রাধান্য লাভ করে। ইহাদের নাম নেস্টোরীয় ও মনোফিসীয়। প্রথমোক্ত মতানুসারে যীশু-খ্রীস্ট দুইটি ব্যক্তিত্বের অধিকারী, একটি স্বর্গীয় অপরটি মানবীয়। দ্বিতীয় মতে যীশুখ্রীস্টের স্বর্গীয় ও মানবীয় সত্তা একই ব্যক্তিত্বে সম্মিলিত হইয়াছে। মিসরেও খ্রীস্টধর্মে অনুরূপ স্বতন্ত্রমতবাদের সৃষ্টি হয়। রোমান আমলে এরিয়ান ও এথেনেসিয়ান মতবাদের দ্বন্দ্বের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বাইজান্টাইন আমলে সিরিয়ার অনুকরণে মিসরে মনোফিসীয় মতবাদ গড়িয়া উঠে। মিসরের গীর্জার ভাষা হইল কপ্টিক। এইভাবে সিরিয়া ও মিসরে স্বতন্ত্র ধর্মীয় মতবাদের মাধ্যমে কন্স্টান্টিনোপল সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ পায়।

ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে মধ্যপ্রাচ্য

বাইজান্টাইন ও সাসানীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা

মধ্যপ্রাচ্যে ন্যূনাধিক সহস্র বৎসরের বিদেশী শাসনের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের একটি অংশে এই বিদেশী শাসন দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নাই। পারস্য আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের ফলে গ্রীকদের পদানত হইলেও এক শত বৎসরের অধিককাল পারস্যে গ্রীক শাসন টিকিয়া থাকিতে পারিল না। প্রাচীন যুগে পারসিকগণ তাহাদের দেশে এক অতি উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সর্বপ্রাচীন পারসিক সাম্রাজ্যের নাম একিমেনীয় সাম্রাজ্য। খ্রীস্টপূর্ব ৫৫০ সাল হইতে আলেক্‌জাণ্ডারের আক্রমণ পর্যন্ত এই সাম্রাজ্য স্থায়ী হইয়াছিল। একিমেনীয় নেতা কুরুস পশ্চিম এশিয়ার বহু অংশ জুড়িয়া একটি বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পুত্র ক্যাম্বিসেস মিসরও জয় করেন। সর্বশ্রেষ্ঠ পারসিক সম্রাট দারায়ুস সাসিডনিয়া ও থ্রেস পর্যন্ত নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। দারায়ুস পাক-ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য ২১টি সাত্রাপী বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। একিমেনীয় সম্রাটগণের আমলে পারস্যে এক সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। রাস্তা-ঘাটের উন্নতি হয়। সুসা, একবাটানা, ব্যাবিলন ও পার্সিপলিস নামে চারিটি রাজধানী শহর নির্মিত হয়। সাম্রাজ্যের সর্বত্র আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। পারসিকদের ধর্ম জোরোএস্টার নামক অতি প্রাচীন ধর্ম প্রচারক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই ধর্মের মূলকথা ছিল, ভাল ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায় এবং সত্য ও অসত্যের সংঘাত। 'আহুর মাযদা' সত্যের প্রতীক, 'আহরিমান' অসত্যের প্রতীক। পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত এই দুই বিপরীত শক্তি সংগ্রাম করিতেছে। অন্তিমে ন্যায় ও সত্যের জয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই ধর্মে একটি শেষ বিচারের দিনের কথা বলা হইয়াছে। ইহার ফলে মন্দলোকদের জন্য নরক ও ভাল লোকদের জন্য ফিরদউস বা স্বর্গ নির্ধারিত হইবে। জোরোএস্টারের বাণী জেন্দাবেস্তা নামক গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে।

পারস্যে গ্রীক শাসনের এক শতাব্দী অতিবাহিত হইতে না হইতেই আরদাশীর নামক একজন সামন্ত রাজা গ্রীক রাজাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া ২২৬ খ্রীস্টাব্দে পারস্যে সাসানীয় বংশের রাজত্ব স্থাপন করেন।

এই বংশে মোট চল্লিশজন শাসক রাজত্ব করেন। সাসানীয়গণের শাসনাধীনে পারস্যে এক নবজাগরণের সূচনা হয়। প্রাচীন জোরোএস্ট্রীয় ধর্ম পারসিকগণের এই পুনর্জাগরণে সহায়তা করিয়াছিল। আরদাশীর এই ধর্মের পুরোহিত ও মন্দিরগুলিকে নিজের বশে আনয়ন করিয়া ইহাকে জাতীয় জাগরণের কাজে ব্যবহার করিয়াছিলেন। সাসানীয়গণ ও বাইজান্টাইনগণ পশ্চিম এশিয়ার অধিকার লইয়া তিন শতাব্দী যাবৎ এক মারাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত হয়। পরিশেষে যখন এই দুই শক্তি ক্ষমতার দ্বন্দ্বে নিঃশেষিত প্রায়, তখন নব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও নূতন ধর্মে অনুপ্রাণিত মুসলমান জাতি মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে। সম্রাট প্রথম খসরু (কিসরা আন-নওশিরওয়াঁ, ৫৩১-৫৭৯) সাসানীয় বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি ন্যায়বিচারক বলিয়া প্রজাসাধারণের মধ্যে অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার ন্যায়বিচারের কাহিনী ইসলামী সাহিত্যকেও প্রভাবিত করিয়াছে। তাঁহার বাইজান্টাইন সমসাময়িক ছিলেন সম্রাট জাস্টিনিয়ান। খসরুর সেনাবাহিনী সিরিয়ায় প্রবেশ করিয়া এন্টিয়ক (আন্তাকিয়া) লুঠ করে এবং ভূমধ্যসাগরের তীর পর্যন্ত অধিকার করে। জাস্টিনিয়ান বহু অর্থের বিনিময়ে তাঁহার সহিত শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। খসরুর বাহিনী ৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে ইয়ামনের আবিসিনীয় বাহিনীকে পরাজিত করিয়া সেখানে পারসিক আধিপত্য স্থাপন করে। এই ঘটনা হজরত রসূলুল্লার জন্মের চার পাঁচ বৎসরের মধ্যে ঘটিয়াছিল। আন্-নওশিরওয়াঁর পৌত্র খসরু ফিরোজ (৫৮৯-৬২৮) পুনরায় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া দামিস্ক ও জেরুজালেম দখল করিয়া "সত্যক্রুশ" বহন করিয়া টেসিফোনে তাঁহার রাজধানীতে লইয়া আসেন। তিনি মিসরও দখল করেন। কিন্তু ৬১০ খ্রীস্টাব্দে হিরাক্লিয়াস নামক এক বীর সেনাপতি ও সুদক্ষ রাজনীতিবিদ্ কনস্টান্টিনোপলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিসরে বাইজান্টাইন অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে মধ্যপ্রাচ্যের এই দুই প্রধান রাজশক্তি পরস্পর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ব্যতীত অন্যান্য আভ্যন্তরীণ কারণেও দুর্বল ও পতনোন্মুখ হইয়া পড়ে। ইহারা আপন আপন রাজ্যে ভিন্ন মতাবলম্বী ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন চালাইত। এইরূপ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ইসলামের আবির্ভাব হয়।

সাসানীয় রাজবংশ (২২৬-৬৫১)

৪

আরবের প্রাচীন ইতিহাস

গ্রীক ও রোমান লেখকগণের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ, প্রাথমিক যুগের মুসলিম ঐতিহাসিকগণের ঐতিহাসিক কিংবদন্তী এবং বিভিন্ন শিলা ও ধাতব লিপি হইতে আরবদেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়। যদিও আরবদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও খননকার্য যথাযথভাবে চালান হয় নাই, তথাপি শেষোক্ত উপকরণই প্রাচীন ইতিহাসের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এ পর্যন্ত ইয়ামনে ৩০০০ লিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই লিপিগুলির পাঠোদ্ধারের ফলে জানা যায় যে, দক্ষিণ-আরবে একটি পূর্ণাঙ্গ বর্ণমালা ও ভাষা প্রচলিত ছিল। পরবর্তী কালে উত্তর-আরবের ভাষা ও বর্ণমালা উক্ত ভাষা ও বর্ণমালার স্থান দখল করে।

দক্ষিণ আরবের সভ্যতা

প্রাচীন যুগে দক্ষিণ আরবে পর পর কয়েকটি রাজবংশ রাজত্ব করে। ঐ সময় দক্ষিণ আরবে একটি উন্নত সভ্যতা গড়িয়া উঠে। সর্বপ্রথম যে রাজবংশ রাজত্ব করে তাহার নাম মিনায়ী রাজবংশ। এই বংশের রাজারা খ্রীঃ পূঃ ১২০০ সাল হইতে ৬৫০ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। জাওফ-ই-ইয়ামনে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমগ্র দক্ষিণ আরবে ইহার প্রাধান্য বিস্তৃত হয়।

মিনায়ী সভ্যতা

সাবায়ী সভ্যতা

মিনায়ী বংশের পতনের পর দক্ষিণ আরবে সাবায়ী বংশ শক্তিশালী হইয়া উঠে। তাঁহাদের রাজত্বকাল খ্রীঃ পূঃ ৯৫০ সাল হইতে ১১৫ সাল পর্যন্ত। এই বংশের প্রথম দিকের শাসকগণ প্রায় তিন শতাব্দী পর্যন্ত মিনায়ীদের সমসাময়িক ছিলেন। ইহার পর সমগ্র দক্ষিণ আরবে সাবায়ী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম যুগে খ্রীঃ পূঃ ৯৫০ সাল হইতে

৬৫০ সাল পর্যন্ত এই বংশের মোট সতরজন শাসক "পুরোহিত রাজা" নামে অভিহিত হইতেন। মারীবের অনতিদূরে 'সিরওয়া' দুর্গে তাহাদের প্রথম রাজধানী স্থাপিত হয়। বিখ্যাত 'মারীবের বাঁধ' এই যুগের রাজাগণের অন্যতম প্রধান কীর্তি। এই বাঁধ তৎকালীন প্রকৌশল দক্ষতার পরিচয় দেয়। দ্বিতীয় যুগে (খ্রীঃ পূঃ ৬৫০—১১৫) শাসকগণ 'সাবারাজ' উপাধি ধারণ করেন। মারীবেই এখন ইঁহাদের রাজধানী স্থাপিত হয়। এই যুগই দক্ষিণ-আরবের প্রাচীন ইতিহাসের স্বর্ণযুগ।

হিময়ার বংশ

সাবায়ী বংশের পতনের পর হিময়ার বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। হিময়ারগণ সাবায়ীগণেরই স্বগোত্রীয় ছিলেন। ইঁহাদের রাজত্বকাল খ্রীস্টপূর্ব ১১৫ সালে আরম্ভ হইয়া খ্রীস্টীয় ৫২৫ সালে শেষ হয়। তাঁহাদের রাজধানী ছিল জাফর নামক শহরে। পরবর্তীকালে সানায় রাজধানী স্থাপিত হয়। এই বংশের রাজাগণ সুরক্ষিত দুর্গে বাস করিতেন। সানায় গুমদান নামক দুর্গনগরী বিংশতিতল বিশিষ্ট ছিল। ইহাই বোধ হয় পৃথিবীর লিখিত ইতিহাসে প্রথম গগনচুম্বী প্রাসাদ। পূর্ববর্তী মিনায়ী ও সাবায়ী রাজ্যের মত হিময়ার রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল আন্তর্জাতিক ব্যবসা। লোহিত সাগরে হিময়ারগণের একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার ছিল। পরবর্তীকালে রোমানগণ এই বাণিজ্যে তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায়। হিময়ার যুগের শেষের দিকে আরব দেশে ক্রমশঃ খ্রীস্টান ধর্ম ও ইহুদী ধর্ম প্রবেশ লাভ করে। রোমান সম্রাট কনস্টান্টিয়াস খ্রীস্টীয় ৩৫৬ সালে দক্ষিণ-আরবে একজন খ্রীস্টান দূত প্রেরণ করেন। খ্রীস্টান দূত থিওফিলাস আদনে ও হিময়ার রাজ্যে কয়েকটি গীর্জা নির্মাণ করেন। এই যুগে ইহুদী ধর্ম আরবে প্রচার লাভ করে। বিশেষতঃ শেষ হিময়ার সম্রাট জুনওয়াস নিজেই ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেন।

তিনি কালক্রমে খ্রীস্টান নির্যাতক বলিয়া পরিগণিত হন। তিনি ৫২৩ খ্রীস্টাব্দে নাজরানের খ্রীস্টানগণকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। কথিত আছে, একটিমাত্র লোক কোনক্রমে বাঁচিয়া যায় এবং পালাইয়া বাইজান্টাইন সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। সম্রাট আবিসিনিয়ার খ্রীস্টান রাজা নাজ্জাশীকে* খ্রীস্টানদের পক্ষ অবলম্বন করিতে আহ্বান করেন। নাজ্জাশী

* আবিসিনিয়ার রাজার উপাধি ছিল নাজ্জাশী (Negus)

আরব দেশ

ভূমধ্য সাগর
ভূ-প্রকৃতি
কৃষিভূমি
মালভূমি
মরুভূমি
আল-নুফুদ
মদীনা
জেদ্দা
মক্কা
পারস্য উপসাগর
লোহিত সমুদ্র
এডেন
আদন উপসাগর
আফ্রিকা

আরব দেশ

আরবে পর পর দুইবার, ৫২৩ ও ৫২৫ খ্রীস্টাব্দে, দুইটি অভিযান প্রেরণ করেন। পরবর্তী অভিযানের সেনাপতি ছিল আবরাহা। যুদ্ধে জুনওয়াস নিহত হন এবং হিমযার বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে। এইভাবে দক্ষিণ আরবে হাবশী আধিপত্য স্থাপিত হয়। আবরাহা ইয়ামনের রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়। ৫২৫ সাল হইতে ৫৭৫ সাল পর্যন্ত অর্ধ-শতাব্দী কাল ইয়ামনে হাবশী অধিকার অক্ষুণ্ন থাকে। আবরাহা সানায় একটি গীর্জা নির্মাণ করে। আরবদের নিকট ইহা আল-কালিস (গ্রীক Ekklesia) নামে পরিচিত হয়। এই গীর্জাটি কাবার প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া পরিগণিত হয়। কথিত আছে, কাবার দুইজন পূজারী সানার গীর্জার পবিত্রতা নষ্ট করে এবং আবরাহা সসৈন্যে মক্কা আক্রমণ করে। এই ঘটনা হজরত মুহম্মদের (দঃ) জন্মের বৎসর (৫৭০ খ্রীঃ) সংঘটিত হইয়াছিল। আবরাহার বাহিনীতে একটি হস্তী ছিল বলিয়া আরবগণ ঐ বৎসরকে 'হস্তীর বৎসর' (আম-উল-ফীল) নামে অভিহিত করে। কারণ, ইতিপূর্বে তাহারা কখনও হাতী দেখে নাই। আবরাহার সৈন্যবাহিনীতে মড়ক আরম্ভ হওয়ায় তাহার অভিযান ব্যর্থ হয়।

ইয়ামনে হাবশী শাসনের বিরুদ্ধে শীঘ্রই আরবদের মধ্যে চরম অসন্তোষ দেখা দেয়। তাহারা প্রাচীন হিমযার বংশের একজন যুবরাজের নেতৃত্বে হাবশী অধিকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে। পারস্য সম্রাট তাহাদের আবেদনক্রমে ৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে ইয়ামনে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। আবিসিনীয় সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয় এবং ইয়ামনে পারস্য অধিকার স্থাপিত হয়। ইয়ামন পারস্য সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। হিজরী ষষ্ঠ সালে (৬২৮ খ্রীঃ) ইয়ামনের পারসিক শাসনকর্তা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

উত্তর ও মধ্য-আরবের সভ্যতা

পেট্রা

দক্ষিণ-আরবের মত উত্তর ও মধ্য-আরবেও কয়েকটি সমৃদ্ধিশালী নগর-সভ্যতা গড়িয়া উঠে। ইহাদেরও প্রধান উপজীবিকা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। আরবের উত্তরে বর্তমান জর্ডন রাজ্যে ওয়াদি মুসা নামক

স্থানে নাবাতী জাতিব লোক এক[illegible] রাজ্য স্থাপন কবে। পেট্রা নামক শহরে ইহাব বাজধানী ছিল। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৩০০ সাল হইতে খ্রীস্টীয় ১০৫ সাল পর্যন্ত পেট্রায় নাবাতিগণ ক্ষমতাশালী ছিল। পাহাড কাটিয়া ইহাদেব সুবক্ষিত দুর্গ-নগবী পেট্রা নির্মিত হইযাছিল। দক্ষিণ আবব ও ভূমধ্যসাগবেব মধ্যবর্তী বাণিজ্যপথে অবস্থিত ছিল বলিযা পেট্রার গুরুত্ব ও প্রাধান্য সমধিক ছিল। ক্রমশঃ মধ্যপ্রাচ্যে বোমান অধিকাব স্থাপিত হয। খ্রীস্টীয ১০৬ সালে পেট্রা বাজ্য বোমান সাম্রাজ্যেব অন্তর্ভুক্ত হয়।

পামীরা

পেট্রাব পতনেব পব সিবিযাব মরুভূমিতে একটি মরূদ্যানকে কেন্দ্র কবিযা পামীবা শহব গডিযা উঠে। দ্বিতীয ও তৃতীয শতাব্দীতে এই শহব মধ্যপ্রাচ্যেব অন্যতম সমৃদ্ধ শহব বলিযা পরিগণিত হয। ইহা বোমান সাম্রাজ্যেব একটি স্বাযত্তশাসিত বাজ্য ছিল। পামীবাব আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পূর্বে চীনদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্বোল্লিখিত পেট্রা শহবেব মত পামীবাব সমৃদ্ধিও এই বাণিজ্যেব উপব নির্ভবশীল ছিল। খ্রীস্টীয তৃতীয শতকে পামীবা উন্নতিব উচচ শিখবে আবোহণ কবে। পামীবাব শাসনকর্তা ওদাযনা বোমান সম্রাট কর্তৃক প্রাচ্যেব উপ-সম্রাট পদে নিযুক্ত হন। তাঁহাব আমলে পামীবা 'পশ্চিম এশিযাব বানী' বলিযা স্বীকৃত হয। কিন্তু ২৬৬—৬৭ খ্রীস্টাব্দে ওদাযনা গুপ্তঘাতকেব হস্তে নিহত হন। তঁহাব সুন্দবী ও উচচাভিলাষিণী স্ত্রী জযনব (Zenobia) 'প্রাচ্যেব বানী' উপাধি গ্রহণ কবিযা স্বাধীনতা ঘোষণা কবেন। তিনি স্বীয বাজ্যেব সীমানা বর্ধিত কবেন এবং এশিযা-মাইনবেব বৃহদাংশ ও মিসব দখল কবেন। ২৭০ খ্রীস্টাব্দে তাঁহাব বিজযী সেনাবাহিনী আলেকজান্দ্রিযা অধিকাব কবে। কিন্তু তাঁহাব এই বিজয-গৌবব ক্ষণস্থাযী হইযাছিল। ২৭২ খ্রীস্টাব্দে বোমান সম্রাট অবেলিযান তাহাব সেনাপতিকে পবাজিত কবিযা পামীবা অধিকাব কবেন। বানী জযনব পলাযনপব হইলেন কিন্তু অবশেষে ধৃত ও বন্দিনী হইলেন। সম্রাট পামীবাকে ধ্বংস স্তূপে পবিণত কবেন। পামীবাব গৌবব-সূর্য চিবতবে অস্তমিত হয। পামীবাব সভ্যতা গ্রীক, সিবীয় ও পাবসিক উপাদানেব সংমিশ্রণে গঠিত হয। সময, সুযোগ ও উপযুক্ত পবিবেশে মরুভূমিব বেদুঈনগণও যে উচচস্তবেব সভ্যতাব

ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে আরবের প্রান্তঃসীমায় দুইটি ও আরবের মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটি রাজ্য গড়িয়া উঠে। আরবের উত্তরে সিরিয়ায় গাস্সান বংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের শাসকগণ খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকে এই রাজ্য বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন হইয়া পড়ে। আরবের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ফোরাতের পশ্চিম উপকূলে প্রাচীন ব্যাবিলনের অনতিদূরে হিরা নামক স্থানে আরেকটি আরব রাজ্য গড়িয়া উঠে। লখমী বংশের রাজারা হিরায় রাজত্ব করিতেন। ইঁহারাও খ্রীস্টান ছিলেন। গাসসান বংশ ও লখমী বংশের রাজারা ইয়ামনী ছিলেন। কিন্তু শেষোক্ত বংশের রাজারা পারসিক প্রভাবান্বিত ছিলেন। এইজন্য উভয় রাজ্যের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রেষারেষি ছিল। মধ্য-আরবে শেষে হিময়ারগণের প্রভাবাধীন যে রাজ্যটি গড়িয়া উঠে, ইহার নাম ছিল কিন্দা রাজ্য। হাজরা-মউতের পশ্চিমাঞ্চলে ইহাদের আদি নিবাস ছিল। ক্রমান্বয়ে ইহারা মধ্য-আরবে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। আরবের অভ্যন্তরে বেদুঈন সম্প্রদায়সমূহকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আনয়ন করিয়া একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আরবে এই প্রথম। এই রাজ্য বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। জাহিলিয়ার বিখ্যাত কবি ইমরুল কয়স এই কিন্দা রাজবংশের বংশধর ছিলেন।

বিস্তারিত পাঠ্য-তালিকা

১. হিট্টি : হিস্ট্রি, অব দি এরাব্স, ম্যাকমিলান এণ্ড কোঃ, লণ্ডন, ১৯৫১।

২. নবিহ আমীন ফারিস : দি এরাব হেরিটেজ, নিউ জারসি, ১৯৪৬।

৫

জাহিলিয়া যুগ

আরবের প্রাচীন যুগের সভ্যতার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই সভ্যতা আরবের প্রান্তঃসীমায় বিকাশ লাভ করিয়া লয়প্রাপ্ত হয়। ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে অর্থাৎ খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতকে আরবের প্রায় সর্বত্র বিভিন্ন পরিবার ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লাগিয়াই ছিল। এই শতাব্দীকে আরবের ইতিহাসে জাহিলিয়া যুগ বা অন্ধকার যুগ বলা হইয়া থাকে। সচরাচর আরবের প্রাক্-ইসলামী যুগকে জাহিলিয়া বলিয়া অভিহিত করা হয়। আমরা এই যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিব।

জাহিলিয়া যুগে আরবদেশে বিশেষ করিয়া উত্তর আরবে লেখার প্রচলন ছিল না বলিলেই চলে। ঐ সময় নানা রকম কিংবদন্তী, জনশ্রুতি, প্রবাদ ও কবিতা আরবদের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। এইসব কাহিনী ও কবিতা হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হয় নাই। এই কাহিনীগুলি অলীক ও কাল্পনিক হইলেও ইহাদের সাহায্যে জাহিলিয়া যুগের অবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়। উত্তর আরবে এই যুগের মাত্র তিনটি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

জাহিলিয়া যুগে আরবের বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে সামান্য ঘটনা হইতে বচসা, ঝগড়াঝাটি ও শেষ পর্যন্ত খুনাখুনি হইয়া যাইত।

রাজনৈতিক অবস্থা

এইভাবে দুই গোত্রের মধ্যে একবার ঝগড়া বাধিয়া গেলে পুরুষানুক্রমে তাহার জের চলিতে থাকিত। অন্যান্য গোত্রের লোকেরা নিজেদের সুযোগ ও সুবিধামত কোন না কোন দলে যোগদান করিত। এইভাবে যুদ্ধ বিরাট আকার ধারণ করিত। ঝগড়ার সূত্রপাত সামান্য কারণেই হইত। যেমন গবাদি পশু লইয়া চারণভূমি অথবা পানির কূপের অধিকার লইয়া দুই গোত্রের মধ্যে ঝগড়া বাধিত। কোন কোন সময় ব্যক্তিগত মান অপমানের প্রশ্ন লইয়াও গোত্রীয় ঝগড়া শুরু হইত। ঝগড়া ও যুদ্ধবিগ্রহ বহুদিন চলার পর উভয় পক্ষ যখন ক্লান্তি বোধ করিত, তখন তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় শান্তি স্থাপিত হইত। যে

পক্ষে অধিক লোক ক্ষয় হইত, তাহারা প্রতিপক্ষ হইতে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ খুন-খেসারত লাভ করিত। সাধারণ্যে প্রচলিত গীতি-গাথা ও উপকথায় এই সব যুদ্ধের কথা পুরুষানুক্রমে রক্ষিত হইত। গোত্রের কবিরা ইহার কাব্যরূপ দান করিত। নিজ নিজ গোত্রের প্রাচীন ইতিহাস, যুদ্ধবিগ্রহ ও বীর পুরুষগণের বিজয়-কাহিনী ইত্যাদি বিষয় লইয়া তাহারা উস্কানীমূলক কবিতা রচনা করিত। ইহার ফলে আবার নূতন করিয়া ঝগড়া-বিবাদের সূত্রপাত হইত।

মদীনার বনু-আওস ও বনু খজ্‌রজের মধ্যে হিজরতের পূর্বে এইরূপ যুদ্ধ বিগ্রহ লাগিয়াই ছিল। হিজরতের দুই এক বৎসর পূর্বে ইহাদের মধ্যে বু-আসের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মদীনার ইহুদীগণ এবং বেদুঈন আরবগণ তাহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ অথবা খেয়াল খুশীমত উভয়পক্ষে যোগদান করিয়াছিল। হজরতের বয়স যখন ১৫ হইতে ২০ বৎসর ছিল, তখন হজরতের পরিবার ও বনু-হাওয়াজিনের মধ্যেও এইরূপ যুদ্ধ ঘটে; এই যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাসে ঘটিয়াছিল বলিয়া ইহাকে ফিজারের যুদ্ধ বলা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব আরবে পঞ্চম শতাব্দীতে বনু-বকর ও বনু-তগলিবের মধ্যে বসুসের যুদ্ধ ঘটে। বসুস ছিল বনু-বকরের এক বৃদ্ধার একটি উটনী। বনু-তগলিবের এক সর্দারের হাতে এই উটনীটি আহত হয়। ইহার ফলে এই দুই গোত্রের মধ্যে রণ-দামামা বাজিয়া উঠে এবং এই যুদ্ধ চল্লিশ বৎসর কাল স্থায়ী হয়। অবশেষে হিরার শাসনকর্তা মুনজিরের মধ্যস্থতায় এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। মধ্য-আরবের বনু-আবাস ও বনু-জুবিয়ানের মধ্যেও এইরূপ একটি যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধ ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আরম্ভ হইয়া ইসলাম ধর্ম প্রচারের পরেও চলিতে থাকে। উক্ত দুই সম্প্রদায়ের দুইটি ঘোড়ার মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করিয়া এই যুদ্ধ বাধে। আনতারা ইবন শাদ্দাদ নামক এক কবি ও বীরপুরুষ বনু-আবাসের পক্ষে এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। এইভাবে রক্ত-ভিত্তিক পরিবার ও গোত্রগুলি পরস্পর কলহে লিপ্ত ছিল। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, আরবের উত্তরে গাস্‌সান বংশ ও পূর্বে হিরার লখ্‌মী বংশের রাজাগণ যথাক্রমে বাইজান্টাইন ও পারসিক সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন ছিল। দক্ষিণে ইয়ামনে প্রথমে হাবশী শাসন ও পরে পারসিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদেশীরা ইচ্ছা করিলেই সমগ্র আরবদেশকেই দখল করিয়া লইতে পারিত কিন্তু আরবের মরুভূমি, উহার অনুর্বরতা ও ভয়াবহতা যুগে যুগে বেদুঈনকে তাহার স্বাধীনতা রক্ষার্থে সাহায্য করিয়াছিল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, আরবের সমাজ ছিল রক্তভিত্তিক। কাল্পনিক অথবা প্রকৃত রক্ত-সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সমাজ-ব্যবস্থায় প্রত্যেক পরিবার, কওম ও কবীলার লোকেরা নিজদিগকে অভিজাত বলিয়া মনে করিত। অপর পরিবার, কওম বা কবীলার লোককে তাহারা হীন বলিয়া ভাবিত। গোত্রীয় আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য তাহারা পুরুষানুক্রমে আপন আপন বংশ তালিকা সযত্নে রক্ষা করিত। প্রাগ-ইসলামী যুগে আরবের পরিবারগুলি মাতৃপ্রধান ছিল। মাতাকে কেন্দ্র করিয়া পরিবার গড়িয়া উঠিত। কিন্তু হজরত মুহম্মদের (দঃ) জন্মের সময় মক্কায় ও পরে মদীনায় এই প্রথার পরিবর্তন হইতে থাকে। সমাজের এই ভাঙ্গাগড়ার সময় পারিবারিক বন্ধন শিথিল হইতে থাকে। সমাজে স্ত্রীলোকের মর্যাদা হ্রাস পাইতে থাকে। বহুবিবাহ প্রচলিত হয়। এক স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামী থাকার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। মেয়ে সন্তান জন্মানকে আরবের লোকেরা অপমানজনক মনে করিত। তাই তাহাদের মধ্যে মেয়ে সন্তান হত্যার প্রথা প্রচলিত হয়। মেয়েদের অবাধ চলাফেরার স্বাধীনতা থাকিলেও সমাজে তাহাদের অধিকার সুরক্ষিত ছিল না। মেয়েকে বিবাহ দিয়া আত্মীয়-স্বজনগণ যৌতুক আত্মসাৎ করিত। বিধবা ও এতিমদের সম্পত্তি আত্মসাতের কথাও কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত আরব দেশেও ঐযুগে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। মনীবগণ দাসদাসীদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিত। ইহা ছাড়া মদ্যপান, জুয়াখেলা প্রভৃতি কুপ্রথাও আরবদেশে প্রচলিত ছিল।

সামাজিক অবস্থা।

আরবের অধিকাংশ লোক বেদুঈন ছিল। তাহারা মেষ, ছাগ, উট, অশ্ব প্রভৃতি পশু পালন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। এই সকল পশুর জন্য চারণভূমির অনুসন্ধানে তাহারা এক স্থান হইতে অন্যস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত। দুর্দিনে অন্ন সংস্থানের অন্য উপায় না থাকিলে তাহারা পণ্যবাহী উটের কাফেলার উপর আক্রমণ চালাইত। কোন কোন বেদুঈন গোত্র সওদাবাহী উটের মালিকের নিকট হইতে রক্ষা-কর আদায় করিয়া তবে উহার পথ ছাড়িয়া দিত। ইহা ছাড়া সমৃদ্ধিশালী জনপদ ও শহরের উপর বেদুঈনদের আক্রমণ ও লুন্ঠন আরবের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। আরবের মক্কা, মদীনা ও অন্যান্য শহরের জীবনযাত্রা বেদুঈনদের জীবনযাত্রা হইতে পৃথক ছিল। বিশেষ করিয়া মক্কায় তখন একটি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে। মরুভূমির

অর্থনৈতিক অবস্থা।

মধ্যস্থলে অবস্থিত হইলেও মক্কার দুইটি বিশেষ সুবিধা ছিল। দক্ষিণ আরব হইতে সিরিয়া পর্যন্ত যে বাণিজ্যপথ চলিয়া গিয়াছিল, মক্কা ইহার মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। তা'ছাড়া প্রাচীনকাল হইতে মক্কা নগরীতে কাবা নামক ধর্মমন্দির বিরাজিত ছিল। এই মন্দিরের সংলগ্ন অঞ্চলে যুদ্ধ বিগ্রহ ও মারামারি নিষিদ্ধ ছিল। লোকেরা নির্ভয়ে এখানে যাতায়াত করিত। হজরতের চাচা আবু তালিব ও হজরতের প্রথমা পত্নী খাদিজা, বনু উমাইয়ার নেতা আবু সুফিয়ান ও মক্কার আরো অনেকে সিরিয়ায় পণ্যদ্রব্য পাঠাইয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে মক্কায় বিভিন্ন বণিক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিশেষ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। অনেকে বহু অর্থ-সম্পত্তির মালিক হয়। এই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন অর্থলিপ্সা বৃদ্ধি পায়। অল্পসংখ্যক লোকের হাতে বহু অর্থ জমা হয়। এই নূতন সমৃদ্ধিশালী সম্প্রদায় পুরনো গোত্রীয় সহযোগিতা ও সহায়তার কথা বিস্মৃত হয়। তাহারা সমাজের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র বা নিঃস্ব লোকদের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে। অর্থ-সংগ্রহ ও জমা করিয়া রাখা ইহাদের জীবনের পরম ও চরম কাম্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কুরআনে তীব্র ভাষায় এইরূপ অর্থগৃধ্নুতার নিন্দা করা হইয়াছে। মদীনায় ইহুদীদের মধ্যেও সাধারণভাবে আরবের বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কুসীদ প্রথা প্রচলিত ছিল।

সাংস্কৃতিক জীবন

আরবের তখনকার অবস্থা সংস্কৃতি চর্চার পরিপন্থী ছিল। অধিকাংশ লোক লেখাপড়া জানিত না। কিন্তু গোত্রীয় চেতনা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, আত্মম্ভরিতা ও আত্মশ্লাঘা ইহাদিগকে কাব্য ও কবিতায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। ইহারা মুখে মুখে কবিতা রচনা করিত। প্রধান কবিদের কবিতা পুরুষানুক্রমে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন আরবদের প্রতিভা এই কাব্যের ভাষায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। জাহিলিয়া যুগের এই সকল কবিতার মাধ্যমে আরব-জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিশদভাবে জানা যায়। প্রবাদ আছে, "কবিতা আরবদের জীবন-আলেখ্য বিশেষ"। জাহিলিয়া যুগে যে সকল কবি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে 'সব্‌অ' মুয়াল্লাকাত' বা সাতটি সম্মানিত কবিতার লেখক সাতজন কবিই প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, আরবের উকাজ নামক স্থানে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক কাব্য প্রতি-যোগিতায় পর পর শীর্ষস্থান অধিকারী সাতটি কবিতা কাবার প্রাচীর গাত্রে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই কবিতা রচয়িতাদের

নাম ইমরুল কয়স, তরফা, আমর, হারিস, আনতারা, জুহায়র ও লবীদ। ইহাদের মধ্যে ইমরুল কয়স সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া খ্যাত। তিনি মধ্য আরবের কিন্দা রাজপরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বেদুঈন আরবদের বিভিন্ন গুণাবলী যথা, বীরত্ব, সৌজন্য, আতিথেয়তা, এইসব কবিতায় প্রতিফলিত হইয়াছে। তাছাড়া ইহাদের অবাধ ও মুক্ত জীবনযাত্রা, যুদ্ধ, মদ্য ও নারীর প্রতি আসক্তি নিখুঁৎ ভাষায় কবিতায় চিত্রিত হইয়াছে। যুদ্ধের সময় কবিদের কেহ কেহ অস্ত্রধারণেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তবে ইঁহাদের প্রধান কাজ ছিল স্বাজাত্যবোধকে জীবিত রাখা, যোদ্ধাদেরকে যুদ্ধে উৎসাহিত করা, নিজ নিজ গোত্রের সম্মান, প্রতিপত্তি ও আভিজাত্য প্রতিষ্ঠিত করা এবং প্রাচীন বীর পুরুষদেব শৌর্যবীর্যের কাহিনী কাব্যে রূপ দান করা। মোটকথা জাহিলিয়া যুগের কবিতা ছিল আরবদের তৎকালীন জীবনযাত্রার একটি অনবদ্য ও নিখুঁৎ-আলেখ্য।

আরবগণ বৎসরের মধ্যে চারি মাস অর্থাৎ মুহররম, রজব, জুলকাদা ও জুলহিজ্জা শান্তির মাস হিসাবে পালন করিত। এই সময় তাহারা শাণিত অসি কোষবদ্ধ করিয়া বিভিন্ন খেলাধুলা ও হাসিতামাশায় লিপ্ত হইত। বিভিন্ন জায়গায় মেলা বসিত। উকাজের মেলার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এইসব মেলায় কাব্য-প্রতিযোগিতা, মল্লযুদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইত। ইহা ছাড়া বিভিন্ন দেশী পণ্যসামগ্রী বেচাকিনা হইত। উকাজের মেলায় হজরত একবার ধর্মপ্রচারে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

ধর্মীয় জীবন

ইসলামের অভ্যুদয়ের বহু পূর্বে খ্রীস্ট ধর্ম ও ইহুদীধর্ম উভয়ই আরবদেশে প্রবেশ লাভ করে। ৩৫৬ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট কন্‌স্টান্টিয়াস দক্ষিণ-আরবে একজন খ্রীস্টান দূত প্রেরণ করেন। উক্ত দূত আদনে ও অন্যান্য স্থানে কয়েকটি গীর্জা স্থাপন করেন। ইসলামের অভ্যুদয়ের সময় নাজরানে অনেক খ্রীস্টান বাস করিত। ইহুদীধর্ম সম্ভবতঃ খ্রীস্ট ধর্মের পূর্বেই আরবে প্রবেশ লাভ করে। খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইয়ামনে ইহুদী ধর্মের বহুল প্রচার ঘটে, ফলে হিময়ার রাজবংশের শেষ রাজা জুনওয়াস ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত হন। শুধু তাই নয় তিনি খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বীদের উপর নির্যাতন আরম্ভ করেন। কিভাবে এই নির্যাতনের ফলে আরবে হাবশী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। হজরতের জন্মের সময় ইয়াস্রেবে (মদীনায়) অনেকগুলি ইহুদী সম্প্রদায় বাস করিত। কিন্তু সমগ্র আরবের জনসংখ্যার তুলনায় ইহুদী ও খ্রীস্টানদের সংখ্যা নিতান্ত

নগণ্য ছিল এবং বস্তুতান্ত্রিক বেদুঈনদের জীবনে এই দুইটি ধর্মের প্রভাব নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল।

বেদুঈনের ধর্ম ছিল মূলতঃ প্রেতাত্মায় বিশ্বাসের ধর্ম। মরুভূমি ও মরুদ্যানের বৈপরীত্য তাহাকে প্রাচীনকাল হইতে অনিষ্টকারী ও কল্যাণকামী দেবতার অস্তিত্বে আস্থাবান হইতে শিক্ষা দেয়। বাল নামক দেবতা কূপ বা ফোয়ারার দেবতা ছিল। চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজির পূজাও আরবদেশে প্রচলিত ছিল। পশুচারণ যাহাদের জীবিকা, তাহারা রাত্রিতে দলবল লইয়া এক স্থান হইতে অন্যস্থানে রওয়ানা করে, এইজন্য চন্দ্র ও নক্ষত্রের আলো ইহাদের জন্য মঙ্গলজনক। দক্ষিণ-আরবে ও অন্যান্য যে সকল স্থানে কৃষিজীবী সম্প্রদায় বাস করিত, তাহাদের মধ্যে সূর্যের পূজাও প্রচলিত ছিল। ইহা ছাড়া বৃক্ষ, প্রস্তর, পর্বতগুহা ইত্যাদির পূজাও আরবে প্রচলিত ছিল। ক্রমে আরবদের মধ্যে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি পূজার প্রচলন হয়। হুবাল নামক দেবতা কাবার মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দেবতার নিকট হইতে তীর টানিয়া আরবগণ ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করিত।

মক্কার প্রাচীনতম ও প্রধানতম উপাস্য ছিল আল্লাহ। দক্ষিণ আরবের দুইটি লিপিতে আল্লাহ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সিরিয়ার দুইটি লিপিতে এই নামের উল্লেখ রহিয়াছে। কুরাইশ বংশের লোকদের নিকট আল্লাহ স্রষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা নামে পরিচিত ছিল। হজরত মুহম্মদের (দঃ) পিতার নাম ছিল আবদুল্লাহ্। হিজাযের লোকেরা আল্-লাত, উজ্জা ও মানাত নামক তিনটি দেবীর পূজা করিত। ইহাদিগকে তাহারা আল্লার কন্যা বলিয়া অভিহিত করিত। তায়েফের দেবী ছিলেন আল-লাত। মক্কার লোকেরা ও অন্যান্য লোকেরা সেখানে গিয়া এই দেবীর নামে পূজা ও উৎসর্গাদি করিত। মক্কার পূর্বে নাখলা নামক স্থানে প্রবল প্রতাপান্বিতা উজ্জা দেবীর মন্দির ছিল। এই দেবীর নামে মনুষ্য বলি দেওয়া হইত। বিখ্যাত কুরাইশ নেতা কুসাইয়ের একপুত্রের নাম ছিল 'আবদুল-উজ্জা'। মানাত ছিল ভাগ্যদেবী। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী কুদায়দ নামক স্থানে এই দেবীর মন্দির ছিল। মদীনার আওস ও খজরজ বংশের লোকদের নিকট এই দেবী অতি প্রিয় ছিল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আরব দেশে মক্কানগরীর প্রাধান্য দুইটি কারণে স্বীকৃত হইয়াছিল। প্রথমতঃ ইহার কাবা মন্দির ও দ্বিতীয়তঃ ইয়ামন ও সিরিয়ার বাণিজ্য পথে ইহার অবস্থিতি। এই মক্কায় হজরত মুহম্মদের

(দঃ) বংশ কুরাইশ ছিল অতীব প্রতিপত্তিশালী। হজরতের পঞ্চম ঊর্ধ্বতন পুরুষ কুসাইয়ের সময় কাবা মন্দিরের কর্তৃত্ব কুরাইশদের হাতে চলিয়া আসে। কুসাই প্রকৃতপক্ষে মক্কা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। এই সময় মালা নামক একটি মন্ত্রণা সভার সাহায্যে মক্কা নগরীর শাসন পরিচালিত হইত। বিভিন্ন গোত্রের প্রধানদের লইয়া এই মন্ত্রণা-পরিষদ গঠিত হইয়াছিল। কুসাইয়ের মৃত্যুর পর কাবার কর্তৃত্ব লইয়া কুরাইশদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ শুরু হয়। কুরাইশদের হাশিম গোত্রের সঙ্গে আবদ শাম্‌স্‌ (উমাইয়া) গোত্রের লোকদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিরাজিত ছিল। হজরতের দাদা আবদুল মুত্তালিব (হাশিমের পুত্র) কাবার রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত হইয়া জমজম কূপ পুনঃ খনন করেন।

মক্কা ও কাবার কর্তৃত্ব

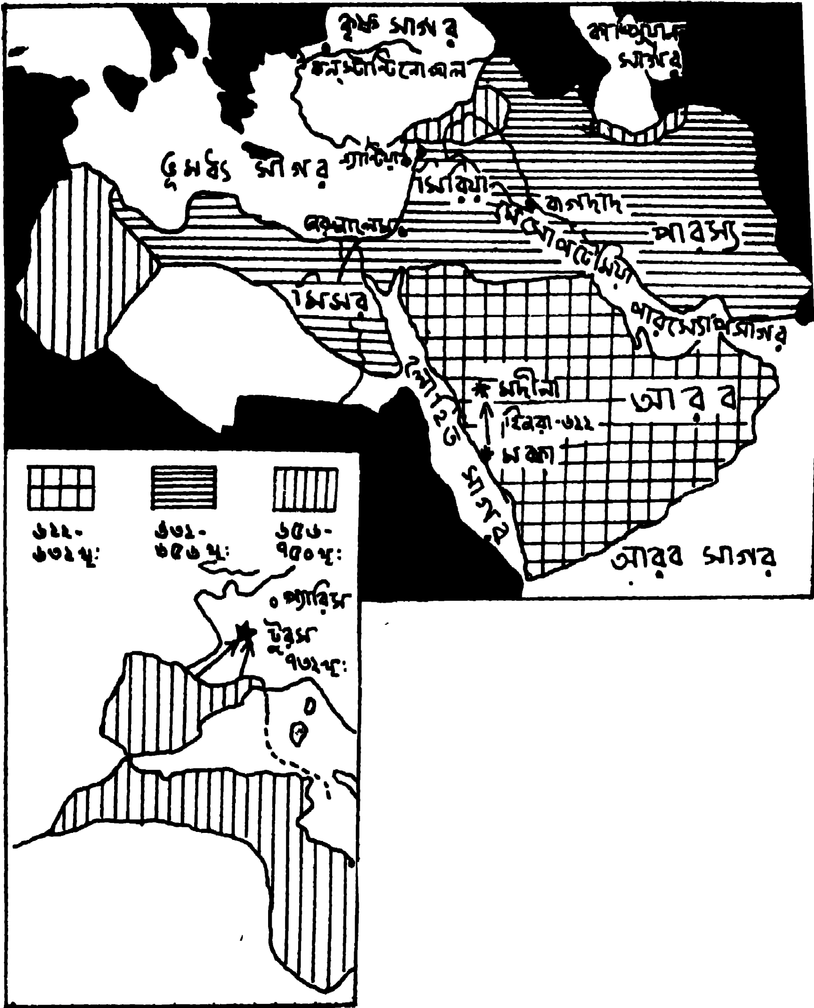
হজরতের জীবন চরিত রচয়িতা ইব্‌ন ইস্‌হাক তৎকালীন চারিজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইঁহারা প্রচলিত পৌত্তলিকতার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। ইহাদের নাম ওয়ারাকা ইব্‌ন নওফল (খাদিজার পিতৃব্য পুত্র), উবায়দুল্লাহ ইবন জাহ্‌স্‌, উসমান ইবন হুওয়াইরিস, এবং জায়দ ইবন আমর। ইঁহাদিগকে হানীফ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইবন ইসহাক আরও বলেন যে, ইঁহারা হজরত ইব্রাহীমের স্বভাবধর্ম হানীফিয়ার অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহাদের মতবাদ, ভাবধারা অথবা ধর্মমত সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইহারা সংঘবদ্ধভাবে কোন মত প্রচারের চেষ্টা করেন নাই। তবে হানীফদের অস্তিত্ব প্রচলিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী সচেতন মনের বিদ্রোহ সূচিত করে। তাহারা স্বাধীনভাবে আপন আপন বুদ্ধিদীপ্তির সাহায্যে স্রষ্টার একত্ব ও মহিমা উপলব্ধি করার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। জাহিলিয়ার নিবদ্ধ অন্ধকারে ইঁহারা তওহীদের ক্ষীণ প্রদীপ শিখা জ্বালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আরবের এই আবহাওয়ায় পৃথিবীর অন্যতম ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ইসলামের নবী হজরত মুহম্মদের (দঃ) জন্ম হয়।

হানীফগণ

বিস্তারিত পাঠ্য-তালিকা

১. পি কে হিট্টি—হিস্ট্রি অব দি এরাব্‌স্‌।
২. নিকল্‌সন লিটারারি হিস্ট্রি অব দি এরাব্‌স্‌।
৩. খুদা বখ্‌স্‌, কন্ট্রিবিউশন টু ইসলামিক সিভিলাইজেশন, প্রথম খণ্ড কলিকাতা, ১৯২৭।

মধ্য প্রাচ্য
ইসলামের অভ্যুদয়



মধ্যপ্রাচ্য (ইসলামের অভ্যুদয়)

৬

হজরত মুহম্মদ (দঃ) : মক্কায়

হজরত মুহম্মদ (দঃ) ৫৭০ খ্রীস্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। আরবের ইতিহাসে ঐ বৎসর 'হস্তীর বৎসর' নামে খ্যাত, কারণ ইয়ামনের হাবশী শাসক আবরাহা ঐ বৎসর একটি হস্তীসহ বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া মক্কা আক্রমণ করে। হজরতের পিতার নাম আবদুল্লাহ ও মাতার নাম আমিনা। তাঁহার জন্মের কিছুকাল পূর্বে তাঁহার পিতা আবদুল্লাহ বাণিজ্যব্যপদেশে মদীনার নিকট ইন্তিকাল করেন। মক্কার অভিজাত সম্প্রদায়সমূহের তৎকালীন প্রচলিত প্রথা অনুসারে শিশুকালে হজরত মুহম্মদকে (দঃ) মরুভূমির আবহাওয়ায় প্রতিপালিত হওয়ার জন্য হালিমা নাম্নী একজন ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করা হয়। আনুমানিক দুই বৎসর যাবৎ হজরত হালিমার গৃহে তাঁহারই স্তন্যে লালিত পালিত হন। হজরতের বয়স যখন ছয় বৎসর তখন তাঁহার মাতা আমিনা মৃত্যুমুখে পতিত হন। হজরতের দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁহার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু দুই বৎসর পর তাঁহার দাদাও পরলোকগমন করেন। তখন হজরতের পিতৃব্য আবু তালিব তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার লইলেন। আবু তালিব মহান ও দয়ালু প্রকৃতির ছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত ভ্রাতুষ্পুত্রকে সুখে-দুঃখে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতে থাকেন।

বাল্য ও যৌবন

মক্কার অপরাপর লোকের মত আবু তালিবও সিরিয়ায় পণ্যাদি লইয়া ব্যবসা করিতে যাইতেন। হজরতের বয়স যখন বার বৎসর, তখন আবু তালিব একবার তাঁহাকে সিরিয়ায় লইয়া গিয়াছিলেন। বালক মুহম্মদ (দঃ) এই সর্বপ্রথম আরবের বাহিরে পদার্পণ করেন। কথিত আছে, সিরিয়ায় বহিরা নামক একজন খ্রীস্টান সন্ন্যাসী হজরত মুহম্মদকে (দঃ) দেখিয়া তাঁহার মধ্যে ভাবী শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শনসমূহ লক্ষ্য করেন এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ যত্নবান হইতে আবু তালিবকে উপদেশ দেন।

পিতৃব্য আবু তালিবের গৃহে হজরতের জীবন অতিবাহিত হইতে থাকে। আবু তালিবের আর্থিক অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল না, সেজন্য কখনও ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ করিয়া কখনও মেষাদি চরাইয়া তিনি পিতৃব্যকে

সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে সাহায্য করিতেন। হজরতের বয়স যখন পনর হইতে বিশ বৎসরের মধ্যে তখন কুরাইশদের সঙ্গে বনু-হাওয়াজিনের এক যুদ্ধ হয়। নিষিদ্ধ মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে ফিজারের যুদ্ধ বলা হয়। এই সময় মক্কায় হিলফুল-ফুজুল অর্থাৎ পুণ্য-সংঘ নামে একটি সংঘ গঠিত হয়। দুর্বলকে সবলের বিরুদ্ধে সাহায্য করা, বিধবা, এতিম অথবা বিপদগ্রস্ত আগন্তুককে সাহায্য করা ও যুদ্ধাদি প্রতিরোধ করা এই সংঘের উদ্দেশ্য ছিল। হজরত মুহম্মদ (দঃ) এই সংঘ গঠনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। পরবর্তী জীবনে তাঁহার ধর্মীয় আদর্শ ও রীতিনীতির সহিত এই সংঘের নীতির বিশেষ মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

বিবাহ ও নবুয়ত লাভ

বাল্যকাল হইতে হজরত মুহম্মদের (দঃ) বিশ্বস্ততা ও সততা সর্বজনবিদিত ছিল। খাদিজা নাম্নী মক্কার এক সদ্বংশজাতা ও ধনাঢ্যা বিধবা রমণী হজরতকে সিরিয়ায় তাঁহার বাণিজ্য কাফেলা লইয়া যাইবার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করেন। পরিণত বয়সে হজরত পুনরায় সিরিয়ায় যাত্রা করেন। ইহাতে তাঁহার অনেক অভিজ্ঞতা লাভ ঘটে। তা' ছাড়া এই বাণিজ্যযাত্রায় খাদিজার অনেক অর্থাগম হওয়ায় তিনি হজরতের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হন। খাদিজা হজরতের চাচা আবু তালিবের নিকট হজরতের সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। এই সময় হজরতের বয়স ২৫ বৎসর ও খাদিজার বয়স আনুমানিক চল্লিশ বৎসর ছিল। যথা-রীতি তাঁহাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়।

খাদিজার সহিত বিবাহ হজরতের জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। বাল্যকাল হইতে তাঁহার জীবন নানা বিপর্যয় ও দুঃখ-দুর্দশার ভিতর দিয়া অতিবাহিত হয়। জীবনে এই সর্বপ্রথম তিনি আর্থিক চিন্তা হইতে মুক্তি লাভ করেন। কারণ মহিয়সী খাদিজা তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি হজরতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উৎসর্গ করিলেন। এই বিবাহ হজরতকে শুধু অর্থোপার্জনের দুশ্চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দেয় নাই বরং তাঁহাকে আপন স্বাভাবিক মনোবৃত্তি চরিতার্থ করিতে সাহায্য করিয়াছিল। কারণ হজরত মুহম্মদ (দঃ) বাল্যকাল হইতে চিন্তাশীল ও ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। সুযোগ পাইলেই তিনি নির্জনে বসিয়া ধ্যান করিতে ভালবাসিতেন। বিবাহের

পর তাঁহার এই মনোভাব আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তিনি মক্কার অদূরে হিরা নামক পর্বতের গুহায় ধ্যান করিতে থাকেন।

বিবাহের পর পিতৃব্য আবু তালিবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য হজরত মুহম্মদ তাঁহার পিতৃব্য পুত্র হজরত আলীকে আপন গৃহে রাখিয়া প্রতিপালন করার ভার গ্রহণ করিলেন। এই সময় হজরত আলীর বয়স ছিল ছয় বৎসর। খাদিজার জায়দ নামক একজন ক্রীতদাস ছিল। খাদিজা এই ক্রীতদাসকে হজরতের সেবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। হজরত জায়দকে দাসত্ব হইতে মুক্তিদান করিয়া তাহাকেও আপন পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এইভাবে দুই পোষ্যকে লইয়া তাঁহাদের সুখের দাম্পত্য-জীবন আরম্ভ হইল। কালক্রমে তাঁহাদের দুই পুত্র ও চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পুত্র দুইটি—তইয়ব ও তাহির শিশুকালেই মারা যায়। কন্যাগণের নাম জয়নব, রুকাইয়া, ফাতিমা ও উম্মে কুলসুম। ইঁহারা পিতার জীবনের মহৎ ঘটনাবলী দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ফাতিমার সহিত হজরত আলীর বিবাহ হইয়াছিল।

বিবাহের পরে ও নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে হজরতের জীবনের একটি উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা কাবার 'হাজরে আসওয়াদ' বা কৃষ্ণ-প্রস্তর সম্পর্কিত ঘটনা। হজরতের বয়স তখন পঁয়ত্রিশ বৎসর। কুরাইশ বংশের লোকেরা ঐ বৎসর কাবা ঘরের পুন: নির্মাণ কার্যে ব্যাপৃত হইল। বহুদিনের সংস্কারের অভাবে কাবা ঘরের অবস্থা জীর্ণ ও শোচনীয় হইয়া পড়িল। যথারীতি মেরামত কার্য সম্পন্ন হইল। কিন্তু সবশেষে গোলমাল বাধিল কৃষ্ণ-প্রস্তর যথাস্থানে সংস্থাপনের প্রশ্নটি লইয়া। বিভিন্ন দলের দলপতিরা প্রত্যেকে চাহিলেন পাথরটি সংস্থাপন করিয়া সম্মানের অধিকারী হইতে। এই সম্মান অর্জনে কেহই পশ্চাৎপদ হইতে চাহিল না। এই প্রশ্নে তাহাদের মধ্যে বচসা ও বিতর্ক আরম্ভ হইয়া যুদ্ধ বিগ্রহ বাধিবার উপক্রম হইল। বহু বিতর্কের পর তাহাদের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির পরামর্শে সাব্যস্ত হইল যে, পরদিন প্রত্যুষে যে ব্যক্তি সর্বাগ্রে কাবাঘরে প্রবেশ করিবে তাহার উপরই বিবাদ মীমাংসার ভার ন্যস্ত হইবে। পরদিন ভোরে দেখা গেল, সর্বাগ্রে কাবাঘরে ঢুকিলেন হজরত মুহম্মদ (দ:)। সততা ও বিশ্বস্ততার জন্য কুরাইশদের নিকট হজরত ইতিপূর্বে 'আল-আমীন' (বিশ্বাসী) বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাহারা সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "এই যে আল-আমীন, আমরা সন্তুষ্ট, এই যে "মুহম্মদ"!

হজরত ব্যাপারটি শুনিয়া তাহাদিগকে একটি চাদর আনিতে বলিলেন। তিনি চাদর বিছাইয়া কৃষ্ণ-প্রস্তরটিকে উহার উপর রাখিলেন আর বিভিন্ন যুযুধান গোত্রের লোকদিগকে চাদরের চারিদিক ধরিতে বলিলেন। পাথরটি যখন যথাস্থানে নীত হইল তখন হজরত নিজহাতে পাথরটি বসাইয়া দিলেন। এইভাবে হজরতের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য কুরাইশগণ আসন্ন যুদ্ধের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইল।

হজরতের বয়স যখন চল্লিশ বৎসর তখন তিনি নবুয়তের সম্মানে ভূষিত হইলেন। কিছুকাল হইতে হজরত মুহম্মদ(দঃ) মক্কার অদূরবর্তী হেরা গিরি-গুহায় নির্জনে ধ্যান করিয়া আসিতেছিলেন। বিশেষ করিয়া প্রতি বছর রমজান মাস তিনি এইভাবে সম্পূর্ণ ধ্যান্-ধারণা ও প্রার্থনা-আরাধনায় যাপন করিতেন এবং দীন-দুঃখীদের মধ্যে দান-খয়রাত করিতেন। এইভাবে যখন তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইল, তখন রমজান মাসের এক পবিত্র রাত্রিতে তিনি আল্লার বাণী লাভ করিলেন। কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতগুলি তাঁহার উপর অবতীর্ণ হইল:

"পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন,
যিনি জমাট রক্ত থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন;
পড়, যেহেতু তোমার প্রভু মহানুভব,
যিনি কলম দিয়ে (জ্ঞান) শিখিয়েছেন,
মানুষ যা জানত না তাই তাকে শিখিয়েছেন।"

আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অভিনবত্বে হজরত মুহম্মদ (দঃ) একাধারে অভিভূত ও আতঙ্কিত বোধ করিলেন। তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বীয় অভিজ্ঞতার কথা খাদিজার নিকট বিবৃত করিলেন। খাদিজা তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন যে, তিনি নবুয়তের সম্মান লাভ করিয়াছেন। খাদিজা ইহা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি তাঁহার এক পিতৃব্য-পুত্র ওয়ারাকা ইবন নওফলের নিকট গমন করিলেন। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে ওয়ারাকার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। হজরতের অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়া ওয়ারাকা মহানন্দে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের মত মুহম্মদের নিকটও নামুস (জিব্রাইল) ফিরিশতা স্রষ্টার বাণী লইয়া আসিয়াছেন। মুহম্মদ তাঁহার সম্প্রদায়ের নবী।" স্বল্পকাল বিরতির পর আবার হজরত

আল্লার বাণী লাভ করিলেন: "হে মুজাম্মিল, উঠ এবং ভয় প্রদর্শন কর" (৭৪ : ১)। প্রথম ওহী লাভের তিন বৎসর পর (৬১৩ খ্রীঃ) তিনি এই বাণী লাভ করেন। তখন হইতে তিনি সত্য প্রচার আরম্ভ করিলেন।

ধর্মপ্রচার

হজরত মুহম্মদ (দঃ) যে ধর্ম প্রচার করিলেন, তাহার নাম ইসলাম। বহু দেবদেবীর প্রচলিত পূজার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া তিনি লোকদিগকে স্রষ্টার একত্বে বিশ্বাস করিবার জন্য উদাত্ত কন্ঠে আহ্বান জানাইলেন।

একত্ববাদ

মানব-সৃষ্টির মূলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার অসীম নৈপুণ্যের কথা তিনি ঘোষণা করিলেন। আল্লাহ কি ভাবে বিশ্ব-প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই মানুষের খেদমতে নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহাও হজরত প্রচার করিলেন। অসহায় মানুষের প্রতি আল্লাহতাআলার অপার করুণার কথা তিনি বিশদ-ভাবে বুঝাইয়া বলিলেন। এমন করুণাময় ও মহানুভব যে স্রষ্টা তাঁহার প্রতি মানুষের কি কর্তব্য তাহাও তিনি নির্ধারিত করিলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চিহ্ন স্বরূপ মানুষ আল্লার ইবাদত করিবে। এই ইবাদত সালাত বা নামাজের রূপ পরিগ্রহ করে। জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্ববাসিগণ সকলে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া একই পংক্তিতে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িবে। বাদশা-ফকীর বা আমীর-গরীবে কোন ভেদাভেদ থাকিবে না। আধ্যাত্মিক মূল্য ছাড়াও নামাজের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে শুরু হইতেই ইমামের প্রতি আনুগত্য, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা শিক্ষা দেওয়া হয়। জার্মান লেখক জোসেফ হেল নামাজকে "ইসলামের প্রথম কৃচ্ছ্কাওয়াজের ক্ষেত্র' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবাদত : নামাজ

স্রষ্টার একত্বের সঙ্গে সঙ্গে হজরত সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শ ও শিক্ষা দিলেন। পরবর্তীকালে মদীনায় এই ভ্রাতৃত্বের আদর্শ আরও পরিস্ফুটভাবে মুসলমানদের জীবনধারায় বিকাশ লাভ করিয়াছিল। হজরত প্রচার করিলেন, মুসলমান মাত্রই ভাই-ভাই, তা সে যে কোন গোত্র, বংশ বা দেশেরই হউক না কেন। বিশেষ গোত্র বা বংশের আভিজাত্যের দাবী অস্বীকার করা হইল। যে ব্যক্তি সদাচরণ করিবে সেই আল্লার কাছে উচ্চমর্যাদার অধিকারী হইবে। হজরত মহম্মদ (দঃ) এইভাবে আরবদের আভিজাত্যের মূলে চরম আঘাত হানিলেন।

সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব

সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজ-জীবনে রূপায়িত করার জন্য জাকাতের ব্যবস্থা করা হইল। ইসলাম ধর্মে জাকাত ঐচ্ছিক দান-খায়রাত নহে। ইহা একটি বাধ্যতামূলক ধর্মীয় কর্তব্য। তদানীন্তন মক্কার ব্যবসাভিত্তিক সমাজে ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অতিরিক্ত বস্তুতান্ত্রিকতা প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল এবং ধনিক সম্প্রদায় যে ভাবে সমাজের দরিদ্র ও নিঃস্ব মানুষের প্রতি কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া আত্মকেন্দ্রিক ও ভোগ-সর্বস্ব জীবন যাপন করিতেছিল, তাহার বিরুদ্ধে হজরত সতর্কবাণী উচ্চারণ করিলেন। কুরআনে এই সম্প্রদায়ের কঠোর নিন্দাবাদ করা হইয়াছে। অর্থসম্পদ মানুষের প্রতি করুণাময় আল্লাহ্-তাআলার বিশেষ দান। ইহার প্রকৃত অধিকারী আল্লাহ। মানুষ কিছু-দিনের জন্য ইহার তত্ত্বাবধায়কমাত্র। তাই এই সম্পদের কিয়দংশ যতক্ষণ পর্যন্ত দরিদ্র ও দুঃস্থ মানবের কল্যাণে ব্যয়িত না হইবে, ততক্ষণ মানুষ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বিমুখ থাকিবে। আর্থিক উৎসর্গ ব্যতীত আধ্যাত্মিক মুক্তি সম্ভব নয়। এই ধর্মীয় কর্তব্যকে "জাকাত" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। স্তূপীকৃত স্বর্ণরৌপ্য ও পুঞ্জীভূত অর্থসম্পদ মানুষের আত্মাকে কলুষিত করে আর জাকাত তাহার মনকে উদার ও পবিত্র করে। কৃপণতা ও অর্থগৃধ্নুতা ইসলামের দৃষ্টিতে অতীব দোষণীয় অপরাধ। হজরত শেষ বিচারের সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়া বলিলেন যে, মানুষকে তাহার কৃতকর্মের জন্য স্রষ্টার নিকট জবাবদেহী হইতে হইবে। প্রত্যেক পুরুষ ও নারী ন্যায়, অন্যায় বা পাপ-পুণ্যের জন্য পুরস্কৃত বা শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে। ইসলামের উপরোক্ত মূলনীতি ও বিধি-ব্যবস্থা আরবের তৎকালীন রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাধিসমূহ নিরসন করিয়া আরববাসীদিগকে সম্পূর্ণ নিরাময় করিয়া তুলিতে পারে ইহাতে কোন সন্দেহ ছিল না ; কিন্তু হজরতের জন্মভূমি মক্কা তথা হিজাযের অধিবাসীরা নানা কারণে এই ধর্মকে মানিয়া লইতে অস্বীকার করিল। মানুষের সহজাত রক্ষণশীলতা কোন পরিবর্তনকে সহজে মানিয়া লইতে পারে না। হজরত মুহম্মদ (দঃ) মক্কায় আশৈশব মক্কাবাসীদের মধ্যে বড় হইয়াছেন। তাঁহাকে একজন নবী ও নেতা বলিয়া স্বীকার করিতে অনেকেই নারাজ ছিল। সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার নিকট হইতে পিতৃপিতামহের ধর্মীয় আচরণের পরিপন্থী কোন কথা শুনিতেই মক্কাবাসীরা

জাকাত

বিচারের দিন

ইসলাম প্রচার

ঘোরতর আপত্তি তুলিল। ইহা ছাড়া কুরাইশ নেতাগণ ভাবিল যে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে কাবার দেবদেবীর প্রাধান্য অস্বীকার করিতে হয়, তৎসঙ্গে কাবার নেতৃত্ব ও পৌরোহিত্যের ফলে তাহারা যে সকল আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত, তাহারও অবসান ঘটে। আবার ইসলামের সাম্যের বাণী মানিয়া লইলে গোত্রীয় আভিজাত্যের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। উল্লিখিত কারণে অতি অল্পসংখ্যক লোক নূতন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রথম দীক্ষিতদের মধ্যে খাদিজা, আলী, আবুবকর, জায়দ, উসমান, যুবাইর, তালহা ও আবদুর রহমানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতিপত্তিশালী আরব গোত্রের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেও কিছু সংখ্যক লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কাজেই সংখ্যায় নগণ্য হইলেও প্রাথমিক মুসলমানগণ প্রভাব-প্রতিপত্তিতে কোন অংশে কম ছিলেন না। অবশ্য ক্রীতদাস ও দরিদ্র শ্রেণীর কিছু লোকও ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া নানা অসুবিধা ও নির্যাতন সহ্য করিয়াও নূতন ধর্মকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, কারণ ইসলামের সার্বজনীন শিক্ষা সকল শ্রেণীর লোকদিগকে প্রথম হইতেই অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

হজরত মুহম্মদ (দঃ) প্রথমে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনদের নিকট ধর্মের বাণী শুনাইতে মনস্থ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একবার তাঁহার পিতৃব্যগণকে একত্রিত করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে কিছু বলিবার পূর্বেই আবু লাহাব (আবদুল মুত্তালিবের অন্যতম পুত্র) তাঁহাকে যাদুকর আখ্যায়িত করিল এবং তাহার ভ্রাতাগণ সভাস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। হজরত প্রকাশ্যে ধর্মপ্রচার আরম্ভ করিলেন এবং মূর্তিপূজার অসারতা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। কুরাইশদের নেতাগণ সমবেত হইয়া হজরতের পিতৃব্য আবু তালিবের নিকট গমন করিল এবং হজরতকে তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দিতে বলিল। আবু তালিব হজরতকে ডাকাইয়া কুরাইশ সর্দারদের কথা বলিলেন। হজরত ইহার উত্তরে বলিলেন, "পিতৃব্য, আল্লাহর কসম, যদি তাহারা আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্র আনিয়া দেয় এবং তৎপরিবর্তে আমাকে আমার পন্থা পরিত্যাগ করিতে বলে তথাপি আমি এই পথ ছাড়িব না, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাকে জয়যুক্ত করেন অথবা এই পথে আমার বিনাশ সাধন হয়।" বলিতে বলিতে হজরতের দুই চক্ষু অশ্রুতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আবু তালিব তখন তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, "তোমার যাহা খুশী প্রচার

কুরাইশদের বিরোধিতা: নির্যাতন

করিয়া বেড়াও, আমি কোন অবস্থাতেই তোমার পক্ষ ত্যাগ করিব না।" আবু তালিব বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের লোকদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, তাহারা যেন নবীকে কুরাইশদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করে। একমাত্র আবু লাহাব ব্যতীত আর সকলে তাঁহার কথায় রাজী হইল।

কুরাইশগণ তখন নির্বোধ লোকদিগকে হজরতের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিতে লাগিল। ইহারা হজরতকে মিথ্যাবাদী, কবি, যাদুকর ও ভূতাবিষ্ট বলিয়া গালি-গালাজ করিতে লাগিল। কুরাইশ বংশের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা আপন আপন গোত্রের মুসলমানদিগকে নানাভাবে নির্যাতন করিতে লাগিল। হজরত বিলাল জুমাহ্ বংশের একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁহার মনিব তাঁহাকে মরুভূমির মধ্যে শোয়াইয়া বুকে পাথর চাপা দিয়া খররৌদ্রে ফেলিয়া রাখিত। এই অবস্থায় বিলাল "আহাদ" "আহাদ" ("একম্, একম্") বলিয়া চীৎকার করিতেন। হজরত আবু বকর তাঁহার একটি ক্রীতদাসের বদলে বিলালকে মুক্ত করিয়া লইলেন। হজরত আবু বকর এইরূপে আরও কয়েকজন মুসলমান ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীকে তাঁহাদের মনিবের কবল হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

হজরতের বিরুদ্ধাচারীদের মধ্যে মখজুম গোত্রের আবু জহল ছিল সর্বপ্রধান। সে সর্বদা মক্কাবাসীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কাইয়া দিত। সে যখন শুনিত কোন লোক মুসলমান হইয়াছে, তখন সে যদি দেখিত যে, সমাজে তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তি রহিয়াছে এবং তাহার আত্মীয়-স্বজনরা তাহাকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত, তখন সে তাহার নিন্দাবাদ করিত এবং বলিত, "তুমি তোমার পিতার ধর্ম ছাড়িয়াছ, অথচ তোমার পিতা তোমার চেয়ে ভাল ছিল। আমরা তোমাকে অর্বাচীন বলিয়া ঘোষণা করিব এবং নির্বোধ নামে কলঙ্কিত করিব ; ইহাতে তোমার সুনাম সুখ্যাতি নষ্ট হইবে।" নও-মুসলিম যদি সওদাগর হইত, তবে সে বলিত, "আমরা তোমার পণ্য বর্জন করিয়া তোমাকে ভিখারী বানাইয়া ছাড়িব।" নব-দীক্ষিত সমাজে কোন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি না হইলে, সে তাহাকে মারধর করিত ও অপরাপর ব্যক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিত। আবদ-শামস (উমাইয়া) গোত্রের নেতা আবু সুফিয়ানও হজরতের ঘোরতর বিরোধিতা করিয়াছিলেন।

হজরত যখন দেখিলেন যে, অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে, তখন তিনি মুসলমানদিগকে আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া মুসলমানগণ আবিসিনিয়ায় চলিয়া যান। ইহাদের কেহ কেহ আপন আপন পরিবার সহ, আবার কেহ একাকীও গমন করেন। হজরত উসমান ও তাঁহার স্ত্রী রুকাইয়াও (হজরত মুহম্মদের কন্যা) তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। এইভাবে সর্বমোট তিরাশিটি পরিবার আবিসিনিয়ায় গমন করে। ইঁহাদের কেহ কেহ মদীনায় হিজরতের পূর্বে আবিসিনিয়া হইতে মক্কায় ফিরিয়া আসেন, অন্যান্যরা খায়বারের যুদ্ধের পূর্বে মদীনায় হজরতের সঙ্গে মিলিত হন। আবিসিনিয়ার খ্রীস্টান রাজা নাজ্জাশী মুসলমানদিগকে তাঁহার রাজ্যে আশ্রয় দেন। ইহা দেখিয়া মক্কাবাসীরা তাহাদের দুইজন প্রতিনিধিকে আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করিলেন। তাহারা নাজ্জাশীকে নানা উপঢৌকনে সন্তুষ্ট করিয়া দলত্যাগী মুসলমানদিগকে পরিহার করিতে বলিল। নাজ্জাশী মুসলমানদের নেতা জাফর ইবন আবু তালিবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আবু তালিব রাজার সম্মুখে তাঁহাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ, মক্কাবাসীদের অত্যাচার ও নূতন ধর্মের মর্মবাণী এমন প্রাণস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিলেন যে, রাজা তাঁহাদের প্রতি সহৃদয়তা প্রদর্শন করিলেন এবং তাঁহার রাজ্যে তাঁহাদিগকে বসবাসের অনুমতি দান করিলেন। মক্কার প্রতিনিধিরা বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল।

আবিসিনিয়ায় হিজরত ৬১৫ খ্রীঃ

এই সময় হজরত উমর ইসলাম ধর্ম কবুল করেন। কথিত আছে, একদা তিনি হজরত মুহম্মদকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তিনি শুনিতে পাইলেন, তাঁহার ভগ্নী ও ভগ্নীপতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। তিনি ভগ্নীপতির গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে মারধর করিলেন। কিন্তু সেখানে কুরআনের কিয়দংশ পাঠ শুনিয়া তিনি অভিভূত হইলেন এবং তাঁহার ভগ্নী ও ভগ্নীপতির প্রতি কঠোর আচরণের জন্য গভীর অনুশোচনা প্রকাশ করিলেন। তারপর তিনি হজরত মুহম্মদের নিকট গিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন। আবদুল্লাহ্ ইবন মাসুদ বলিয়াছেন, "উমরের ইসলাম গ্রহণ একটি বিজয় বিশেষ, তাঁহার মদীনায় হিজরত পরম সাহায্য এবং তাঁহার সরকার খোদায়ী অনুকম্পা। তাঁহার মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত আমরা কাবাঘরে নামাজ পড়িতে পারিতাম না। মুসলমান হওয়ার পর তিনি কুরাইশদের সহিত লড়াই করিলেন এবং সেখানে নামাজ পড়িলেন এবং আমরাও তাঁহার সহিত শরীক হইলাম।"

উমরের ইসলাম গ্রহণ

কুরাইশ নেতারা যখন দেখিল যে, আবিসিনিয়ায় মুহাজির

মুসলমানগণ শান্তি ও নিরাপদে বসবাস করিতেছে এবং উমর ও হামজার সাহস ও শৌর্যবীর্যে মক্কার মুসলমানরাও নির্ভয়ে দিন যাপন করিতেছে, তখন তাহারা চরমপন্থা হিসাবে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকে সমাজচ্যুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। তাহারা আবু জহলের নেতৃত্বে সমবেত হইয়া একটি অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করিল এবং ইহাকে কাবাঘরে ঝুলাইয়া রাখিল। এই অঙ্গীকারপত্র অনুসারে তাহারা বনু হাশিমের (ও বনু মুত্তালিবের) সহিত সকল সম্পর্ক বর্জন করিবে (৬১৬খ্রীঃ)। তাহারা তাহাদের সহিত কোন বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিবে না এবং সকল ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিবে। এই পন্থায় ক্ষুধা তৃষ্ণায় কষ্ট দিয়া তাহারা মুসলমানগণকে ধর্মত্যাগে বাধ্য করিবে। বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের লোকেরা আবু তালিবের গলিতে গমন করিয়া তাঁহার সহিত বসবাস আরম্ভ করিল। আবু লাহাব হাশিম গোত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সে এবং তাহার স্ত্রী উভয়ে মুসলমানদের ঘোরতর বিরোধিতা করিতে আরম্ভ করিল। কুরআনে ইহাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হইয়াছে। দুই বা ততোধিক বৎসর এইভাবে বনু হাশিমের লোকেরা একঘরে হইয়া থাকিল। অধিকাংশ সময় খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে তাহাদিগকে বহু কষ্টে দিনাতিপাত করিতে হইত। কালক্রমে কুরাইশ নেতাগণ তাহাদের বর্জন-নীতির বর্বরতা ও অসারতা বুঝিতে পারিল। আবার তাহাদের মধ্যে অনেকেই বনু হাশিমের সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ ছিল। ইহারা গোপনে গোপনে বনু হাশিমকে খাদ্যাদি যোগাইত। পরিশেষে ইহাদেরই কয়েকজনের প্রচেষ্টায় এই ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হইল।

বনু হাশিমের সমাজচ্যুতি ৬১৬ খ্রীঃ

কুরাইশদের বর্জন-নীতি পরিহারের অল্পকাল পরেই হজরতের পিতৃব্য আবু তালিব পরলোক গমন করেন। ঐ বৎসরই হজরতের প্রিয়তমা পত্নী খাদিজার ইন্তিকাল হয়। ইঁহারা উভয়ে হজরতের কর্মজীবনে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। আবু তালিব ছিলেন প্রথম জীবনে হজরতের প্রতিপালনকর্তা ও পরবর্তীকালে তাঁহার রক্ষাকর্তা। আবু তালিবের খাতিরেই বনু হাশিম কুরাইশদের যাবতীয় অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে হজরতের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। ধর্মপ্রচারে হজরতের স্বাধীনতা ও সুযোগের পশ্চাতে ছিল এই গোত্রীয় সমর্থন। আবু তালিবের ভয়েই কুরাইশ নেতৃবৃন্দ হজরত ও তাঁহার

শোকের বৎসর ৬১৯ খ্রীঃ

অনুসারীদের বিরুদ্ধে কোন চরম পন্থা অবলম্বন করিতে সাহস পায় নাই। তাই আবু তালিবের মৃত্যু হজরতের জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। খাদিজা ছিলেন প্রকৃতই হজরতের সহধর্মিণী। ওহীলাভের প্রথম অবস্থায় এই মহিয়সী মহিলা হজরতের মনে আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় করিয়া তাঁহার জীবনে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিলেন। সুখে দুঃখে তিনি ছিলেন হজরতের নিত্যসহচরী ও উৎসাহদাত্রী। এই দুইটি মৃত্যু হজরতকে নানাদিক হইতে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। তাঁহার কর্মজীবনে ইহা একটি নূতন পরীক্ষা। আল্লাহ্‌র অপার করুণায় এই পার্থিব বিয়োগের পর পরই হজরত এক নূতন আধ্যাত্মিক মর্যাদায় ভূষিত হইলেন। ইহার নাম মি'রাজ। এই মি'রাজের মাধ্যমে তাঁহার বিয়োগবিধুর আত্মা মহাপ্রভুর অতি সন্নিধানে আধ্যাত্মিক মহাশান্তি লাভ করিলেন।

আবু তালিবের মৃত্যুর পর আবু লাহাব বনু হাশিম গোত্রের সর্দার নিযুক্ত হইল। আবু লাহাব ইসলাম ধর্মের ঘোরতর শত্রু ছিল। এই সময় হজরতের উপর কুরাইশদের নির্যাতন বাড়িয়া গেল। দুষ্ট লোকেরা নামাজ-রত অবস্থায় হজরতের শরীরে পশুর নাড়িভুঁড়ি ছুঁড়িয়া মারিত। একবার এক দুষ্ট লোক হজরতের মাথায় ধূলা ছুঁড়িয়া মারিল। হজরতের এক কন্যা তাঁহার মস্তক ধৌত করিতে করিতে বিলাপ আরম্ভ করিলেন। হজরত তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে, আল্লাহ্ তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। তিনি আরও বলিলেন, "আবু তালিবের জীবদ্দশায় কুরাইশরা আমার সহিত কখনও এইরূপ ব্যবহার করে নাই।" এইসব কারণে হজরত ধর্মপ্রচারের নূতন ক্ষেত্র খুঁজিতে প্রয়াসী হইলেন। তিনি প্রথমে মক্কার আট মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত তায়িফ নগরীতে ইসলাম ধর্ম প্রচার করিতে মনস্থ করিলেন। তায়িফ মক্কা হইতে অপেক্ষাকৃত উর্বর এলাকায় অবস্থিত একটি বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। অবস্থাপন্ন মক্কাবাসীরা ইহাকে গ্রীষ্মাবাস হিসাবে ব্যবহার করিত। তায়িফের অধিবাসী বনু সাকিফ মক্কার বনু হাশিম ও বনু উমাইয়ার সহিত আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ ছিল। কাজেই ইসলাম প্রচারের নূতন ক্ষেত্র হিসাবে হজরত এই তায়িফ শহরকে বাছিয়া লইয়াছিলেন। তায়িফে হজরত কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোককে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানান। কিন্তু ইহারা সকলে তাঁহার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। তায়িফের নেতারা শুধু হজরতকে প্রত্যাখ্যান করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, তাহারা দুষ্ট লোকদের তাঁহার বিরুদ্ধে

তায়িফে ধর্মপ্রচার

লেলাইয়া দিল। ইহারা পাথর মারিয়া হজরতের দেহ রক্তাক্ত করিয়া ফেলিল। তায়িফ হইতে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিবার সময় হজরত নাখলা নামক স্থানে গভীর রাত্রিতে প্রার্থনায় নিমগ্ন হইলেন। জীবনের এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে হজরত পরম শক্তিমান আল্লাহতাআলার নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিলেন। তারপর তিনি মক্কার দিকে রওয়ানা করেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এইবার মক্কায় সরাসরি প্রত্যাবর্তন তাঁহার পক্ষে নিরাপদ হইবে না। তাই তিনি কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। পরিশেষে নওফল গোত্রের মুতিম নামক একজন সর্দার তাঁহাকে আশ্রয় দিতে রাজী হইলে তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ইহার পর হজরত হজের সময় মেলা উপলক্ষে কয়েকটি আরব গোত্রের মধ্যে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রচেষ্টাও ফলপ্রসূ হয় নাই। ৬২০ খ্রীস্টাব্দে তিনি যখন এইভাবে আকাবা নামক স্থানে ইসলাম প্রচার করিতে গেলেন তখন মদীনা হইতে আগত খজরজ গোত্রের কয়েকজন লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাহাদিগকে কুরআনের বাণী শুনাইলেন। তাহারা ছয়জন লোক তখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল। ৬২১ সালে হজের মওসুমে ইহাদের মধ্যে পাঁচজন লোক আরও সাতজন লোককে সঙ্গে লইয়া হজরতের সহিত পুনরায় আকাবায় মিলিত হয়। ইহাদের মধ্যে আওস বংশের তিনজন লোক ছিল। ইহারা সকলে ইসলাম ধর্ম কবুল করিল এবং বিভিন্ন পাপকর্ম পরিহার করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইল। ইহাকে আকাবার প্রথম অঙ্গীকার বলা হয়।

মদীনাবাসীদের সহিত যোগাযোগ

পর বৎসর (৬২২ খ্রীঃ) বাহাত্তরজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক আকাবায় হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করে। ইহারা সকলে হজরতকে আপদে-বিপদে রক্ষা করার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া প্রতিশ্রুতি দান করিল। ইহাকে আকাবার দ্বিতীয় অঙ্গীকার বলা হয়। এইভাবে হজরতের মদীনায় হিজরতের পথ সুপ্রশস্ত হইল। ইহার পর হজরতের সাহাবাগণ চুপে চুপে মদীনায় হিজরত আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে হজরত মুহম্মদ হজরত আবু বকরকে সঙ্গে লইয়া মদীনার পথে রওয়ানা হইলেন। ইহাই ইতিহাসে "হিজরত" নামে খ্যাত। তাঁহারা নবুয়তের ত্রয়োদশ বর্ষের

হিজরত, ২৪শে সেপ্টেম্বর, (৬২২ খ্রীঃ)

১২ই রবিউল আউয়াল* (মোতাবেক ২৪শে সেপ্টেম্বর, ৬২২ খ্রীঃ) মদীনার উপকণ্ঠে কুবা নামক স্থানে পৌঁছিলেন। হজরত আলী হজরত মুহম্মদের নিকট গচ্ছিত আমানতের জিনিসপত্র ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য তিন দিন মক্কায় অবস্থানের পর কুবায় আসিয়া হজরত মুহম্মদের সহিত মিলিত হন। কুবায় হজরত মুহম্মদ পৃথিবীর প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। মদীনায় হজরতের অনুসারীদের অনেকেই নিজ নিজ বাসস্থানে হজরতকে আতিথেয়তা দানের সৌভাগ্য অর্জন করিতে চাহিলেন, কিন্তু হজরত তাঁহার মেজবান নির্বাচনের ভার আপন উটের উপর ছাড়িয়া দেন। উটটি হজরত আবু আইয়ুবের বাসগৃহের সম্মুখে গিয়া জানু গাঁড়িয়া বসিল। মদীনায় মসজিদে-নববী প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত হজরত মুহম্মদ আবু আইয়ুব আনসারীর গৃহে অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি মসজিদে-নববীর সংলগ্ন কুঠরীতে গমন করেন।

এইভাবে হজরতের জীবনের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইল। মক্কাবাসীদের বিরোধিতা, ধর্মের জন্য নির্যাতন ভোগ, ধর্মপ্রচারের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও অশেষ ত্যাগ স্বীকার এবং অবশেষে জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ তাঁহার এই জীবনকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। তিনি এক্ষণে জীবনের পরিপূর্ণতার প্রথম ধাপে অবতীর্ণ হইলেন। পরবর্তী জীবনের অভাবনীয় সাফল্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের যাবতীয় প্রস্তুতি এ মক্কা-জীবনেই সংসাধিত হইয়াছে। জন্মভূমিতে পরিত্যক্ত নবী জন্মভূমির বাহিরে সম্মানের আসন লাভ করিলেন। যাঁহারা নূতন ধর্মের খাতিরে হজরতের সহিত জন্মভূমির মায়া কাটাইয়া মদীনায় হিজরত করিলেন, তাঁহাদিগকে মুহাজির (বাস্তুত্যাগী) বলিয়া আখ্যায়িত করা হইল। আর ধর্মের খাতিরে যাহারা ইহাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিল সেই সকল মদীনাবাসী মুসলমানদিগকে আনসার (সাহায্যকারী) নামে অভিহিত করা হইল। ইসলামের ভ্রাতৃত্বের মহান আদর্শ নূতন আবাসভূমি মদীনায় আনসার ও মুহাজিরগণের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের মধ্যদিয়া বাস্তবায়িত হইয়া উঠিল।

---

* ঐ বৎসরের চান্দ্রমাসের পহেলা মুহররম মোতাবেক ৬২২ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই জুলাই হইতে হিজরী বর্ষ গণনা করা হয়। হজরত উমর হিজরী সালের প্রবর্তন করেন।

৭

হজরত মুহম্মদ (দঃ) : মদীনায়

হিজরতের প্রাক্কালে মদীনার অবস্থা

মদীনা শহরের পূর্ব নাম ইয়াস্রেব ছিল। এই শহরে হজরতের পদার্পণের পর ইহার নাম হইল 'মদীনাতুন্নবী' বা নবীর শহর। সংক্ষেপে ইহা মদীনা নামেই পরিচিত হইতে থাকে। মদীনায় এই সময় আওস ও খজরজ নামক দুইটি প্রধান গোত্রের লোক বাস করিত। ইহারা প্রাচীন-কালে ইয়ামন হইতে ইয়াস্রেবে আসিয়া বসবাস করিতে থাকে। কালক্রমে ইহারা এই শহরে সংখ্যাধিক্য লাভ করে এবং স্থানীয় লোকদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। হজরতের সময় মদীনায় বহু সংখ্যক ইহুদী বাস করিত। ইহাদের মধ্যে বনু কুরাইজা, বনু নাজির ও বনু কাইনুকা প্রধান ছিল। আওস ও খজরজ গোত্রের লোকেরা প্রায়ই পরস্পর কলহে লিপ্ত হইত। হিজরতের কয়েক বৎসর পূর্বে ইহাদের মধ্যে বু'আসের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মদীনার আশে পাশের খর্জুর বাগান ও কর্ষণোপযোগী ভূমি ইহাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল। কিন্তু গোত্রীয় কলহের ফলে তাহাদের আর্থিক জীবনে অনিশ্চয়তা বিরাজ করিত। মক্কায় যেমন একশ্রেণীর ধনিক সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের ফলে বেদুঈন সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল তেমনি গোত্রীয় কলহ-বিবাদ মদীনার কৃষি-প্রধান জীবনযাত্রায়ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করিয়াছিল। মক্কার অধিবাসীরা অনুরূপ অবস্থায় ইসলামের একতা ও সাম্যের বাণী অস্বীকার করিল। তবে কি কারণে মদীনার লোকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল? বিভিন্ন ঐতিহাসিক ইহার জন্য বিভিন্ন কারণ দর্শাইয়াছেন। হজরত মুহম্মদ (দঃ) মক্কাবাসীদেরই একজন ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে নূতন ধর্মের বাণী শুনিতে তাহারা নারাজ ছিল। তাহাদের রক্ষণশীলতা ও গোত্রীয় আভিজাত্য নূতন ধর্ম গ্রহণের পথে প্রধান অন্তরায় ছিল। হজরতের নূতন ধর্ম-ভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে মক্কার অভিজাত সম্প্রদায়সমূহ পুরাতন গোত্রভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য শেষ বারের মত আত্ম-সচেতন হইয়া উঠিল। মদীনা অপেক্ষা মক্কায় গোত্রীয় আভিজাত্য অতি প্রাচীন ও একান্ত বদ্ধমূল ছিল। গতানুগতিক গোত্রীয় কলহ ও

বিবাদের সমাধানের চেয়ে গোত্রীয়-ব্যবস্থাকে বাঁচাইয়া রাখিবার চিন্তাই তাহাদিগকে পাইয়া বসিল। অন্য পক্ষে আওস ও খজরজ বংশের লোকেরা তাহাদের সাম্প্রতিক কলহে নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। যে সামাজিক ব্যাধি তাহাদের জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত ও পঙ্গু করিয়া তুলিতেছিল তাহার সমাধানের জন্যই যেন তাহারা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাই হজযাত্রার সময় যখন তাহারা হজরতের মুখ হইতে একতা ও সাম্যের বাণী শ্রবণ করিল, তখন তাহারা তাহাতে নিজেদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাইল। তাহারা ভাবিল, ইসলাম ধর্ম যেমন তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, তেমনি হজরত-নবীর নেতৃত্ব তাহাদের নগরীতে একটি শান্তির রাজ্য স্থাপন করিতে পারে। মক্কাবাসীরা যে জীর্ণ সমাজ-ব্যবস্থাকে জিয়াইয়া রাখিবার জন্য হজরতকে প্রত্যাখ্যান করিল, মদীনাবাসীরা সে জীর্ণ ব্যবস্থাকেই ভাঙ্গিয়া গড়িবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিল। কোন কোন লেখকের মতে মদীনায় ইহুদীদের সান্নিধ্যের ফলে তওহীদবাদ ও নবুয়তের ধারণা সম্বন্ধে তাহারা পূর্বাহ্নেই অবহিত ছিল। আল্লার একত্ব ও হজরত মুহম্মদের নবুয়ত গ্রহণের মাধ্যমে তাহারা এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া ইসলামের বাণী গ্রহণ করিল।

মদীনায় পৌঁছিয়া হজরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহার অসাধারণ সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় দেন। মক্কার মুসলমান সম্প্রদায় ছিল সংখ্যায় নগণ্য, সমাজে অবহেলিত ও জানমালের নিরাপত্তার ভয়ে সর্বদা আতঙ্কিত। মদীনায় এই

মদীনার গঠনতন্ত্র

অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। মক্কা হইতে আগত মুহাজির ও মদীনার আনসারগণ একই আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং একই ভাব-ধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এক একক ধর্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে। তাহারা হজরত মুহম্মদের নবুয়তে আস্থাবান ছিল। মদীনায় পৌঁছিয়াই হজরত তাঁহার সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য মসজিদে-নববীর প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে শুক্রবারে জুমআর নামাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মদীনায় হজরতের আগমনের পূর্বে সর্বজন স্বীকৃত কোন শাসন-ব্যবস্থা ছিল না। মদীনায় পৌঁছার পর জনসাধারণের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার দায়িত্বও তাঁহার স্কন্ধে অর্পিত হয়। মুহাজির ও আনসারগণ ব্যতীত মদীনার অন্য অধিবাসীরা ছিল ইহুদী। তাহারা হজরত মুসার প্রচারিত ধর্ম ও তওরাত কিতাবের অনুসারী ছিল। তাহারাও তওহীদ-

বাদী ছিল। দূরদর্শী রাজনীতিকের মত হজরত বুঝিতে পারিলেন যে, এই ইহুদী সম্প্রদায়কে বাদ দিয়া মদীনায় কোন নিরাপত্তা-ব্যবস্থা কায়েম হইতে পারে না। তাই তিনি মুসলমান ও ইহুদীদের সমানাধিকারের ভিত্তিতে মদীনায় এক সরকার প্রতিষ্ঠার কাজে মনোযোগী হইলেন। তওহীদপন্থী মুসলমান ও তওহীদপন্থী ইহুদীদের একই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে একত্র বসবাসের এক আদর্শ পন্থা তিনি উদ্ভাবন করেন। কিন্তু তওহীদপন্থী হইলেও মুসলমান ও ইহুদীদের ধর্মীয় আচার-নিষ্ঠায় পার্থক্য থাকা একান্ত স্বাভাবিক। তাই ধর্মের ব্যাপারে হজরত ইহুদীদিগকে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করেন। এই মর্মে তিনি একটি গঠনতন্ত্র ঘোষণা করেন। এই গঠনতন্ত্রকে ঐতিহাসিকগণ "মদীনার গঠনতন্ত্র" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই গঠনতন্ত্রের প্রধান প্রধান ধারাগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হইল:

ইবন ইসহাক বলেন, 'আল্লার নবী আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে একটি দলীল লিখিলেন, ইহাতে তিনি ইহুদীদের সহিতও একটি সন্ধি ও অঙ্গীকার করিলেন, তাহাদিগকে ধর্ম ও সম্পত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং অধিকার ও কর্তব্য দান করিলেন;

"রহমানুর রহীম আল্লাহ্‌র নামে.

কুরাইশ ও ইয়াস্রেবের মুসলমানগণ ও যাহারা তাহাদিগকে অনুসরণ করে ও তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া একত্র যুদ্ধ করে, তাহাদের মধ্যে ইহা নবী মুহম্মদের একটি দলিল।"

"তাহারা অন্যান্য লোক হইতে একটি পৃথক সম্প্রদায় (উম্মাহ্)।" .. .. "আল্লাহ্‌র স্বস্তি-ব্যবস্থা (জিম্মাহ) এক ও অভিন্ন,.. .. .. বিশ্বাসিগণ অপরাপর লোকদের চেয়ে পৃথক থাকিয়া পরস্পরকে রক্ষা করিবে।"

"ইহুদীদের মধ্যে যে আমাদিগকে অনুসরণ করে, তাহার জন্য অনুরূপ সাহায্য ও সমর্থন থাকিবে, যতক্ষণ বিশ্বাসীরা তাহার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং সে তাহাদের বিরুদ্ধে অন্যদেরকে সাহায্য না করে।"

"যখন আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ হইতে থাকে, তখন মুমীনদের (বিশ্বাসীদের) মধ্যে শান্তি অবিভাজ্য হইবে। কোন মুমীন অন্য মুমীন হইতে পৃথকভাবে শান্তি স্থাপন করিতে পারে না। শুধুমাত্র তাহাদের (মুমীনদের) মধ্যে সমতা ও ন্যায়বিচার রক্ষার বেলায় ইহার ব্যতিক্রম হইবে।"

.. ..

"যখনই কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতদ্বৈধ হয়, তখনই ইহা আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রসুলের কাছে মীমাংসার জন্য সোপর্দ করা হইবে।"

"ইহুদীগণ যুদ্ধ চলাকালে মুমীনদের সহিত এক সহযোগে যুদ্ধের খরচ বহন করিবে।"

"বনু আউফের ইহুদীগণ মুমীনদের সঙ্গে একই সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহুদীদের জন্য তাহাদের ধর্ম (দীন) এবং মুসলমানদের জন্য তাহাদের ধর্ম। একথা তাহাদের নিজেদের বেলায় যেমন প্রযোজ্য তাহাদের আশ্রিতের (মাওলা) বেলায়ও তেমন প্রযোজ্য। শুধুমাত্র যে অন্যায় করিয়াছে অথবা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে তাহার বেলায় ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবে। ঐরূপ লোক তাহার নিজের ও পরিবারের উপর অমঙ্গল টানিয়া আনিবে।"

.. .."এই দলীলের অনুসারী লোকদের জন্য ইয়াস্রেব উপত্যকা পবিত্রভূমি স্বরূপ।"

"যখনই এই দলীলের লোকদের মধ্যে এমন কোন ঘটনা বা বিবাদ ঘটে যাহাতে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা থাকে, তখন উহা আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রসুলের কাছে মীমাংসার জন্য নেওয়া হইবে। আল্লাহ্‌ এই দলীলের সঠিক ও বিশ্বস্ত প্রতিপালক।"

"কুরাইশ ও তাহাদের সাহায্যকারীদিগকে কোন প্রতিবেশীসুলভ আশ্রয় দেওয়া হইবে না।"

"হঠাৎ যাহারা ইয়াস্রেব আক্রমণ করিবে, তাহাদের বিরুদ্ধে ইহারা (এই দলীলের লোকেরা) পরস্পরকে সাহায্য করিবে।"... ...

মদীনা-গঠনতন্ত্রের তারিখ লইয়া বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। তবে অধিকাংশ সমালোচকের মতে হজরতের মদীনা আগমনের পর বদরের যুদ্ধের পূর্বে ইহা প্রচারিত হয়। গঠনতন্ত্রের প্রধান প্রধান ধারাগুলি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিলে ইহার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে যথাযথ ধারণা করা যায়। দলীলটির প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য মদীনার মুসলমান ও অমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে সহজ সাধারণ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া একটি যৌথ স্বস্তি-ব্যবস্থা কায়েম করা। এই স্বস্তি-ব্যবস্থার তিনটি ধাপ বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। প্রথমতঃ মক্কা হইতে আগত মুসলমানগণ ছিল এই স্বস্তি-ব্যবস্থার অন্তঃকরণ স্বরূপ; দ্বিতীয় ধাপে ইয়াস্রেবের মুসলমানগণ তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া ধর্মের ভিত্তিতে এক শক্তিশালী রক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিল।

মদীনা গঠনতন্ত্রের গুরুত্ব

এবং মক্কা ও সিরিয়ার বাণিজ্যপথে মক্কাবাসীদের জন্য বাধা সৃষ্টির প্রয়াস পাইলেন। ইতিমধ্যে একবার মক্কার একজন সর্দার দলবলসহ মদীনায় মুসলমানদের চারণভূমিতে তাহাদের উটের পাল আক্রমণ করে। হজরত তাহাকে বহুদূর পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া পলায়নে বাধ্য করে।

কারণ দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবন জাহ্শ্‌কে বারজন লোকসহ মক্কা ও তায়িফের মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানে প্রেরণ করেন এবং "কুরাইশদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও সংবাদ দানের" আদেশ দেন। ঘটনাক্রমে ঐ সময় কুরাইশদের কয়েকজন লোক সিরিয়া হইতে পণ্যদ্রব্য লইয়া ফিরিতেছিল। আবদুল্লাহ্ ইহাদিগকে আক্রমণ করিয়া আমর ইবন হাজরামী নামক এক ব্যক্তিকে নিহত করে ও অপর দুইজনকে বন্দী করে। তাহাদের পণ্যদ্রব্যও আবদুল্লার হাতে আসে। আবদুল্লাহ্ মদীনায় আসিয়া এই ঘটনা বিবৃত করিলে হজরত তাহাদিগকে এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন, "তোমাদিগকে যাহা করিতে আদেশ দেওয়া হয় নাই, তোমরা তাহা করিয়াছ এবং নিষিদ্ধ মাসে তোমরা যুদ্ধ করিয়াছ, যাহার জন্য তোমাদের কোন প্রত্যাদেশ ছিল না।" এমন কি হজরত প্রথমতঃ গনীমতের মাল গ্রহণ করিতেও অস্বীকার করেন।

নাখলার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াই কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। এই সময় মক্কাবাসীদের এক বিরাট বাণিজ্য-কাফেলা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে বহু মূল্যবান পণ্যদ্রব্য সহ সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। আবু সুফিয়ান মক্কায় খবর পাঠাইয়া দিল যে, মুসলমানগণ তাহার কাফেলা লুন্ঠন করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। এই সংবাদে তাহাদের মধ্যে রণ-দামামা বাজিয়া উঠিল। এদিকে হজরতের কানেও এইসব খবর পৌঁছিলে তিনি মুসলমানদিগকে লইয়া একটি বৈঠকে মিলিত হন এবং বিশেষ করিয়া আনসারদের মতামত শুনিতে চাহিলেন। তাহারা প্রয়োজন হইলে মক্কাবাসীদের মুকাবিলার জন্য তাহাদের সঙ্কল্পের কথা এক বাক্যে জানাইল। দ্বিতীয় হিজরীর রমজান মাসে (মার্চ, ৬২২) হজরত ৩০০ জন মুসলমানের সহিত মদীনা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। এদিকে মক্কাবাসীরা আবু জহলের নেতৃত্বে এক হাজার লোকের একটি বাহিনী লইয়া মদীনার দিকে অগ্রসর হইল। তাহারা বদরের নিকট শুনিতে পাইল যে, আবু সুফিয়ানের কাফেলা নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। তখন যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত নিরর্থক মনে করিয়া কুরাইশদের দুইটি সম্প্রদায়

(জুহরা ও আদী) ফিরিয়া আসিল। নাখলার দুর্ঘটনায় নিহত লোকের খুন-খেসারত মিটাইয়া দিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিবার জন্য একজন কুরাইশ সর্দার আগাইয়া আসিলেন, কিন্তু আবু জহল কৌশলে তাঁহাকে বারণ করিয়া যুদ্ধের কারণ জিয়াইয়া রাখিল এবং সম্পূর্ণ বাহিনীকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিল।

দ্বিতীয় হিজরীর রমজান মাসে (মার্চ, ৬২২) বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের পূর্বরাত্রে হজরত বদরের নিকটবর্তী প্রায় সকল পানির কূপ দখল করিয়া লইলেন। কুরাইশগণ হজরতের প্রকৃত অবস্থিতি সম্বন্ধে অবগত ছিল না। যুদ্ধের দিন প্রত্যুষে হজরতকে কূপসমূহের নিকটে দেখিতে পাইয়া তাহারা প্রমাদ গণিল। প্রথমে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হইল, উভয়পক্ষে তীর বিনিময় হইল এবং তারপর রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মুসলমানদের প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে কুরাইশগণ পিছু হটিয়া চলিল। হজরত মুহম্মদ (দঃ) তখন এক মুঠি নুড়ি-পাথর লইয়া শত্রুর প্রতি ছুঁড়িয়া মারিলেন এবং তাহাদিগকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করিবার জন্য মুসলমানদিগকে আদেশ করিলেন। মুসলমানগণ অমিততেজে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া কুরাইশদিগকে আক্রমণ করিল। তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। আবু জহল সমেত বহু কুরাইশ সর্দার নিহত হইল এবং অনেকে বন্দী হইল। হজরত বন্দীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহারের আদেশ দিলেন। ইহাদের মধ্যে যাহারা বিত্তবান ছিল, তাহাদিগকে অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দেওয়া হইল। যাহারা টাকা পয়সার অভাবে মুক্তিমূল্য দিতে অপারগ হইল হজরত পরিশেষে তাহাদিগকে এমনিই ছাড়িয়া দিলেন। মক্কাবাসীদের হৃদয় জয়ের জন্য ইহা অত্যন্ত কার্যকরী হইয়াছিল।

বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের জয়ের কারণ বিশ্লেষণ করিতে হইলে বলিতে হয়, ইহা ছিল অবিশ্বাসের উপর বিশ্বাসের জয়; অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার উপর নিয়ম-শৃঙ্খলার জয়। মুসলমানগণ যুদ্ধ করিতেছিল তাহাদের ধর্ম-রক্ষার জন্য, যে ধর্মের জন্য তাহারা স্বদেশ, আত্মীয়-স্বজন ও ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়াছিল। ইসলামের জন্য যুদ্ধে প্রাণদান করিয়া শহীদ হইলে পরকালে তাহাদের সুনিশ্চিত স্বর্গলাভ ঘটিবে। এক উত্তম ও উত্তুঙ্গ জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহারা প্রাণপণ যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। অন্যপক্ষে মক্কাবাসীদের অনেকেই শুধু জেদের বশবর্তী হইয়া মুসলমানদের প্রতি তাহাদের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যুদ্ধে নামিয়াছিল।

কিন্তু তাহাদের মধ্যে একতার অভাব ছিল। মুসলমানগণ তওহীদ-পন্থী ও সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী। হজরতের অবিসম্বাদিত নেতৃত্ব ও ধর্মের পথে একত্র কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ মুসলমানদিগকে একক ও অবিভাজ্য গোষ্ঠীতে পরিণত করিয়াছিল। কুরাইশদের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব ছিল। মুসলমানগণ হজরতের নেতৃত্বাধীনে সর্বক্ষণ নিয়ম-শৃঙ্খলা মানিয়া চলিয়াছিল। তাঁহার রণনৈপুণ্য ও সৈনাপত্য মুসলমানদের জয়ের আর একটি কারণ। এই সকল কারণে সংখ্যায় নিতান্ত নগণ্য হইলেও মনোবল ও শৌর্যবীর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া মুসলমানগণ তিনগুণেরও বেশী শত্রুসৈন্যকে পর্যুদস্ত করিয়া দিয়াছিল। শুধু যে সংখ্যায় মুসলমানগণ নগণ্য ছিল তাহা নহে, তাহাদের অস্ত্রবল ও সমর-সরঞ্জামও কুরাইশদের তুলনায় অনেক কম ছিল। কুরাইশদের সংখ্যাধিক্য ও সমর-প্রস্তুতির প্রাচুর্য তাহাদিগকে অতিমাত্রায় দাম্ভিক করিয়া তুলিয়াছিল। সংখ্যাধিক্য হেতু সুনিশ্চিত জয় অবধারিত মনে করিয়া তাহারা মুসলমানদের শক্তি সম্পর্কে ভুল ধারণা করিয়াছিল। পরিশেষে ঈমান, একতা ও শৃঙ্খলারই জয় হইল।

ইসলামের ইতিহাসে বদরের যুদ্ধ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া রহিয়াছে। বিপুল সমর-সজ্জায় সুসজ্জিত বিরাট কুরাইশ বাহিনীর উপর স্বল্পসংখ্যক মুসলমানের বিজয়কাহিনী দিকে দিকে বিঘোষিত হইল। আরবের লোকেরা এই বিজয়কে অলৌকিক বিজয় বলিয়া মনে করিল। তাহাদের প্রত্যয় হইল যে, ইসলাম সত্য ধর্ম এবং হজরতের নবুয়তে তাহারা আস্থাবান হইল। তাহাদের আরও বিশ্বাস হইল যে, খোদায়ী সাহায্যের ফলেই মুসলমানদের এই বিস্ময়কর বিজয় সম্ভবপর হইয়াছে। বদরের বিজয়ের ফলে ইসলামের ভবিষ্যৎ যেমন দৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, তেমনি এই যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় ঘটিলে কি অবস্থা হইত, তাহাও ভাবিয়া দেখিবার মত। এই যুদ্ধে পরাজিত হইলে ইসলামের ইতিহাস হয়ত ভিন্নভাবে লিখিত হইত, হয়ত ইসলাম ও মুসলমানদের নাম ও নিশানা পৃথিবীর বুক হইতে মুছিয়া যাইত।

বদরের শোচনীয় পরাজয়ের কথা মক্কায় পৌঁছিলে মক্কাবাসীদের নিকট প্রথমে ইহা অবিশ্বাস্য মনে হইল। পরে ইহার যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহারা একাধারে বিস্মিত ও হতোদ্যম হইয়া পড়িল। আবু সুফিয়ান দেখিল মদীনার রাষ্ট্র মক্কাবাসীদের সিরিয়ার বাণিজ্যের পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া

দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থা বেশীদিন চলিলে তাহাদের অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্যয় ঘনাইয়া আসিবে। তাই মক্কাবাসীদের প্রতিশোধ স্পৃহা জিয়াইয়া রাখিবার জন্য সে সকল সম্ভাব্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিল। সে প্রস্তাব করিল যে, বদরের যুদ্ধের পূর্বে যে বাণিজ্য কাফেলা নিরাপদে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ মুনাফা যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য ব্যয় করিতে হইবে। সে নিজে প্রতিজ্ঞা করিল যে, যতক্ষণ মুহম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিতে না পারিবে, ততক্ষণ সে তৈল-প্রসাধনী ও স্ত্রীলোক স্পর্শ করিবে না। কা'ব-উল-আশরাফ নামক কবি তাহার কবিতায় যুদ্ধে নিহত মক্কাবাসীদের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া মক্কাবাসীদের প্রতিহিংসা জাগাইয়া রাখিল। বদরের যুদ্ধের দশ সপ্তাহ পরে আবু সুফিয়ান তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে দুই শত লোক সহ মদীনা আক্রমণ করিল। ইহুদী নাজির গোত্রের একজন লোক আবু সুফিয়ানকে আশ্রয় ও সাহায্য দান করিল। আবু সুফিয়ান দুইটি ঘর পুড়াইয়া ও কয়েকটি শস্যক্ষেত্র নষ্ট করিয়া মক্কায় ফিরিয়া আসিল। পথিমধ্যে সে বোঝা হালকা করিবার জন্য কিছু বার্লি ফেলিয়া গিয়াছিল। তাই এই যুদ্ধকে 'বার্লির যুদ্ধ' বলা হয়।

উহুদের যুদ্ধ (২৩শে মার্চ ৬২৫ খ্রী:)

অবশেষে মদীনা আক্রমণের জন্য একটি বিরাট বাহিনী গঠন করা হইল। ৬২৫ খ্রীস্টাব্দের ১১ই মার্চ মক্কাবাসীরা ৩০০০ সৈন্যের সুসজ্জিত বাহিনী সহ মদীনার দিকে যাত্রা করিল। তাহাদের সঙ্গে ৭০০ বর্ম, ৩০০০ উট ও ২০০ অশ্ব ছিল। এই বিশাল বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিল আবু সুফিয়ান। ২১শে মার্চ তাহারা মদীনায় পৌঁছিল এবং উহুদ পর্বতের নিকটে তাঁবু গাঁড়িল। তাহারা তাহাদের পশু চরাইয়া মদীনা-বাসীদের শস্যক্ষেত্র নষ্ট করিল। হজরত মুহম্মদ (দঃ) একটি পরামর্শ সভা ডাকিলেন। হজরত ও অন্যান্য প্রবীন লোকেরা মদীনায় থাকিয়া শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করার পক্ষপাতী ছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইবন উবাই নামক মদীনার নেতাও এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু যুবসম্প্রদায় শহর হইতে বাহির হইয়া শত্রুদের মুকাবিলা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিল। হজরত পরিশেষে শেষোক্ত মতের পক্ষে রায় দিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইবন উবাই কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর দলবল সহ হজরতের পক্ষ ত্যাগ করিয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিল। হজরত উহুদের পাদদেশে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। মুসলিম বাহিনীর বাম পার্শ্ব আবদুল্লাহ্ ইবন জুবাইরের

নেতৃত্বে পঞ্চাশজন তীরন্দাজ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। হজরতের পক্ষে সর্বমোট ৭০০ জন লোক যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। হজরত শুভ্র পোশাক পরিহিত ৫০ জন তীরন্দাজকে নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড় করাইয়া নিম্নলিখিত উপদেশ দিলেন, "শত্রুর অশ্বারোহীকে তীর নিক্ষেপ করিয়া দূরে রাখিবে এবং যুদ্ধ আমাদের অনুকূলে বা প্রতিকূলে হউক, কোন অবস্থাতেই তোমরা শত্রু সৈন্যকে পশ্চাদ্দিক হইতে আসিতে দিও না। তোমরা যথাস্থানে অবস্থান করিবে যেন তোমাদের দিক হইতে শত্রু আমাদের নাগাল না পায়।"

তেইশে মার্চ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মদীনাবাসীদের প্রচণ্ড আক্রমণে মক্কাবাসীরা পশ্চাদপসরণ করিল। পরাজয় সুনিশ্চিত ভাবিয়া মুসলমানগণ বেসামাল হইয়া পড়িল। এমন কি তীরন্দাজদের অনেকে গনীমতের আশায় স্থান ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ইত্যবসরে মক্কাবাসীরা খালিদ ইবন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুসলমানদিগকে পার্শ্ব ও পশ্চাদ্দিক হইতে প্রচণ্ড আক্রমণ করিল। তখন মুসলমানদের মধ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। গুজব রটিয়া গেল যে, হজরতের মৃত্যু হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি আহত হইলেন এবং তাঁহার একটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। মুসলমানদের একটি দল মূল বাহিনী হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। হজরত বাকী লোকদিগকে উহুদের পাদদেশে একত্রিত করিয়া তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিলেন। মক্কাবাসীরা অবশেষে সৈন্যবাহিনী উঠাইয়া প্রস্থান করিল। এই যুদ্ধে হজরত হাম্জা সহ অনেক (৬৫ জন) মুসলিম বীর পুরুষ শাহাদত বরণ করেন। আর কুরাইশদের বাইশজন লোক নিহত হয়।

উহুদের যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য একাধারে এক চরম পরীক্ষা ও বিষম বিপর্যয়। কিন্তু হজরতের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও সমর কুশলতার গুণে তিনি শীঘ্রই মুসলমানদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও মনোবল ফিরাইয়া আনিলেন। অন্যপক্ষে মুসলমানদের এত ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও উহুদের যুদ্ধকে মক্কাবাসীদের নিরঙ্কুশ বিজয় বলা যায় না। মদীনার মুসলমান সম্প্রদায়কে নির্মূল করিবার জন্য তাহারা যে স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহা বিন্দুমাত্রও সফল হইল না। তাহাদের ক্ষয়ক্ষতিও কম হয় নাই। এইজন্য তাহাদের মনোবল নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং মদীনা শহর আক্রমণ না করিয়াই তাহারা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিল।

বদরের যুদ্ধের পর বনু কাইনুকা নামক ইহুদী গোত্রের সহিত মুসলমানদের বিবাদ ঘটে। কয়েকজন ইহুদী বাজারে একজন মুসলমান মহিলাকে অপমান করে। ইহাতে উত্তেজিত হইয়া একজন মুসলমান একজন ইহুদীকে হত্যা করে। ইহুদীরাও প্রতিশোধ হিসাবে উক্ত মুসলমানকে হত্যা করে। এই কারণে ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে ইহুদীরা পরাজিত হয় এবং হজরত তাহাদিগকে মদীনা হইতে নির্বাসিত করেন। উহুদের যুদ্ধের কয়েক মাস পর ইহুদীদের বনু নাজির গোত্রের সহিতও মুসলমানদের যুদ্ধ বাধে। তাহারা হজরতকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র ফাঁদিতেছিল। ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি বনু নাজিরকে শান্তিপূর্ণভাবে দশদিনের মধ্যে মদীনা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহার কথা অমান্য করিয়া মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। যুদ্ধে তাহাদের পরাজয় হইল এবং তাহাদিগকে খাইবারে নির্বাসিত করা হইল।

ইহুদীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

খন্দকের যুদ্ধ বা পরিখার যুদ্ধ মদীনার মুসলিম রাষ্ট্র ধ্বংসের জন্য মক্কাবাসীদের চরম প্রচেষ্টার ফল। তাহারা সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া বহু গোত্রের সমন্বয়ে এক বিরাট দল গঠন করিল। খাইবারে নির্বাসিত বানু নাজির গোত্রের ইহুদীরাও এই দল গঠনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিল। তাহারা বনু গাতফানকে এই মর্মে প্ররোচিত করিল যে, যদি বনুগাতফান মক্কাবাসীদের সঙ্গে মদীনা আক্রমণে যোগ দেয়, তাহা হইলে খাইবারের খর্জুর ফসলের অর্ধেক তাহাদিগকে দেওয়া হইবে। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে গঠিত মক্কাবাসীদের সম্মিলিত বাহিনীতে মোট ১০,০০০ সৈন্য সংগৃহীত হইল। বনু গাতফান ছাড়া সুলাইম, আসাদ ও অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র ও জনবল সহ কুরাইশদের সঙ্গে যোগদান করিল। কুরাইশ ও গাতফান উভয় সম্প্রদায়ের ৩০০ করিয়া অশ্ব ছিল। এই বিরাট বাহিনীর মুকাবিলা করার জন্য হজরত মুহম্মদ (দঃ) ৩০০০ লোক সংগ্রহ করিলেন। বস্তুতঃ বনু কুরাইজার ইহুদীগণ ও মুনাফিকগণ ব্যতীত মদীনার প্রায় সকল মুসলমানই এই যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন।

খন্দকের যুদ্ধ মার্চ ৬২৭ খ্রীঃ

মক্কাবাসীদের যুদ্ধযাত্রার সংবাদ পাইয়াই হজরত বিশেষ সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। অশ্বারোহীদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তিনি মদীনার উত্তর দিকে একটি পরিখা (খন্দক) খনন করার সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করিলেন। একজন পারসিক সাহাবী সালমান হজরতকে এই ব্যাপারে উপদেশ ও পরামর্শ দান করিয়াছিলেন। হজরত মুসলমানদের সাহায্যে ছয়দিন ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমের পর পরিখা খনন সমাপ্ত করিলেন। অতঃপর তিন সহস্র মুসলমানকে লইয়া তিনি সল পাহাড়ের পাদদেশে শিবির স্থাপন করিলেন। তাঁহাদের ও শত্রুবাহিনীর মধ্যে ছিল নব-নির্মিত পরিখা। স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদিগকে শহরের নিরাপদ স্থানে রাখিয়া দেওয়া হইল। মক্কাবাসীরা পরিখা অতিক্রম করার জন্য রাত্রে বহুবার চেষ্টা করিল কিন্তু মুসলমানদের বিরামহীন অতন্দ্র প্রহরার জন্য কৃতকার্য হইতে পারিল না। তাহারা বনু কুরইজার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া মুসলমান-দিগকে পশ্চাদ্দিক হইতে ব্যতিব্যস্ত রাখিবার প্রয়াস পাইল কিন্তু বনু কুরাইজা যুদ্ধের সময় সক্রিয় সহযোগিতা হইতে বিরত রহিল। পরিখার দিক হইতে যতবার মক্কাবাসীরা আক্রমণ চালাইল, ততবারই তাহারা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া গেল। একপক্ষকাল এইভাবে কাটাইয়া তাহারা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। কৃতকার্যতার আশু সম্ভাবনায় নিরাশ হইয়া ধীরে ধীরে বেদুঈন গোত্রসমূহ তাহাদের দল হইতে খসিয়া পড়িতে লাগিল। তদুপরি ঝড় ও শীতে কাবু হইয়া তাহারা ছাউনী উঠাইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিল। তাহাদের অশ্বারোহী বাহিনী পরিখায় বাধাপ্রাপ্ত হইয়া অকর্মণ্য হইয়া পড়িল। হজরতের অপূর্ব রণ-কুশলতা, সংবাদ আদান-প্রদানে তৎপরতা ও সর্বোপরি পরিখার বিশেষ সুবিধা মুসলমানদের যুদ্ধজয়ে সহায়তা করিয়া-ছিল। মুসলমানদের সংহতি, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও নবীর নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা তাহাদিগকে বিজয়ের পথে পরিচালিত করিয়াছিল; অন্যপক্ষে বিরাট মক্কাবাহিনীর বিভিন্ন দল উপদলের মধ্যে একতা ও সংহতির নিতান্ত অভাব ছিল।

খন্দকের যুদ্ধে পরাজয় মক্কাবাসীদের চরম পরাজয় সূচিত করে। হজরত মুহম্মদ (দঃ) ও তাঁহার অনুগামী মুসলমানদিগকে মদীনা হইতে উৎপাটিত করিয়া ইসলামের নাম ও নিশানা মুছিয়া ফেলিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া মক্কাবাসীরা বার বার অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। খন্দকের পরাজয়ের পর তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিল যে, মুহম্মদ (দঃ) ও তাঁহার সম্প্রদায় মদীনায় সসম্মানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। আরবের কোন শক্তিই আর তাঁহাদের মুকাবিলা করিতে পারিবে না। অন্যপক্ষে মক্কাবাসীদের সম্মান-প্রতিপত্তি, তাহাদের আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী চিরতরে খর্ব ও পর্যুদস্ত হইল। সিরিয়ার বাণিজ্য তাহাদের হাতছাড়া হইয়া গেল এবং তাহারা অর্থনৈতিক মন্দার শীকার হইয়া পড়িল।

কুরাইজার শাস্তি

মদীনা অবরোধের সময় বনু কুরাইজা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কাবাসীদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। হজরতের সহিত সন্ধির শর্ত অনুসারে তাহারা তাঁহাকে সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত ছিল। কিন্তু মক্কাবাসীদের আড়ম্বর ও বিস্তারিত যুদ্ধ-প্রস্তুতি দেখিয়া তাহারা ভাবিয়াছিল যে, যুদ্ধে মুহম্মদের (দঃ) ও তাঁহার অনুসারীদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সেজন্য তাহারা মক্কা-বাসীদের সহিত গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাদিগকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করিল। যুদ্ধের সময় অবশ্য তাহারা কুরাইশদিগকে সাহায্য দানে বিরত থাকে। এহেন শত্রুকে মদীনায় রাখা বিপজ্জনক ভাবিয়া খন্দকের যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই হজরত তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলেন। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাহাদের কি শাস্তি হওয়া উচিত, তাহা নির্ধারণ করার জন্য হজরত তাহাদেরই অনুরোধক্রমে তাহাদের বন্ধু ও মিত্র সম্প্রদায় বনু আওসের সা'দ ইবন মুয়াজকে বিচারক নিযুক্ত করিলেন। সা'দ রায় দিলেন যে, বনু কুরাইজার সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হউক এবং তাহাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদেরকে বন্দী করা হউক। এই দণ্ডাজ্ঞা প্রদানের ব্যাপারে সা'দ প্রাচীন গোত্রীয় আনুগত্যের উপর ইসলামের প্রতি আনুগত্যের প্রাধান্য দিয়াছিলেন। বনু কুরাইজার দণ্ডপ্রাপ্তির পর মদীনায় আরও কিছু সংখ্যক ইহুদী বসবাস করিতে থাকে। তাহারা মোটামুটি মদীনা রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকে।

ষষ্ঠ হিজরীতে হজরত মুহম্মদ (দঃ) উমরা (ছোট হজ) পালনের সিদ্ধান্ত করিয়া আনসার, মুহাজির ও অন্যান্য বেদুঈন আরব সমভিব্যাহারে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সর্বমোট ১৪০০ লোক তাহার সঙ্গে রওয়ানা হইল। হজরত ও তাহার সঙ্গীসাথীরা হাজীর পোষাক পরিয়া কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে লইয়া চলিলেন। হজরত তাঁহার শান্তিপূর্ণ মনোভাবের নিদর্শন স্বরূপ সঙ্গী সাথীগণকে যুদ্ধাস্ত্র পরিহার করিতে বলিলেন। তাহাদিগকে শুধু খাপে বদ্ধ তরবারি সঙ্গে লইতে অনুমতি দেওয়া হইল। বহুদিন হইল মুহাজিরগণ ঘরবাড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব ত্যাগ করিয়া মদীনায় প্রবাসী জীবন-যাপন করিয়া আসিতেছে। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য অনেকের মন আকুল হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে মক্কা ও কাবা ইসলাম ধর্মের প্রাণকেন্দ্র বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। আরবদের প্রাচীন ধর্মকেন্দ্র মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে।

হুদায়বিয়ার সন্ধি (৬২৮ খ্রীঃ)

হজ্ব ও উমরা ইসলাম ধর্মে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এইসব কারণে হজরত এক্ষণে উমরা পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। খন্দকের যুদ্ধের পর মক্কা-বাসীদের সহিত আর কোন যুদ্ধ বিগ্রহ হয় নাই। শান্তিপূর্ণভাবে শুধু একটি ধর্মীয় কর্তব্য পালনের মাধ্যমে হজরত ইহাও দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে, মক্কাবাসীদের প্রতি তাঁহার কোন শত্রুতামূলক মনোভাব নাই।

কিন্তু তথাপি মক্কাবাসীরা মুসলমানদের মনোভাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত বোধ করিতে পারিল না। হজরত তঁাহার দলবল সহ হুদায়বিয়া নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করিলেন। মক্কাবাসীরা মুসলমানদিগকে জানাইয়া দিল যে, কিছুতেই তাহাদিগকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। উভয় পক্ষে বহুবার সংবাদ আদান-প্রদান হইল কিন্তু মক্কাবাসীদের অনমনীয় মনোভাবের পরিবর্তন হইল না। একবার হজরত উসমানকে আবু-সুফিয়ান ও অন্যান্য কুরাইশ দলপতিদের নিকট পাঠান হইল। তাহারা উসমানকে আটক করিয়া রাখিল। গুজব রটিল যে, হজরত উসমানকে হত্যা করা হইয়াছে। ইহা শুনিয়া হজরত তাঁহার সঙ্গিগণকে প্রয়োজন হইলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলিলেন। মুসলমানগণ 'রিদওয়ানের চুক্তি' নামে একটি চুক্তিতে পরস্পর আবদ্ধ হইল। শীঘ্রই খবর পাওয়া গেল যে, হজরত উসমান নিরাপদে আছেন। কুরাইশগণ তখন সুহাইল ইবন আমর নামক এক ব্যক্তিকে হজরতের নিকট পাঠাইল। অনেক আলাপ আলোচনার পর নিম্নলিখিত শর্তে সন্ধি স্থাপিত হইল:

"হে আল্লাহ্, তোমার নামে, ইহা ঐ সন্ধি, যাহা মুহম্মদ ইবন আবদুল্লাহ সুহাইল ইবন আমরের সাথে সম্পাদন করিয়াছে। তাহারা দশ বৎসরের জন্য লোকজনের মধ্য হইতে যুদ্ধ-বিগ্রহ দূর করিতে অঙ্গীকৃত হইল। এই সময়ে লোকেরা নিরাপদে থাকিবে এবং কেহ কাহারও গায়ে হাত তুলিবে না। কুরাইশদের মধ্য হইতে কোন লোক তাহার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত মুহম্মদের (দঃ) নিকট চলিয়া আসিলে মুহম্মদ (দঃ) তাহাকে তাহাদের নিকট প্রত্যর্পণ করিবে। কিন্তু মুহম্মদের নিকট হইতে যদি কেহ কুরাইশ-দের নিকট চলিয়া যায়, তবে কুরাইশরা তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য থাকিবে না। আমাদের মধ্যে সকল শত্রুতা পরিহার করিতে হইবে এবং কোন আক্রমণ ও লুটপাট হইতে পারিবে না। যে কেহ মুহম্মদের সহিত কোন চুক্তি বা মৈত্রী স্থাপন করিতে চায়, সে তাহা করিতে পারে,

আর যে কেহ কুরাইশদের সহিত কোন চুক্তি বা মৈত্রী সম্পাদন করিতে চায়, সে তাহা করিতে পারে। তোমাকে এই বৎসর আমাদের মধ্য হইতে চলিয়া যাইতে হইবে এবং তুমি আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মক্কায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। আগামী বৎসর আমরা তোমার পথ ছাড়িয়া দিব এবং তুমি তোমার সঙ্গী সাথিগণকে লইয়া মক্কায় প্রবেশ করিয়া তিনদিন অবস্থান করিতে পারিবে। তোমরা একজন অশ্বারোহীর অস্ত্র ও কোষবদ্ধ তরবারি বহন করিতে পারিবে। ইহা ব্যতীত অন্যকিছু লইয়া তোমরা ইহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

হজরত আলী উপরোক্ত দলীলের লিখক ছিলেন। লিখা সমাপ্ত হওয়ার পর হজরত মুহম্মদ (দঃ) মুসলমান ও মক্কাবাসীদের প্রতিনিধিগণকে দলীলে সাক্ষ্য হিসাবে স্বাক্ষর করিতে আহ্বান করেন। তারপর হজরত কুরবানী করিলেন এবং মস্তক মুণ্ডন করিলেন। সাহাবীরাও তদ্রূপ করিলেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের জন্য এক বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। কুরআনে ইহাকে সুস্পষ্ট বিজয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে ইহার শর্তগুলি মুসলমানদের জন্য অসুবিধাজনক হইলেও, ইহাতে সর্বপ্রথম মক্কাবাসিগণ মদীনাবাসীদের সহিত সমতার ভিত্তিতে পরস্পরের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইল। দশ বৎসরের জন্য যুদ্ধ-বিরতি একদিকে যেমন হজরতের শান্তিকামী মনের পরিচয় দিল, অন্যদিকে তেমনি শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিভিন্ন আরব-গোত্রের মিত্রতা অর্জনে তাঁহাকে সাহায্য করিল। এই সময় হজরত ইসলাম প্রচারেরও যথেষ্ট সুযোগ লাভ করিলেন। বহু লোক ইসলামের শান্তির বাণী গ্রহণ করিল। ইসলামের দুই জন সুবিখ্যাত বীর-যোদ্ধা এই সময় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইঁহারা হইলেন খালিদ-ইবন-ওয়ালিদ ও আমর ইবনুল-আস। হুদায়বিয়া হইতে ফিরিয়া হজরত কয়েকজন দূতকে বিভিন্ন প্রতিবেশী রাজা-বাদশার নিকট ইসলামের শান্তির বাণী লইয়া প্রেরণ করেন। আরব দেশে হজরত বিভিন্ন আরব-গোত্রের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

হজ সমাধা না করিয়া ফিরিয়া যাওয়ায় কুরাইশের জিদ রক্ষা হইল, অন্যপক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে মদীনাবাসীদের মক্কায় হজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। শান্তি প্রতিষ্ঠার ফলে হজরতের ও মুসলমানদেরই লাভ হইল সর্বাপেক্ষা বেশী। কিন্তু মক্কাবাসীরাও লাভবান হইল সন্দেহ নাই কারণ তাহারা আবার সিরিয়ায় অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ পাইল। কুরাইশদের

মনস্তুষ্টির জন্যই হজরত তাহাদের পলাতক ব্যক্তিদের প্রত্যর্পণের শর্ত মানিয়া লইয়াছিলেন। অন্যপক্ষে তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, মুসলমানদের জন্য ইহাতে ক্ষতির বা আশঙ্কার কোন কারণই নাই। কারণ, হজরতের নিকট হইতে কোন লোক কুরাইশদের নিকট চলিয়া যাইবে না। হুদায়বিয়ার সন্ধির সকল শর্ত সামগ্রিকভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, হজরত মুসলমানদিগকে ভবিষ্যৎ বিজয়ের প্রস্তুতি হিসাবে অনেক অসুবিধাজনক শর্ত মানিয়া লইতে রাজী করাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ, মক্কাবাসীরা হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলেই হজরতের ও মুসলমানদের শান্তিকামী মনোভাবের সম্যক পরিচয় পাইয়া মনেপ্রাণে ইসলাম কবুল করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিল। কাজেই এই হুদায়বিয়ার সন্ধিই দুই বৎসর পরে মক্কা-বিজয়ের পথ—অন্যকথায় মক্কার আত্মসমর্পণের পথ সুপ্রশস্ত করে।

খাইবারের যুদ্ধ (মে-জুন ৬২৮)

বনু কুরাইজার দণ্ডাজ্ঞার পর মদীনার ইহুদীরা শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন করিতে থাকে। কিন্তু খাইবারের ইহুদীরা হজরতের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক আচরণ অব্যাহত রাখে। ইহাদের মধ্যে নির্বাসিত বনু নাজীরের ইহুদীরাই ছিল প্রধান। তাহারা পার্শ্ববর্তী আরব সম্প্রদায় সমূহকে টাকা পয়সা দিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিতে থাকে। হজরত মুহম্মদ(দঃ) তাহাদের এইসব কার্যকলাপের বিষয় জানিতে পারিয়া হুদায়বিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর খাইবার আক্রমণ করেন। খাইবারের ইহুদীরা মুসলমানদের সহিত প্রাণপণ যুদ্ধ করে। একে একে ইহুদীদের দুর্গগুলি মুসলমানদের দখলে আসে। খাইবারের ইহুদীরা বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন দুর্গে বাস করিত। তাহারা মুসলমানদের শক্তির যথার্থ অনুমান করিতে পারে নাই এবং সংঘবদ্ধভাবে মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে চেষ্টা করে নাই। অবরোধের পূর্বে তাহারা যথেষ্ট পানীয় জলের ব্যবস্থা করিয়া রাখে নাই। মুসলমানেরা যোদ্ধা হিসাবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয় এবং একে একে ইহুদী দুর্গগুলিকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করে। আত্মসমর্পণের পর ইহুদীদিগকে তাহাদের চাষের জমি ফিরাইয়া দেওয়া হইল। ইহুদীরা তাহাদের উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক মুসলমানগণকে দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইল। খাইবারের ইহুদীদের কথা শুনিয়া ফাদাকের ইহুদীরাও তাহাদের উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ হজরতকে দেওয়ার শর্তে তাঁহার সহিত শান্তি স্থাপন করিল। তখন হইতে ফাদাক হজরতের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিগণিত হয়। তায়মা নামক ইহুদী-

গোত্রকে হজরত জিয্য়া নামক কর দানের প্রতিশ্রুতিতে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করেন। ইহার বিনিময়ে ইহুদীদের ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়।

খাইবারের যুদ্ধের পর মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে যে সকল যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তন্মধ্যে মুতা অভিযান প্রধান। সিরিয়া-সীমান্তে অবস্থিত গাস্‌সানে হজরতের একজন শান্তিদূত নিহত হয়। হজরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহার পোষ্যপুত্র জায়দকে ৩০০০ সৈন্যসহ ইহার প্রতিশোধ লওয়ার জন্য গাস্‌সানে প্রেরণ করেন। মুতা নামক স্থানে একটি বাইজান্টাইন সৈন্যবাহিনীর সহিত মুসলমানদের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে সেনাপতি জায়দ ও অপর দুইজন প্রধান সেনাপতি নিহত হন। তারপর খালিদ-ইবন-ওয়ালিদ মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে নিরাপদে মদীনায় ফিরাইয়া আনেন।

মুতা অভিযান (সেপ্টেম্বর, ৬২৯)

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর বনু খুজা'আ হজরত মুহম্মদের (দঃ) সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হয়। অনুরূপ বনু বকর কুরাইশদের সহিত মিত্রতায় আবদ্ধ হইল। নওফল-ইবন-মু'আবিয়া নামক বনু বকরের এক দলপতি কুরাইশদের নিকট হইতে কিছু যুদ্ধাস্ত্র লাভ করে এবং রাত্রিতে অতর্কিতে খুজা'আ গোত্রকে আক্রমণ করে। রাত্রির অন্ধকারে কুরাইশগণ বনু বকরকে যুদ্ধে সাহায্যও করে। খুজা'আ গোত্রের নেতারা মদীনায় হজরতের নিকট বনু বকর ও তাহাদের মিত্র কুরাইশদের সম্বন্ধে অভিযোগ করে। কুরাইশগণ এই ঘটনার ফলে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত ভীত ও শঙ্কিত বোধ করিতে থাকে। তাহারা আবু সুফিয়ানকে হজরতের নিকট প্রেরণ করে। কুরাইশদের আগাগোড়া ব্যবহার হজরতের অজানা ছিল না, তাই তিনি এইবার আবু সুফিয়ানের সহিত কোন প্রকার আলাপ-আলোচনা করিতে অস্বীকার করেন।

মক্কা-বিজয় (জানুয়ারী ৬৩০)

৬৩০ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হজরত মুহম্মদ (দঃ) ১০,০০০ সঙ্গীসহ মদীনা হইতে মক্কায় রওয়ানা হইলেন। মক্কার অনতিদূরে তাঁহারা শিবির সংস্থাপিত করিলেন। সেখানে রাত্রিতে দশ সহস্র লোকের দশ সহস্র বাতি জ্বলিয়া উঠিল। এই সংবাদ পাইয়া মক্কাবাসীরা ভীত ও আতঙ্কিত হইয়া পড়িল। আবু সুফিয়ান বুঝিতে পারিল যে, মক্কাবাসীদের পক্ষে হজরত ও মুসলমানদের বিরোধিতা সম্পূর্ণ নিরর্থক। তাই সে মুসলমানদের শিবিরে আসিয়া হজরতের নিকট আত্মসমর্পণ করিল ও ইসলামধর্ম গ্রহণ করিল। হজরত

তাহার সম্মানার্থে মক্কাবাসীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করিয়া বলিলেন, "যে কেহ আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করিবে, সে নিরাপদ ; যে নিজেকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখে, সেও নিরাপদ এবং যে মসজিদে প্রবেশ করে, সেও নিরাপদ।" পরদিন হজরতের বাহিনী চারিভাগে বিভক্ত হইয়া চারদিক হইতে মক্কায় প্রবেশ করে। যে বাহিনী খালিদের অধীনে অগ্রসর হইতেছিল, কেবল তাহারাই সামান্য বাধাপ্রাপ্ত হয়। কুরাইশদের মাত্র চব্বিশজন লোক ও অন্য একগোত্রের চারিজন লোক নিহত হয়। এই যুদ্ধে পথ ভুলিয়া মাত্র দুইজন মুসলমান শত্রুহস্তে নিহত হয়। ৬৩০ খ্রীস্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী হজরত মক্কায় প্রবেশ করেন। এই ঘটনাকে 'ফাত্‌হ্-মক্কা' বা মক্কা-বিজয় নামে অভিহিত করা হয়। সাধারণ-ক্ষমা ঘোষণার ফলে প্রায় একরূপ বিনা রক্তপাতেই মুসলমানগণ মক্কায় প্রবেশ লাভ করে। মাত্র গুটিকতক লোককে বিশেষ বিশেষ অপরাধের জন্য সাধারণ ক্ষমার আওতা হইতে বাদ দেওয়া হয়। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ উহুদের যুদ্ধে নিহত মুসলিম বীর হামজার পেট চিরিয়া তাঁহার হৃৎপিণ্ড চর্বণ করিয়াছিল। সেও হজরতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিল।

হজরত মুহম্মদ (দঃ) পনর বিশদিন মক্কায় অবস্থান করিয়া কাবাগৃহ ও অন্যান্য স্থান হইতে প্রতিমা সমূহ বিদূরিত করিলেন। কাবাগৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি লাঠি হাতে কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াত উচ্চারণ করিলেন, "সত্য আসিয়াছে, এবং অসত্য চলিয়া গিয়াছে; অবশ্যই অসত্য চলিয়া যাইবেই।" তারপর তিনি একে একে মূর্তিগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। নাখলায় উজ্জার মূর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলার জন্য খালিদ-ইবন-ওয়ালিদকে পাঠান হইল। মক্কার আশে পাশে ইসলাম প্রচারের জন্য হজরত ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করিলেন।

মক্কা-বিজয় হজরত মুহম্মদের জীবনের চরম সাফল্য সূচিত করে। কুরাইশদের অত্যাচারে যাঁহাকে একদিন আত্মীয়-পরিজন ও ঘরবাড়ী ছাড়িয়া মদীনায় হিজরত করিতে হইয়াছিল, তিনিই আজ বিজয়ীর বেশে আবার নিজের জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। দীর্ঘ আট বছরের ব্যবধানে কিসে এই পরিবর্তন সম্ভব করিল? সেদিনের গৃহত্যাগী নবী আজ কি করিয়া জয়ের মুকুট মাথায় পরিয়া পুনরায় মক্কায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন? বস্তুতঃ দুইটি কারণে তাঁহার এত বড় বিজয় সম্ভব হইয়াছিল। প্রথমতঃ

ইসলামের শান্তির বাণী। আরবের তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের বাণী ও সমাজ-ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে আরবদের মধ্যে প্রসার লাভ করিতে থাকে। রক্ষণশীল ও স্বার্থান্ধ কুরাইশগণ যুগের এই দাবীকে কোনক্রমেই দাবাইয়া রাখিতে পারিল না। হুদায়বিয়ার সন্ধির পরই বহু লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে থাকে। কাজেই মক্কা-বিজয়ের পূর্বেই মক্কাবাসীরা হজরত ও মুসলমানগণকে বাধাদান নিষ্প্রয়োজন মনে করিল। দ্বিতীয়তঃ হজরতের উজ্জ্বল-চরিত্র, দূরদর্শিতা, ও সহনশীলতা তাঁহার এই বিজয়ের পথ সুপ্রশস্ত করে। তিনি সময় বুঝিয়া কাজ করিতেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মুসলমানদের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও তিনি কুরাইশ-দের সহিত অনেক অসুবিধাজনক শর্তে শান্তি স্থাপনে প্রয়াসী হন। ইহাতে সংশ্লিষ্ট সকলে তাহার আন্তরিকতা ও শান্তিকামী মনোভাবের পরিচয় পাইয়া সন্তুষ্ট হয়। তিনি নিজের চরিত্র ও ব্যবহার গুণে এমন অবস্থার সৃষ্টি করিলেন, যাহার ফলে একরূপ বিনা যুদ্ধেই মক্কা-বিজয় সম্ভব হইয়াছিল।

হুনায়নের যুদ্ধ

মক্কা-বিজয়ের বৎসরই হুনায়নের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হজরত মুহম্মদ (দঃ) যখন মক্কার ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন হাওয়াজিন ও সাকিফ গোত্রের লোকেরা যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করে। হজরত লোক পাঠাইয়া গোপনে তাহাদের সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিলেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। সাফওয়ান-ইবন-উমাইয়া নামক কুরাইশ সর্দার, যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই, হজরতকে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও যানবাহন দিয়া সাহায্য করিলেন। হজরতের মক্কা অভিযানে নিযুক্ত ১০,০০০ সৈন্যের সহিত ২০০০ মক্কাবাসী যুক্ত হইল। ইহারা সকলে হুনায়ন অভিমুখে যাত্রা করিল। ৬৩০ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী হজরত হুনায়নের নিকট পৌঁছিলেন। শত্রু সৈন্যের সংখ্যা ছিল ২০,০০০। মুসলমানগণ শত্রু সৈন্যের এত বড় সমাবেশ দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত হইল। বনু হাওয়াজিন তাহাদের যাবতীয় গবাদি-পশু, স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়ে-দিগকে লইয়াই যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। তাহাদের নেতা মালিক মনে করিয়াছিল যে, এইগুলির রক্ষার্থে হাওয়াজিনের পুরুষ যোদ্ধারা প্রাণপণ যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে। শত্রুদের প্রচণ্ড আক্রমণে প্রথমে মুসলমানরা

পলায়নপর হইল। কিন্তু হজরত মুহম্মদ ও বিশিষ্ট আনসার ও মুহাজির নেতৃবৃন্দ অবিচলভাবে রণাঙ্গণে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁহারা সৈন্যবাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিলেন এবং শত্রুরা পশ্চাদপসরণ করিল। শত্রুদের অনেকে নিহত ও বন্দী হইল। হুনায়নের যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের সহিত বেদুঈন-আরবদের এক সরাসরি শক্তি পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় মুসলমানগণই অবশেষে জয়ী হইল। ইহার পর বেদুঈন আরবগণ হজরতের সহিত আর কখনও অস্ত্র ধারণ করে নাই। পক্ষান্তরে নবম হিজরীতে (৬৩০—৩১ খ্রীঃ) আরবের বিভিন্ন স্থান হইতে বেদুঈন গোত্রের দূতসমূহ হজরতের নিকট মদীনায় আগমন করিয়া বিভিন্ন চুক্তি ও মৈত্রীতে আবদ্ধ হইতে থাকে।

তবুক অভিযান (৭৩০-৩১ খ্রীঃ)

নবম হিজরীতে হজরত বাইজান্টাইনদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বাইজান্টাইনদের সহিত মুতার যুদ্ধে জায়দ ও অপর দুইজন সেনাপতি নিহত হওয়ার পর সিরিয়ার দিক হইতে যে কোন মুহূর্তে বাইজান্টাইন আক্রমণের আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এই অভিযান মুসলমানদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষার সামিল ছিল। হুনায়নের যুদ্ধের পর অনেকেই শান্তি ও আরামের জীবন-যাপন করিতে চাহিয়াছিল। তাহারা একে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তদুপরি গরম অত্যধিক ছিল, বহুদিন ধরিয়া অনাবৃষ্টি চলিতেছিল। মুনাফিকগণ আবদুল্লাহ্ ইবন উবাইয়ের নেতৃত্বে মুসলমানদের পক্ষ ত্যাগ করিল। ইহাছাড়া কয়েকজন মুসলমানও গড়িমসি করিয়া এই যুদ্ধে যোগদান করে নাই। কিন্তু নানাবিধ কষ্ট ও অসুবিধা সত্ত্বেও সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এই যুদ্ধের আহ্বান অভূতপূর্ব সাড়া জাগাইয়াছিল। হজরত আবু বকর এতদুপলক্ষে তাহার যথাসর্বস্ব দান করেন। হজরত উসমানও প্রভূত অর্থ দান করেন। মহিলাগণ তাহাদের অলঙ্কার ও গহনাপত্র যুদ্ধের জন্য দান করিল। তারপর আলীকে মদীনায় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া হজরত যুদ্ধযাত্রা করিলেন এবং মদীনা ও দামিস্কের মধ্যবর্তী তবুক নামক স্থানে ছাউনী ফেলিলেন। তবুকে হজরত দশদিন অবস্থান করিলেন। সেখানে কোন বাইজান্টাইন সৈন্যবাহিনী না দেখিয়া মুসলমানরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল এবং মদীনায় ফিরিয়া আসিল। তবুকে অবস্থান কালে হজরত সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত অনেকগুলি ইহুদী ও খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। ইহাদের মধ্যে আকাবা উপসাগরের মুখে অবস্থিত খ্রীস্টধর্মাবলম্বী

আয়লা সম্প্রদায় প্রধান। আয়লার শাসনকর্তা য়ুহান্না-ইবন-রূবা স্বয়ং হজরতের নিকট আসিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। আয়লার বাৎসরিক জিয্য়া ৩০০ দীনার ধার্য হইল। য়ুহান্নাকে হজরত নিম্নলিখিত দলীল লিখিয়া দিয়াছিলেন:

"দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহ তাআলার নামে। ইহা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল মুহম্মদের (দঃ) তরফ হইতে য়ুহান্না-ইবন-রূবা ও আয়লার লোকদের নিকট স্থলপথে ও জলপথে তাহাদের বাণিজ্য কাফেলা ও জাহাজের জন্য একটি রক্ষা-কবচ। তাহারা সকলে এবং তাহাদের সঙ্গী সিরিয়া ও ইয়ামনের সকল লোক ও নাবিক আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল মুহম্মদের (দঃ) রক্ষণাধীন। তাহাদের মধ্যে কেহ যদি কোন নূতন কথা তুলিয়া সন্ধি-ভঙ্গ করে, তখন তাহার ধন-সম্পদ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। সেই অর্থ যে দখল করিয়া লইতে পারিবে, তাহা তাহার ন্যায্য পাওনা হইবে। তাহাদিগকে তাহাদের কূপে নামিতে কিংবা তাহাদের জলপথ বা স্থলপথ ব্যবহার করিতে বাধা দান নিষিদ্ধ করা হইল।"

আয়লার নিকট মাকনা নামক ইহুদী অধ্যুষিত একটি ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী শহর ছিল। তাহারা তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের এক চতুর্থাংশ করদান করার প্রতিশ্রুতিতে হজরতের সহিত সন্ধি স্থাপন করিল। আম্মানের নিকটবর্তী আজরু ও জারবা নামক ইহুদী অধ্যুষিত শহর দুইটিও জিয্য়া আদায়ের অঙ্গীকারে হজরতের সহিত সন্ধি স্থাপন করিল।

অপর একজন খ্রীস্টান নরপতি উকায়দিরের সহিত মুসলমানরা যুদ্ধ করিল। খালিদ-ইবন-ওয়ালিদ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দী করিলেন। পরিশেষে তিনিও জিযয়া আদায়ে সম্মত হইয়া সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হন।

এই প্রসঙ্গে প্রতিনিধি প্রেরণের বৎসর নাজরানের খ্রীস্টানদের সহিত হজরত যে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাজরানের খ্রীস্টানদের পক্ষ হইতে তিনজন নেতা হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ২০০০ জামা তাহাদের কর ধার্য হইল। যুদ্ধের সময় তাহারা মুসলমানদিগকে ৩০টি বর্ম, ৩০টি অশ্ব ও ৩০টি উট ধার দিবে। যুদ্ধের সময় ইহার মধ্য হইতে যাহা কিছু নষ্ট হইবে, তাহার মূল্য দেওয়া হইবে। ইহার বিনিময়ে নাজরানের খ্রীস্টান সম্প্রদায়, তাহাদের জমিজমা, অর্থ-সম্পদ, ও গীর্জা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল কর্তৃক রক্ষিত

হইবে। কোন পুরোহিত তাহার গীর্জা হইতেব হিস্কৃত হইবে না, কোন সন্ন্যাসীকে তাহার মঠ হইতে সরান হইবে না। জাহিলিয়া-যুগের কুসীদ-প্রথা ও রক্তের প্রতিশোধ রহিত করা হইল। এই চুক্তির পর যদি কেহ সুদ গ্রহণ করে, তবে তাহার জন্য আমার রক্ষা প্রযোজ্য হইবে না। যদি কোন খ্রীস্টান মহিলা কোন মুসলমানকে বিবাহ করে, তবে তাহার স্বামী তাহাকে তাহার ধর্মকর্মে বাধা প্রদান করিবে না।

নবম হিজরীকে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ প্রতিনিধি প্রেরণের বৎসর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ঐ বৎসর আরবের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ মদীনায় আসিয়া হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করে এবং মদীনা রাষ্ট্রের অধীনতা স্বীকার করিয়া লয়। এতদুপলক্ষে বহু গোত্রের লোক ইসলাম ধর্ম কবুল করে। হজরত মুহম্মদ (দঃ) ইসলাম ধর্মের মূলনীতিগুলি শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতিনিধিদলের সহিত ধর্মোপদেষ্টা প্রেরণ করেন। কোন কোন গোত্রের প্রতিনিধিরা নিজেরাই শুধু মুসলমান হইলেন—আবার কেহ কেহ তাহাদের গোত্রের পক্ষ হইতে শুধু রাজনৈতিক আনুগত্য প্রকাশ করিতে আসিয়াছিলেন। সুদূর উমান, হাজরা-মাউত ও ইয়ামন হইতেও প্রতিনিধি দল মদীনায় আগমন করিয়াছিল। বস্তুতঃ নবম ও দশম হিজরীতে হজরত কৃতকার্যতার সর্বোচ্চ সোপানে উন্নীত হইয়াছিলেন। মক্কা-বিজয় ও হুনায়নের যুদ্ধের পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য লোকদের মধ্যে হিড়িক পড়িয়া যায়। মদীনার চারিপার্শ্ব হইতে বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা মদীনার রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আস্থাশীল হইয়া দলে দলে হজরতকে তাহাদের সর্বোচ্চ অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করিতে আগাইয়া আসিল। সত্য ও বিশ্বাসের প্রদীপ্ত শিখায় অসত্য ও অধর্মের অন্ধকার দূরীভূত হইল এবং সমগ্র আরব ভূমি ইসলামের নবারুন স্পর্শে এক নূতন উষায় জাগিয়া উঠিল।

সানাতুল উফুদ (৬৩০-৩১ খ্রীঃ)

দশম হিজরীর জিলকাদ মাসে হজরত মক্কায় হজ করিতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং লোকজনকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। এই হজ তাঁহার জীবনের শেষ হজ ছিল বলিয়া ইহাকে বিদায়-হজ বলা হয়। অগণিত মুসলমানদের এক বিরাট যাত্রীদল সহ হজরত মক্কায় আসিয়া পৌঁছিলেন। হজরত হজের বিভিন্ন রীতি-নিয়ম লোকজনকে বুঝাইয়া দিলেন। আরাফাতের ময়দানে তিনি সমবেত

বিদায় হজ (২২ ফেব্রুয়ারী ৬৩২)

জনতাকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করেন। তিনি কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়া বক্তৃতা করেন এবং আল্লাহকে সাক্ষী করিয়া তাঁহার নবুয়তের দায়িত্বের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন। তিনি বলেন:

"হে মানুষ সকল, আমার কথা অবধান কর। আমি জানিনা, এই বছরের পর তোমাদের সঙ্গে আমার আর দেখা হইবে কিনা, আজিকার এই দিন এই মাস যেমন পবিত্র,—তোমাদের রক্ত ও তোমাদের সম্পত্তি তোমাদের প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় পর্যন্ত পরস্পরের জন্য তেমন পবিত্র। তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে এবং তিনি তোমাদিগকে তোমাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন। আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি। কাহারও কাছে যদি কোন আমানত থাকে, তবে সে যেন তাহা আমানতদাতাকে ফিরাইয়া দেয়। সকল কুসীদ রহিত হইল কিন্তু তোমরা তোমাদের মূলধন পাইবে। কাহারও প্রতি অন্যায় করিও না এবং কেহ তোমাদের প্রতি অন্যায় করিবে না। আল্লাহ্ এইরূপ বিধান করিয়াছেন যে, সুদপ্রথা থাকিবে না। আব্বাস-ইবন-আবদুল মুত্তালিবের সুদ সমস্তই রদ করা হইল। জাহিলিয়া-যুগের সকল রক্তপাত অপরিশোধ্য থাকিবে। আমি প্রথম যে রক্তমূল্য রহিত বলিয়া ঘোষণা করিতেছি, তাহা হইল রবীয়া ইবন হারিসের রক্তমূল্য।...."

"তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের হক আছে এবং তোমাদের উপরও তাহাদের হক আছে।....আমি তোমাদের নিকট যাহা রাখিয়া গেলাম, যদি তোমরা তাহা মজবুত করিয়া ধর, তবে তোমরা কখনও বিপথে চালিত হইবে না। তাহা হইল আল্লার কিতাব ও রসুলের সুন্নত। সুতরাং আমি যাহা বলি, তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।"

"জানিয়া রাখ যে, প্রতি মুসলমান প্রতি মুসলমানের ভাই এবং মুসলমানেরা পরস্পর ভাই ভাই। ভাই স্বেচ্ছায় তোমাকে যাহা দেয় শুধু তাহা গ্রহণ করাই আইন-সম্মত। কাজেই তোমরা পরস্পরের উপর জুলুম করিও না। হে আল্লাহ্ আমি কি পৌঁছাই নাই?" লোকেরা বলিল, "হ্যাঁ, আল্লাহ্।" রসুল বলিলেন, "হে আল্লাহ্, তুমি সাক্ষী থাক।"

হজরত মুহম্মদ এতদুপলক্ষে ক্রীতদাস-দাসীদের সম্বন্ধেও মুসলমানগণকে উপদেশ দান করেন। তিনি বলেন, "তোমরা যাহা খাও, দাসদাসীদিগকে তাহাই খাইতে দিবে, তোমরা যাহা পর, তাহাদিগকে তাহাই পরিতে দিবে। যদি তাহারা এমন অপরাধ করে, যাহা তোমরা ক্ষমা করিতে

না পার, তবে তাহাদিগকে বর্জন কর। তাহারা আল্লার বান্দা এবং তাহাদের সহিত নিষ্ঠুর ব্যবহার করা সমীচীন নহে।

"তোমরা যাহারা উপস্থিত তাহারা অনুপস্থিত লোকদিগকে ইহা বলিবে। যাহারা ইহা শুনিল, হয়ত তাহাদের চেয়ে যাহাদিগকে ইহা বলা হইবে তাহারাই ইহা ভাল মনে রাখিবে।"

বিদায়-হজ হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর হজরত জায়দের পুত্র উসামার নেতৃত্বে সিরিয়ায় একটি অভিযান প্রেরণ করেন।

হজরত মুহম্মদ (দঃ) হুদায়বিয়ার সন্ধির পর হইতে তাঁহার ইনতিকালের সময় পর্যন্ত আরব ও অনারব রাজা-বাদশাহ্‌দের নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানাইয়া শান্তিদূত প্রেরণ করেন। আরব রাজা বাদশাহদের মধ্যে ইয়ামামা, বাহরাইন, উমান ও ইয়ামনের বাদশাহদের নাম উল্লেখযোগ্য।

দূত প্রেরণ

অনারব বাদশাহ্‌দের মধ্যে আবিসিনিয়ার নাজ্জাশী, রোমের হিরাক্লিয়াস ও পারস্য সম্রাট খুসরুর নাম ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে। একাদশ হিজরীর সফর মাসে হজরত পীড়িত হইয়া পড়েন। একদা মধ্যরাত্রিতে তিনি 'বাকি'উল গারকদ্দ' নামক কবরস্থানে গমন করেন এবং মৃত-আত্মার জন্য কান্নাকাটি ও প্রার্থনা করেন। অতঃপর তিনি তাঁহার পত্নী হজরত আয়িশার গৃহে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত করেন। সেখান হইতে তিনি মসজিদে নববীতে নামাজ পড়াইতে যাইতেন। মৃত্যুর তিনদিন পূর্ব পর্যন্ত তিনি নামাজ পড়াইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তারপর তাঁহার শরীর দুর্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। একাদশ হিজরীর ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার (মোতাবেক ৮ই জুন, ৬৩২ খ্রীঃ) তিনি মহিমান্বিত প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁহার মৃত্যু এত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ছিল যে, সাধারণ মুসলমানগণ ইহা বিশ্বাসই করিতে পারিল না। হজরত উমরও মনে করিলেন যে, ইহা একটি গুজব ব্যতীত আর কিছুই নহে। মুসলমানদের শত্রুরা তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এইরূপ গুজব ছড়াইয়াছে। হজরত আবু বকর নীরবে আয়িশার গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং হজরতের মুখমণ্ডল হইতে আবরণ উন্মোচন করিলেন। তারপর তিনি হজরতের মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া বাহিরে আসিলেন। তিনি লোকজনকে সম্বোধন করিয়া কুরআনের এই আয়াত আবৃত্তি করিলেন: মুহম্মদ রসুল বইত নন, তাঁহার পূর্বে রসুলগণ গত হইয়াছেন। তিনি যদি মৃত্যুমুখে পতিত হন বা নিহত হন তবে

কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে? যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে সে আল্লার কোন ক্ষতি করিতে পারে না। আল্লাহ্ কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করিবেন।" ততক্ষণে হজরত উমরের ও অন্যান্য সকলের প্রতীতি জন্মিল যে হজরত মুহম্মদের মৃত্যু হইয়াছে।

চরিত্র ও কৃতিত্ব: মুসলমানদের নিকট হজরত মুহম্মদ আখিরী বা শেষ নবী। তাহাদের মতে তিনি আদর্শ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হিসাবে সকল অনুকরণীয় মানবীয় গুণের অধিকারী। ঐতিহাসিকদের নিকট তিনি একজন বিখ্যাত ধর্মপ্রবর্তক সমাজ-সংস্কারক সার্থক-শাসক ও রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে পৃথিবীর ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল আসনে সমাসীন থাকিবেন। তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র মাধুর্য দ্বারা তাঁহার সমসাময়িকদের হৃদয় জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বেই সততা ও বিশ্বস্ততার জন্য তাঁহার দেশবাসিগণ তাঁহাকে আল্-আমীন (বিশ্বাসী) আখ্যায় অখ্যায়িত করিয়াছিল। ঘটনাবহুল জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা একদিকে যেমন তাঁহার মনোবলকে সুদৃঢ় করিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি দুঃস্থ মানবতার জন্য তাঁহার মমত্ববোধকে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। বদান্যতা ও ক্ষমাশীলতা তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি ইয়াতিম ছিলেন বলিয়া ইয়াতিম, দীন-দুঃখী ও দরিদ্রের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি উদার ও দয়াবান ছিলেন। আনাস ইবন মালিক দশ বৎসর যাবৎ হজরতের খিদমত করিয়াছিলেন কিন্তু কখনও হজরতের মুখ হইতে কোন কঠোর বাক্য শুনেন নাই। মক্কা-বিজয়ের পর মক্কাবাসীদের প্রতি তাঁহার উদার ও ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার তাঁহার মহানুভবত্বের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। যাহারা তাঁহাকে মাতৃভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল এবং নানা অত্যাচার ও নির্যাতনে অতীষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাদিগকে নিজের হাতের মুঠার মধ্যে পাইয়াও তিনি ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলেন। বিপদাপদে স্থিরচিত্ততা, ধর্মে ও কর্মে অবিচল নিষ্ঠা এবং মানবকল্যাণে অকপট আন্তরিকতা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সহায়তা করিয়াছিল। পশুপক্ষীর প্রতি তাঁহার দয়া তাহার মহানুভব চরিত্রের আর একটি দিক সূচিত করে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল। তাহাদের মনস্তুষ্টি বিধানের জন্য তিনি তাহাদের সঙ্গে মনোজ্ঞ ক্রীড়া কৌতুকে লিপ্ত হইতেন। তাঁহার গায়ের রং সুন্দর ও দেহ-সৌষ্ঠব সুঠাম ছিল। পায়ে হাটিবার সময় তিনি এত দ্রুত চলিতেন যে, কম

লোকই তাহার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারিত। তিনি স্বল্পভাষী কিন্তু সদালাপী ছিলেন। তিনি উচ্চহাস্য করিতেন না কিন্তু তাহার মৃদু হাসিতে অন্তরের পবিত্রতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। সমগ্র আরব দেশের মুকুট-বিহীন সম্রাটের উচ্চ আসনে সমাসীন হইয়াও তিনি সাদাসিদা জীবন যাপন করিতেন। নিজের জুতা, কাপড় মেরামত করিয়া, মেষাদি দোহন করিয়া ও সাধারণ গৃহস্থালীর কাজকর্ম করিয়া তিনি অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার এক অত্যুজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

হজরতের প্রচারিত ধর্ম : হজরত মুহম্মদ মূলতঃ ও প্রধানতঃ একজন নবী বা ধর্মপ্রবর্তক ছিলেন। তাহার প্রচারিত ধর্মের নাম ইসলাম। ইহার আক্ষরিক অর্থ আত্মসমর্পণ। আল্লার ইচ্ছায় আত্মসমর্পণের নাম ইসলাম। আরবের তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সমস্যাদির সুষ্ঠু সমাধান এই নবধর্মে নিহিত ছিল এবং সেই জন্যই আরববাসিগণ ক্রমে ক্রমে যাবতীয় সংস্কার ত্যাগ করিয়া এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। অন্যপক্ষে নূতন ধর্ম অবলম্বনের ফলে তাহাদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিল। তাহারা নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত ও নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইল এবং সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে এক নূতন আলোড়নের সৃষ্টি করিল। হজরতের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে ইসলাম ধর্মের কয়েকটি অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমরা আলোচনা করিয়াছি। নিম্নে ইসলামের প্রধান অনুষ্ঠানাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের মধ্যে শাহাদত বা আল্লার একত্বের স্বীকারোক্তি প্রথম। "আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, মুহম্মদ তাহার রসুল" এই স্বীকারোক্তি ইসলামের জন্য মৌলিক। এই স্বীকারোক্তি অনুসারে এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস ও হজরত মুহম্মদের নবুয়তে বিশ্বাস মুসলিম ঈমানের অঙ্গ। বিচারের দিনে বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের আর একটি প্রধান অঙ্গ। স্রষ্টার একত্বে বিশ্বাস আরবে প্রচলিত বহু দেবদেবীর উপাসনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সূচক। এইজন্য ইসলামে শিরক বা আল্লার সহিত দেবতা উপদেবতার অংশীদার কল্পনা নাস্তিকতার শামিল।

শাহাদৎ

শাহাদত বা ঈমানের স্বীকারোক্তির পর অপর চারিটি স্তম্ভ কর্মের পর্যায়ে পড়ে। ইহাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধানটির নাম সালাত বা নামাজ।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও তাহার গুণকীর্তন ইহার উদ্দেশ্য। দৈনিক পাঁচবার কাবামুখী হইয়া ইমামের (নেতার) পিছনে দলবদ্ধ অবস্থায় অথবা একাকী নামাজ পড়িতে হয়। দৈনিক নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন নহে। সময় ও নিয়ম মত ইহা যেখানে সেখানে পড়িতে পারা যায়। শুক্রবারে জুমার নামাজের জন্য মসজিদে যাইতে হয়। নামাজের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক। ইহা অন্যভাবেও মুসলমানদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জমা'আতে (দলবদ্ধ) নামাজ পড়িবার সময় ধনী, দরিদ্র, মনিব-ভৃত্য, রাজা প্রজা নির্বিশেষে সকলে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া নামাজ আদায় করে। ভ্রাতৃত্বের আদর্শ রূপায়ন, নেতার প্রতি আনুগত্য, একতা, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা প্রভৃতি নামাজের আনুসঙ্গিক ফল বলিয়া ধরা যাইতে পারে।[১]

জাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। ইহার গুরুত্ব ও তাৎপর্য পূর্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।[২] জাকাত একই সঙ্গে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তব্য। শুধু বদান্যতা বলিলে ইহার তাৎপর্য পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে মক্কায় নূতন বণিক-শ্রেণীর মধ্যে যে বস্তুতান্ত্রিকতা ও অর্থগৃধ্নুতা দেখা দিয়াছিল, জাকাত একাধারে ইহার প্রতিবাদ ও সমাধান স্বরূপ। মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষায় নামাজ শারীরিক ইবাদত (উপাসনা) আর জাকাত আর্থিক ইবাদত।

জাকাত

ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ রোজা (সওম)। নামাজ ও জাকাতের প্রত্যাদেশ মক্কাতেই কার্যকরী হয়। রোজা ও হজ প্রাথমিক মদীনা যুগে বিধিবদ্ধ করা হয়। হজরত মুহম্মদ যখন মদীনায় আসেন, তখন তিনি ইহুদীদিগকে আশুরার (দশম মুহররমের) রোজা পালন করিতে দেখেন। তিনিও ঐ দিনে রোজা রাখিতেন। পরে রমজান মাসের রোজা মুসলমানদের জন্য ফরজ বলিয়া নির্ধারিত হয়।

রোজা

হজ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। কাবায় হজ করা এক অতি প্রাচীন আরবীয় প্রথা। প্রাথমিক মদীনা-যুগে হজের বিধান করা হয়। মদীনার মুসলমানদের জন্য মক্কায় হজ পালন তাহাদের দীর্ঘ প্রবাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। আরবের প্রাচীন ধর্মকেন্দ্র কাবা ও হজরতের জন্মভূমি মক্কা এই হজের মাধ্যমে ইসলামের প্রাণকেন্দ্রে

হজ্জ

১. পূর্বে দ্রষ্টব্য পৃঃ ৫৭
২. ,, পৃঃ ৫৮

পরিণত হইল। হজের সাহায্যে পৃথিবীর সকল দেশ হইতে সকল জাতি ও বর্ণের মুসলমানগণ বৎসরে একবার পরস্পর সাক্ষাতের সুযোগ পায়। শুধুমাত্র সম্পন্ন মুসলমানদের জন্য জীবনে অন্ততঃ একবার হজ পালন করা অবশ্য কর্তব্য। ইসলামের ঐক্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাস্তব রূপায়নে হজের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই উপলক্ষে হাজীগণ আল্লার নামে যে গবাদি পশু উৎসর্গ করিয়া থাকে, বিশ্বের যাবতীয় মুসলমান ঈদুল-আজহা উপলক্ষে তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বিশ্বস্রষ্টার উদ্দেশ্যে প্রতীক উৎসর্গে যোগদান করিয়া তাহাদের যাবতীয় উপাসনা, ধর্মকর্ম ও 'জীবন মরণ' বিশ্বস্রষ্টার হাতে সঁপিয়া দেয়।

হজরতের সমাজ সংস্কার: পূর্বেই বলা হইয়াছে যে. হজরত মুহম্মদ ছিলেন মূলতঃ ও প্রধানতঃ একজন নবী ও ধর্ম-প্রচারক। কিন্তু তিনি যে ধর্মপ্রচার করিলেন, তাহার বিধি-নিয়ম আরবের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদের সামগ্রিক জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধন করে। বস্তুতঃ তাঁহার ধর্মে তৎকালীন আরবদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের যাবতীয় অনাচার ও ব্যাধির সুষ্ঠু সমাধান নিহিত ছিল। তাই আমরা তাঁহাকে সমাজ-সংস্কারক ও রাজনীতিকের ভূমিকায়ও দেখিতে পাই। তাঁহার এই বিভিন্ন ভূমিকা এক ও অভিন্ন। ইহাদিগকে আলাদা করিয়া দেখা যায় না। কারণ ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি তাঁহার একক ভূমিকারই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। এইখানেই অন্যান্য ধর্মপ্রচারকদের সহিত তাঁহার পার্থক্য।

তাঁহার প্রচারের ফলে আরবদের সমাজ-জীবনে যে সকল অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, আমরা সে বিষয় কিছু আলোচনা করিব। রক্ত-সম্পর্ক ভিত্তিক আরব-সমাজে ধনী-নির্ধন, আশরাফ-আতরাফ, মনীব-গোলাম ও অভিজাত-অনভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান ছিল দূরতিক্রমনীয়। হজরত মুহম্মদ মুসলমানদের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিলেন। শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি ছিল তাকওয়া বা আল্লার ভয়। বংশ-মর্যাদা বা অর্থের প্রাচুর্য শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে অগৌণ প্রতিপন্ন হইল। প্রত্যেক ধর্মই মোটামুটি সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই ব্যাপারে ইসলাম ধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যাহারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইল, তাহারা যে গোত্র বা সম্প্রদায়েরই হউক না কেন আল্লার চোখে তাহারা সকলেই সমান। প্রথম হইতেই এই সাম্য আরব ছাড়া অনারব লোকদের

প্রতিও সমানভাবে প্রযোজ্য হইয়াছিল। হাবশী ক্রীতদাস বিলাল ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া হজরতের মসজিদের মুয়াজ্জিনের মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। সালমান ফারসী হজরতের একজন সম্মানী ও নেতৃস্থানীয় সাহাবী ছিলেন। ধর্মীয় সাম্য সমাজের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য ছিল। আইনের চোখে সাধারণ লোক ও রাজা-বাদশার মধ্যে কোন তারতম্য ছিল না। হজরত উমরের খিলাফত সময়ে সংঘটিত একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। জাবালা নামক একজন গাস্সান যুবরাজ মুসলমান হইয়া হজ করিতে মক্কায় আসিয়াছিল। একজন সাধারণ মুসলমান জাবালার কাপড় মাড়াইয়া দেওয়ায়, সে তাহাকে চপেটাঘাত করিয়াছিল। হজরত উমরের নিকট ইহার অভিযোগ পোঁছিলে জাবালা মনে করিয়াছিল যে, সে রাজ-রাজড়া লোক কাজেই যে লোকটি তাহার কাপড় মাড়াইয়া দিয়াছিল, তাহারই শাস্তি হইবে। কিন্তু হজরত উমর চপেটাঘাত প্রাপ্ত লোকটিকে জাবালার গালে অনুরূপ চড় মারিবার অনুমতি দেওয়ায় জাবালা এমন কঠোর সাম্যবাদী ধর্মের অনুশাসন এড়াইবার জন্য নিজের দেশে পালাইয়া ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিল। বস্তুতঃ যাহারা ইসলামের সাম্যনীতি মানিয়া নিতে পারিত না—ইসলাম ধর্মে তাঁহাদের স্থান ছিল না। আনসার ও মুহাজিরগণ পরস্পরকে এমনভাবে বিপদাপদে সাহায্য সহায়তা করিত, যে তাহারা যেন একে অপরের মাতৃগর্ভজাত ভাই। এই ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করিবার জন্য হজরত ধনী ও সম্পন্ন মুসলমানদের জন্য জাকাত বাধ্যতামূলক করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার ফলে মুসলমানদের মধ্যে কেহ অযথা অন্নাভাবে বা অর্থাভাবে কখনও কষ্ট পাইত না। ইহা ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে তিনি সুদে ঋণ দেওয়া (রিবা) নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। যেহেতু মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই, সেহেতু পরস্পরের আর্থিক অনটনের সুযোগে একে অপরকে শোষণ বা নির্যাতন করা নিতান্ত গর্হিত ও অন্যায়। মুসলমানগণ পরস্পরকে বিনা লাভে বা সুদে কর্জ দান করিবে, ইহাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। অন্যপক্ষে সৎ বা সাধু উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থোপার্জনকে তিনি সকল সময় উৎসাহিত করিতেন। এইভাবে তিনি সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ধর্মীয় আদর্শকে সুদৃঢ় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

হজরতের সামাজিক সংস্কারের মধ্যে তাঁহার বিবাহ ও পারিবারিক আইনসমূহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জাহিলিয়া যুগে পারিবারিক বন্ধন শিথিল

হইয়া পড়িয়াছিল।[১] হজরত মুহম্মদ পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করেন। বহু বিবাহ প্রথা নিয়ন্ত্রিত করা হইল। ধর্মে যেমন পুরুষ এবং নারীকে সমান দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে সমাজেও নারীদিগকে সুনির্দিষ্ট অধিকার ও সুযোগ সুবিধা দান করা হইল। সৎমাকে বিবাহ করা অথবা কোন দুই ভগ্নীকে এক সঙ্গে বিবাহ করা কিংবা দুগ্ধ-সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইল। পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। জাহিলিয়া যুগে পিতা বা অভিভাবকগণ মেয়েদিগকে বিবাহ দিয়া তাহাদের মোহর (যৌতুক) আত্মসাৎ করিত। কিন্তু নূতন আইনে তাহারা নিজেরাই নিজেদের মোহরের মালিক হইল। বর্বর যুগের তালাক প্রথা আইনানুগ ও মার্জিত করা হইল। মেয়ে-সন্তান হত্যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইল। জাহিলিয়া যুগে মেয়েরা যেভাবে অবাধে চলাফেরা ও মেলামেশা করিত, তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাদের জীবনে শ্লীলতা ও শালীনতা আনয়ন করা হইল। পারিবারিক জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধান করাই ছিল তাঁহার সংস্কারের উদ্দেশ্য। প্রাচীন আরবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। মনীবগণ ক্রীতদাসকে তাহাদের ক্ষেত-খামারে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, পশুচারণে ও গৃহকর্মে নিয়োগ করিত। তাহারাই ছিল সমাজের প্রকৃত অর্থকরী শ্রমিক সম্প্রদায়। কিন্তু পণ্যদ্রব্যের মত তাহারা অর্থের বিনিময়ে বিক্রীত হইত। সমাজে তাহাদের কোন সুনির্দিষ্ট অধিকার ছিল না। তাহাদের ভাগ্য মনীবের খেয়াল খুশীর উপর নির্ভরশীল ছিল। হজরতের দরদী মন ইহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ব্যথায় আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে সকল ক্রীতদাস ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, হজরত নিজে এবং তাঁহার সাহাবিগণ নিজেদের অর্থ ব্যয় করিয়া ঐ সকল ক্রীতদাসের মুক্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি ক্রীতদাসের প্রতি ভাল ব্যবহারের জন্য সকলকে উপদেশ দিতেন। তাহাদের উত্তম খোরপোষের ব্যবস্থার জন্য তিনি তাগিদ দিতেন। বিদায় হজ উপলক্ষে তিনি মুসলমানগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন নিজেরা যাহা পরে, ক্রীতদাসগণকেও তাহা পরিতে দেয় এবং নিজেরা যাহা খায়,

---

৩. পূর্বে দ্রষ্টব্য পৃঃ ৪৫

তাহাদিগকে তাহাই খাইতে দেয়। ক্রীতদাসকে মুক্তিদান পুণ্যের কাজ বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

হজরতের অন্যান্য সমাজ-সংস্কারের মধ্যে জুয়াখেলা ও মদ্যপান নিষিদ্ধকরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাহিলিয়া যুগে এই দুইটি অসামাজিক প্রথা আরব-সমাজে সচরাচর প্রচলিত ছিল।

হজরত মুহম্মদ ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে আরববাসীদের সমাজ ও রাজনীতিতে অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন, ইহা পূর্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার জন্মভূমি মক্কায় তিনি তাঁহার নববিধান সামগ্রিকভাবে কার্যকরী করার সুযোগ পান নাই। মদীনায় হিজরত তাঁহার সম্মুখে এক নবদিগন্ত ও উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সিংহদ্বার উন্মোচিত করিয়া দিল। এখানে আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই, ধর্মপ্রবর্তক ও রাজনীতিকের যুগ্ম ভূমিকায়। বনু-আওস ও খজরজের আহ্বানে মদীনায় হিজরত করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মদীনায় একটি স্বস্তি-ব্যবস্থা স্থাপন করার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। মদীনা গঠনতন্ত্রের সাহায্যে তিনি প্রথমে আনসার ও মুহাজিরগণকে একটি 'উম্মা' (সম্প্রদায়) বলিয়া অভিহিত করিলেন। মক্কার ও মদীনার মুসলমানগণ ধর্মের ভিত্তিতে একটি সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া পরস্পরের রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত ও ব্যষ্টিগতভাবে দায়ী হইল। গোত্রীয় আনুগত্য, যাহার ভিত্তি ছিল রক্ত-সম্পর্ক, এই রক্ষা-ব্যবস্থায় নিতান্ত গৌণস্থান অধিকার করিল। মুসলমানগণ মুখ্যতঃ একে অপরের ও সামগ্রিকভাবে সকল মুসলমানের রক্ষার জন্য পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ হইল। মুসলমানেরাই মদীনার স্বস্তি ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ ছিল। কিন্তু দূরদর্শী রাজনীতিকের মত হজরত দেখিতে পাইলেন যে, মদীনা শহর ও উহার আশে পাশে বহু ছোট বড় ইহুদী সম্প্রদায়ও বসবাস করিত। মদীনার রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মদীনার ইহুদী সম্প্রদায়সমূহকে বাদ দিয়া মদীনায় কোন স্বস্তি-ব্যবস্থা কায়েম করা যাইবে না। তাই তিনি ইহুদীদিগকে তাঁহার রক্ষা ব্যবস্থায় শামিল করিয়া লইলেন এবং মদীনা-গঠনতন্ত্র অনুসারে ইহুদিগণকেও উম্মার অন্তর্ভুক্ত করা হইল। এখানে উম্মার তাৎপর্য রাজনৈতিক, ধর্মের সঙ্গে ইহার কোন যোগাযোগ ছিল না। তাই মদীনা-গঠনতন্ত্রে স্পষ্ট উল্লেখ করা হইল, "মুসলমানদের জন্য তাহাদের ধর্ম এবং ইহুদীদের জন্য তাহাদের ধর্ম।" যে সব ইহুদী সম্প্রদায় মদীনা গঠনতন্ত্রের শর্তাবলী মানিয়া লইয়া মদীনার বৃহত্তর স্বস্তি-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত

হইয়াছিল, তাহাদের নাম এই গঠনতন্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিছুকাল পরে যখন ইহুদিগণ নানা রকম গোপন ষড়যন্ত্রে ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হইল, তখন তাহাদিগকে মদীনা হইতে নির্বাসিত করা হইল। তখন হইতে মুসলমানরাই শুধু উম্মার অন্তর্ভুক্ত রহিল। এইভাবে উম্মার মধ্যে অমুসলমানের অন্তর্ভুক্তির অবসান হইল। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, ইসলামী সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংস্থায় গোত্রের অবস্থা কিরূপ হইল? গোত্র কি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইল? আরবের গোত্র-সম্প্রদায় সমূহের সঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ের তুলনা করিলে এইরূপ মনে হইত যে, মুসলমানগণ বিভিন্ন গোত্র সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজেরাই একটি গোত্র-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। তবে এই দুই সমাজ-ব্যবস্থায় প্রথম ও প্রধান পার্থক্য এই ছিল যে, গোত্র-সম্প্রদায়গুলির ভিত্তি ছিল রক্ত-সম্পর্ক, আর ইহার সদস্যরা পরিচালিত হইত গোত্রীয় আদর্শ ও নীতির দ্বারা। অন্যপক্ষে মুসলমানেরা একসূত্রে গ্রথিত হইত ধর্মের দ্বারা এবং নূতন ধর্মের ধর্মীয়, সামাজিক, আদর্শ ও নীতি দ্বারা তাহারা পরিচালিত হইত। কাজেই এই দুই সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তিই সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। কিন্তু ইসলামে গোত্রীয় ব্যবস্থাকে গুরুত্ব না দিলেও পরিচয়ের সূত্র হিসাবে গোত্রাদির নাম ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয় নাই। কুরআনে উল্লেখ রহিয়াছে যে, আল্লাহ মানুষদিগকে পরস্পর পরিচয়ের সুবিধার জন্য গোত্র ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু কোন গোত্রের লোক বলিয়া মুসলমান হিসাবে কাহাকেও শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দেওয়া হয় নাই। অন্যপক্ষে বদান্যতা প্রদর্শনের ব্যাপারে আপন নিকটাত্মীয় ও গোত্রভুক্ত দরিদ্র লোকজনকে ইসলামে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। কারণ আপন লোকজনের প্রতি কর্তব্য বিস্মৃত হইলে, সমাজের স্বাভাবিক বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে বংশ ও পরিবারকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। পরবর্তী যুগে আরব-মুসলমানগণ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া পুনরায় গোত্রীয় পরিচয়কে যথাসর্বস্ব মনে করিয়া লইয়াছিল এবং গোত্রীয় ভিত্তিতে আভিজাত্যের দাবী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পাইয়াছিল।

রাষ্ট্রীয় সংস্থা।

মদীনায় শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ধীরে ধীরে হজরতের রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে থাকে। পর পর কয়েকটি পর্যায়ে এই ক্ষমতার প্রসার ঘটে। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় সন্দেহাতীতভাবে হজরতের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছিল।

অতঃপর খন্দকের যুদ্ধে মক্কাবাসীদের সকল দম্ভ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাওয়ার পর, আরবের গোত্র সম্প্রদায়গুলি স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, মদীনা-রাষ্ট্রের বিরোধিতা তাহাদের জন্য অমঙ্গলই টানিয়া আনিবে। হুদায়বিয়ার চুক্তিতে হজরতের শান্তিকামী মনের পরিচয় পাইয়া বহু আরব গোত্র হজরতের সহিত তথা মদীনা-রাষ্ট্রের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে থাকে। হুদায়বিয়ার চুক্তির ফলে ক্রমশঃ মুসলমানের সংখ্যাও বাড়িয়া যাইতে লাগিল। ইহার ফলে ৬৩০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে হজরত দশ হাজার মুসলমানের বিরাট বাহিনী লইয়া মক্কার নিকট শিবির সংস্থাপন করেন। কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান হজরতের বিরোধিতা নিরর্থক মনে করিয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করে। বহুকাল বিরোধিতার পর জন্মভূমি মক্কা হজরতের আনুগত্য স্বীকার করে। ইহার অব্যবহিত পরেই হুনায়নের যুদ্ধে বনু হাওয়াজিন ও বনু সাকিফ গোত্রের লোকেরা বিশ সহস্র আরবদের এক বিরাট বাহিনী লইয়া শেষ-বারের মত হজরতের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধে তাহাদের শোচনীয় পরাজয়ের পর প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র আরব উপদ্বীপে হজরতের অবিসম্বাদিত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথে সকল বাধা বিপত্তির নিরসন হয়। দূত প্রেরণের মাধ্যমে আরব সম্প্রদায়গুলি একে একে হজরতের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লয়। এই জন্য নবম হিজরীকে (৬৩০-১ খ্রীঃ) ইসলামের ইতিহাসে দূত-প্রেরণের বৎসর (সানাতুল উফুদ) বলিয়া অভি-হিত করা হয়। আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে এই সময় সুদূর উমান, হাজরামউত ও ইয়ামন হইতে দূতগণ মদীনায় আসিয়া হজরতের নিকট স্ব-স্ব গোত্রের আনুগত্য প্রকাশ করে। হজরত দূরদর্শী রাজনীতিকের মত ইহাদের সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন। কোন কোন গোত্রের সর্দারগণ রাজনৈতিক আনুগত্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ধর্মও গ্রহণ করিয়াছিল। আবার কেহ কেহ শুধু রাজনৈতিক আনুগত্য প্রকাশ ও মৈত্রী স্থাপন করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল। এইভাবে সমগ্র আরবে হজরতের তথা মদীনা-রাষ্ট্রের আধিপত্য স্থাপিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত চুক্তি ও মৈত্রীর শর্তও বিভিন্নছিল। কেহ কেহ হজরতকে শত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইল। আবার কেহ মদীনা-রাষ্ট্রে রাজস্ব দানে অঙ্গীকৃত হইল। বহু গোত্রের সহিত হজরত তাহাদের নিজ নিজ সর্দারের মাধ্যমে সম্পর্ক রক্ষা করিতেন। আবার কোন কোন এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও রাজস্ব আদায়ের জন্য হজরত মক্কা ও মদীনাবাসী মুসলমানগণকে কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

মুয়াজ ইবন জাবালকে হজরত সমগ্র ইয়ামন ও হাজরামউতে ধর্ম বিষয়ে উপদেশ দান ও রাজস্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মক্কায় তিনি আবদুশ্ শাম্‌স্ গোত্রের একজন যুবককে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন ইহুদী ও খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের সহিত হজরত বিভিন্ন সময়ে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সকল সন্ধিতে মদীনা-রাষ্ট্রের সহিত তাহাদের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের প্রতি তাহাদের কর্তব্য ও তাহার বিনিময়ে তাহাদের সুযোগ সুবিধা সুস্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করা হইয়াছিল। এবিষয়ে পরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিব।

মদীনা-রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে হজরত মুহম্মদ রাষ্ট্রীয় তহবিলেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অবশ্য প্রথম অবস্থায় নিয়মিত কোন রাষ্ট্রীয় তহবিল গড়িয়া উঠে নাই। ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ অনুযায়ী মুসলমান-গণ পরস্পর পরস্পরকে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই সাহায্য করিত। জনসাধারণের বা রাষ্ট্রের কোন সাময়িক বিপর্যয় বা অভাব উপস্থিত হইলে, হজরতের অনুরোধে অথবা ইঙ্গিত মাত্র সম্পন্ন মুসলমানেরা তাহাদের ধন সম্পদ রাষ্ট্রীয় কল্যাণে অকাতরে দান করিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তবুকের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ধনী প্রবর হজরত উসমান এই উপলক্ষে অনেক অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। হজরত আবু বকর যুদ্ধ-তহবিলে তাঁহার যথাসর্বস্ব দান করিয়াছিলেন। হজরত মুহম্মদের মদীনা-জীবনের শেষ কয়েক বৎসর হইতে রাষ্ট্রীয় তহবিলে কয়েকটি নিয়মিত উপায়ে রাজস্ব সংগৃহীত হইতে থাকে। মুসলমানগণ কর্তৃক জাকাত ও সদকা দেওয়া হইত। প্রথমটি সম্পন্ন মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক বলিয়া বিবেচিত হয়। আর সদকা বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে প্রদত্ত ঐচ্ছিক দান। অমুসলমানদের নিকট হইতেও কর আদায় করা হইত। ইহুদী ও খ্রীস্টানদের সহিত হজরত যে সকল চুক্তি বা সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে জিয্‌য়া শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে। অমুসলমানগণকে মুসলিম রাষ্ট্রের রক্ষা-ব্যবস্থায় শামিল করার ফলে তাহাদের জান মাল রক্ষার জন্য এই কর গ্রহণ করা হইত। 'উশর নামক এক প্রকার করও সময় সময় আদায় করা হইত। যুদ্ধবন্দিগণ নিজদিগকে মুক্ত করিবার জন্য যে অর্থ প্রদান করিত তাহার নাম ছিল সি'আয়া। অমুসলমানদের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহের সময় যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে অর্থ সামগ্রী মুসলমানদের হাতে আসিত, তাহার নাম ছিল গনীমা (গনীমত)। হজরত গনীমা হইতে এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের

রাজস্ব ব্যবস্থা

জন্য রাখিতেন, বাকী অংশ যুদ্ধে যোনদানকারী সৈনিকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হইত। অশ্বারোহী সৈনিক নিজের অংশের সঙ্গে অশ্বের জন্যও বিশেষ ভাগ পাইত। এইভাবে হজরতের জীবদ্দশায়ই ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায় সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে।

ইহুদী ও খ্রীস্টানদের সহিত সম্পর্ক :

শাসক হিসাবে হজরতকে মুসলমান ও পৌত্তলিক আরবগণ ব্যতীত ইহুদী ও খ্রীস্টানদের সংস্পর্শেও আসিতে হইয়াছিল। ইহারা আহল-ই-কিতাব বা স্বর্গীয় গ্রন্থের অনুসারী নামে পরিচিত হইত। হজরত উভয় সম্প্রদায়ের সহিত স্বাভাবিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিতে চাহিয়াছিলেন। মদীনায় রাষ্ট্র গঠন, মক্কাবাসীদের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সন্ধি, মক্কা বিজয়, ইহুদী ও খ্রীস্টানদের সহিত সম্পর্ক ও সমগ্র আরব উপদ্বীপ ব্যাপী সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন একটি শাসন-ব্যবস্থা স্থাপনের মধ্যে তাঁহার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, ও শসন-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রথমেই পূর্ববর্তী সকল নবীকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। মুসলমানদের নিকট ইহুদীদের নবী হজরত মূসা ও খ্রীস্টান ধর্মের প্রবর্তক হজরত ঈসা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। মদীনায় পদার্পণ করিয়াই হজরত মুহম্মদ ইহুদীদের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হন।

মদীনায় পেঁৗছিয়া হজরত দেখিলেন যে, মদীনা ও উহার আশে পাশে বহু ইহুদী বসবাস করিতেছে। তিনি মদীনা গঠণতন্ত্রের মাধ্যমে ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সহযোগিতা স্থাপন করেন। তিনি ইহুদীদিগকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করেন। নবী হিসাবে তিনি ইসলাম ও ইহুদী ধর্মের সাদৃশ্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহুদীদিগকে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করিতে কোনরূপে বাধ্য করেন নাই। কিন্তু তিনি একথাও মনে করিয়াছিলেন যে, উভয় ধর্মের লোকেরা প্রতিবেশী হিসাবে ও একই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে পারিবে। কিন্তু ইহুদীরা হজরতের নবুয়তের দাবী ও ইসলামের কৃতকার্যতায় ঈর্ষান্বিত হইয়া অচিরেই হজরতের ও ইসলামের বিরূপ সমালোচনা আরম্ভ করিল। তাহারা মনে করিত যে, তাহারা আল্লার একমাত্র মনোনীত সম্প্রদায় এবং আল্লার ওহী তাহাদের উপরই অবতীর্ণ হইয়াছে। আর কোন জাতি আল্লার মনোনীত হইতে পারে না। তাহারা হজরত মুহম্মদের নবুয়ত অস্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন আচার

ইহুদীদের সাথে সম্পর্ক

অনুষ্ঠান সম্বন্ধে প্রকাশ্যে বিভিন্ন বিরূপ মন্তব্য করিতে আরম্ভ করিল। এইভাবে ইহুদীদের সহিত হজরতের বিরোধের সূচনা হয়। ইহুদীদের কবি কা'বউল-আশরাফ মুসলিম বিদ্বেষী কবিতা রচনা করিয়া জনসাধারণে প্রচার করিতে থাকে। মুসলিম কবি হাস্সান ইবন সাবিত ইহার প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। হজরত মুহম্মদ যখন জেরুজালেম হইতে মক্কার দিকে কিবলা পরিবর্তন করেন, তখন ইহুদিগণ অনেক ঠাট্টা বিদ্রুপ করিতে থাকে। মৌখিক বিরোধ ও শক্রতা হইতে অচিরেই ইহুদিগণ নানা রকম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে আরম্ভ করে। তাই হজরত পর্যায়ক্রমে তিনটি প্রধান ইহুদী সম্প্রদায় বনু কায়নুকা, বনু নাজির ও বনু কুরায়জার বিরুদ্ধে বিশেষ বিশেষ কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই বিষয় পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।[৪]

মদীনা হইতে এই তিনটি সম্প্রদায়ের ইহুদিগণের অপসারণের পর আরও কিছুসংখ্যক ইহুদী মদীনায় বসবাস করিতে থাকে। তাহারা মোটামুটি হজরতের অনুগত থাকিয়া শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করিতে থাকে।

মদীনা হইতে নির্বাসনের পর বনু নাজির নামক ইহুদী সম্প্রদায় খাইবারে বসবাস করিতে থাকে। কিন্তু তাহারা সুযোগ পাইলেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন করিত। প্রথম সুযোগ আসিল খন্দকের যুদ্ধের সময় (৬২৭ খ্রীঃ)। তাহারা গাতফান গোত্রের আরবগণকে খাইবারের খর্জুর ফসলের অর্ধেক পুরস্কার স্বরূপ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহাদিগকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানে প্ররোচিত করে। হুদায়বিয়ার সন্ধির বৎসর (৬২৮খ্রীঃ) হজরত যখন মুসলমানগণকে লইয়া মক্কায় উমরা পালনের জন্য মদীনা ত্যাগ করেন, তখন খাইবারের ইহুদীরা পার্শ্ববর্তী আরব সম্প্রদায় সমূহকে আবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে। হুদায়বিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হজরত খাইবার আক্রমণ করেন এবং ইহুদীদিগকে শেষ বারের মত পরাজিত করেন। খাইবারের যুদ্ধের পর নূতন করিয়া ইহুদীদের সহিত সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে খাইবারের ইহুদীরা তাহাদের জমি ফিরিয়া পাইল এবং হজরতকে উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ দিতে প্রতিশ্রুত হইল। ইহা দেখিয়া ফাদাক ও ওয়াদিউল-কুরা অঞ্চলের ইহুদীরা বিনাযুদ্ধে অনুরূপ শর্তে হজরতের সহিত শান্তি স্থাপন করে। তায়মা নামক স্থানের ইহুদীদের সহিত যে সন্ধি

ওয়াদি-উল কুরা

৪. পূর্বে দেখুন পৃঃ ৭৯, ৮১

স্থাপিত হয়, তদনুসারে তাহারা জিযয়া কর দানে প্রতিশ্রুত হয়। পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে,[৫] আকাবা উপসাগরের মুখে অবস্থিত মাকনা নামক ইহুদী অধ্যুষিত ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী শহরের অধিবাসীদের সহিত তাহাদের উৎপন্ন শস্য, ধৃত মৎস্য ও তৈয়ারী কাপড়ের এক চতুর্থাংশ কর হিসাবে প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে তাহাদিগকে আল্লাহ ও রসুলের রক্ষা ব্যবস্থার শামিল করিয়া লওয়া হয়। মদীনা-গঠনতন্ত্রে প্রদত্ত ইহুদীদিগের সুযোগ ও অধিকারের সহিত বর্তমান সন্ধির শর্তসমূহ তুলনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহুদিগণ প্রথমতঃ সমতার ভিত্তিতে স্বাধীন ও স্বায়ত্ত্বশাসিত সম্প্রদায় হিসাবে মদীনা-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সেই সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা তাহারা রক্ষা করিতে পারিলনা। কিন্তু দূরদর্শী রাজনীতিকের মত হজরত ইহুদীদিগকে পুনরায় সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত অধিকারের ভিত্তিতে মুসলিম রাষ্ট্রের করদ প্রজা হিসাবে গ্রহণ করেন। এই সকল সন্ধিতে ইহুদীদের ধর্মীয়-স্বাধীনতা পূর্বের মতই অক্ষুন্ন থাকে এবং মুসলিম রাষ্ট্র তাহাদের জানমালের নিরাপত্তার দায়ীত্ব গ্রহণ করে।

খৃষ্টানদের সহিতসম্পর্ক

আমরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সহিত হজরতের সন্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছি। হজরতের প্রচারিত ধর্মের সহিত যেমন ইহুদী ধর্মের সাদৃশ্য ছিল, খ্রীস্টান ধর্মের সহিতও তেমনি সাদৃশ্য ছিল। তবে ইহুদীদের সহিত যেমন দুই পর্যায়ে তাঁহার সম্পর্কের কথা আমরা আলোচনা করিয়াছি খ্রীস্টানেদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। মক্কা-বিজয়ের পরবর্তী যুগে যখন সমগ্র আরব উপ-দ্বীপের আরব সম্প্রদায় সমূহ হজরতের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া মদীনা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতে থাকে, তখন উত্তর ও দক্ষিণ আরবের খ্রীস্টানসমূহও হজরতের সহিত সন্ধি স্থাপন করে। ইহুদীরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদের সহিত নানা শত্রুতামূলক আচরণ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়। অবশেষে খাইবারের যুদ্ধের পর হজরত তাহাদিগকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করেন। খ্রীস্টানদের সহিত কোনকালেই ঐরূপ অপ্রীতিকর বা তিক্ত সম্পর্ক গড়িয়া উঠে নাই। অন্যপক্ষে হজরতের মক্কায় অবস্থান কালে কুরাইশদের নির্যাতন হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য ৬১৫ খ্রীস্টাব্দে মক্কার বহু মুসলমান আবিসিনিয়ায় হিজরত করিলে আবিসিনিয়ার খ্রীস্টান

৫. পঃ ৮৯

রাজা নাজ্জাশী মুসলমানদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এমন কি মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রেরিত কুরাইশদের একটি প্রতিনিধি দলের চক্রান্তকেও তিনি ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিয়াছিলেন। তাহার এই বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ মুসলমানগণ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে। আকাবা উপসাগরের মুখে অবস্থিত আয়ালার খ্রীস্টানদের সহিত হজরত যে সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। বাৎসরিক ৩০০ দীনার জিয্য়া প্রদানের বিনিময়ে ইহাদিগকে নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। নাজরানের খ্রীস্টানদের সহিত হজরতের সন্ধির কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সন্ধি অনুসারে দুই হাজার জামা তাহাদের কর ধার্য হইল। তাহারা যুদ্ধের সময় মুসলমানদিগকে সাজসরঞ্জাম ও উট-ঘোড়া ধার দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হইল। তাহাদের জান-মাল ও ধর্মকর্মের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হইল। ইহা ছাড়া বিভিন্ন খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের নিকট হজরত ইসলাম গ্রহণ, অন্যথায় জিয্য়া প্রদানের জন্য আহ্বান করিয়া বহু চিঠিপত্র প্রেরণ করেন। সিরিয়ায় প্রেরিত হজরতের দূতের হত্যার ফলে বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে প্রেরিত মুতা অভিযান (৬২৯ খ্রীঃ) ও পরে তবুক অভিযান (৬৩১ খ্রীঃ) আরবের অভ্যন্তরে বসবাসকারী খ্রীস্টানদের সহিত হজরতের সম্পর্কের কোন ব্যত্যয় ঘটায়নি।

হজরতের জীবনের ঘটনাবলীর আলোচনা হইতে তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন একাধারে নবী, সমাজ সংস্কারক, রাজনীতিবিদ ও মানবের কল্যাণকামী মহাপুরুষ। নবী হিসাবেই তিনি সমধিক খ্যাত। বিশ্বমানবের এক-ষষ্ঠাংশ তাহার প্রচারিত ধর্মের অনুসারী হিসাবে দৈনিক পাঁচবার মিনারে মিনারে আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা করিয়া তাঁহার মহানবী জীবনের চরম সার্থকতার কথা প্রচার করিতেছে। তাঁহার প্রচারিত ধর্মের কল্যাণে এক যাদুর স্পর্শে আরবের শতধা-বিচ্ছিন্ন ও যুযুধান সম্প্রদায় সমূহ এক ধর্ম, এক আদর্শ ও এক নেতার পতাকাতলে এক নূতন মানবগোষ্ঠি হিসাবে জমায়েত হইয়াছিল। অচিরেই তাহারা পারসিক ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যদ্বয়কে পর্যুদস্ত করিয়া সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং বিশ্বের ইতিহাসে অপূর্ব শৌর্যবীর্য, মানবতাবোধ ও জ্ঞান-সাধনার অত্যুজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়ের জন্য বিস্তারিত পাঠ্য তালিকা

Guillaume, A,—Life of Muhammad
(ইবন হিশামের সিরাতের ইংরেজী তর্জমা)
অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৫

William Muir—Life of Muhammad, এডিনবার্গ, ১৯২৩

Montgomery Watt—Muhammad at Mecca
অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬০

Montgomery Watt—Muhammad at Medina
অক্সফোর্ড ১৯৫৬

খুলাফা-ই-রাশিদীন

আবু বকর সিদ্দিক (৬৩২—৬৩৪খ্রীঃ)
উমর ফারুক (৬৩৪—৬৪৪ খ্রীঃ)
উসমান গনী (৬৪৪—৬৫৬ খ্রীঃ)
আলী মুর্তজা (৬৫৬—৬৬১ খ্রীঃ)

৮

আবুবকর সিদ্দিক

(৬৩২—৬৩৪ খৃঃ)

মদীনায় দশ বৎসর কর্মবহুল জীবন যাপনের পর ৬৩২ খ্রীস্টাব্দের ৮ই জুন হজরত মহা প্রভুর সন্নিধানে মহাপ্রয়াণ করিলেন। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু তাঁহার অনুরক্ত ও গুণমুগ্ধ ভক্তবৃন্দকে বিস্ময়াভিভূত ও বিমূঢ় করিয়া তুলিল। নেতার এই অপ্রত্যাশিত তিরোধানে হতবাক ও শোকাকুল জনতা মসজিদ-ই-নববীর প্রাঙ্গনে আসিয়া সমবেত হইতে আরম্ভ করিল। হজরত উমর মনে করিয়াছিলেন যে, হজরতের মৃত্যু হয় নাই; তিনি মুর্ছিত হইয়াছেন মাত্র। উত্তেজিত কন্ঠে তিনি ঘোষণা করিলেন,—শীঘ্রই হজরতের মুর্চ্ছার অবসান ঘটিবে। হজরত আবু বকর সেই মুহুর্তে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া আয়িশার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন এবং হজরতের মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া জনতাকে উদ্দেশ করিয়া ঘোষণা করিলেন, "যে মুহম্মদের উপাসনা করে তাহার জানা উচিত যে, মুহম্মদ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে আর যে আল্লার উপাসনা করে তাহার জানা উচিত যে, আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাঁহার মৃত্যু নাই।"তারপর কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করিয়া তিনি সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, হজরত একজন নবী ছিলেন এবং তাঁহার পূর্বে বহু নবী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মসজিদ-ই-নববীর প্রাঙ্গণে সমবেত জনতা শান্ত ও অবিচলভাবে এই নিষ্ঠুর মহাসত্য স্বীকার করিয়া লইল।

হজরতের মৃত্যু

হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পর মুসলমানদের প্রথম ও প্রধান সমস্যা হইল মদীনা রাষ্ট্রের জন্য কাউকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করা। এ বিষয় হজরত কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করিয়া যান নাই। আরবের প্রথানুযায়ী গোত্রীয় প্রধানের পদ বংশানুক্রমিক ছিল না। কাজেই হজরতের কোন পুত্রসন্তান বাঁচিয়া থাকিলে কি হইত তাহা চিন্তা করা অপ্রাসঙ্গিক। হজরতের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সংবাদ পাওয়া গেল, আনসারগণ তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে নেতা নির্বাচন করিবার জন্য এক জায়গায় সমবেত হইয়াছে। হজরত আবু বকর ও হজরত উমর এই সংবাদে বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া

আবুবকর খলীফা

প্রধান সাহাবা হজরত আবূ উবায়দাকে সঙ্গে লইয়া আনসারদের সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। আনসারগণ দাবী করিল যে, তাহারাই হজরতকে আশ্রয় দান করিয়াছে, মুহাজিরগণকে প্রতিপালন করিয়াছে এবং ইসলাম ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কাজেই মদীনার শাসনকর্তা তাহাদের মধ্য হইতেই নির্বাচিত হইবে। এমন কি সা'দ ইবন উবাদা নামক একজন খজরজ নেতাকে তাহারা নেতা নির্বাচনের জন্য পছন্দ করিয়াও লইয়াছে। হজরত আবু বকর ধীর অথচ দৃঢ় কণ্ঠে আনসারদের কথায় সায় দিয়া বলিলেন যে, তাহাদের প্রতিটি দাবীই সত্য কিন্তু নেতৃত্বের ব্যাপারে কুরাইশদের দাবী অগ্রগণ্য। কারণ যিনি হজরত মুহম্মদের স্থলাভিষিক্ত হইবেন তিনি শুধু মদীনার শাসকই হইবেন না, সমগ্র আরব দেশের তিনি হইবেন সর্বাধিনায়ক, আর সমগ্র আরব দেশের নেতৃত্বের জন্য একমাত্র কুরাইশগণই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। আনসারদের কেহ কেহ প্রস্তাব করিলেন যে, আনসার ও মুহাজিরদের মধ্য হইতে দুইজন নেতা নির্বাচিত হউক। নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্র ও মুসলিম সম্প্রদায় ইহাতে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িবে এবং মহানবী মুহম্মদের সারা জীবনের সাধনাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিবে এই আশংকায় প্রবীণ সাহাবাগণ প্রমাদ গণিলেন। বহুক্ষণ উভয় পক্ষে কথা কাটাকাটি হইল। বিপদ দেখিয়া হজরত আবু বকর আগাইয়া গেলেন এবং উমর ও আবু উবায়দার প্রতি নির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, আনসার ও মুহাজিরগণ যেন ইহাদের মধ্যে একজনকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই এই কথার প্রতিবাদ করিয়া হজরত আবু বকরকেই নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন এবং তাঁহার হাত ধরিয়া আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলেন। ইহা দেখিয়া বনু আওস আবু বকরের হাত ধরিয়া বায়আৎ (আনুগত্যের শপথ) করিল। ইহার পর খজরজ ও পরে মুহাজিরগণ ও আন্যান্য লোক একে একে আবু বকরকে খলীফা (নবীর প্রতিনিধি) বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। হজরত মুহম্মদ কাহাকেও উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করিয়া যান নাই বটে তবে তিনি যখন পীড়িত অবস্থায় মসজিদে নামাজের ইমামতী করিতে অপারগ হইলেন, তখন তিনি হজরত আবু বকরকে তাঁহার পরিবর্তে নামাজ পড়াইতে অনুমতি দিয়াছিলেন। তাই তাঁহাকে খলীফা বলিয়া মানিয়া নিতে কাহারও কোন সঙ্কোচ বা দ্বিধা হয় নাই। এইভাবে হজরত আবু বকর মুসলিম রাষ্ট্রের প্রথম খলীফা নির্বাচিত হইলেন।

পরদিন হজরতের কাফন দাফন সম্পন্ন হইল। আয়িশার প্রকোষ্ঠেই তাঁহাকে দাফন করা হইল। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনান্তে হজরত আবু বকর মদীনার মসজিদের মিম্বরে উপবেশন করিলেন এবং সমবেত জনতা তাঁহাকে খলীফা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। তারপর তিনি দাঁড়াইলেন এবং জনতাকে উদ্দেশ করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করিলেন। তিনি বলিলেন, "ওহে জনগণ, আমি তোমাদের শাসক নিযুক্ত হইয়াছি কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নহি। যদি আমি ভাল করি, তোমরা আমার সহায়তা করিও, যদি মন্দ চলি, আমাকে শোধরাইয়া দিও। তোমরা সত্যানুরাগী হইবে, কারণ সত্যানুরাগ আনুগত্যের শামিল; মিথ্যাকে পরিহার করিবে, কারণ মিথ্যা-বাদিতা বিদ্রোহের শামিল। তোমাদের মধ্যে যে দুর্বল, সে আমার নিকট শক্তিশালী—যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত না করিব আর শক্তিশালী ব্যক্তি আমার বিবেচনায় দুর্বল বলিয়া প্রতীয়মান হইবে,—যতক্ষণ না খোদার ইচ্ছায় আমি তাহার নিকট হইতে (দুর্বলের) অধিকার আদায় করিব। আল্লার রাস্তায় জিহাদ হইতে বিরত হইও না, কারণ যে জিহাদ হইতে বিরত থাকিবে আল্লাহ তাঁহাকে অপমানিত করিবেন।......যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও আল্লার রসুলের অনুগত থাকি, ততক্ষণ তোমরাও আমার অনুগত থাকিবে, যখন আমি তাঁহাদের অবাধ্য হই, তখন তোমাদের আনুগত্যের কোন অধিকার আমার নাই। এখন নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হও। খোদা তোমাদের মঙ্গল করুন।" জনতা নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হইল এবং হজরত আবু বকর খলীফা হিসাবে সর্বপ্রথম নামাজের ইমামতী করিলেন।

আবুবকরের প্রথম ভাষণ

হজরত আবু বকর ইসলামের ইতিহাসে খুলাফা-ই-রাশিদীনের (সত্য পথে পরিচালিত খলীফাগণ) সর্বপ্রথম খলীফা। তাঁহার ও তাঁহার পরবর্তী তিনজন খলীফার শাসনকালকে খুলাফা-ই-রাশিদীনের যুগ বলা হয়। ইঁহারা সকলে হজরতের নিকটতম ও প্রিয়তম সাহাবা ছিলেন এবং তাঁহারই শিক্ষা ও আদর্শ ইহাদিগকে সরাসরিভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল এবং তাঁহারই প্রদর্শিত পথে ইঁহারা শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। সেই জন্যই ইঁহাদিগকে খুলাফা-ই-রাশিদীন বা সত্যপথে পরিচালিত খলীফা বলা হয়।

খুলাফা-ই-রাশিদীন

খলীফা হইয়াই হজরত আবু বকরের প্রথম কর্তব্য হইল হজরতের অন্তিম ইচ্ছা কার্যে পরিণত করা। মুতার অভিযানে নিহত জায়দ ও

অন্যান্য শহীদানের হত্যার প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে হজরত তাঁহার শেষ পীড়ার পূর্বে জায়দের পুত্র উসামাকে সিরিয়া সীমান্তে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরতের অসুস্থতা ও মৃত্যুর জন্য এই অভিযান কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই। হজরত আবু বকর খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরবর্তী দিবসে উসামাকে সৈন্য সমাবেশের আদেশ দান করিলেন। হজরতের মৃত্যু সংবাদ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আরব সম্প্রদায় সমূহ মদীনার আনুগত্য অস্বীকার করিয়া দিকে দিকে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীয়মান করিল। চতুর্দিক হইতে এই সকল দুঃসংবাদ রাজধানী মদীনায় আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। খলীফাকে রাজধানী শহরে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া উত্তরাঞ্চলে অভিযান প্রেরণ অনেকের বিবেচনায় অদূরদর্শিতা ও হঠকারিতা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। হজরত উমর খলীফার নিকট বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন যে, এই অভিযান মদীনার জন্য ও খলীফার জন্য বিপজ্জনক হইতে পারে। আর যদি নিতান্তই এই অভিযান প্রেরণ করিতে হয়, তবে উসামার চেয়ে বয়স্ক ও অভিজ্ঞ কাহারও নেতৃত্বে যেন পাঠান হয়। প্রথম দাবীর জওয়াবে আবু বকর বলিলেন, "যদি চতুর্দিক হইতে নেকড়ে বাঘের দল মদীনার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে আর আমি নির্জন ও একা পড়িয়া থাকি তথাপি অভিযান যাইবেই। প্রভু মুহম্মদের মুখনিঃসৃত একটি বাক্যও অযথা যাইতে পারে না।" দ্বিতীয় দাবীর উত্তরে আবু বকর বলিলেন যে, যাঁহাকে হজরত নিজে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া অন্য কাহাকেও নিযুক্ত করার ধৃষ্টতা তাঁহার নাই। আসন্ন বিপদের মুখে সিরিয়ায় অভিযান প্রেরণ মদীনা রাষ্ট্রের শত্রুদের মনে এই প্রতীতি জন্মাইল যে, আবু বকর মদীনার রক্ষা ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ রাখিয়া দূরে এই অভিযান প্রেরণ করেন নাই।

উসামার অভিযান

রিদ্দার যুদ্ধ বা ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পর বহুলোক মদীনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। আবু বকরের খিলাফত কালের অধিকাংশ এই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহে কাটিয়া যায়। এই যুদ্ধকে রিদ্দার যুদ্ধ বা ধর্ম ত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলা হয়। হজরতের জীবদ্দশায় আরবের বিভিন্ন স্থানে ভণ্ডনবীদের আবির্ভাব হয়। চতুর্দিক হইতে এই সময় বিদ্রোহের

সংবাদ মদীনায় পৌঁছিতে লাগিল। হজরতের কর্মচারী ও শাসনকর্তাগণ স্ব স্ব স্থান হইতে বিতাড়িত হইলেন। মুসলমানগণ শত্রুদের হাতে নিহত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বিদ্রোহের দাবানল সমগ্র আরব উপ-দ্বীপে ছড়াইয়া পড়িল। হজরত আয়িশা বলেন, "যখন নবী মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, তখন আরবগণ ধর্মত্যাগ করিল, ইহুদী ও খ্রীস্টানগণ মাথা-চাড়া দিয়া উঠিল এবং বিদ্রোহ দেখা দিল। মুসলমানগণ নবীর মৃত্যুতে শীত শর্বরীতে বর্ষণসিক্ত মেষপালের মত হইয়া পড়িল। অবশেষে আল্লাহ্ তাহাদিগকে আবু বকরের নেতৃত্বাধীনে একত্রিত করিলেন।" প্রকৃতপক্ষে হজরতের জন্মভূমি হিজায ও ইহার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ ব্যতীত আরবের অন্যান্য অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় নাই। স্থানে স্থানে বেদুঈনগণ শুধু নামমাত্রই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। কোন কোন অঞ্চলে নেতৃস্থানীয় দুই একজন লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। দূরাঞ্চলে ইয়ানন, ইয়ামামা ও উমানে গোত্রের সর্দারগণই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, জনসাধারণের মধ্যে ইসলামের মর্মবাণী পৌঁছাইবার জন্য অধিক সংখ্যায় ধর্মপ্রচারক প্রেরণ অল্পসময়ের মধ্যে সম্ভব হইয়া উঠে নাই। হজরতের মৃত্যুর মাত্র দুই তিন বৎসব পূর্বে সমগ্র আরব উপদ্বীপের আরব গোত্র সমূহ হজরতের ও মদীনা রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইয়া-ছিল। এই আনুগত্য বহুক্ষেত্রে মূলতঃ রাজনৈতিক আনুগত্য। ইহারা কালক্রমে হয়ত ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করিয়া মুসলমান হইতে পারিত কিন্তু হজরতের মৃত্যুর সুযোগে বিভিন্ন দলপতিগণ মদীনা রাষ্ট্রের আনুগত্য অস্বীকার করিয়া বসিল। যাহারা মাত্র কিছু দিন পূর্বে হজরতের রাজ-শক্তির ভয়ে অথবা মদীনা রাষ্ট্রে সুযোগ সুবিধা লাভের আশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা তাহাদের পূর্ব ধর্মে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। এই ভাবে ধর্মত্যাগীদের যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে এক বিরাট বিদ্রোহ আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করিল। নানা কারণে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ইহার মধ্যে হজরতের মৃত্যুই বিদ্রোহের প্রথম ও প্রধান কারণ। হজরতের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও অপূর্ব সাংগঠনিক ক্ষমতা তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে সমগ্র আরব উপদ্বীপকে তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে একত্রিত করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে আরব সর্দারগণ মনে করিল যে, হজরত মুহম্মদের সহিত সন্ধি বা চুক্তি ছিল ব্যক্তিগত। তাঁহার মৃত্যুতে সেই সকল চুক্তি বা সন্ধির অবসান ঘটিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও

কারণ

হজরতের মৃত্যু

নানাবিধ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে আরবদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কারণে ও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া মদীনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীয়মান করিল।

আরব দেশে হজরতের পূর্বে কোনকালেই সমগ্র উপদ্বীপের উপর একটি কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপিত হয় নাই। আরবের গোত্রসমূহ যুগ যুগ ধরিয়া নিজেদের আবাস ভূমিতে শতধা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বসবাস করিত।

রাজনৈতিক কারণ

গোত্রীয় যুদ্ধ বিগ্রহ আরবের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। তাই হজরতের মৃত্যুর পর গোত্রগুলি পুনবায় কেন্দ্রীয় সরকারের আনুগত্য অস্বীকার করিয়া পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চাহিল। আবার গোত্রীয় ও স্থানীয় আনুগত্য প্রাধান্য লাভ করিল। মদীনার প্রাধান্য, কুরাইশ ও আনসারদের কর্তৃত্ব আরবগণ মানিতে চাহিল না। অথচ মুসলমান হইলেই তাহাকে মদীনা রাষ্ট্রের আনুগত্যও স্বীকার করিয়া লইতে হইত। আরববাসীরা আবহমান কাল

অর্থনৈতিক কারণ

হইতে শুধু যে কোন সরকারের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নাই তাহা নহে বরং তাহারা কাহাকেও কোন প্রকার কর-দানেও অভ্যস্ত ছিল না। হজরতের মৃত্যুর সাথে সাথে জাকাত ও অন্যান্য কর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। জাকাতের সামাজিক মূল্য ও উপকারিতা তাহারা উপলব্ধি করিতে না পরিয়া জাকাত প্রদানকে এক বিরাট বোঝার শামিল মনে করিতে লাগিল। তুলায়হা নামক একজন ভণ্ড নবীর সমর্থকগণ হজরত আবু বকরের নিকট এই মর্মে এক প্রস্তাব পাঠাইল যে, তাহারা ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি মানিয়া চলিতে রাজী থাকিবে যদি শুধু তাহাদিগকে জাকাত হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। মদীনার কোন কোন নেতা বিপদের ভয়াবহতার কথা বিচার করিয়া ইহাদের সহিত সমঝোতায় পৌঁছিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন কিন্তু হজরত আবু বকর ইহাদের প্রস্তাবকে ঘৃণা-ঘরে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, "যদি তোমরা জাকাতের উটের একটি খুঁটাও ধরিয়া রাখ, তথাপি ইহার জন্য আমি তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিব।" আবু বকর সত্যই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, একটি ব্যাপারে একবার নিষ্পত্তি হইলে আরও অনেক ব্যাপারেই এইরূপ করিতে হইবে এবং অবশেষে আপোষ-রফা হইতে হইতে ইসলাম ধর্ম সমূলে লোপ পাইবে।

ধর্মীয় ব্যাপারে আরবগণ ছিল অতিমাত্রায় বস্তুতান্ত্রিক। মরুভূমির

মুক্ত ও স্বাধীন আবহাওয়ায় প্রতিপালিত হইয়া তাহারা উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিল। ইসলামের বিধি-নিষেধ গুলি তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ সাধনে নিতান্ত সুফলপ্রদ হইলেও ইহা পরখ করিয়া দেখিবার মত তাহাদের সুযোগ ও অবকাশ কোথায়?

ধর্মীয় কারণ

অজু, নামাজ, রোজা প্রভৃতি ধর্মীয় বিধান তাহাদের স্বাধীন জীবনে অগণিত প্রতিবন্ধকের মত বোধ হইতে লাগিল। তাই হজরতের মৃত্যুতে সুযোগ পাইয়া তাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। আবার কোন কোন লোক নবী হিসাবে হজরতের বিরাট সাফল্যে ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া উঠিল। তাহারা দেখিল হাশিম গোত্রের নবী মুহম্মদ একটি নূতন ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে সমগ্র আরব উপদ্বীপে নিজের প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হইয়াছে। তাহারা আপন আপন গোত্রে নবী সাজিয়া অনুরূপ সাফল্য অর্জন করিতে বদ্ধপরিকর হইল। আরবের বিভিন্ন স্থানে বহু ভণ্ড নবীর আবির্ভাব হইল। ইহাদের কেহ কেহ হজরতের জীবদ্দশায়ও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। আরব উপ-দ্বীপের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ইয়ামামা নামক স্থানে বনু হানীফা গোত্রের মুসায়-লামা ইহাদের অন্যতম। কথিত আছে, মুসায়লামা হজরতের নিকট এই মর্মে এক চিঠি লিখিয়াছিল, "আল্লার নবী মুসায়লামার নিকট হইতে আল্লার নবী মুহম্মদের নিকট, পৃথিবীর একার্ধ তোমার হউক, অপরার্ধ আমার হউক।" উত্তরে হজরত মুহম্মদ লিখিয়াছিলেন, "আল্লার নবী মুহম্মদের নিকট হইতে মিথ্যুক মুসায়লামার নিকট, পৃথিবীর মালিক আল্লাহ্, তিনি যাহাকে খুশী ইহার উত্তরাধিকার দান করেন।" মুসায়লামা বনু-তমীমের সাজা নাম্নী খ্রীস্টান মহিলার পানি গ্রহণ করিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিল। সাজাও নবুয়ত দাবী করিয়াছিল। অপর ভণ্ড নবীর নাম ছিল তুলায়হা। সে বনু আসাদ ও বনু গাতাফানের নবী ছিল। যতদূর জানা যায়, ইহারা ইসলামের কয়েকটি আচার ও রীতিনীতি নিজের মনগড়া ভাষায় লোকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিল। এই গুলির মধ্যে এমন কোন মাহাত্ম্য ছিল না বা জনসাধারণ এই সমস্তের প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করে নাই। তাহাদের সাময়িক সাফল্য আপন আপন গোত্রীয় আনুগত্যের ফলেই সম্ভবপর হইয়াছিল।

রিদ্দার যুদ্ধ

আবু বকরের দূরদর্শিতা ও অনমনীয় মনোভাব ইসলামকে চরম বিপদের

হাত হইতে রক্ষা করিল। জাকাত অস্বীকারকারীদের প্রতি আবু বকরের মনোভাবের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ধর্মত্যাগী ও বিদ্রোহীদের প্রতি আবু বকরের নীতি উক্ত ঘটনা হইতেই বুঝা যায়। তিনি দাবী করিলেন, বিদ্রোহীরা হয় আত্মসমর্পণ করিবে আর না হয় তাহাদের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ চালাইয়া তাহাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইবে। এই বিরাট বিপদের মুখে আবু বকর বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। উসামার যুদ্ধ যাত্রার পর বনু আবস ও বনু জুবয়ানের লোকেরা মদীনা আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া একদল রাবাজায় ও অন্য দল জুল-কাস্সায় সমবেত হইল। আবু বকর মদীনা রক্ষার আশু ব্যবস্থা করিলেন। পার্শ্ববর্তী অনুগত সম্প্রদায়ের লোকদিগকে ডাকিয়া পাঠান হইল এবং মদীনার বিভিন্ন প্রবেশ পথে প্রহরী নিযুক্ত করা হইল।

জুল কাস্সা হইতে শত্রুদল মদীনার উপর আক্রমণ চালাইল কিন্তু মুসলমানদের সচকিত প্রহরা ও রক্ষা ব্যবস্থার ফলে শহরের কিছু ক্ষতি করিতে পারিল না। আবু বকর স্বয়ং মদীনা হইতে অগ্রসর হইয়া

মদীনা আক্রান্ত

একটি সুসজ্জিত ক্ষুদ্র বাহিনীর সাহায্যে একদা প্রত্যুষে শত্রুদের শিবির আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে জুল-কাস্সা হইতে বিতাড়িত করিলেন। এই সামান্য ঘটনায় মদীনার সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। সৈন্য সামন্ত ব্যতীত শত্রু সৈন্যের এই শোচনীয় পরাজয়ের কথা দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল। কিছু কিছু সম্প্রদায়ের সর্দারগণ জাকাত লইয়া আসিতে শুরু করিল। বনু তমীম ও বনু তায়ীর লোকেরাই সর্ব প্রথম জাকাত দিতে আসিল। আবু বকর বলিলেন, "ইহারা শুভ-সন্দেশ বাহী, ইহারাই প্রকৃত মানুষ ও ধর্মের রক্ষক।" ইতিমধ্যে উসামা তাঁহার সফল অভিযান সমাপনান্তে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। শত্রুরা জুল-কাস্সা হইতে বিতাড়িত হইয়া রাবাজায় সমবেত হইল এবং কয়েকজন মুসলমানকে হত্যা করিয়া তাহাদের প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করিল। আবু বকর এইবার উসামাকে মদীনা রক্ষার ভার দিয়া একটি ক্ষুদ্র বাহিনী লইয়া রাবাজা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। খলীফার জীবনাশঙ্কায় ভীত ও অনুরক্ত ভক্তগণ বারংবার তাহাকে স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে নিষেধ করিল। কিন্তু তিনি সব অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া শত্রু-সৈন্যের উপর আপতিত হইলেন। তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল, কিছু লোক নিহত ও কিছু বন্দী হইল। আবস ও জুবয়ান গোত্রের

লোকেরা পালাইয়া বুজাখায় তুলায়হার সৈন্যদলে যোগ দান করিল। খলীফা মুসলমানদের প্রাথমিক বিজয়ে সন্তুষ্ট হইয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন। মদীনা সর্বপ্রকারের বিপদ হইতে মুক্ত হইল। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গোত্রসমূহ আবার জাকাত পাঠাইয়া মদীনার বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইল। কিন্তু খলীফার সম্মুখে তখনও অথৈ পাথার। দূর দূরান্তে বিদ্রোহীরা তখনও ইসলামের নাম নিশানা মুছিয়া ফেলিতে বদ্ধ পরিকর। সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলাম ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। হজরতের অন্তিম ইচ্ছা—"আরব দেশে দ্বিতীয় আর কোন ধর্ম থাকিতে পারিবে না।" ভণ্ড নবী-দিগকে দমন করিতে হইবে। ধর্মত্যাগীদিগকে ইসলাম ধর্মে ফিরাইয়া আনিতে হইবে কিংবা তাহাদিগকে নির্মূল করিতে হইবে। বিদ্রোহের মূলোৎপাটন করিয়া আরব উপদ্বীপে ইসলামের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে হইবে।

মদীনা বিপদমুক্ত

আবু বকর জুল-কাস্‌সায় সকল সৈন্য সমাবেশ করিলেন। অনুগত গোত্রগুলিকে সেখানে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সমগ্র মুসলিম সৈন্য বাহিনীকে একাদশটি পৃথক দলে বিভক্ত করিয়া প্রতি দলের জন্য একজন সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। ইহাদের প্রত্যেককে তিনি একটি একটি পতাকা দান করিলেন এবং বিশিষ্ট এলাকায় ধর্মত্যাগীদের দমন করিতে আদেশ দিলেন। রিদ্দার যুদ্ধে আল্লার অসি খালিদ ইবন ওয়ালীদ বিশেষ প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ তুলায়হাকে দমন করার ভারপ্রাপ্ত হইলেন। ইকরিমা এবং সুরাহবিল মুসায়লামার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। মুহাজিরকে ইয়ামনে, আল-আলাকে বাহরাইনে, হুজায়ফাকে মাহরায় এবং আমরকে বনু কুজাআর বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইল। এইভাবে মদীনা রক্ষার জন্য সামান্য সৈন্য রাখিয়া আবু বকর যুগপৎ বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান প্রেরণ করিলেন। আবু বকর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া ধর্ম-ত্যাগীদের প্রতি এক পরোয়ানা জারী করিলেন। যাহারা তওবা (অনুশোচনা) করিয়া আত্মসমর্পণ করিবে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া ইসলাম ধর্মে ফিরাইয়া লওয়া হইবে। যাহারা অস্বীকার করিবে, তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া হইবে এবং তাহাদের যোদ্ধাগণকে হত্যা করা হইবে। মেয়ে লোক ও শিশুদিগকে বন্দী করা হইবে (অক্টোবর, ৬৩২ খ্রীঃ)।

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান

'আল্লার অসি' খালিদ প্রথমে বনু তায়ীর লোকদিগকে বশে আনিলেন। তারপর তিনি তুলায়হাকে বুজাখার যুদ্ধে পরাজিত করেন। তুলায়হা সস্ত্রীক সিরিয়ায় পলায়ন করিল। তুলায়হার সম্প্রদায় বনু আসাদ খালিদের নিকট আত্মসমর্পণ করিল এবং ইসলাম ধর্মে ফিরিয়া আসিল। পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও আত্মসমর্পণ করিল। ইহার পর খালিদ বনু তমীমের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। স্ত্রী নবী সাজা মেসোপোটেমিয়া হইতে তগলিব ও অন্যান্য খ্রীস্টান গোত্রের লোকজনকে লইয়া বনু তমীমের আবাস ভূমিতে আসিয়া পৌঁছিল। সেখানে তমীমের লোকেরা তাহাকে নবী বলিয়া স্বীকার না করায় সাজা ইয়ামামায় পলায়ন করিয়া মুসায়লামার সহিত যোগদান করিল। ইয়ামামার হানীফা গোত্রের ৪০,০০০ লোক মুসায়লামার নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। মুসায়লামা ইতিমধ্যে সাজাকে উপযুক্ত আড়ম্বর আয়োজনের সহিত বিবাহ করিয়া ইয়ামামার অর্ধেক রাজস্ব মোহর হিসাবে দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হইল। ইকরিমা ও সুরাহবিল ইয়ামামার বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া মুসায়লামার হাতে পরাজিত হইলেন। তখন খলীফা আবু বকর খালিদকে মুসায়লামার বিরুদ্ধে প্রেরন করিলেন।

রিদ্দার যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ইয়ামামার যুদ্ধ। বনু হানীফার লোকেরা মুসলমানদের সহিত বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিল। মুসলমানগণ ও সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিল। মুসায়লামা ও তাহার সঙ্গীরা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া প্রাচীর পরিবৃত্ত উদ্যান-নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং মুসলমানদের সম্মুখে নগরদ্বার বন্ধ করিয়া দিল। মুসলমানগণ তাহাদের একজন দুর্ধর্ষ বীর পুরুষকে প্রাচীরের উপর উঠাইয়া দিল। তিনি অতর্কিতে নীচে লাফাইয়া পড়িয়া ডাইনে ও বামে তরবারী চালনা করিলেন এবং নগরদ্বার খুলিয়া দিলেন। মুসলমানগণ উত্তাল তরঙ্গের মত নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিল। স্বল্প পরিসর স্থানে বহু-লোকের ভিড়াভিড়িতে বনু হানীফার লোকেরা অগণিত সংখ্যায় মৃত্যুবরণ করিল। মুসায়লামা দশ সহস্র অনুচর সহ নিহত হইল। মুসলমানদের প্রায় বার শত লোক মৃত্যু বরণ করিল। এই যুদ্ধে বহু কুরআনের হাফিজ শহীদ হইয়াছিলেন। মদীনার ঘরে ঘরে শোকের কালো ছায়া নামিয়া আসিল। আনসার ও মুহাজিরদের কোন গৃহ বাকী ছিল না যেখানে

ইয়ামামার যুদ্ধ
৬৩৩ খ্রীঃ

কাহারও মৃত্যুতে বিলাপ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় নাই। বনু হানিফার লোকেরা ইহার পর আত্মসমর্পণ করিয়া ইসলাম ধর্মে ফিরিয়া আসিল।

অন্যান্য সেনাপতিগণ আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে ধর্মত্যাগীদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। সেনাপতি আলা বাহরাইনের বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত করিলেন। এই যুদ্ধে মুসান্না নামক একজন স্থানীয় যোদ্ধা বিশেষ প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। হুজায়ফা ও ইকরিমা সম্মিলিতভাবে উমাল দখল করিলেন। অতঃপর সেনাপতি ইকরিমা সেনাপতি মুহাজিরকে ইয়ামন ও হাজরামাউত অভিযানে সাহায্য করিবার জন্য রওয়ানা হইলেন। ইতিমধ্যে ইয়ামনের ভণ্ডনবী আসওয়াদের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু বিদ্রোহিগণ মদীনা সরকারের আনুগত্য অস্বীকার করিয়াই চলিল। অবশেষে ইহাদের মধ্যে এক গৃহ-বিবাদের ফলে কয়স ও আমর নামক দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী দলপতি মুহাজিরের হাতে বন্দী হইল। ইয়ামন মুসলমানদের দখলে আসিল। হাজারামাউতের লোকেরা প্রাচীন কিন্দা বংশের যুবরাজ আশ'আশের নেতৃত্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। কিন্তু মুহাজির ও ইকরিমার সম্মিলিত বাহিনীর নিকট তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল এবং আশ্‌আশ বন্দী হইয়া হজরত আবু বকরের নিকট মদীনায় নীত হইল। এইভাবে সমগ্র আরব উপদ্বীপে বিদ্রোহ প্রশমিত হইল। হজরত আবু বকরের খিলাফতের প্রথম বৎসর এইভাবে অতিবাহিত হইল।

রিদ্দার যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের ফলে সমগ্র আরব উপদ্বীপ ইসলাম ধর্মে ফিরিয়া আসিল এবং সর্বত্র মদীনা রাষ্ট্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। হজরত মুহম্মদের সময় একবার মোটামুটিভাবে এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর সুযোগে আরব গোত্রসমূহ পুনরায় নিজ নিজ গোত্রীয় আধিপত্য ও প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হইল। তাহাদের এই প্রচেষ্টা শুধু যে কেবল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল তাহা নহে সমগ্র আরব উপদ্বীপ পুনরায় ইসলামের পতাকাতলে একতাবদ্ধ হইল। অন্য পক্ষে এই যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় ঘটিলে হয়ত ইসলামের নাম নিশানা পৃথিবীর বুক হইতে চিরতরে মুছিয়া যাইত। এই যুদ্ধ বিজয়ের কৃতিত্ব দুঃসাহসী ও অমিত বিক্রম আরব বীর পুরুষদের কিন্তু প্রধান কৃতিত্ব হজরত আবু বকরের, যিনি ধর্মে স্থির, কর্মে নিরলস ও সঙ্কটে অবিচল ছিলেন। বিদ্রোহীদের প্রতি তাহার কঠোর

ফল

আপোষবিহীন মনোভাবের ফলেই ইসলাম সুনিশ্চিত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইল। "তিনি না হইলে ইসলাম বেদুঈন গোত্রসমূহের সঙ্গে আপোষ রফা করিয়া মিলাইয়া যাইত অথবা খুব সম্ভব আঁতুড় ঘরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইত।"[১] রিদ্দার যুদ্ধের সুদূর প্রসারী ফল সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে আরবদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সাম্রাজ্য বিস্তার। আরব উপদ্বীপে বিদ্রোহ দমনে যে যে যুদ্ধকৌশল, শৌর্যবীর্য ও নেতৃত্ব প্রদর্শিত হইয়াছিল বাইজান্টাইন ও সাসানীয় সাম্রাজ্যের সহিত যুদ্ধে তাহাই তাহাদিগকে নিশ্চিত বিজয়ের পথে পরিচালিত করিয়াছিল।

বাইজান্টাইন ও সাসানীয় সাম্রাজ্যের সহিত যুদ্ধ

রিদ্দার যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর উত্তরে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ও পূর্বে পারসিক সাম্রাজ্যের সহিত মুসলমানদের সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠে। নানা কারণে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বাইজান্টাইন ও সাসানীয় সাম্রাজ্যদ্বয় বহুকাল যাবৎ পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া নিজেদের শক্তি ক্ষয় করিযাছিল। উভয় সাম্রাজ্যই বিলাসিতা, দুর্নীতি, অত্যাচার ও ধর্মীয় কোন্দলের ফলে অবনতির প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছিল। যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের উদ্দেশ্যে উভয় সাম্রাজ্যে প্রজাদের উপর ক্রমবর্ধমান করের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে সরকারের প্রতি তাহাদের আনুগত্য ক্রমান্বয়ে শিথিল হইতে থাকে। আরবের উত্তরাঞ্চলে বাইজান্টাইন সম্রাটগণ বহু আরব গোত্রকে ভাতা ইত্যাদি প্রদান করিয়া তাহাদিগকে বশে রাখিয়াছিল কিন্তু সাম্প্রতিক কালে এই বৃত্তি-ভাতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বাইজান্টাইন ও সাসানীয় সাম্রাজ্যের এই সকল দুর্বলতার ফলে মধ্যপ্রাচ্যে যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, কোন শক্তিশালী জাতি বা গোষ্ঠি দ্বারা তখন ঐ শূন্যতা পূর্ণ হইত। ঠিক এই সময়ই আরববাসীরা প্রথমে হজরত মুহম্মদের নেতৃত্বে ও পরে হজরত আবু বকরের নেতৃত্বে ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে একত্রিত ও সংঘবদ্ধ হইয়া একটি নূতন শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই তাহারা দুর্বল ও পতনোন্মুখ সাম্রাজ্য-দ্বয়ের স্থান দখল করিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু আরবদের বহিরাভিযান ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পূর্ব পরিকল্পিত কোন নীতির ফল নহে। হজরত আবু বকর বা হজরত উমর কখনও বিশাল

১. উইলিয়ম ম্যুর, কেলিফেট, ১৪

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন নাই। দ্বিতীয় খলীফা হজরত উমর মুসলমানদিগকে রাজধানী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার ভয়ে দূরে অভিযান পরিচালনা করিতে নিষেধ করিতেন। উত্তরে বাইজান্টাইন ও পূর্বে সাসানীয় সাম্রাজ্যের সহিত প্রথমে আরবদের ছোটখাট সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং তাহাই ধীরে ধীরে দীর্ঘস্থায়ী বিশাল যুদ্ধে পরিণত হয়। ইহার পরবর্তী পর্যায়ে পরিকল্পিত ও নিয়মিত যুদ্ধ বিগ্রহ আরম্ভ হয়। সুতরাং আরবদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা কোন পরিকল্পনার ফল নহে, বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইহার প্রতিকূলে কাজ করিয়াছিল।

কোন কোন লিখকের মতে আরবদের সাম্রাজ্য বিস্তার রিদ্দা যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল। ইঁহারা মনে করেন যে, রিদ্দার যুদ্ধের পর আরবগণ সমগ্র উপদ্বীপকে একত্রিত করিয়াছিল বটে কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহে তাহাদের অর্থ সম্পদ, গো-মেষাদি বিনষ্ট হয়, তাহারা সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও নিঃসম্বল হইয়া পড়ে। ক্ষুধার্ত বেদুঈনগণ তখন বাইজান্টাইন ও সাসানীয় সাম্রাজ্যের উর্বর এলাকা সমূহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। এই মতবাদ সম্পূর্ণ অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। রিদ্দার যুদ্ধের পরে আরবের অবস্থা পূর্ব বা পরের চেয়ে ভাল বা খারাপ ছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অন্যপক্ষে সিরিয়া ও ইরাকের আরব গোত্র সমূহ আরবগণকে নিকটাত্মীয় মনে করিয়া তাহাদের শাসনকে অভিনন্দিত করিয়াছিল এবং হিট্টির মতে "মুসলিম বিজয় প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্য কর্তৃক ইহার পূর্ববর্তী প্রাধান্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।"

আরবগণকে ধর্মীয় উন্মাদনা যুদ্ধ বিগ্রহে কতখানি উৎসাহিত করিয়াছিল আর অর্থলিপ্সা তাহাদের বিজয় স্পৃহাকে কতখানি উদ্দীপিত করিয়াছিল, এই বিষয় লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেক বিতর্ক রহিয়াছে। প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের যুদ্ধ যাত্রার প্রধান, উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। ধর্মই আরবগণকে নূতন অনুপ্রেরণা ও নূতন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া একই পতাকাতলে সমবেত করিয়াছিল। ধর্মের নাম করিয়াই তাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল। আল্লাহু আকবর' ছিল মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধধ্বনি। আরবের লোকেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তাহাদের মরুভূমির আবাসস্থলে অজ্ঞাত জীবন যাপন করিতেছিল। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরেই তাহারা বিশ্ব মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাজেই মূলতঃ এই আন্দোলনকে ধর্মীয় আন্দোলন আখ্যা দিলে ভুল হইবে না। কিন্তু

ইহা অনুদার, উন্মাদনা প্রসূত ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না, কারণ যাহারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিত করদানের বিনিময়ে তাহাদের জানমাল ও ধর্মের নিরাপত্তা বিধান করা হইত। মুসলমানদের মধ্যে সাধারণ সৈনিকদের মনে অর্থ ও গনীমত (যুদ্ধে লব্ধ বস্তু) লাভের বাসনা যুদ্ধের অপর আকর্ষণ ছিল। যে কোন বিজেতা বাহিনীর পক্ষে এই কথা সমভাবে প্রযোজ্য। এই কথা বলিয়া প্রাথমিক মুসলমানদিগকে দোষারোপ করার মধ্যে কোন বিশেষ যুক্তি নাই। তাহারা কেবল অর্থের লালসায় দিগ্বিজয় করিয়াছিল এমন কথা নিতান্তই হাস্যকর। মহান আদর্শে উদ্দীপিত ও সৎগুণের অধিকারী না হইলে আরব সৈন্য বাহিনী বিপক্ষ দলের বড় বড় সৈন্যদলকে অবলীলাক্রমে পরাজিত করিতে পারিত না। অন্যপক্ষে যে সৈন্য বাহিনী তাহাদের হাতে পরাজিত হইয়াছিল তাহারাই ছিল বেতনভুক, এবং আদর্শ ও সদুদ্দেশ্য বিবর্জিত।

পারসিকদের সহিত যুদ্ধ

রিদ্দার যুদ্ধের অবসানের পর খালিদ ১০,০০০ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী সহ উত্তরে ফোরাত নদীর অববাহিকা অঞ্চলের দিকে যাত্রা করিলেন। অপর সেনাপতি মুসান্না ৮০০০ সৈন্যের এক দল লইয়া খালিদের সহিত যোগদান করেন। খালিদ আল-হিরা (ইরাক) নামক প্রদেশের রাজধানী আল-হিরার দিকে সৈন্য পরিচালনা করিলেন। ঐ প্রদেশ পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রদেশের সত্রপ (শাসনকর্তা) হরমুজ তাঁহার আরব প্রজাগণের উপর নানারূপ অত্যাচার করিয়া তাহাদের বিরাগ ভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি খালিদকে বাধা দিতে আসিলেন। খালিদ তাঁহাকে হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে না হয় কর দিতে আহ্বান করিয়া একটি পত্র প্রেরণ করেন:—"ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর, তাহা হইলে তোমরা নিরাপদ। অন্যথায় তুমি ও তোমার লোকেরা কর দান কর। যদি কর দান করিতে অস্বীকার কর তবে তোমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে। এমন একটি সম্প্রদায় তোমাদের উপর আপতিত হইয়াছে, যাহারা মৃত্যুকে ঐ রূপ ভালবাসে যেইরূপ তোমরা জীবনকে ভালবাস।" হরমুজ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি খালিদের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হইলেন। তাঁহার সৈন্য বাহিনী "শৃঙ্খলের যুদ্ধে" (জাতুস-সালাসিল) পরা-

পশ্চিম ইরাক দখল, ৬৩৩ খ্রী

জিত হইয়া পলায়ন করে। হরমুজের মৃত্যু সংবাদ রাজধানী মাদায়িনে পেঁৗছিলে পারস্য সম্রাট আর একটি সৈন্য বাহিনী পাঠাইয়া খালিদের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু এইবারেও তাহারা পরাজিত হইল। সম্রাট এইবার অভিজ্ঞ সেনাপতি বাহমনকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ওয়ালাজা ও আল্লিসের যুদ্ধে পারসিকগণ পরপর পরাজিত হইল। ইহার পর খালিদ আমগিসিয়া নামক একটি সমৃদ্ধিশালী নগর অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন। যখন গনীমতের মাল হইতে রাষ্ট্রের প্রাপ্য এক পঞ্চমাংশ মদীনায় পেঁৗছিল তখন আবু বকর ইহা দেখিয়া খালিদের কৃতিত্বে এত উৎফুল্ল হইয়াছিলেন যে, তিনি আনন্দের আতিশয্যে বলিয়া উঠিলেন "ওহে কুরাইশ তোমাদের শার্দুল—তথা ইসলামের শার্দুল পারস্যের শার্দুলের উপর লাফাইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার শিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছে। নিশ্চয়ই মাতৃগর্ভ নিঃশেষ হইয়াছে। কোন নারীই আর দ্বিতীয় খালিদকে জন্ম দিবে না।"

ইহার পর খালিদ আল-হিরা নগরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। নগরীর অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল খ্রীষ্টান। নগরীর সত্রপ পলায়ন করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর হিরা নগরীর লোকেরা আত্মসমর্পণ করিল। আল-হিরার অধিবাসিগণ কর দিতে স্বীকার করিয়া খালিদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইল। সন্ন্যাসিগণকে এই কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল। মুসলমানগণ তাহাদের নগর রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিল। হিরা নগরী ও প্রদেশের অধিকার আরবদের বহিরাভিযানের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আরব উপদ্বীপের সীমানার বাহিরে ইহাই সর্বপ্রথম আরব অধিকার। নগরের শাসনভার নেতৃস্থানীয় লোকদের উপর অর্পিত হয়। প্রদেশের জমিদার শ্রেণীর লোকেরা খালিদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া কর দানে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। হজরত আবু বকর সাধারণ কৃষকগণকে তাহাদের জমি হইতে বেদখল করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। জমিতে তাহাদের মালিকানা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। মুসলিম রাষ্ট্র তাহাদিগকে জিম্মী বা রক্ষা প্রাপ্ত লোক হিসাবে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিল।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সহিত যুদ্ধ

হজরত মুহম্মদের জীবদ্দশায় মুতার অভিযান হইতেই বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সহিত মুসলমানদের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। হজরতের অন্তিম

ইচ্ছা কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে আবু বকর খলীফা হইয়াই জায়দের পুত্র উসামার নেতৃত্বে সিরিয়ায় অভিযান প্রেরণ করেন—এই কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। রিদ্দার যুদ্ধের পর হজরত আবু বকর তিনজন সেনাপতির নেতৃত্বে সিরিয়ায় অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত করেন (৬৩৩ খ্রীঃ)। প্রায় ৩০০০ (মতান্তরে ৫০০০) লোকের এক একটি বাহিনী আমর ইবনুল-আস, ইয়াজিদ-ইবন-আবু সুফিয়ান ও শুরাহ্‌বিল ইবন হাসানার নেতৃত্বে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করিল। আবু সুফিয়ানের অপর পুত্র মু'আবিয়া তাঁহার ভ্রাতা ইয়াজিদের পতাকাবাহী হিসাবে সিরিয়ায় গমন করেন। আমর পশ্চিমদিকের সমুদ্র তীরবর্তী পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলেন এবং অপর দুইজন সেনাপতি পূর্বাঞ্চলের পথে রওয়ানা হইলেন। কিছুদিনের মধ্যে মদীনা হইতে সেনাপতি আবু উবায়দার নেতৃত্বে আরও অতিরিক্ত সৈন্যদল আসিয়া পৌঁছিল এবং পূর্ববর্তী তিনবাহিনীর সহিত যোগদান করিয়া তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়া তুলিল। প্রতিটি বাহিনী যখন যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইত, তখন হজরত আবু বকর পদব্রজে অশ্বারোহী নেতার পার্শ্বে ধরিয়া চলিতে চলিতে নিম্ন লিখিত উপদেশ দিতেন :

"হে লোকগণ আমি তোমাদিগকে দশটি আদেশ দিতেছি, ইহা তোমরা অবশ্যই অনুগতভাবে পালন করিবে। কাহাকেও প্রতারিত করিও না এবং কাহারও নিকট হইতে চুরি করিও না, কাহারও সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিও না এবং কাহারও অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করিও না, কোন শিশু, স্ত্রীলোক বা বৃদ্ধকে হত্যা করিও না, খেজুর গাছের ছাল তুলিও না অথবা খেজুর গাছ পোড়াইও না, ফলবান বৃক্ষ কাটিও না বা শস্য বিনষ্ট করিও না। খাদ্যের প্রয়োজন ব্যতীত গবাদি পশু হত্যা করিও না।"

সিরিয়ার ওয়াদি আরাবা নামক স্থানে বাইজান্টাইনদের সহিত আরবদের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এখানে ৬৩৪ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইয়াজিদ প্যালেস্টাইনের শাসনকর্তা সারজিয়াসকে পরাজিত করিলেন। ইতিমধ্যে আল্লার অসি খালিদ ইবন ওয়ালিদ ইরাক হইতে সিরিয়ায় উপস্থিত হইলেন। সেনাপতি মুসান্নাকে ইরাকে রাখিয়া আঠার দিন ক্রমাগত মরুভূমির পথে চলিয়া তিনি বাইজান্টাইন সেনাদলের ঠিক পিছনে উপস্থিত হইলেন। মারজ রাহিত নামক স্থানে তিনি গাসসান সেনাদলকে পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি অন্যান্য মুসলমান সৈন্যদের সহিত মিলিত হইয়া প্রধান

সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন। এইবার সিরিয়ার রণাঙ্গনের সর্বপ্রথম বিখ্যাত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ আজনাদায়নের যুদ্ধ নামে খ্যাত। বাইজান্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের ভ্রাতা থিওডোরের নেতৃত্বাধীনে এক লক্ষ সৈন্য চল্লিশ হাজার মুসলমানের বিরুদ্ধে আজনাদায়নে অস্ত্রধারণ করে। যদিও বাইজান্টাইন-সৈন্য সংখ্যা ও সমরায়োজন প্রচুর ছিল, তথাপি সাহস ও মনোবলে তাহারা মুসলমানদের সমকক্ষ ছিল না। খ্রীস্টানদের মধ্যে একতার অভাব ছিল। একদল পুরোহিত ও সন্ন্যাসী যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিয়া স্বর্ণ ক্রুশ দোলাইয়া 'ধর্ম বিপন্ন' ধুয়া তুলিয়া সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিবার প্রয়াস পাইল কিন্তু ইহাতেও বিশেষ কোন ফল হইল না। একতা, মনোবল ও ধর্মবিশ্বাস মুসলমানদিগকে অজেয় করিয়া তুলিল। একজন মুসলমান একাই দশজনের মুকাবিলা করিতে পশ্চাৎপদ হইত না। থিওডোর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। হিরাক্লিয়াস ক্ষোভে ও দুঃখে এন্টিয়কে চলিয়া গেলেন। সিরিয়ার যুদ্ধ ক্ষেত্রে আজনাদায়নের বিজয় মুসলমানদের সর্বপ্রথম বিখ্যাত বিজয়।

আজনাদায়নের যুদ্ধ, ৩১শে জুলাই ৬৩৪খৃঃ

আবুবকরের মৃত্যু

৬৩৪ খ্রীস্টাব্দের হেমন্তকালে হজরত আবু বকর অসুস্থ হইয়া পড়েন। তিনি নামাজের ইমামতির ভার উমরের উপর অর্পণ করেন। লোকেরা চিকিৎসক ডাকিতে চাহিলে তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। হজরত উমরকে খলীফা মনোনীত করার সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি সাহাবাদের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। অতঃপর তিনি উসমানকে ডাকিয়া এই মর্মে এক নির্দেশ নামা লিখাইলেন। মসজিদ-ই-নববীর অঙ্গনে সমবেত জনসাধারণের অবগতির জন্য উহা পড়িয়া শুনান হইল। খলীফার স্ত্রী আসমা তাঁহাকে জানালার দিকে উঠাইয়া ধরিলেন এবং তিনি ক্ষীণ কন্ঠে বহু কষ্টে জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি যাহাকে তোমাদের উপর নিযুক্ত করিয়াছি তাহার প্রতি তোমরা সন্তুষ্ট কিনা? সে আমার কোন আত্মীয় নহে, সে খাত্তাবের পুত্র উমর। সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোক নির্বাচনে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি সুতরাং তোমরা অনুগত হিসাবে তাহার কথামত চলিবে। লোকেরা সমস্বরে উত্তর করিল, "আমরা শুনিব।" মৃত্যুর পূর্বে তিনি হজরত উমরকে শয্যাপার্শ্বে ডাকাইয়া

উপদেশ দান করিলেন এবং কোমলতা ও কঠোরতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে বলিলেন। ৬৩৪ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট তাঁহার মহান আত্মা স্বর্গীয় প্রভুর সন্নিধানে মহাপ্রয়াণ করিল। তাঁহার খিলাফত দুই বৎসর তিন মাস কাল স্থায়ী হইয়াছিল।

হজরত আবু বকরের খিলাফত স্বল্পকাল স্থায়ী হইলেও ইসলামের ইতিহাসে ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহার খিলাফতের প্রধান ঘটনা ধর্মত্যাগীদের দমন। মহানবীর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হিসাবে ইসলাম

চরিত্র ও কৃতিত্ব

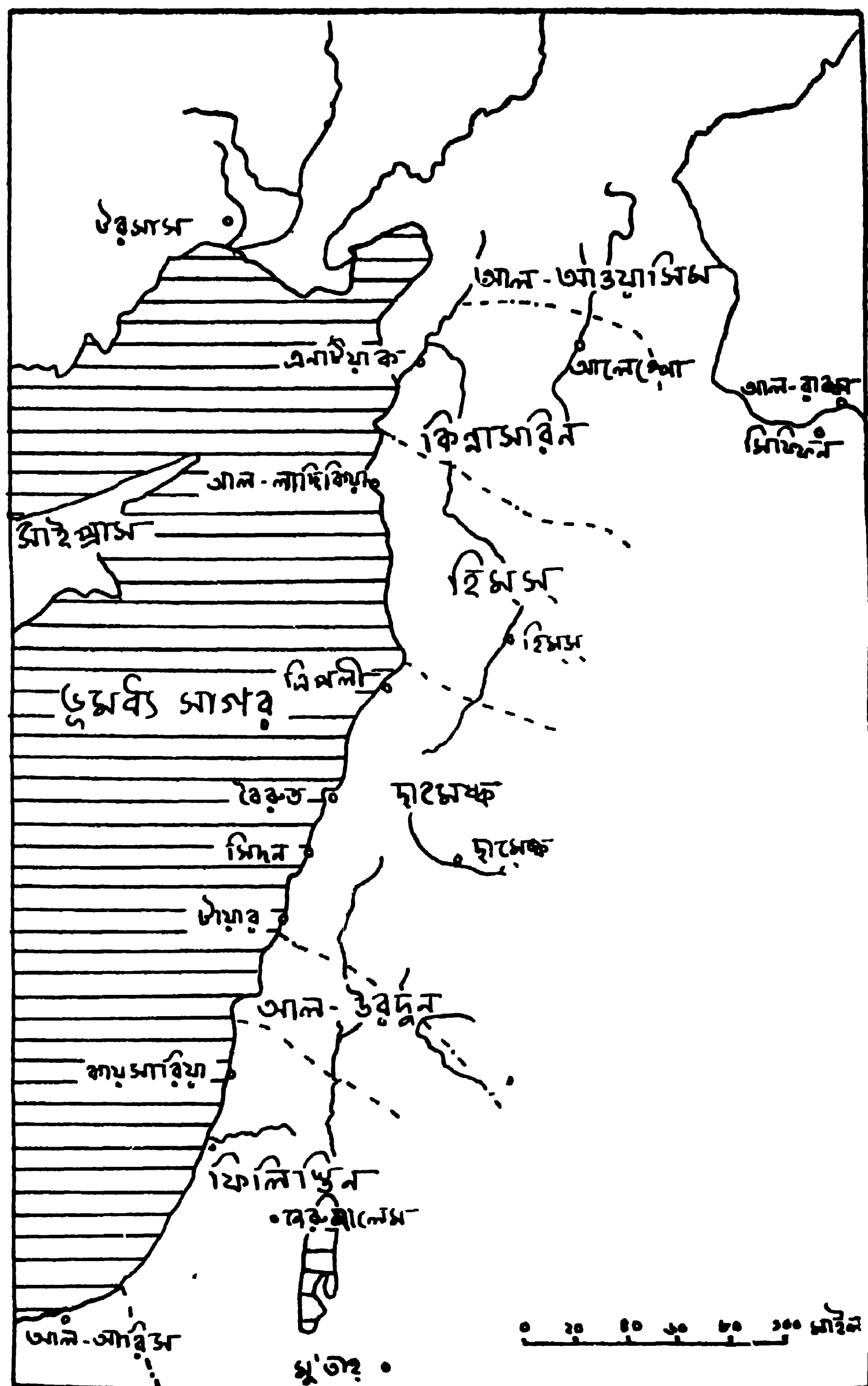
ধর্মে তাঁহার অবিচলিত আস্থা ও সত্য রক্ষার্থে আমরণ সংগ্রামের বজ্রকঠোর সংকল্প ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান সম্প্রদায়কে চরম বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। দয়া, ক্ষমা ও কোমলতা তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ছিল। কিন্তু ধর্মত্যাগীদের প্রতি তিনি দৃঢ়তা ও কঠোরতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অনাড়ম্বর ছিল। খলীফা হইবার পূর্বে তিনি কাপড়ের ব্যবসায় করিতেন। খলিফা হওয়ার পরও জীবিকা নির্বাহের জন্য তিনি নিজের ব্যবসা চালাইয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু ইহাতে রাষ্ট্রের কাজকর্মে ব্যঘাত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া সাহাবারা তাঁহাকে বাৎসরিক ৬০০০ দিরহাম ভাতা হিসাবে গ্রহণ করিয়া ব্যবসা ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি ইহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু এই অর্থকে তিনি কর্জ বলিয়া মনে করিতেন এবং মৃত্যুর পূর্বে অছিয়ত করিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার কিছু জমি বিক্রয় করিয়া সরকারী তহবিলে সেই সমুদয় অর্থ যেন প্রত্যার্পণ করা হয়। খিলাফতের প্রথম ছয় মাস তিনি মদীনার উপকন্ঠে অবস্থিত তাঁহার বাসগৃহ হইতে দৈনিক পদব্রজে ও অশ্বারোহনে মদীনার মসজিদে আসিয়া শাসন কার্য পরিচালনা করিতেন। পরে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি মসজিদের পার্শ্বে বাসস্থান স্থানান্তরিত করেন। হজরত মুহম্মদের মতই তাঁহার শাসনকার্য ও বিচার আচার অতি সাদাসিধা ভাবে সম্পন্ন হইত। খলীফার কোন দেহরক্ষী বা দাসদাসী ছিল না। তিনি রাষ্ট্রের খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় নিজে দেখাশুনা করিতেন। দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তিনি রাত্রে বাহির হইতেন। বিশ্বস্ত সাহাবাগণকে তিনি বিশেষ বিশেষ কার্যের ভার দিয়াছিলেন। তিনি শাসনকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে উপযুক্ত লোক খুঁজিয়া বাহির করিতেন। হজরত উমর ছিলেন তাঁহার বিশিষ্ট সহচর, ও প্রধান উপদেষ্টা। বিচার বিভাগের ভারও হজরত

উমরের উপর ন্যস্ত ছিল। হজরত আলী ছিলেন প্রধান কর্মসচিব। জায়দ ও উসমানও মাঝে মাঝে লিখক হিসাবে কাজ করিতেন। সাধুতা ও সততার সহিত বিনয় যুক্ত হইয়া হজরত আবু বকরকে মহিমামণ্ডিত করিয়াছিল। লোকেরা তাহাকে আল্লার খলীফা বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি বলিতেন, "আমি আল্লার রসুলের খলীফা"। হজরতের কথাও কাজের নির্ভুল অনুসরণ ও তাঁহার যাবতীয় ইচ্ছা বাস্তবায়নের সকল দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মদীনার শিশু রাষ্ট্র ও নব প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ধর্মকে আসন্ন বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইসলামের দিগ্বিজয়ের প্রথম যুগ তাঁহার খিলাফতের সময় আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহারই দূরদর্শিতা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও সুযোগ্য পরিচালনায় মুসলিম সেনাবাহিনী এক সুনিশ্চিত বিজয়ের পথে মহাযাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল।

বিস্তারিত পাঠ্য

হিট্টি, হিস্ট্রি অব্ দি এরাব্স্
মুর, কলিফেট, ইট্স্ রাইজ ডিক্লাইন এণ্ড ফল

সিরিয়ার সামরিক বিভাগ



সিবিযাব সামবিক বিভা।

৯

উমর ফারুক

(৬৩৪ খ্রীঃ—৬৪৪ খ্রীঃ)

হজরত আবু বকরের মৃত্যুর পর দিন উমর মদীনার মসজিদ-ই-নববীর মিম্বরে দাঁড়াইয়া খলিফা হিসাবে জনতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন, "আরবগণ বিদ্রোহী উষ্ট্রের সদৃশ, চালকের কর্তব্য তাহাদিগকে ঠিক পথে পরিচালিত করা। আমি কাবার প্রভুর শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমাদের যে পথে চলা উচিত আমি তোমাদিগকে সেই পথেই পরিচালিত করিব।" অতঃপর লোকেরা হজরত উমরের হাত ধরিয়া বয়আৎ (আনুগত্যের শপথ গ্রহণ) করিল। ইরাকের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি মুসান্নার আবেদনক্রমে পারস্য সীমান্তে নূতন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হইল।

সিরিয়ার যুদ্ধ

আজনাদায়দের যুদ্ধের পর হইতে সিরিয়া বিজয়ের জন্য নিয়মিত যুদ্ধ বিগ্রহ আরম্ভ হইল। সমগ্র প্যালেস্টাইন এই যুদ্ধের ফলে মুসলমানদের দখলে আসিল। মুসলমানগণ গাসসান রাজ্যের রাজধানী বুসরা অধিকার করিল। ইহার পর জর্ডন নদীর পূর্ব তীরবর্তী ফিহ্‌ল নগরীও তাহাদের দখলে আসিল। ৬৩৫ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী মারজুস্‌-সুফ্‌ফার নামক স্থানে রোমানদের পরাজয়ের ফলে সিরিয়ার রাজধানী দামিস্ক বিজয়ের পথ সুপ্রশস্ত হইল। পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন নগরী দামিস্ক 'নগরীসমূহের মহিষী' নামে সুবিখ্যাত ছিল। প্রাচীনকাল হইতে প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে এই নগরী বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। বিশ ফুট উচ্চ ও পনর ফুট পুরু প্রাচীর দ্বারা ইহা পরিবেষ্টিত ছিল। এই সময় ইহা খ্রীস্টান ধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল। সেন্ট জনের গির্জাসহ নগরী ও উহার আশেপাশে পনরটি গির্জা অবস্থিত ছিল। ৬৩৫ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই মার্চ খালিদ ইবন ওয়ালিদ দামিস্ক অবরোধ করিলেন। সিরিয়া সীমান্তের অপরাপর প্রধান সেনাপতিগণ খালিদের সহিত নগর

দামিস্ক বিজয়

অবরোধে সহায়তা করিয়াছিল। আবু উবায়দা, ইয়াজিদ, আমর ও শুরাহ্‌বিল বিভিন্নদিকের নগরদ্বারগুলি সতর্কতার সহিত পাহারা দিয়া রাখিলেন। ছয়মাস অবরোধের পর দামিস্কবাসিগণ নিম্নলিখিত শর্তে খালিদ ইবন ওয়ালিদের নিকট আত্মসমর্পণ করিল:—

"মহানুভব ও দয়ালু আল্লাহতাআলার নামে; খালিদ ইবন ওয়ালিদ নগরে প্রবেশ লাভ করিয়া দামিস্কবাসীদের সহিত এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হইবেন: তিনি তাহাদের জান, মাল ও ধর্মের নিরাপত্তা বিধান করিবেন। তাহাদের নগর-প্রাচীর ধ্বংস করা হইবে না। কোন মুসলমানকে তাহাদের গৃহে চাপাইয়া দেওয়া হইবে না। এই মর্মে আমরা তাহাদিগকে আল্লাহ্‌তাআলার রসুল, খলীফা ও মুসলমানদের রক্ষা ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিতেছি। যতক্ষণ তাহারা জিয্‌য়া প্রদান করিবে ততক্ষণ তাহাদের মঙ্গল বই অমঙ্গল হইবে না"।

ইহার পর খালিদ ইবন ওয়ালিদ আবু উবায়দার সহিত মিলিত হইয়া সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই অঞ্চলের বা'লবাক, হিম্‌স্‌, হামা ও অন্যান্য নগর একে একে বিনা বাধায় মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। সিরিয়াবাসীদের এই স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বেচ্ছা প্রণোদিত আত্মসমর্পণের মূলে রহিয়াছে মুসলমানদের উদার ও সহৃদয় ব্যবহার। সিরিয়াবাসীদের প্রতি তাহাদের ব্যবহার পরমত সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। রোমান শাসনাধীনে তাহারা নানা প্রকার করভারে জর্জরিত ছিল। এতদঞ্চলের খৃষ্টানগণ তাহাদের ধর্মমতের জন্য বাইজান্টাইন গির্জাধিপতিগণ কর্তৃক নানাভাবে নিপীড়িত হইত। মুসলমানগণ তাহাদিগকে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করে। রোমানগণের তুলনায় মুসলমানদের আর্থিক দাবী দাওয়া অত্যন্ত সীমিত ছিল। এইজন্য সিরিয়াবাসিগণ মুসলমান শাসনকে অভিনন্দিত করিয়াছিল। নূতন শাসকদের প্রতি তাহাদের মনোভাবের পরিচয় নীচের ঘটনা হইতে সম্যক উপলব্ধি করা যায়। শায়জার নামক নগরের অধিবাসিগণ বিজেতা মুসলমানদিগকে সম্বর্ধনা করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের নগর হইতে বাহির হইয়া গায়ক ও বাদক সমভিব্যহারে বিজেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করে এবং তাহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। একজন নেষ্টরীয় খ্রীস্টান পুরোহিত ১৫ হিজরীতে (৬৩৬—৭ খ্রীঃ) মুসলমানদের সম্বন্ধে নিম্নরূপ উক্তি করিয়াছেন: যে আরবগণকে আল্লাহ আমাদের যুগে রাজত্ব দান করিয়াছেন তাঁহারা আমাদের

প্রভু হইয়াছেন; তাঁহারা আমাদের ধর্মকে রক্ষা করেন, তাঁহারা আমাদের পুরোহিত ও সাধু সন্ন্যাসিগণকে সম্মান করেন এবং আমাদের গির্জা ও ধর্মাশ্রমের জন্য অর্থ সাহায্য দান করেন।"

সম্রাট হিরাক্লিয়াস মুসলমানদিগকে সিরিয়া হইতে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করিলেন। এতদুদ্দেশ্যে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী সমাবিষ্ট হইল। এই সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা কাহারও মতে এক লক্ষ আবার কাহারও মতে ৫০,০০০ ছিল। হিরাক্লিয়াসের ভ্রাতা থিওডোর এই বিশাল বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। বিশাল বাইজান্টাইন সেনাবাহিনীর সম্মুখে খালিদ হিম্‌স্‌, দামিস্ক ও অন্যান্য অধিকৃত শহরসমূহ একে একে পরিত্যাগ করিয়া ২৫০০০ লোকের এক বাহিনীসহ জর্ডন নদীর পূর্বদিকের শাখা ইয়ারমুকের অববাহিকায় শিবির সংস্থাপন করিলেন। হিমস্‌ শহর হইতে সৈন্যাপসরণের সময় মুসলমানগণ অধিবাসীদের নিকট হইতে আদায়কৃত সমুদয় রাজস্ব প্রত্যর্পণ করে কারণ তাহারা আপাততঃ হিম্‌স্‌বাসিগণকে বাইজান্টাইন আক্রমণ হইতে রক্ষার প্রতিশ্রুতি পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করে। মুসলমানদের সততা হিম্‌স্‌বাসিগণকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাহারা গ্রীকবাহিনীর সম্মুখে নগর দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া মুসলমানদিগের সহিত গ্রীকদের শক্তি পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। ৬৩৬ সালের ২৩শে জুলাই গ্রীক ও মুসলিম বাহিনী পরস্পর মোকাবেলা করিল। এই যুদ্ধ ইতিহাসে ইয়ারমুকের যুদ্ধ নামে খ্যাত। প্রথম দিনেই যুযুধান বাহিনীর মধ্যে অস্ত্র বিনিময় হইল; ইহাতে মুসলমানেরা কৃতকার্যতা লাভ করিল। ইহার পর এক মাস ধরিয়া উভয় পক্ষ নিষ্ক্রিয়ভাবে পরস্পরের মুখামুখি দাঁড়াইয়া রহিল। এই সময় গ্রীকবাহিনীতে অসন্তোষ ও দলাদলির উদ্ভব হয়। অবশেষে ৬৩৬ সালের ২০শে আগষ্ট এক প্রবল ধূলি ঝড়ের দিনে আরবগণ প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। তাহাদের সংঘবদ্ধ আক্রমণের সম্মুখে গ্রীকবাহিনী বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। গ্রীকদের অশ্বারোহী সৈন্যগণ পার্শ্ববর্তী ময়দানে পলায়নপর হইল। পদাতিক বাহিনীকে তাহারা দলে দলে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থাপিত করিয়াছিল। এক্ষণে ইহারা আরবদের বর্শাফলকে বিদ্ধ হইতে লাগিল অথবা নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। আরবদের সংঘবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্র বাহিনী গ্রীকদের বিশাল অথচ বিশৃঙ্খল সৈন্যদলকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত ও নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিল। সৈন্যাধ্যক্ষ

ইয়ারমুকের যুদ্ধ ২০ আগষ্ট ৬৩৬

থিওডোর যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলেন। হিরাক্লিয়াস তখন এন্টিয়কে অবস্থান করিতেছিলেন। এই বিপর্যয়ের সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিলে তিনি শেষবারের মত সিরিয়ার প্রতি নিম্নরূপ বিদায় বাণী উচ্চারণ করিয়া এন্টিয়ক ত্যাগ করিয়া কনষ্টান্টিনোপলে প্রত্যাবর্তন করেন:—"সিরিয়া, তোমাকে বিদায়; শত্রুর জন্য কত উত্তম না এই দেশ!" এই যুদ্ধে মুসলমানগণকেও বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। হজরতের অনেক সাহাবা এই যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। কিন্তু এই যুদ্ধ চূড়ান্তভাবে সিরিয়ার ভাগ্য মীমাংসা করিয়া দেয় এবং সিরিয়া প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের দখলে আসে।

ইয়ারমুকের পূর্বে মুসলমানগণ যে সকল অঞ্চল হইতে পশ্চাদপসরণ করিয়াছিল এক্ষণে তাহার পুনরাধিকার আরম্ভ হইল। দামিস্কসহ অপরাপর সকল শহর অনায়াসে ও অতি অল্প সময়ে অধিকৃত হয়। এই সময় দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমরের আদেশে সেনাপতি খালিদের পরিবর্তে আবু উবায়দা প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। খলীফা আবু বকরের জীবদ্দশায়ই উমর খালিদের কোন কোন কার্যকলাপে তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তাঁহার মতে খালিদ শত্রুদের প্রতি অযথা কঠোর আচরণ করিয়াছিলেন এবং অনেক কবিকে রাষ্ট্রীয় তহবিল হইতে বহু অর্থ এনাম দিয়াছিলেন। খালিদ কিন্তু ঐ অর্থ তাঁহার নিজস্ব তহবিল হইতে দিয়াছিলেন বলিয়া দাবী করেন।

খালিদ পদচ্যুত

খালিদের এই ব্যাখ্যা হজরত উমরের মনঃপূত হইয়াছিল কিনা বলা যায় না, তবে তিনি খালিদকে প্রধান সেনাপতির পদ হইতে অপসারণের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং সরকারী ঘোষণায় খালিদের কোন অসাদাচরণের উল্লেখ না করিয়া তাঁহার পদচ্যুতির জন্য এই মর্মে কারণ দর্শাইয়াছিলেন যে খালিদের বিজয়াভিযানে জনসাধারণ তাঁহার বীরত্বের উপর এত বেশী আস্থা স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, তাহারা সকল বিজয়ের উৎস সর্বশক্তিমানের উপর নির্ভরশীলতা পরিহার করিয়া বসিয়াছিল।

সৈন্যাধ্যক্ষের পদ হইতে অপসারিত হইয়া খালিদ কিছুকাল আবু উবায়দার সহিত সিরিয়ায় অবস্থান করিলেন। তিনি হজরত উমরের আদেশ শিরোধার্য করিয়া আবু উবায়দার সহিত সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের নগরসমূহ পুনরুদ্ধারে তাঁহাকে সাহায্য করেন। এন্টিয়ক, আলেপ্পো ও অন্যান্য নগর একে একে মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করিল।

জেরুজালেম নানা কারণে মুসলমানদের জন্য অতি পবিত্র। ইহুদী ও খৃষ্টধর্মের প্রাণকেন্দ্র এবং মুসলমানদের প্রথম কিবলা হিসাবে মুসলমানদের নিকট ইহার গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিম সেনাপতি আমর ইবনুল-আস জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হইলেন। নগরের ধর্মাধ্যক্ষ মুসলমান বাহিনীর আগমনে আত্মসমর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি এই শর্তে আত্মসমর্পণ করিতে রাজী হইলেন যে, স্বয়ং খলীফা হজরত উমর জেরুজালেমে আসিয়া নগর রক্ষার দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন। জেরুজালেমের ধর্মাধ্যক্ষের এই ডাকে হজরত উমর সাড়া দিলেন। বহু নবী-পয়গম্বরের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত এবং ইহুদী খ্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মের পুণ্যভূমি জেরুজালেম দর্শনের জন্য তিনি মদীনা হইতে উষ্ট্রের পৃষ্ঠে একটি ভৃত্য সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। ভৃত্যের সহিত পালাক্রমে একবার উটের পিঠে চড়িয়া আর একবার উটের দড়ি ধরিয়া নিতান্ত নিরাড়ম্বরভাবে একটি জীর্ণ পিরহান পরিধান করিয়া তিনি জেরুজালেম পৌঁছিলেন। তাহার সরলতা, ধর্মপরায়ণতা ও নিরাড়ম্বর জীবনযাত্রা জেরুজালেমের ধর্মাধ্যক্ষকে ও খ্রীস্টানদিগকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিয়াছিল। হজরত উমর ধর্মাধ্যক্ষের সহিত নগরীর বিভিন্ন তীর্থস্থান পরিদর্শন করিলেন। নামাজের সময় উপস্থিত হইলে ধর্মাধ্যক্ষ হজরত উমরকে সেখানকার গির্জায় (Church of the Resurrection) নামাজ পড়িতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু হজরত উমর নিতান্ত বিনীতভাবে অস্বীকার করিয়া বলিলেন যে তিনি যদি সেখানে নামাজ পড়েন তবে তাঁহার অনুসারী মুসলমানগণ পরবর্তীকালে এই অজুহাতে গির্জাটি দখল করিয়া লইবার দাবী জানাইবে। হজরত উমর যীশুখ্রীস্টের জন্মস্থান বেথলেহেম ও হজরত সুলায়মান কর্তৃক নির্মিত বিখ্যাত ইহুদী উপাসনালয় পরিদর্শন করেন।

জেরুজালেম বিজয়
জানুয়ারী ৬৩৭

জেরুজালেমের অধিবাসীদের সহিত নিম্নলিখিত শর্তে এক সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়:

তাহাদের জানমাল, গির্জা ও ক্রুশ নিরাপদ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। তাহাদের গির্জা ধ্বংস করা হইবে না বা আবাসগৃহে পরিণত করা হইবে না। ধর্মের ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হইবে না। ইহুদী, খ্রীস্টান ও অন্যান্য যাহারা জেরুজালেমে বসবাস করিবে তাহারা অন্যান্য শহরের অধিবাসীদের মত জিয্য়া প্রদান করিবে। গ্রীক

অধিবাসিগণকে নগর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অথবা স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। সিরিয়ার অধিকৃত অঞ্চলের শাসন শৃঙ্খলা ও রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি সমাধা করিয়া হজরত উমর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

হজরত উমরের খিলাফতের পঞ্চম বৎসর সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের সিজারিয়া নামক শহর অধিকৃত হয় (৬৩৮ খ্রীঃ)।

শীঘ্রই সিরিয়ায় এক ভয়াবহ মহামারী আরম্ভ হইল। সেনাপতি আবু উবায়দা ও তাঁহার সৈন্যবাহিনীর এক বিরাট অংশ এই মহামারীর কবলে প্রাণ হারাইল। তাঁহার মৃত্যুর পরে ইয়াজিদ ও ইয়াজিদের মৃত্যুর পরে মু'আবিয়া সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন।

তিন বৎসর সময়ের মধ্যেই (৬৩৪—৬৩৬ খ্রীঃ) প্রায় সমগ্র সিরিয়া মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সামরিক ও নৌ-শক্তির দুর্বলতা মুসলমানদের বিজয়ে সাহায্য করিয়াছিল। অন্য-পক্ষে মুসলমানদের শৌর্যবীর্য ও সামরিক কলা-কৌশল উন্নততর ছিল। ইহা ছাড়া স্থানীয় অধিবাসীরা আরবদের মতই সেমিটিক জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই তাহারা বাইজান্টাইন শাসকগণকে ঘৃণার চোখে দেখিত। আরবগণকে তাহারা জ্ঞাতি ও স্বজাতি মনে করিয়া বিনা দ্বিধায় তাঁহাদের শাসন মানিয়া লইয়াছিল। আবার সিরিয়াবাসীদের মধ্যে অনেকেই ছি। মনোফিসাইট খৃষ্টান সম্প্রদায় ভুক্ত। গ্রীক ধর্মনেতারা ইহাদিগকে নানা প্রকারে নির্যাতন করিত। সিরিয়াবাসিগণ বাইজান্টাইন শাসনামলে নানা-প্রকার গুরু করভারে নিপীড়িত হইত। এই সকল কারণে মুসলমানদের সিরিয়া বিজয় এত সহজ সাধ্য হইয়াছিল। নূতন শাসকগণ ধর্মের ব্যাপারে তাহাদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়াছিল।

ইরাক ও পারস্য বিজয়

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আল-হিরা বিজয়ের পর খালিদ সিরিয়া বিজয়ে অন্যান্য আরব সেনাপতিগণকে সাহায্য করিবার জন্য চলিয়া যান। তিনি বেদুঈন দলপতি মুসান্নাকে ইরাকের সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া যান। খালিদের প্রস্থানের পর হইতে মুসান্না পারসিকদের সহিত যুদ্ধে কখনও পরাজিত আবার কখনও বা বিজয়ী হন। সেতুর যুদ্ধে (নভেম্বর ৬৩৪) তাঁহার পরাজয় ঘটে। কিন্তু শীঘ্রই বুওয়াইবের যুদ্ধে

তিনি পারসিক সেনাপতি মিহ্‌রানকে পরাজিত করিয়া ইরাকে মুসলমানদের বিজয়ের পথ সুপ্রশস্ত করেন। তিনি নিম্ন মেসোপটেমিয়া অঞ্চল অধিকার করিয়া উত্তরে বাগদাদ (তৎকালে দজলা নদীর তীরে অবস্থিত একটি গ্রাম) ও তাকরীত পর্যন্ত মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। পারস্য বিজয়ে মুসান্নার দান অপরিসীম। তিনি খলীফা হজরত উমরের নিকট নূতন সৈন্যবাহিনী চাহিয়া পাঠাইলেন। খলীফা সা'দ ইবন আবি ওয়া-ক্কাসকে সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া বিরাট সেনাবাহিনীসহ ইরাকের রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। সিরিয়া হইতে আগত সৈন্যদলসহ সা'দ ৩০,০০০ সৈন্য লইয়া ইরাকে পৌছিলেন। ইতিপূর্বে সেনাপতি মুসান্নার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে আরব সৈন্যদলকে তিনি উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন যে তাহারা যেন মরুভূমির কাছাকাছি থাকিয়া যুদ্ধ করে; কারণ বিপদাপদ ঘটিলে মরুভূমি তাহাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হইবে। অপর পক্ষে পারসিক-গণ মরুভূমিতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

সৈন্যাধ্যক্ষ সা'দ নূতন করিয়া সৈন্যদলকে সুবিন্যস্ত করিলেন। হজরতের সময়ের অভিজ্ঞ বীর যোদ্ধাদিগকে সেনাপতির পদ প্রদান করা হইল। সর্বমোট ১৪০০ সাহাবা এই যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন; ইহাদের মধ্যে ৯৯ জন বদরের যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। মুসান্নার উপদেশ মত সা'দ মরুভূমির প্রান্ত সীমায় থাকিয়া কাদিসিয়ার প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। খলীফা উমরের নির্দেশ ক্রমে সা'দ পারস্য সম্রাটকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানাইয়া অন্যথায় কর দানে স্বীকৃত হওয়ার জন্য বিশজন যোদ্ধার এক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিলেন। সম্রাট প্রতিনিধিদলকে অপমান করিবার জন্য মাটির একটি ভারী বোঝা তাহাদের একজনকে মাথায় করিয়া নগর দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইতে বলিলেন। প্রতিনিধিদল মাটির বোঝা মাথায় করিয়া কাদি-সিয়ায় সেনাপতি সা'দের সম্মুখে ফেলিলেন এবং আনন্দের আতিশয্যে বলিয়া উঠিলেন: "সা'দ, আনন্দ করুন, আল্লাহ আপনাকে পারস্যের মাটি দান করিয়াছেন।"

কাদিসিয়ার যুদ্ধ, জুন ৬৭৬

এই সময় পারস্যে এক অন্তর্বিপ্লব ঘটে; ইহার ফলে ইয়াজদর্জির্দ নামক একুশ বৎসর বয়স্ক এক যুবক সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেনাপতি রুস্তম বহু হস্তীসমেত একলক্ষ বিশ হাজার সৈন্য লইয়া যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইলেন। তিনি ব্যাবিলনের নিকট ফোরাত নদী পার হইলেন এবং মুসলমান

বাহিনীর মুখামুখি শিবির সংস্থাপন করিলেন। প্রথমদিন মুসলমানদের তকবীর ধ্বনির মধ্য দিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষের প্রধান প্রধান বীর পুরুষ দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। মুসলমানগণ বদরের যুদ্ধের বীরত্ব পূর্ণ ঘটনাবলীর পুনরভিনয় করিলেন এবং প্রতিপক্ষের প্রধান যোদ্ধাগণকে পরাজিত করিয়া কয়েকজনকে বন্দী করিলেন। হরমুজ নামক একজন পারসিক সেনাপতি বন্দী হইলেন। পরবর্তী পর্যায়ে শত্রুপক্ষের হস্তী-বাহিনী বেদুঈনদের ব্যূহ ভেদ করিয়া ত্রাসের সৃষ্টি করিল। বেগতিক দেখিয়া সৈন্যাধ্যক্ষ সা'দ একদল তীরন্দাজকে হস্তীর আরোহিগণকে লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন। ইহাদের অব্যর্থ তীর নিক্ষেপে আরোহিগণ হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইল এবং চালক-বিহীন হস্তীসমূহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে সেনাপতি কাকার অধীনে একদল সৈন্য সিরিয়া হইতে আসিয়া পৌঁছিল। আরবগণ বিপুল বিক্রমে পারসিকগণকে আক্রমণ করিল। ঐদিন পারসিক-দের হস্তিবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতে পারে নাই। তাহাদের সেনাপতি রুস্তম প্রাণ মরিয়া বাঁচিলেন। দুই সহস্র মুসলমান ও দশ সহস্র পারসিক হতাহত হইল। এইদিনেও যুদ্ধ অমীমাংসিত রহিল। তৃতীয় দিনে পারসিকদের হস্তীগুলি পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আরবদের সৈন্য-বাহিনীকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। সেনাপতি কাকা ইহাদের চক্ষু ও দন্ত লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিলেন। এবং ইহারা পুনরায় আরোহি-গণকে ফেলিয়া দিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিল। চতুর্থদিনে মুসল-মানগণ মরিয়া হইয়া শেষবারের মত শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সহসা ঘূর্ণিঝড় উঠিল এবং পারসিকদের তাঁবু উপড়াইয়া নদীতে নিক্ষেপ করিল। সেনাপতি রুস্তম পলায়নপর হইলেন কিন্তু ধৃত হইয়া মুসলমানদের হাতে নিহত হইলেন। নেতার মৃত্যুতে সৈন্যবাহিনী আতঙ্কিত ও বিশৃঙ্খল হইয়া পশ্চাদপসরণ আরম্ভ করিল। মুসলমানগণ তাহাদিগকে দ্রুত অনুসরণ করিল। তাহাদের অনেকে নিহত হইল আবার অনেকে পার্শ্ববর্তী নদী-গর্ভে নিমজ্জিত হইল। ইয়ারমুকের যুদ্ধে যেমন সিরিয়ার ভাগ্য নির্ধারিত হইল, তেমনি কাদিসিয়ার যুদ্ধে পারস্যের ভাগ্য চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত হইল। আরবগণ আগাগোড়া অমিততেজ ও অসীম ধৈর্য সহকারে যুদ্ধ চালাইয়া জয়ী হইল। মুসলমানগণ বহু গণীমতের মাল অর্জন করিল। এই পরাজয়ের পর পারস্যবাহিনী পুনরায় একত্রিত ও সংঘবদ্ধ হইতে

পারিল না। পারস্যের দিক দিগন্তে মুসলমানদের বিজয় বৈজয়ন্তী বজ্র-নির্ঘোষে ঘোষিত হইত। একদা প্রত্যুষে হজরত উমর ছদ্মবেশে মদীনার উপকন্ঠে টহল দিয়া ফিরিতেছিলেন। এমন সময় এক উষ্ট্রারোহী কাদিসিয়ার বিজয় সংবাদ লইয়া আসিল। খলীফা পদব্রজে তাহার উটের পিছনে পিছনে মদীনায় আসিয়া পেঁৗছিলেন। ততক্ষণে খলীফার চতুর্দিকে বহুলোকের ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। দূত অবাক বিস্ময়ে খলীফার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহার পূর্ববর্তী আচরণের জন্য লজ্জিত বোধ করিল। রোমের কাইসার ও পারস্যের খসরুর চেয়ে প্রবল প্রতাপান্বিত খলীফা এইভাবে একজন সাধারণ লোকের মত সর্বাগ্রে মুসলমানদের এক মহা-বিজয়ের সুসংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন।

কাদিসিয়ার বিজয়ের ফলে দজলার পশ্চিমে অবস্থিত ইরাকের নিম্নাঞ্চল আরবদের দখলে আসিল। ইরাকের অধিবাসিগণ জাতিতে আরব ও সেমিটিক ছিল তাই তাহারাও সিরিয়াবাসীদের মতই আরব বিজেতাগণকে নিজেদের মধ্যে বরণ করিয়া লইয়াছিল। ইরাকের খ্রীস্টান অধিবাসিগণ পারসিক শাসনাধীনে নানাভাবে নির্যাতিত হইত। আরবগণ সকলকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করিয়াছিল। এই সকল কারণে সিরিয়ার মতই আরবদের ইরাক বিজয়ও সহজ হইয়াছিল।

পারস্যের রাজধানী মাদায়িন দজলার উভয় তীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল। পশ্চিম তীরের নগরীর নাম ছিল সেলুসিয়া (Seleucia) পূর্ব তীরের নগরীর নাম ছিল টেসিফোন (Ctesiphon)। এই যুগল নগরী আরবদের নিকট মাদায়িন নামে পরিচিত হইত। পূর্বতীরের নগরীতেই পারস্য সম্রাটের প্রাসাদ (ইওয়ান-ই-কিস্রা) অবস্থিত ছিল। মুসলিম সৈন্যাধ্যক্ষ সা'দ প্রথমে পশ্চিম তীরের নগরী আক্রমণ করিলেন। নদীর অপর তীর হইতে শ্বেত মর্মরে নির্মিত কিসরার প্রাসাদ সা'দের চক্ষু ঝলসাইয়া ফেলিল। পারস্য সম্রাট সা'দের নিকট একজন দূত প্রেরণ করিয়া এই মর্মে প্রস্তাব করিলেন যে তিনি মুসলমানদিগকে দজলার পশ্চিমাঞ্চলের যাবতীয় অধিকার ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন যদি তাহারা সম্রাটকে পূর্বাঞ্চলে নির্বিঘ্নে বসবাস করিতে দেয়। সা'দ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। পারসিকগণ পশ্চিমতীরের নগরী হইতে সদলবলে প্রস্থান করিল। মুসলমানগণ কয়েক সপ্তাহ এখানে বিশ্রাম করিল। ইতিমধ্যে সম্রাট ইয়াজদজির্দ তাঁহার পরিবারবর্গ ও রাজকীয়

মাদায়িন অধিকার ৬৩৭ খৃঃ

ধনভাণ্ডার উত্তরাঞ্চলের হুলওয়ান নগরে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং প্রস্থানোদ্যত হইলেন। আরবগণ দজলা অতিক্রম করার জন্য নৌযানের অনুসন্ধান করিয়া ব্যর্থ হইল কারণ পশ্চিম তীর হইতে সকল নৌকা সরাইয়া লওয়া হইয়াছিল। অবশেষে সা'দ স্বল্প পরিসর একটি পারাপারের স্থান খুঁজিয়া বাহির করিলেন। খরস্রোতা নদীর মধ্যদিয়া দুঃসাহসিক অশ্বারোহিগণ সাঁতার কাটিয়া অপর তীরে উপস্থিত হইল। একে একে সম্পূর্ণ সৈন্য-বাহিনী নদী পার হইল। পারস্যবাসিগণ আরবদের অতর্কিত আক্রমণে সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিল। সা'দ কিসরার প্রাসাদ দখল করিলেন। বহু ধন সম্পদ ও মূল্যবান তৈজসপত্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, মূল্যবান পরিচ্ছদাদি হীরা, মুক্তা, মাণিক্য ও নানাপ্রকার শিল্পসামগ্রী মুসলমানদের হাতে পড়িল। খলীফা উমরের নিকট গনীমতের এক পঞ্চমাংশ মদীনায় প্রেরিত হইল। বহুমূল্যবান দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল একটি প্রকাণ্ড গালিচা। সা'দ কিসরার প্রাসাদের বিরাট হল ঘরটিকে মসজিদে পরিণত করিলেন।

জালুলীয যুদ্ধ ৬৩৭

ইয়াজদজির্দ হুলওয়ান হইতে জালুলায় একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। সম্রাট হুলওয়ান হইতে রাই শহরে চলিয়া গেলেন। মুসলমানগণ হুলওয়ান ও অধিকার করিল। হজরত উমর মুসলমান-দিগকে মেসোপটেমিয়ার সমতল ভূমি ছাড়িয়া পূর্বদিকে রাজ্য বিস্তার করিতে নিষেধ করিলেন।

হজরত উমর আরবদিগকে বিজিত দেশের শহরে বসবাস করিতে নিষেধ করেন। সৈন্যেরা শহরের আরাম আয়েশ ও বিলাস ব্যসনে অভ্যস্ত হইয়া তাহাদের সামরিক শৌর্যবীর্য হারাইয়া ফেলিবে এই ছিল তাঁহার ভয়। ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে কুফা ও বসরায় সেনানিবাস স্থাপিত হয়। কালক্রমে এই দুইটি সেনানিবাস প্রসিদ্ধ শহর ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি অর্জন করে। কুফায় সেনাপতি সা'দ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি নিজের বসতির জন্য একটি সুরম্য অট্টালিকা ও নির্মাণ করেন। এই প্রাসাদের সম্মুখে তিনি একটি ফটকদ্বার তৈরী করেন। ইহা শুনিয়া খলীফা উমর বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন। খলীফা এক দূত মারফৎ তাঁহাকে আদেশ দিয়া পাঠাইলেন যে সেনাপতির ফটকদ্বার সেনাপতির ও জনসাধারণের মধ্যে এক বিরাট অন্তরায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। এই ফটক যেন অবিলম্বে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। সা'দ খলীফার

কুফা ও বসরার পত্তন ৬৩৮ খ্রীঃ

আদেশ শিরোধার্য করিয়া ফটকটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন কিন্তু তিনি খলীফাকে জানাইলেন যে ফটক তৈরীর পিছনে তাঁহার এরূপ কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

পারস্যের মূল ভূখণ্ডে যুদ্ধ

হজরত উমর আরবদিগকে ইরাক ছাড়িয়া পারস্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে বার বার নিষেধ করিতে থাকেন কিন্তু পারস্য বাসীদের শত্রুতামূলক আচরণের ফলে ও মুসলমান সেনাপতি-গণের অনুরোধক্রমে ধীরে ধীরে তাঁহাকে উক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হয়। খুজিস্তানের পারসিক প্রতিনিধি হরমুজান কাদিসিয়ার যুদ্ধ হইতে অব্যাহতি পাইয়া আরব অধিকৃত স্থানসমূহের উপর আক্রমণ চালাইতে থাকেন। মুসলমান সেনাপতি উৎবা হরমুজানকে পরাজিত করিয়া ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে খুজিস্তান অধিকার করেন। ইহার দুই বৎসর পরে হরমুজান পুনরায় মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইলেন। মুসলমানগণ হরমুজানকে অনুসরণ করিয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার জন্য খলীফার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলে হজরত উমর তাহাদিগকে খুজিস্তানের সেচ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও পতিত ও অনাবাদী জমি আবাদের ব্যবস্থা করিতে আদেশ দেন। ইতিমধ্যে সম্রাটের আদেশ ক্রমে হরমুজান পুনরায় মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। নু'মান নামক মুসলমান সেনাপতির নেতৃত্বে কুফা ও বসরার সম্মিলিত বাহিনী হরমুজানকে রামহরমুজ নামক স্থানে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন (৬৪০ খৃঃ)। ইহার পর মুসলমানগণ সুস ও জুন্দিসাবুর অধিকার করিল। এই সময় মুসলমান সৈনিকদের একদল প্রতিনিধি হজরত উমরের নিকট আবেদন করিল যে পারস্য সম্রাটের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া যাইবার জন্য তাহাদিগকে অনুমতি দেওয়া হউক। হজরত উমর প্রতিনিধি দলের নিকট জানিতে চাহিলেন পারসিকরা কেন বার বার বিদ্রোহী হয়; তাহাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের কঠোর ব্যবহার এই বিদ্রোহের কারণ কিনা। প্রতিনিধিদল উত্তর করিল যে তাহারা কখনও পারসিকদের সহিত কঠোর ব্যবহার করে নাই বরং তাহাদের সম্রাট বার বার তাহাদিগকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিয়াছে এবং তাহাদের সহিত চুক্তি ভঙ্গ করিতে উৎসাহিত করিয়াছে। পরিশেষে হজরত উমরকে বাধ্য হইয়া পারস্যাভিযানের উপর হইতে যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইল।

পারস্য সম্রাট ইয়াজদর্জিদ মুসলমানদের সহিত শেষবারের মত শক্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণকে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী

সমাবেশ করিতে আহ্বান জানাইলেন। "কাস্পিয়ানের তীর হইতে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত, অক্ষু নদীর তীর হইতে পারস্যোপসাগর পর্যন্ত বিশাল এলাকার লোকগণ এই আহ্বানে সাড়া দিয়া কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী দামাবান্দ নামক স্থানে সম্রাটের পতাকাতলে সমবেত হইল। ২১ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের এক সেনাবাহিনী ফিরুজান নামক সেনাপতির অধীনে একত্রিত হইল। অচিরেই এই বিপুল বাহিনী পার্বত্য এলাকা হইতে কুফা ও বসরার উপর আপতিত হইয়া মুসলমানদিগকে বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত করিবার উপক্রম হইবে। ইহা শুনিয়া হজরত উমর স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন কিন্তু সাহাবাদের অনুরোধ ক্রমে মদীনায় থাকাই শ্রেয় মনে করিলেন। খুজিস্তান হইতে সেনাপতি নুমানকে ডাকাইয়া তিনি সৈন্যাধ্যক্ষের পদ দান করিলেন। বসরা, কুফা ও সুস হইতে সৈন্যবাহিনী আসিয়া হুলওয়ানে সমবেত হইল। মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩০,০০০ শত্রুর এক পঞ্চমাংশ মাত্র। নিহাওন্দ নামক স্থানে উভয়পক্ষে যুদ্ধ হইল। সেনাপতি নুমান শহীদ হইলেন। কিন্তু মুসলমানগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। পারসিকদের সেনাপতি ফিরুজান হামাদান অভিমুখে পলায়নপর হইলে পথিমধ্যে ধৃত হইয়া নিহত হইলেন। মুসলমানগণ হামাদানও অধিকার করিলেন। হামাদানের অগ্নি-মন্দিরে রক্ষিত রাজকীয় ধনসম্পদ ও মূল্যবান রত্নসম্ভার মুসলমানদের হাতে পড়িল। তন্মধ্যে দুইটি পাত্রে রক্ষিত রত্ন ৪০ লক্ষ দিরহাম মূল্যে বিক্রীত হইল। ৬৪৩ খ্রীস্টাব্দে মুসলমানগণ রাই শহর অধিকার করেন। ইয়াজদজির্দ শহর হইতে শহরে, স্থান হইতে স্থানান্তরে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। কুফা ও বসরা হইতে ছয়টি সৈন্যদল একে একে ফারস, কিরমান, মাকরান, সিজিস্তান, খুরাসান ও আজরবাইজান দখল করিল।

নিহাওন্দের যুদ্ধ, ৬৪২ খ্রীঃ

মিসর বিজয়

হজরত উমর যখন জেরুজালেমে আসেন তখন সেনাপতি আমর ইবনুল-আস খলীফার নিকট মিসর জয়ের অনুমতি প্রার্থনা করেন। আমর প্রাগ-ইসলামী যুগে বহু বার ব্যবসা বাণিজ্য ব্যপদেশে মিসরে যাতায়াত করিয়াছিলেন। ঐদেশের রাস্তাঘাট তাঁহার জানা ছিল। হজরত উমর বরাবর রাজ্যসীমা বিস্তারের বিরোধী ছিলেন। আমরের অনুরোধক্রমে খলীফা

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে মিসর জয়ের অনুমতি দিলেন। দুঃসাহসী আমর মাত্র 4000 লোক লইয়া মিসর অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। মদীনায় ফিরিয়া হজরত উমর সাহাবাদের সহিত পরামর্শ করিয়া আমরকে ডাকিয়া পাঠাইতে চাহিলেন কিন্তু আমর ইতিমধ্যে মিসর সীমান্তে পদার্পণ করায় তিনি সেনাপতি জুবায়রকে এক বিরাট সৈন্যদল সহ তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন।

আমর প্রথমে ফারামা, বিলবায়স ও আইন শামস্ অধিকার করিয়া ব্যবিলন নামক দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এই সময় কুরুস (Cyrus) নামক বাইজান্টাইন রাজপ্রতিনিধি ও ধর্মাধ্যক্ষ আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার সেনাপতি থিওডোরাসসহ মুসলমানদের মুকাবিলা করিবার জন্য ব্যবিলনে চলিয়া আসিলেন। আমর মদীনা হইতে প্রেরিত সৈন্যদলের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। অবশেষে সেনাপতি জুবায়রের নেতৃত্বে নূতন সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ১০ হাজারে উন্নীত হইল। বাইজান্টাইনদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ২০ হাজার; ইহা ছাড়া দুর্গের অভ্যন্তরে তাহাদের আরও 5000 সৈন্য ছিল। এতৎসত্ত্বেও বাইজান্টাইন সৈন্যবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল, থিওডোরাস আলেকজান্দ্রিয়ায় পলায়ন করিলেন এবং কুরুস ব্যবিলনের দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আরবগণ দুর্গ অবরোধ করিয়া রাখিল। কুরুস অর্থ দ্বারা অবরোধকারিগণকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইলেন। আরবগণ করদান, ইসলাম গ্রহণ অথবা যুদ্ধ এই তিনটি পন্থার যে কোন একটি গ্রহণ করিতে কুরুসকে আহ্বান জানাইল। কুরুসের দূত মুসলমানদের শিবির হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতি দান করিল:

"আমরা এমন একদল লোকের সাক্ষাৎ পাইয়াছি যাহাদের প্রত্যেকের নিকট জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়, এবং খ্যাতি-প্রতিপত্তির চেয়ে দীন-হীন অবস্থা অধিক পছন্দনীয়। এই পৃথিবীর প্রতি ইহাদের কাহারও বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নাই। তাহারা মাটির উপর ছাড়া বসে না, এবং জানুর উপর ছাড়া খায় না। তাহাদের নেতা তাহাদের একজনেরই মত। তাহাদের নীচকে উচ্চ হইতে এবং প্রভুকে ভৃত্য হইতে তারতম্য করা যায় না। যখন নামাজের সময় আসে তখন তাহাদের কেহই অনুপস্থিত থাকে না, সকলেই অজু করিয়া বিনীতভাবে নামাজ আদায় করে।"

আরবদের পক্ষ হইতে একদল প্রতিনিধি কুরুসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করিলেন উবাদা ইবন সামিত নামক একজন হাবশী মুসলমান। ইহা দেখিয়া কুরুস নিতান্ত আশ্চর্য বোধ করিলেন। কুরুস মুসলমানদিগকে কর দিতে রাজী হইয়া সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট সন্ধির শর্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিলেন। হিরাক্লিয়াস সন্ধির শর্ত অনুমোদন করিলেন না। অধিকন্তু তিনি কুরুসকে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া নির্বাসন দণ্ড দান করিলেন।

আরবগণ ব্যবিলনের অবরোধ চালাইয়া গেল। সাতমাস অবরোধের পর জুবায়র ও তাঁহার সঙ্গীরা দুর্গের চতুষ্পার্শ্বের পরিখাটি ভর্তি করিয়া দেওয়াল উল্লঙ্ঘন করিয়া অতর্কিতে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিল। মুহুর্মুহু: 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে দুর্গের অভ্যন্তর প্রকম্পিত হইল। ৬৪১ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল দুর্গটি মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করিল।

ইতিমধ্যে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের মৃত্যু হইয়াছে। মিসরের গ্রীক শাসক গোষ্ঠী ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িল। মিসরের স্থানীয় খ্রীস্টানেগণ কপ্ট (কিস্তী) নামে অভিহিত হইত। গ্রীক শাসকগণ তাহাদের উপর গ্রীক ধর্মমত চাপাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়। কপ্ট ধর্মাধ্যক্ষ বেঞ্জামিন গ্রীক শাসন হইতে পালাইয়া একটি মঠে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। ব্যবিলনের যুদ্ধের পর হইতে কপ্টগণ আরব শাসকগণকে সাহায্য করিতে থাকে।

আলেকজান্দ্রিয়ার যুদ্ধ ও সন্ধি

সেনাপতি আমর ব্যবিলনে একটি সেনাবাহিনী রাখিয়া মিসরের বাইজান্টাইন রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। তৎকালে আলেকজান্দ্রিয়া কনষ্টান্টিনোপলের পরেই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও শক্তিশালী নগর ছিল। মদীনা হইতে নতন সৈন্যদলসহ আমর সর্বমোট ২০ হাজার সৈন্য লইয়া আলেকজান্দ্রিয়ার দুর্ভেদ্য প্রাচীরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্গাভ্যন্তরে ৫০,০০০ বাইজান্টাইন সৈন্য ছিল। ইহা ছাড়া আলেকজান্দ্রিয়ার অনতিদূরে ভূমধ্য সাগরের উপকূলে মোতায়েন ছিল শক্তিশালী গ্রীক নৌ-বহর। দুর্গের ভিতর হইতে গ্রীকগণ আরবদের প্রতি প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিতেছিল। হিরাক্লিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কনস্টান্স নির্বাসিত কুরুসকে পুনরায় আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রত্যাবর্তন করিবার অনুমতি দান করেন। ৬৪১ খৃষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর কুরুস আমরের সহিত এক সন্ধি স্থাপন করিয়া কর দিতে স্বীকৃত হন। কোন বাই-জান্টাইন সেনাবাহিনী মিসরে থাকিতে পারিবে না বলিয়া উভয়পক্ষ সম্মত হয়।

ব্যবিলনের উপকন্ঠে যেখানে আমর শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন সেখানে একটি সামরিক নিবাস গড়িয়া উঠে। ইহাকে ফুস্‌তাত নাম দওয়া হেয়। এখানে আমর একটি মসজিদ ও স্থাপন করেন। ফুসতাত কালক্রমে একটি শহরে উন্নীত হয় এবং ইহা ফাতিমীয় খলীফাগণের সময় পর্যন্ত মিসরের রাজধানী ছিল। আমর নীলনদের সহিত লোহিত সাগরের সংযোগকারী একটি প্রাচীন খালের সংস্কার সাধন করেন। ইহার ফলে মিসর হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সমুদ্রপথে আরবের বন্দরসমূহে পেঁীছাইবার সুযোগ হইল। আমর ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াই মিসরের কপ্ট খৃষ্টান ধর্মাধ্যক্ষ বেঞ্জামিনের অনুসন্ধান করিলেন এবং তাহাকে পূর্বপদে অধিষ্ঠিত করিলেন। আলেকজান্দ্রিয়া অধিকারের পর আরবদের সহজ সরল জীবন-যাত্রা ও সামরিক শৌর্যবীর্য সম্পর্কে মিশরীয়গণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে সেনাপতি আমর একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। প্রথমে তিনি বেদুঈন পদ্ধতিতে উষ্ট্রাদি জবেহ করিয়া একটি বিরাট ভোজের আয়োজন করিলেন। ইহাতে মিসরীয়গণও উপস্থিত ছিলেন। পরদিন মিসরের উপাদেয় খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া আবার সকলকে ডাকিলেন। এইবারও আরবগণ পরম তৃপ্তি সহকারে ভোজন পর্ব সমাধা করিল। তৃতীয়দিন সৈন্য-বাহিনীকে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত করিয়া উপস্থিত স্থানীয় জনসাধারণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "প্রথমদিনের ভোজের আয়োজন করা হইয়াছিল আমাদের স্বদেশের সহজ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তোমাদিগকে অবহিত করার জন্য। পরেরদিনের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে এই যে আমরা তোমাদিগকে দেখাইতে চাহিয়াছি বিজিত দেশের সৌখিন জিনিসও আমরা উপভোগ করিতে পারি এবং তা সত্ত্বেও আমরা আমাদের সামরিক শৌর্য রক্ষা করিতে পারি যেখন আজ তোমরা দেখিতেছ্।"

ফুসতাত নগর স্থাপিত

আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের পর সেনাপতি আমর পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইয়া বার্কা ও ত্রিপলি অধিকার করেন। খলীফা উসমানের সময় গ্রীকগণ আলেকজান্দ্রিয়া পুনরধিকারের চেষ্টা করে। মুসলমানগণ অন্যত্র রাজ্যজয়ে ব্যাপৃত ছিল। সেনাপতি আমর দ্রুত প্রত্যাবর্তন করিয়া গ্রীকদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন (৬৪৬ খৃঃ)।

হজরত উমরের শাসন ব্যবস্থা

হজরত উমরের সময় মুসলমানদের রাজ্য বহুদূর বিস্তৃতি লাভ করায়

হজরত উমরই সর্বপ্রথম একটি সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বহুজাতি ও ধর্মের লোকের সমন্বয়ে গঠিত বিশাল সাম্রাজ্যে কিভাবে ন্যায় ও নীতির সুপ্রশস্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা কায়েম করা যায় এই ছিল দূরদর্শী হজরত উমরের চিন্তা। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের যাবতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ, বিজিত দেশে অমুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান ও সর্বোপরি জনসাধারণের কল্যাণ সাধন ছিল তাঁহার শাসন ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য।

শাসননীতি

হজরত আবু বকরের খিলাফত আমলে যে বিদ্রোহ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল তাহার অভিজ্ঞতা খলীফা উমরকে সুস্পষ্ট শাসন নীতি নির্ধারণ করিতে সহায়তা করিয়াছিল। হজরতের জীবদ্দশায় ইহুদীরা সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে ধর্মত্যাগীদের আন্দোলনের সময় ইহুদী ও খৃষ্টানগণ ধর্মত্যাগীদেরকে প্রকাশ্যভাবে সহায়তা করিয়াছিল। ইহা ছাড়া বাইজানটাইনদের সহিত মুসলমানদের বরাবর যুদ্ধ করিতে হইত। তাই হজরত উমর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, আরব উপদ্বীপকে ইসলামের দুর্ভেদ্য ঘাটিরূপে—কেবলমাত্র মুসলমানদের আবাস ভূমি হিসাবে—সকল সম্ভাব্য বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র ও অসদাচরণের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে তিনি আরবের খৃষ্টান ও ইহুদী সম্প্রদায়কে আরবদেশ ছাড়িয়া মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্যত্র চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। নাজরানের খৃষ্টানগণকে তাহাদের জায়দাদের বদলে অন্যত্র জমি অথবা নগদ অর্থ গ্রহণ করিতে বলা হইল। ইহাদের কেহ কেহ সিরিয়ায় চলিয়া গেল। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোক কুফায় বসতি স্থাপন করিল। তাহাদের সহিত পূর্ববর্তী সন্ধির শর্তানুসারে কর আদায়ের বিনিময়ে নূতন আবাসভূমিতে তাহাদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা হইল। অনুরূপ খাইবারের ইহুদীগণকেও তাহাদের সম্পত্তির বিনিময়ে অর্থ দান করিয়া সিরিয়ায় প্রেরণ করা হইল। খলীফা উমরের শাসন ব্যবস্থার দ্বিতীয় প্রধান নীতি এই ছিল যে যেহেতু আরব উপদ্বীপ এক্ষণে মুসলমানদের আবাসভূমি হিসাবে নির্ধারিত হইল সেজন্য তাহারা আরবদেশের বাহিরে কোথাও ভূসম্পত্তির মালিক হইয়া চাষাবাদ করিতে বা বসবাস করিতে পারিবে না। ইহার কারণ হজরত উমর বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে আরবগণ বিদেশে বসবাস আরম্ভ করিলে তাহাদের সামরিক শৌর্যবীর্য নষ্ট হইয়া যাইবে এবং তাহারা আরাম আয়েশে

লিপ্ত হইয়া শান্তি প্রিয় নিরীহ জাতিতে পরিণত হইবে। অন্যপক্ষে বিজিত দেশে মূল জমিজমার মালিকগণ তাহাদের জায়গা জমি হারাইয়া অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিবে। ইহাতে রাষ্ট্রের রাজস্বেরও ক্ষতি হইবে। মুসলমানগণ যোদ্ধা হিসাবে রাষ্ট্র হইতে বেতন ও ভাতা পাইবে। তাহারা মূল আরব ভূখণ্ডে কোন জমির মালিক থাকিলে উশর নামক কর প্রদান করিবে।

হজরত উমর আরবের বাহিরে আরবগণকে কোন শহরে বা নগরে বাসেরও অনুমতি দেন নাই। কারণ ইহাতে তাহারা নগর সভ্যতার বিলাসব্যসনে মগ্ন হইয়া সামরিক কর্তব্য বিচ্যুত হইবে। সেজন্য তিনি বিভিন্ন দেশে তাহাদিগকে সুনির্দিষ্ট সামরিক নিবাসে বসবাস করিতে নির্দেশ দেন। সিরিয়ায় জাবিয়া হিম্স্, আমওয়াস, তাবারিয়া, লুদ্দ ও রামলায় সেনানিবাস স্থাপিত হইল। মিসরে ফুসতাত ও আলেকজান্দ্রিয়ায় সামরিক শিবির স্থাপিত হইল। ইরাকে নবনির্মিত কুফা ও বসরা নগরী নতন সেনানিবাস হিসাবে নির্দিষ্ট হইল।

অমুসলমানগণ তাহাদের ধর্মের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিত। তাহাদের ধর্মীয় নেতাদের শাসনাধীনে তাহারা স্ব স্ব ধর্মীয় আইন অনুসারে শাসিত হইত। মুসলিম রাষ্ট্রের সহিত তাহারা চুক্তিবদ্ধ বা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাকিত। এইজন্য তাহাদিগকে 'আহলুজ-জিম্মাহ' বা চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায় বলা হইত। সংক্ষেপে ইহারা জিম্মী নামে অভিহিত হইত। ইহারা মুসলিম রাষ্ট্রে করদানের বিনিময়ে জানমাল ও ধর্মের নিরাপত্তা লাভ করিত। অমুসলমানগণ উক্ত চুক্তি অনুসারে বহির্শক্রর আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য একপ্রকার সামরিক কর দিত। ইহাই জিযিয়া নামে অভিহিত হইত। ভূসম্পত্তির মালিক হিসাবে ইহারা ভূমি রাজস্ব ও (খারাজ) আদায় করিত।

অমুসলমানদের প্রতি নীতি

রাজস্ব ব্যবস্থা

খলীফা উমরের সময় নিম্নলিখিত উপায়ে রাজস্ব সংগৃহীত হইত। খারাজ বা ভূমি রাজস্ব কর্ষণযোগ্য ভূমির উপর ধার্য করা হইত। এতদুদ্দেশ্যে সিরিয়া ও ইরাকে ক্ষেত্র পরিমাপ করা হইল। এই জরীপের ভিত্তিতে জমির পরিমাণ ও উৎপাদিকা শক্তি ও পূর্বতন আইন কানুন মোতাবেক জমির রাজস্ব নির্ধারণ করা হইল। সিরিয়ায় প্রতি জরিব (৬০ হাত × ৬০ হাত) জমির উপর

খারাজ

এক নির্দিষ্ট কর ধার্য করা হইল। ইহাকে রাজস্ব আদায় ও শান্তিরক্ষার জন্য স্থানীয় সর্দারগণের সাহায্য নেওয়া হইত। অমুসলমানদের নিকট হইতে জিয্‌য়া নামক রক্ষা কর গ্রহণ করা হইত। রাজ্যজয়ের সময় তাহাদের সহিত যে সন্ধি করা হইত তাহারই শর্তানুসারে এই করের পরিমাণ নির্ধারিত হইত। মোটামুটি বিত্তবানদের জন্য মাথা পিছু ৪ দীনার, মধ্যবৃত্ত শ্রেণীর জন্য ২ দীনার ও সাধারণ শ্রেণীর জন্য ১ দীনার হিসাবে জিয্‌য়া ধার্য হইত। যেহেতু এই কর সামরিক কাজের পরিবর্তে ধার্য হইত সেজন্য অমুসলমানদের সবল সক্ষম ব্যক্তিদের নিকট হইতেই এই কর গ্রহণ করা হইত। স্ত্রীলোক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ে, ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী, বৃদ্ধ, অপ্রকৃতিস্থ ও রোগগ্রস্ত ব্যক্তির উপর এই কর ধরা হইত না। বিত্তবান মুসলমানগণের নিকট হইতে সুনির্ধারিত নিয়মে জাকাত আদায় করা হইত। জাকাতের অর্থ দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের ভরণ পোষণের জন্য ব্যয়িত হইত।

জিয্‌য়া

হজরত উমরের সময় গণীমৎ (যুদ্ধক্ষেত্রে লব্ধ সামগ্রী) হইতে রাষ্ট্রীয় তহবিলে বহু অর্থ সংগৃহীত হইত। খাইবারের যুদ্ধের পর হজরত মুহম্মদ নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর নিকট হইতে যে সকল দ্রব্য সামগ্রী পাওয়া যাইবে তাহার এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা হইবে। বাকী পাচভাগের চারভাগ যুদ্ধে যোগদানকারী সৈনিকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হইবে। হজরত উমরের সময় এই উপায়ে বহু অর্থ আমদানী হইত। গণীমতের এক পঞ্চমাংশকে 'খুমুস' বলা হইত।

জাকাত

হজরত উমরের রাজস্ব ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার তাঁহার রাজস্ব বন্টন। উপরোক্ত উপায়ে রাজস্ব সংগৃহীত হওয়ার পর শাসন সংক্রান্ত ও সামরিক ব্যয় নির্বাহের পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত তাহা মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা হইত। এই উদ্দেশ্যে আদম শুমারী করা হইল। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, ইহাই "পৃথিবীর ইতিহাসে লিখিত সর্বপ্রথম আদমশুমারী যাহা রাজস্ব বন্টনের উদ্দেশ্যে করা হইয়াছিল।" মুসলমানদের নামধাম যে বালাম খাতায় লিপিবদ্ধ করা হইত তাহাকে দীওয়ান বলা হইত। এই খাতায় প্রত্যেকের নামে ভাতা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ভাতা নির্ধারণের ব্যাপারে তিনটি বিষয় বিবেচনা করা হইত—ইসলাম গ্রহণে অগ্রগণ্যতা, রসুলুল্লার সহিত সম্পর্ক ও জিহাদে অংশ গ্রহণ। তালিকায় সর্বাগ্রে উম্মাহাতুল

দীওয়ান

মুমিনীন (মুমীনগণের মাতা) অর্থাৎ হজরত রসুলুল্লার সহধর্মিনিগণের নাম লিপিবদ্ধ করা হইল। ইঁহাদের ভাতা বাৎসরিক ১০,০০০ দিরহাম ধার্য হইল। ইহার পর আনসার ও মুহাজিরগণের নাম লিপিবদ্ধ করা হইল। বদরের যুদ্ধে যোগদানকারী মুজাহিদগণ প্রত্যেকে ৫০০০ দিরহাম পাইতেন। হুদায়বিয়ার যুদ্ধে যাহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের বৃত্তি ছিল ৪০০০ দিরহাম। রিদ্দার যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের বৃত্তি ৩০০০ দিরহাম ধার্য হইল। যাহারা সিরিয়া ও ইরাকে যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাদের বৃত্তি এবং বদরের মুজাহিদগণের পুত্রদের বৃত্তি ছিল ২০০০ দিরহাম। কাদিসিয়া ও ইয়ারমুকের যুদ্ধের পর যাহারা সৈন্যবিভাগে যোগদান করিয়াছিল তাহাদের বৃত্তি ছিল ১০০০। একজন সাধারণ সৈনিকের জন্য ন্যূনপক্ষে ৫০০—৬০০ দিরহাম বৃত্তি নির্ধারিত হইত। সৈনিকদের স্ত্রী, বিধবা মেয়েলোক, ছেলেমেয়ে প্রত্যেকে রাষ্ট্রীয় তহবিল (বয়তুলমাল) হইতে নির্ধারিত ভাতা প্রাপ্ত হইত। প্রত্যেক নবজাত শিশুর নামে ১০ দিরহাম ভাতা মঞ্জুর করা হইত এবং বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে তাহার ভাতাও বৃদ্ধি হইত। আরবদের গোলাম, তাহাদের মাওলারা ও (মুক্তিপ্রাপ্ত দাস অথবা আশ্রিত) বৃত্তি পাইত। উইলিয়ম ম্যুর বলেন, "একটি জাতির পক্ষে সম্পূর্ণ রাজস্ব, গণীমৎ ও রাষ্ট্রের জয়লব্ধ সম্পদ সম-ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে ভাগাভাগি করিয়া লওয়ার দৃষ্টান্ত সম্ভবতঃ জগতে বিরল।" হজরত উমর উদ্বৃত্ত রাজস্বের শেষ কপর্দক পর্যন্ত জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতে পারিলে গৌরবান্বিত বোধ করিতেন।

প্রাদেশিক শাসন

হজরত মুহম্মদের সময় প্রধান প্রধান শহরে ও প্রদেশে আমীর নামধারী শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিল। •হজরত উমর এই পদবী বহাল রাখেন। তিনি বিজিত দেশসমূহকে সুনির্দিষ্ট প্রদেশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক প্রদেশে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আহওয়াজও বাহরাইন একটি প্রদেশ ছিল; সিজিস্তান, মাকরান ও কিরমান লইয়া একটি প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল। তাবারিস্তান ও খুরাসান দুইটি ভিন্ন প্রদেশ ছিল। দক্ষিণ পারস্য তিনটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। ইরাকের বসরা ও কুফায় দুইজন শাসনকর্তা ছিলেন। সিরিয়ার হিমস্, দামিস্ক ও জেরুজালেমে তিনজন শাসনকর্তা ছিলেন। আফ্রিকা তিনটি প্রদেশে ও আরবদেশ

পাচটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। ছোট প্রদেশের শাসনকর্তাকে ওয়ালী বা নায়িব বলা হইত। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ পদাধিকার বলে জুমা ও জামাতের ইমামতি করিতেন এবং শুক্রবারে খুৎবা পাঠ করিতেন। প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব ছাড়া কৃষির উন্নতি বিধানও আমীর বা ওয়ালীর দায়িত্ব ছিল। হজরত উমরের নির্দেশে ইরাকের পয়ঃপ্রণালীর সংস্কার সাধন করা হয়। দজলা ও ফুরাত নদীর বহুদিনের অবহেলিত বাঁধসমূহের পুনর্নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশেষ ধরণের কর্মচারী নিয়োগ করা হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত সেনাবাহিনী ছাড়া প্রদেশের রাজধানীসমূহে কোন জরুরী অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য অশ্বারোহী বাহিনী সংরক্ষিত করা হইত।

কাজী নিয়োগ

হজরত উমর সর্বপ্রথম বিচারের জন্য কাজী নিযুক্ত করেন। ঐতিহাসিক বালাজুরী বলেন যে তিনি দামিস্কে ও উরদুনে এবং হিম্স্ ও কিন্নিসরিনে কাজী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সবল সক্ষম মুসলমান সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিত। খলীফা নিজেই সৈন্যবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন। তবে বিশেষ অভিযান উপলক্ষে খলীফা কোন একজনকে সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতেন। সৈন্যাধ্যক্ষ খলীফার নায়েব বা স্থলাভিষিক্ত হিসাবে নামাজে নেতৃত্ব করিতেন। সৈন্যগণ পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীতে বিভক্ত ছিল। অশ্বারোহিগণ প্রধানতঃ তীর ধনুক, ও বর্শা ব্যবহার করিত এবং পদাতিকগণের প্রধান যুদ্ধ সরঞ্জাম ছিল ঢাল, তরবারি ও তীর-ধনুক। প্রতিরক্ষার জন্য সৈনিকগণ বর্মও পরিধান করিত। বর্শার ফলক বাহরাইনের উপকূলে খাত্ নামক স্থানে নির্মিত হইত বলিয়া ইহা খাত্তী নামে অভিহিত হইত। উৎকৃষ্ট তরবারী ভারত হইতে আমদানী হইত বলিয়া ইহা হিন্দী নামে পরিচিত হইত। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনী পাচটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইত, যথা, অগ্র, মধ্য, বাম, ডান ও পশ্চাৎ। অশ্বারোহিগণ ডাইনে ও বামে থাকিয়া পদাতিকগণকে রক্ষা করিত। পদাতিক দল তিন শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হইত। সম্মুখে থাকিত বর্শাধারী ও পশ্চাতে থাকিত ধনুর্ধরগণ। আর মধ্যভাগেও থাকিত সাধারণ পদাতিকগণ। পরস্পরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করা হইত। দামামা ও ভেরীর আওয়াজের সাহায্যে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইত। যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহু আকবর ধ্বনি সৈনিকদিগকে উৎসাহিত করিত। কোরআন শরীফের আয়াত পাঠ

সৈন্যবিভাগ

করিয়াও যুদ্ধে সৈনিকগণকে উৎসাহ দেওয়া হইত। হজরত উমরের সময় মুসলমান বাহিনী ইহার অপূর্ব মনোবলের জন্য বিখ্যাত ছিল। সৈনিক-গণ আল্লার উপর গভীর বিশ্বাস ও ধর্মে অবিচলিত আস্থা হইতে এই মনোবল প্রাপ্ত হইত। মুসলমানদের দ্বিতীয় প্রধান গুণ ছিল তাহাদের অপরিসীম সহিষ্ণুতা। এই সহিষ্ণুতা তাহারা তাহাদের আবাসভূমি মরুভূমি হইতে লাভ করিয়াছিল। মুসলিম বাহিনীর তৃতীয় প্রধানগুণ ছিল ইহার গতিশীলতা। উটের ব্যবহার তাহাদিগকে এই গতিশীলতা দান করিয়া-ছিল।

অন্যান্য ঘটনাবলী

হজরত উমর মাঝে মাঝে মক্কায় হজ করিতে যাইতেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি তিন সপ্তাহকাল মক্কায় অবস্থান করিয়া কাবা শরীফের চতুর্দিকের অঙ্গন বর্ধিত করেন। এই উদ্দেশ্যে কিছু বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। বাড়ীর মালিকগণকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইল। হারাম শরীফের চৌহদ্দীর স্তম্ভগুলি নূতন করিয়া নির্মিত হইল। হজ যাত্রীদের সুবিধার জন্য রাস্তায় বিভিন্ন স্থানে বিশ্রামাগার স্থাপিত হইল। এইগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় আরব গোত্রগুলিকে দায়িত্ব দেওয়া হইল। হজরত উমর হিজরী সনের প্রতিষ্ঠা করেন। যে বৎসর হিজরত সংঘটিত হইয়াছিল সেই বৎসরের পহেলা মুহর্রম হইতে হিজরী সাল গণনা আরম্ভ করা হয়।

হজরত উমরের খিলাফতের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা কুরআন শরীফের বিভিন্ন সূরা ও অধ্যায়ের একত্রীকরণ। তাঁহার খিলাফতের প্রথম দিকে এই কাজ আরম্ভ করা হয়। ইহার প্রথম প্রচেষ্টা হজরত আবু বকরের খিলাফতের সময় হজরত উমরের অনুরোধ ক্রমেই আরম্ভ হইয়াছিল। ইয়া-মামার যুদ্ধে কুরআন মুখস্থকারীদের অনেকেই শহীদ হওয়ার ফলেই কুর-আনের বিভিন্ন অংশ সংগ্রহ ও একত্রীকরণের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনু-ভূত হয়। জায়দ ইবন সাবিত এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভারপ্রাপ্ত হন। বিশেষ যত্ন সহকারে বিভিন্ন সূত্রে নানা উপকরণাদি—যথা চামড়া, তাল-পাতা, পাথর বা লোহার ফলক—হইতে অথবা মুখস্থকারীদের উদ্ধৃতি হইতে পূর্ণ কুরআন শরীফের পাঠ সমাপ্ত করিয়া ইহার পাণ্ডুলিপি হজরত উমরের কন্যা হাফসার হেফাজতে রাখা হয়।

বিশাল মুসলিম জাহানের অবিসংবাদিত নেতা রোমের কাইসার ও পারস্যের খসরুর ত্রাস দ্বিতীয় খলীফা হজরত উমরের মৃত্যু বড়ই শোকাবহ ও করুণ। আবু লুলুয়া নামক একটি পারসিক ক্রীতদাসের হস্তে তিনি নিহত হন। সেনাপতি মুগীরা তাহাকে ইরাক হইতে যুদ্ধবন্দী হিসাবে মদীনায় লইয়া আসিয়াছিলেন। সে মনে মনে হজরত উমরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ফাঁদিতেছিল। একদিন প্রত্যুষে যখন মুসল্লীগণ মদীনার মসজিদে জামাতের জন্য কাতার বন্দী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তখন আবু লুলুয়া সকলের অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতসারে নামাজীদের মধ্যে মিশিয়া গেল। যেইমাত্র তকবীরের সহিত নামাজ আরম্ভ হইল আবু লুলুয়া একটি ছোরার সাহায্যে হজরত উমরের গায়ে ছয়টি আঘাত হানিল। হজরত উমরের আদেশ ক্রমে আবদুর রহমান নামাজের নেতৃত্ব করিলেন।[১] আহত খলীফাকে তাঁহার গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। তিনি আবদুর রহমানকে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু আবদুর রহমান ইহাতে রাজী হইলেননা। হজরত উমর তখন ছয়জন সাহাবার নাম করিয়া বলিলেন যে ইঁহারা একজনকে খলীফা বলিয়া মনোনীত করিবেন। ইঁহাদের নাম আবদুর রহমান, আলী, উসমান, জুবায়র, সাদ ও তালহা। তালহা তখন মদীনায় ছিলেননা। উমর এই নির্বাচক মণ্ডলীকে তিনদিন পর্যন্ত তালহার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিলেন। তারপর তিনি তাঁহার পুত্র আবদুল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যদি নির্বাচকগণের মধ্যে মতভেদ হয় তবে তুমি সংখ্যাগরিষ্ঠদের দলে থাকিবে, যদি ভোট সমান সমান হয় তবে তুমি আবদুর রহমানের পক্ষে থাকিবে।" তিনি হিজরী ২৩ সালের শেষের দিকে সাড়ে দশ বৎসর খিলাফতে অধিষ্ঠিত থাকার পর ইনতিকাল করেন।

মৃত্যু ৬৪৪ খ্রীঃ

চরিত্র ও কৃতিত্ব

হজরত উমরের সময় মুসলিম সাম্রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। হজরত আবু বকরের মৃত্যুর সময় মুসলমানগণ সিরিয়ায় যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। উমরের সময় সিরিয়া ইরাক, পারস্য ও মিসর বিজিত হয়। বাইজাইন্টান সম্রাট শোচনীয় ভাবে পরাজিত হন এবং সাসানীয়

১. আবদুর রহমান ইবন আউফ।

সাম্রাজ্য পর্যুদস্ত হয়। বহু ধনৈশ্বর্যের মালিক হইয়াও হজরত উমর আরবীয় প্রথামত সাদা সিধা জীবন যাপন করিতেন। বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হজরত উমরকে তাঁহার সমসাময়িক রাজা বাদশাহের দূতগণ নিতান্ত অনাড়ম্বর অবস্থায় দেখিয়া বিস্মিত হইত। জেরুজালেমের ধর্মাধ্যক্ষের আহ্বানে সেখানে যাওয়ার সময় তিনি একটি ভৃত্যের সহিত অদল বদল করিয়া একবার উটের পিঠে চড়িতেন আর একবার ভৃত্যকে চড়াইয়া নিজে উটের রশি ধরিয়া টানিতেন। ইহাতে তিনি বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিলেননা। তাঁহার জীর্ণ সাধারণ পোষাক পরিবর্তনের জন্য সেনাপতি আবু উবায়দা বহু মিনতি করিয়া শুধু খলীফার ভর্ৎসনাই শুনিয়াছিলেন। খিলাফতের গুরুদায়ীত্ব ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার চিন্তা তাঁহাকে এতই ব্যাকুল করিয়া তুলিত যে তিনি বিনয় করিয়া বলিতেন, "আমার মাতা যদি আমাকে গর্ভে ধারণ না করিতেন তবে ভালই হইত, আমি যদি তার বদলে এই ঘাসের গুচ্ছ হইতাম!"

শাসনকর্তা ও সেনাপতি মনোনয়নে উমর পক্ষপাত শূন্য ছিলেন। তাঁহার শাসনে যুযুধান ও প্রতিদ্বন্দ্বী আরব গোত্রসমূহ ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ইসলামের সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। বিদ্রোহপ্রবণ কুফা ও বসরা নগরী তাঁহার খিলাফত সময়ে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া চলিত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রথম বয়সের তেজোদৃপ্ততা বহুলাংশে প্রশমিত হইয়াছিল। তথাপি ন্যায়ের খাতিরে উমর আমরণ বজ্রকঠোর ছিলেন। তাঁহাকে অধিকাংশ সময় মদীনার বাজারে কোড়া হাতে দেখা যাইত। অন্যায় আচরণকারীকে তিনি কঠোর হস্তে দমন করিতেন। হজরত উমরের কোড়া অন্যলোকের তরবারী অপেক্ষা ভয়াবহ বলিয়া বিবেচিত হইত। দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি তাঁহার দয়া বদান্যতার বহু গল্প প্রচলিত আছে। রাত্রিতে ছদ্মবেশে তাহাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তিনি ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। একদা তিনি এক দরিদ্র বৃদ্ধার ক্ষুধার্ত ছেলে মেয়েদিগকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। বৃদ্ধা তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে উনুনে একটি শূন্য হাঁড়ি চাপাইয়া আগুনে জ্বাল দিতেছিল। হজরত উমর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জন্য খাবার আনিয়া নিজ হাতে পরিতৃপ্তির সহিত খাওয়াইয়া তাহাদের মুখে হাসি ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন।

বিস্তারিত পাঠ্য

মুর, কলিফেট, ইট্‌স্‌ রাইজ ডিক্লাইন এণ্ড ফল
হিট্টি, হিষ্ট্রি অব দি এরাব্‌স্‌

১০

উসমান গনী

(৬৪৪—৬৫৬ খ্রীঃ)

স্বাভাবিকভাবে হজরত উমরের জীবনাবসান হইলে তিনি উত্তরাধিকারী মনোনয়নের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন তাহা অনুমান করা কঠিন। তবে তিনি যে আরও সুনিশ্চিত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মারাত্মক ভাবে আহত খলীফা জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া মুসলিম জগতের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া ছয়জন প্রধান সাহাবার স্কন্ধে এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করার সিদ্ধান্ত করিলেন। ইহাদের মধ্যে যে কেহ নির্বাচিত হইলে এবং এই ছয়জনের সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে তাহা সর্বসাধারণের নিকটও গ্রহণ যোগ্য হইবে মনে করিয়াই হজরত উমর এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নির্বাচকগণ দুই দিন ধরিয়া বাক-বিতণ্ডা ও আলাপ আলোচনা করিয়াও কোন সিদ্ধান্তে পেঁৗছিতে পারিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ ও মতবিরোধ দেখা দিল। প্রবীন আবদুর রহমান এক বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া শহরের নেতৃস্থানীয় লোক ও রাজধানীতে উপস্থিত প্রাদেশিক কর্মকর্তাগণের সহিত পরামর্শ করিলেন। তারপর তিনি নির্বাচকদের নিকট এই মর্মে আবেদন করিলেন যে তিনি নিজের দাবী প্রত্যাহার করিবেন যদি নির্বাচকগণ তাঁহাকে সালিসি করার ভার দেন। ইহাতে তাঁহারা সকলেই সম্মত হইলেন। তারপর তিনি নির্বাচকদের প্রত্যেকের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করিলেন। অবশেষে দেখা গেল হজরত উসমান ও হজরত আলীকে খলীফা মনোনয়নের ব্যাপারে নির্বাচকগণ প্রায় দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িল। আবদুর রহমান এক্ষণে তালহা ও আলীর সহিত আলাদাভাবে আলোচনা চালাইলেন। এইভাবে তৃতীয় দিন অতিবাহিত হইল। হজরত উমরের ওয়াসিয়ৎ অনুসারে চতুর্থদিনে অবশ্যই খলীফা নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করিতেই হইবে।

উসমান খলীফা নির্বাচিত নভেম্বর, ৬৪৪

প্রত্যুষে ফজরের নামাজ আদায় করিবার উদ্দেশ্যে মুসল্লীগণ মদীনার

মসজিদ প্রাঙ্গনে সমবেত হইলেন। সমবেত জনসাধারণের উপস্থিতিতে আবদুর রহমান উসমান ও আলী উভয়কে পর পর জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি খলীফা হইলে আল্লাহ্ ও রসুলের নির্দেশ এবং রসুলের খলীফাগণের রীতিনীতি অনুসারে চলিবেন কিনা। উভয়ে সম্মতিসূচক উত্তর প্রদান করিলেন। তারপর তিনি নিজের সালিসি ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া উসমানের হাত ধরিয়া বয়আৎ (আনুগত্যের শপথ) করিলেন এবং তাঁহাকে খলীফা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। হজরত উসমানের বয়স এই সময় সত্তর পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি হজরত রসুলুল্লার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং হজরতের কন্যা রুকাইয়া ও তাঁহার মৃত্যুর পর উম্মে-কুলসুমকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি ধন্যাঢ্য ছিলেন এবং মুসলমানদের কল্যাণার্থে অকাতরে দান করিয়াছিলেন। তিনি আবিসিনিয়ায় অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে হিজরতে যোগদান করিয়াছিলেন। কাজেই খিলাফতের সর্বপ্রকার যোগ্যতাই তাঁহার মধ্যে ছিল। হিজরী ২৪ সালের ১লা মুহর্রম উসমান খলীফা হিসাবে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন এবং সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন।

হজরত আলী অপরাপর সকলের মত উসমানের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইলেন কিন্তু সালিশ আবদুর রহমান তাঁহার খিলাফতের দাবী অস্বীকার করায় তিনি মনক্ষুন্ন হইলেন। কিছু দিন পর তালহা মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন। তিনিও উসমানকে খলিফা বলিয়া মানিয়া লইলেন।

হজরত উসমানের খিলাফত বার বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। তাঁহার খিলাফত রাজ্য বিস্তারের দিক দিয়া প্রথম দুই খলীফার আরব্ধ কার্যের পরিপূরক। তাঁহার সময়ে বিভিন্ন দিকে মুসলমান সেনাপতি ও সৈন্য বাহিনী কৃতকার্যতার সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ পরিচালনা করিয়া তাহাদের পূর্ববর্তী বিজয় গৌরব অক্ষুণ্ন রাখিয়া চলিল। পারস্য বিজয় তাঁহার সময়েই পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব সীমান্তে নূতন নূতন এলাকায় নামে মাত্র হইলেও খলীফার আধিপত্য স্থাপিত হইল। কিন্তু তাঁহার খিলাফতের শেষের দিকে নানা কারণে মুসলমান সমাজে মতদ্বৈধ ও দলাদলি ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করিয়া নৈরাজ্যের সৃষ্টি করিল।

খলীফা উমরের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই পারস্যে বিদ্রোহ দেখা দিল। উসমানের আদেশে বসরার শাসনকর্তা ইবন আমির একাধিক যুদ্ধে বিদ্রোহিগণকে পরাজিত করিয়া এই সকল অঞ্চলে খলীফার আধিপত্য

সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। নিশাপুর ও মার্ভ শহরদ্বয় আত্মসমর্পণ করিয়া কর দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইল। অক্ষু নদীর তীরে খওয়ারিজমে যুদ্ধ হইল এবং বল্‌খও তুখারিস্তান পর্যন্ত অঞ্চল খলীফার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইল। কিরমান ও সিজিস্তানে খলীফার আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং হেরাত, কাবুল ও গজনীর শাসকগণও খলীফার কর্তৃত্ব মানিয়া লইল। কিরমানে দুর্গাদি নির্মিত হইল, পয়ঃ প্রণালী খোদিত হইল এবং বিজেতাদের কেহ কেহ সেখানে জমিজমা অধিকার করিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। পলায়মান পারসিক রাজা ইয়াজদজির্দ স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে হজরত উসমানের খিলাফতের অষ্টম বৎসর (৬৫২) আততায়ী কর্তৃক নিহত হন। তাঁহার ধনরত্নের লোভে পারসিকরাই তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল।

যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্য জয়

কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম দিকে ৬৫৩ সালে তুর্কী ও খাজারদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু আজরবাইজানের পার্বত্য অঞ্চলে আরব নেতাগণও সেনাবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। ঐ সময়ে কিরমানের বরফাবৃত পার্বত্য অঞ্চলেও একটি মুসলিম সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। সিরিয়ায় মুআবিয়া একটি বাইজানটাইন আক্রমণ প্রতিহত করেন। ইহার পর প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে মুআবিয়া গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন। মিসরে হজরত উসমান আমরের পরিবর্তে ইবন আবি সারাহকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ৬৪৭ খ্রীস্টাব্দে ইবন আবিসারাহ ত্রিপলি ও বার্কায় মুসলমান আধিপত্য বিস্তার করেন। কার্থেজের শাসনকর্তা গ্রেগরীর সহিত তাঁহার এক ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানগণ গ্রেগরীর ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্যের মুকাবিলা করিয়া জয়লাভ করিয়াছিল। সিরিয়ার শাসনকর্তা মুআবিয়া সমুদ্রাভিযানের অনুমতি চাহিয়া খলীফা উমরের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন কিন্তু দূরদর্শী ও সাবধানী উমর মুআবিয়াকে সমুদ্রযাত্রার অনুমতি দিলেন না। উমরের মৃত্যুর পর মুআবিয়া উসমানের নিকট আবেদন করিলেন। খলীফা ইহাতে আপত্তি করিলেন না। ৬৪৯ খ্রীস্টাব্দে আবু কয়েসের নেতৃত্বে সাইপ্রাসে একটি অভিযান প্রেরিত হইল। মিসর হইতে ইবন-আবি-সারাহ এই অভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন। অনায়াসে সাইপ্রাস অধিকৃত হইল। কয়েক বৎসর পর রোড্‌স্ দ্বীপও মুসলমানদের দখলে আসিল। ৬৫২ খ্রীস্টাব্দে

ইবন আবি সারাহ

ইবন-আবি-সারাহ আলেকজান্দ্রিয়ার নিকটে একটি বিরাট বাইজান্টাইন নৌ-বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেন।

এই সকল বিজয় অভিযান ও রাজ্য বিস্তার ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল। সৈন্যগণ অপেক্ষাকৃত অবসর জীবন যাপন করিতেছিল। এই দিকে হজরত উসমানের খিলাফত লাভের পর কুরাইশদের দুই প্রধান শাখা বনু হাশিম ও বনু উমাইয়ার মধ্যে দলাদলি ও রেশারেশি আরম্ভ হইল।

আভ্যন্তরীণ গোলযোগ

হজরত উসমান ছিলেন উমাইয়া বংশের লোক আর হজরত আলী হাশিমী বংশের লোক। তাই তাঁহাদের সমর্থকগণ পরস্পরকে ঈর্ষা ও সন্দেহের চোখে দেখিতে লাগিল। কুরাইশদের মধ্যে যখন এইরূপ অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, তখন সুযোগ বুঝিয়া বেদুঈন সৈন্যগণ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এই অসন্তোষ নবনির্মিত সেনানিবাস কুফা ও বসরায় গুরুতর আকার ধারণ করিল। তাহারা ক্রমশঃ মনে করিতে লাগিল যে, ইসলামের যাবতীয় বিজয় তাহাদের বাহু বলেই অর্জিত হইয়াছে। কিন্তু কুরাইশ গোত্রের লোকেরাই রাষ্ট্রের সকল সুযোগ সুবিধা করায়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

খলীফা ছিলেন কুরাইশ বংশের, তিনি সর্বদা কুরাইশ নেতাদের পরামর্শ অনুসারেই রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। যুদ্ধ-বিগ্রহের স্বল্পতা ও অপেক্ষাকৃত অবসর জীবন তাহাদিগকে এই সকল কথা ভাবিবার সুযোগ দিয়াছিল। তাই তাহারা দিন দিন কুরাইশদের কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বিদ্রোহী হইতে লাগিল। রাষ্ট্রের এই সঙ্কটের সময় কুরাইশদের মধ্যে ঐক্য ও সদ্ভাবের প্রয়োজন ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী; কিন্তু হজরত উসমানের দুর্ভাগ্য যে, এই সময় নানা কারণে কুরাইশদের উমাইয়া ও হাশিমী শাখার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় সৈনিকদের বিদ্রোহ দমনে তিনি অপারগ হইলেন। হজরত উসমানের বয়স তখন আশি পার হইয়া গিয়াছে। তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তা ও তৎপরতার অভাব পরিলক্ষিত হইল। ধার্মিক-প্রবর উসমানের বার্ধক্য প্রযুক্ত দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তাঁহার পরিবারের লোকেরা ও মন্ত্রণাদাতাগণ তাঁহাকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিয়া ফেলিল। বিশেষতঃ তাঁহার প্রধান উপদেষ্টা মারওয়ান রাষ্ট্রের প্রধান কর্ণধার সাজিয়া বসিলেন। মারওয়ানের কার্যকলাপে জনসাধারণ উত্তরোত্তর বিদ্রোহ প্রবণ হইয়া উঠিল।

কুফা ও বসরায় বেদুঈন সৈন্যগণ ও জনসাধারণ বার বার শাসনকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। হজরত উসমান শান্তি ও শৃঙ্খলার খাতিরে বারবার শাসনকর্তা পরিবর্তন করিয়া বিদ্রোহের অনল প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি উমাইয়া বংশের লোকজনকে শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত করিয়া ক্রমশঃ হাশিমীদের বিরাগ ভাজন হইলেন। হজরত উসমানের বিরুদ্ধে স্বজন-প্রীতির অভিযোগ রাজ্যের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। গণদাবীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাইতে গিয়া হজরত উসমান স্থানে স্থানে উমাইয়া শাসকগণকেও অপসারিত করিয়া অন্য শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমশঃ এইরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিল যে, বিক্ষুব্ধ জনসাধারণকে কিছুতেই সন্তুষ্ট করা সম্ভব হইল না। উমাইয়া হউক আর অন-উমাইয়া হউক হজরত উসমানের কোন শাসনকর্তাকে তাহারা মানিয়া লইবে না। বেদুঈনদের প্রধান অভিযোগ ছিল কুরাইশদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে। প্রথম হইতেই কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমনই ছিল হজরত উসমানের জন্য প্রকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু তিনি দৃঢ়তা ও তৎপরতার সহিত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করায় বিদ্রোহিগণ আস্কারা পাইয়া গেল। তাঁহার মনোনীত শাসনকর্তাগণও এই সঙ্কট সময়ে একে একে অযোগ্য প্রমাণিত হইল।

কুফাও বসরায় বিদ্রোহ

অন্যান্য কারণ

হজরত উসমানের বিরুদ্ধে যখন তীব্র অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল, তখন বিদ্রোহী ও দুষ্কৃতিকারীরা তাঁহার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উপস্থাপিত করিল। কুরআন শরীফ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা হজরত উসমানের এক স্মরণীয় ও প্রশংসনীয় কীর্তি। মুসলিম জগতের বিভিন্ন স্থানে কুরআন পাঠে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। হজরত উসমান পবিত্র কিতাবের নির্ভুল সংরক্ষণের জন্য উদগ্রীব হইয়া পড়িলেন। তিনি বিখ্যাত সাহাবাগণের পরামর্শক্রমে রাজ্যের সর্বত্র হইতে প্রচলিত কুরআনের কপিগুলি মদীনায় লইয়া আসিলেন। তারপর তিনি কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা হজরত হাফসার নিকট সংরক্ষিত আবুবকরের আমলের কুরআনের প্রতিলিপির সহিত মিলাইয়া নির্ভুল ও বিশুদ্ধ কপি প্রস্তুত করিলেন। এখন এই কপি হইতে অনেকগুলি কপি প্রস্তুত করাইয়া মক্কা, মদীনা,

কুরআন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

কুফা ও দামিস্কে রাখিয়া দেওয়া হইল, এইগুলি হইতে রাজ্যের সর্বত্র কুরআনের প্রতিলিপি ছড়াইয়া দেওয়া হইল। পুরাতন কপিগুলিকে আগুনে পুড়াইয়া ফেলা হইল। হজরত উসমানের সময়োপযোগী প্রচেষ্টার ফলে কুরআনের বিশুদ্ধতা রক্ষা পাইল এবং তাঁহার এই কার্য সকলের অকুন্ঠ প্রশংসা অর্জন করিল। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার শত্রুরা তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন করিল যে, তিনি কুরআন শরীফের অসংখ্য কপি জ্বালাইয়া দিয়াছেন। বিদ্রোহ প্রবণ জনতার মুখে এই অভিযোগ সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আবু-জার-আল-গিফারী নামক জনৈক সুফী সাধকের নির্বাসন হজরত উসমানের বিরুদ্ধে অসন্তোষ আরও বাড়াইয়া তুলিল। তিনি হজরত মুহম্মদের একজন বিশ্বস্ত সহচর ও প্রাথমিক মুসলমানদের অন্যতম ছিলেন। তিনি সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন এবং ইবাদত বন্দেগীতেই সর্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন। রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও বিলাস ব্যসনের সমারোহ দেখিয়া তিনি নিতান্ত মর্মাহত ও ব্যথিত বোধ করিলেন। সুরম্য অট্টালিকা, অসংখ্য দাসদাসী, বহুমূল্য পোষাক-পরিচ্ছদ, অগণিত অশ্ব ও উষ্ট্রাদি রাজ্যের সর্বত্র এমন কি পবিত্র নগরদ্বয় মক্কা ও মদীনার সহজ সরল জীবন যাত্রাকে আমূল পরিবর্তন সাধিত করিয়াছিল। আবু জার এই বস্তুতান্ত্রিক জীবন-যাত্রার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থাপন করিলেন। তিনি ধনী সম্প্রদায়কে দরিদ্রদের উপকারার্থে তাহাদের ধন পরিহার করিতে বলিলেন। কুর-আনের বাণী উদ্ধৃত করিয়া তিনি দামিস্কে ওজস্বিনী ভাষায় প্রচার আরম্ভ করিলেন। বহুলোক তাঁহার চতুষ্পার্শে একত্রিত হইল। মুআবিয়া তাঁহার আন্তরিকতা ও সাধুতা পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে এক সহস্র মুদ্রার একটি থলি উপহার পাঠাইলেন। পরের দিন তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, থলিটি ভুলক্রমে তাঁহাকে পাঠান হইয়াছিল। তাই তিনি উহার প্রত্যর্পণ দাবী করিলেন। আবু জার মু'আবিয়াকে জানাইলেন তিনি রাত্রিতেই ঐ মুদ্রা গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়াছেন। মুআবিয়া বিপদ আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে খলীফা উসমানের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। খলীফা তাঁহার সহিত তর্ক-বিতর্ক করিয়াও তাঁহাকে প্রচার হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। তিনি আবু জারকে বলিলেন যে, ধনী ও সম্পদশালী ব্যক্তিরা জাকাত আদায় করিলে তিনি তাহাদিগকে আর কিছুই করিতে

আবু জার আল্-গিফারী

পারেন না বা তাহাদের ধন-সম্পদে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। অবশেষে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় হজরত উসমান আবু জারকে মরুভূমির রাবাজা নামক স্থানে নির্বাসিত করিলেন। সেখানে দারিদ্র্য ও অনশনে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার এই মৃত্যু সংবাদ দাবানলের মত চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং উসমানের শত্রুরা এই ঘটনার যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিল না।

হজরত উসমান লক্ষ্য করিলেন যে, মক্কা ও মদীনায় কিছুসংখ্যক লোক জুয়া ইত্যাদি খেলিয়া পবিত্র নগরীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতেছে। তাই তিনি ইসলামের বিধান অনুসরণে এই সকল খেলা নিষিদ্ধ করিয়া দেন। কিন্তু যুবা শ্রেণীর লোকেরা উসমানের উপর অসন্তুষ্ট হইল এবং অচিরে তাহারা খলীফার শত্রুদের সহিত মিলিত হইল।

হজরত উমর মক্কা ও মদীনার মসজিদগুলির সংস্কার ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করেন। মক্কায় হজ করিতে গিয়া তিনি কাবাশরীফের অঙ্গনকে বর্ধিত করিতে চাহিলেন। কিন্তু বাড়ীর মালিকেরা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ নিতে অস্বীকার করিয়া ভীষণ গোলযোগ আরম্ভ করিয়া দিল। খলীফা তাহাদিগকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। ইহাতেও উসমানের বিরুদ্ধে কিছু লোক বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। হজরত উসমান হজের অনুষ্ঠানে স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্তন সাধন করেন। এইগুলি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল ; কিন্তু দুষ্ট লোকেরা এই সুযোগে খলীফার বিরুদ্ধে অপপ্রচার আরম্ভ করিয়া তাঁহাকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিল। উল্লিখিত সকল কারণে রাজ্যের সর্বত্র হজরত উসমানের বিরুদ্ধে তুমুল বিক্ষোভ আরম্ভ হইল এবং খলীফার বিরুদ্ধে যাহারই কোন প্রকৃত অথবা অপ্রকৃত অভিযোগ ছিল, সেই বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করিল। উসমানের খিলাফতের শেষের দিকে এই সকল পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ক্রমশঃ ধূমায়িত হইয়া প্রচণ্ড আক্রোশে বিস্ফোরিত হইল।

এই সময় ইবন সাবা নামক জনৈক নও-মুসলিম দিকে দিকে বিপ্লবের আগুন ছড়াইতে আরম্ভ করিল। সে পূর্বে ইহুদী ধর্মাবলম্বী ছিল এবং দক্ষিণ আরবের অধিবাসী ছিল। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর সে সরকার বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয় এবং একে একে বসরা, কুফা ও সিরিয়া হইতে নির্বাসিত হইয়া অবশেষে মিসরের জনসাধারণের মধ্যে অপপ্রচার আরম্ভ করে। তাহার মতে হজরত মুহম্মদ পুনরায় আবির্ভূত হইবেন,

আলীই তাঁহার প্রকৃত প্রতিনিধি। উসমান ছিলেন খিলাফতে অনধিকার চর্চাকারী। উসমানের প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ সকলেই অত্যাচারী। মুসলিম জগতের সর্বত্র অধর্ম ও জুলুমের রাজত্ব। উমাইয়াদের কর্তৃত্বের অবসান না হইলে রাজ্যে সত্য ও ন্যায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে না। মিসরের জনসাধারণের মধ্যে এই সকল মতবাদ প্রচার করিয়াই ইবন সাবা ক্ষান্ত হইল না। পত্রযোগে বিভিন্ন স্থানে এই সকল ভাবধারা প্রচার করা হইল। মিসর, কুফা ও বসরায় হজরত উসমানের বিরুদ্ধে ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক্রমে প্রবল আকার ধারণ করিল। রাজধানী মদীনায়ও অল্পসংখ্যক লোকই হজরত উসমানের অনুগত রহিল। হজরত আলী উসমানকে কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু ক্রমবর্ধমান অরাজকতার মুখে উসমান রক্তপাত ও যুদ্ধ-বিগ্রহ এড়াইয়া যাইতে চাহিলেন। অথচ তাঁহার এই নীতি অন্তিমে রক্তপাত ও বিদ্রোহ বন্ধ করিতে পারিল না। দৃঢ় ও কঠোর হস্তে একবার বিদ্রোহ দমন করিলে বিপদ এত গুরুতর আকার ধারণ করিত না।

খিলাফতের দ্বাদশবর্ষে বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করিল। হজরত উসমানের নিকটাত্মীয় ব্যতীত আর কেহই তাঁহাকে সমর্থন করিল না। মদীনার পথে ঘাটে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থিত হইল। হজরত উসমান হজ্জের পূর্বে রাজ্যের সর্বত্র ঘোষণা করিযা দিলেন যে, হজ্জের সময় প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ যথারীতি মদীনায় আগমন করিবেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের কোন অভিযোগ থাকিলে তাহারা যেন ঐ সময় খলীফার নিকট তাহা উপস্থাপিত করে। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় যেমন সচরাচর ঘটিয়া থাকে অভিযোগকারীরা কেহই তাহাদের অভিযোগ খলীফার সম্মুখে পেশ করিতে সাহস করিল না।

হজরত উসমানকে নানালোকে নানারকম উপদেশ দিল। কেহ বলিল, বিদ্রোহীদিগকে কঠোর হস্তে দমন করা উচিত; কেহ বলিল, শাসনকর্তাগণকে তাহাদের আচরণ সংশোধন করিতে হইবে: আবার কেহ বলিল, রাজ্যজয়েব জন্য বিদেশে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়া অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটান হউক। সিরিয়ার শাসনকর্তা মু'আবিয়া হজরত উসমানকে মদীনা ত্যাগ করিয়া দামিস্কে চলিয়া যাইতে অথবা মদীনায় খলীফার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দামিস্ক হইতে কিছু সৈন্য আনয়নের জন্য পরামর্শ দান কবিলেন। কিন্তু ধর্মপ্রাণ উসমান রসুলুল্লার নগরী ছাড়িয়া যাইতে

কিংবা সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করিয়া উক্ত নগরীর পবিত্রতা ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে অস্বীকার করিলেন।

ইতিমধ্যে চক্রান্তকারীরা সিদ্ধান্ত করিল যে, তাহারা একযোগে কুফা, বসরা ও ফুসতাত হইতে মদীনায় উপস্থিত হইয়া খলীফার নিকট তাহাদের দাবী-দাওয়া পেশ করিবে এবং সমস্বরে ইহার প্রতিকার দাবী করিবে। হজরত উসমান তাহাদের দাবী-দাওয়া মানিয়া না লইলে তাহারা তাঁহার পদত্যাগ দাবী করিবে। অচিরেই বিদ্রোহীরা মদীনার উপকন্ঠে শিবির সংস্থাপিত করিল। তাহারা মদীনাবাসীদের নিকট নগর-প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিল। আলী, তালহা ও জুবাইর বিদ্রোহীদিগকে কঠোরভাবে তিরস্কার করিলেন। মদীনার জনসাধারণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাহা-দিগকে বাধাদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। বিদ্রোহীরা খলীফার নিকট হইতে শাসন-সংস্কারের প্রতিশ্রুতি পাইয়া নগর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। অকস্মাৎ তাহারা প্রত্যাবর্তন করিল। হজরত আলী তাহাদের এই আচরণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল যে, তাহারা হজরত উসমানের একজন ভৃত্যের নিকট হইতে খলীফার সিলমোহরাঙ্কিত একটি ফরমান উদ্ধার করিয়াছে। উক্ত ভৃত্য ফরমানটি লইয়া দ্রুত মিসর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল; ইহাতে তাহাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর কারাদণ্ড, নির্যাতন ও মৃত্যুদণ্ডের আদেশ রহিয়াছে। হজরত আলী জানিতে চাহিলেন যে, কুফা, বসরা ও ফুসতাতে প্রত্যাবর্তনরত তিনটি দলের লোকেরা কিভাবে উক্ত খবর জানিতে পারিয়া আবার এক সঙ্গে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। বিদ্রোহীরা কোন যুক্তি-তর্ক মানিতে চাহিল না। হজরত আলী খলীফা উসমানকে উক্ত ফরমানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এইরূপ দলিলে সিলমোহর দিয়াছেন বলিয়া অস্বীকার করিলেন। বিদ্রোহীরা হজরত উসমানের সহিত তর্ক-বিতর্ক জুড়িয়া দিল এবং তাঁহার পদত্যাগ দাবী করিল। উসমান পদত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলে তাহারা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার ভয় দেখাইল। উসমান দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন, "আমি মৃত্যুই শ্রেয় মনে করি, কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আমার লোকেরা যুদ্ধ করিবে না। যদি যুদ্ধ করাই আমার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে আমি আমার পার্শ্বে বহু সৈন্যবাহিনী ডাকিয়া আনিতে পারিতাম।" পরবর্তী জুমার নামাজের সময় বিদ্রোহীরা মসজিদে গোলযোগ আরম্ভ করিল এবং খুৎবা পাঠরত খলীফাকে প্রস্তরাঘাতে

আহত করিল। ইহার পর তাহারা খলীফাকে তাঁহার প্রাসাদে ঘিরিয়া রাখিল। খলীফার অন্তরীণাবস্থায় আলী, তালহা ও যুবাইর তাঁহার অবস্থা জানিবার জন্য একবার খলীফার প্রাসাদে আগমন করিলেন কিন্তু মারওয়ান হজরত আলীকে এ সকল গোলযোগের জন্য দায়ী করিলেন, ইহাতে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

প্রাসাদের অবরোধ কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া অব্যাহত রহিল। বিদ্রোহীরা কাহাকেও বাহিরে আসিতে কিংবা ভিতরে যাইতে দিল না। এমন কি প্রাসাদে আবদ্ধ লোকেরা বাহির হইতে একটু পানিও পাইল না। ৩৫ হিজরীর ১৮ই জিলহজ্জ (১৭ই জুন, ৬৫৬ খ্রীঃ) বিদ্রোহীরা প্রাসাদ আক্রমণ করিল। যে সকল নাগরিক প্রাসাদ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা বেগতিক দেখিয়া প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। বিদ্রোহীরা প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া হজরত উসমানকে কুরআন পাঠরত অবস্থায় হত্যা করিল। হজরত উসমানের স্ত্রী নায়লা তাঁহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার কয়েকটি অঙ্গুলী কাটিয়া গেল। বার বৎসর খিলাফতের পর উসমান বিরাশি বৎসর বয়সে আততায়ীর হস্তে নিহত হইলেন। দয়ালু ও সরল প্রাণ খলীফা অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ সময়ে জনসাধারণের প্রিয়পাত্র হইয়া থাকিতে পারিতেন। বস্তুতঃ খিলাফতের প্রথমদিকে তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কিন্তু শেষের দিকে নানা কারণে পরিস্থিতি এত মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইল যে, হজরত উসমানের পক্ষে তাহা আয়ত্তে আনা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না।

জার্মান ঐতিহাসিক ওয়েল হাউসেনের মতে 'উসমানের হত্যা ইসলামের ইতিহাসের অন্য যে কোন ঘটনা হইতে অধিকতর যুগান্তকারী।'

উসমানের হত্যার পরিণতি

এই সর্বপ্রথম খলীফার রক্তে আততায়ীদের হস্ত কলঙ্কিত হইল। ইহাতে খিলাফতের পবিত্রতা ও খলীফার দৈহিক নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইল। পরবর্তীকালে উসমানের হত্যা খারিজী সম্প্রদায়ের মতবাদ রূপায়নে অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছিল। অযোগ্য খলীফার পদচ্যুতি অথবা হত্যা সম্পর্কে নানা মতবাদ গড়িয়া উঠিল।

উসমানের হত্যা মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের দ্বার উন্মোচিত করিল। এই গৃহযুদ্ধ একবার আরম্ভ হইলে আর কখনও বন্ধ হইল না। মুসলিম জমাতের ঐক্য বিনষ্ট হইল এবং খলীফা মুসলিম রাষ্ট্রের অবিসম্বাদিত নেতারূপে স্বীকৃতি পাইলেন না। এখন হইতে তরবারীর দ্বারাই খিলাফতের

অধিকার মীমাংসিত হইতে লাগিল। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য ইহা একটি জটিল পরিস্থিতি ছিল। ধর্ম-বিশ্বাস মতে তাঁহারা গৃহযুদ্ধে কোন দলে অংশ গ্রহণ সমীচীন মনে করিতে পারিলেন না। কারণ মুসলমান কর্তৃক মুসলমানের রক্তক্ষয় ধর্মে নিষিদ্ধ। আবার নিরপেক্ষ থাকিলেও তাঁহারা ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের প্রতিকূলে সংগ্রামের ধর্মীয় প্রত্যাদেশ লংঘন করিবেন। অচিরেই মুসলমানদের মধ্যে শিয়া, খারিজী ও অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল।

উসমানের হত্যার ফলে হজরতের পবিত্র নগরী মদীনার গুরুত্ব ও রাজনৈতিক প্রাধান্য ক্রমান্বয়ে নিঃশেষিত হইয়া আসিল। পরবর্তী খলীফা হজরত আলী কুফায় ও উমাইয়া খলীফা মুআবিয়া দামিস্কে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া মদীনার প্রাধান্যের অবসান ঘটাইলেন। খিলাফতের ঐক্য বিনষ্ট হইয়া পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল। ইহার ফলে রাজনীতিতে সাহাবাদের (হজরতের সঙ্গী) প্রাধান্য বিলুপ্ত হইল।

বিস্তারিত পাঠ্য

ম্যুর—কলিফেট, ইট্‌স্‌ রাইজ, ডিক্লাইন এণ্ড ফল
হিট্টি--হিস্ট্রি অব দি এরাব্‌স্‌
ওয়েল হাউসেন (মিসেস উইর)--এরাব কিংডম এণ্ড ইট্‌স্‌ ফল

১১

আলী মুর্তজা

(৬৫৬—৬৬১ খ্রীঃ)

খলীফা উসমানের হত্যা ইসলামের ইতিহাসে এক মর্মান্তিক ও শোচনীয় ঘটনা। মদীনায় কিছুদিন ধরিয়া ভয়াবহ অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। একজন মদীনাবাসী অতি সন্তর্পণে খলীফা-পত্নী নায়লার কর্তিত অঙ্গুলী ও খলীফার রক্ত-রঞ্জিত জামা দামিস্কে লইয়া গিয়া মুআবিয়ার হস্তে সমর্পণ করিল। খলীফার হন্তাগণ ঘটনার পঞ্চম দিবসে একজন খলীফা নির্বাচন প্রয়োজনীয় মনে করিয়া হজরত আলীকে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাইল। আলী নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হইলেন এবং ইসলামের চতুর্থ খলীফা হিসাবে স্বীকৃত হইলেন (২৩শে জুন, ৬৫৬ খ্রীঃ)। তালহা ও জুবাইর তাঁহার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলেন। ইহার পর অপরাপর সকলে হজরত আলীকে খলীফা বলিয়া মানিয়া লইল। বিদ্রোহীরা হজরত আলীকে খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত করিয়া তাহাদের কৃতকার্যতার সংবাদ আপন আপন দেশে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে কুফা, বসরা ও ফুসতাত অভিমুখে প্রস্থান করিল।

আলী খলীফা মনোনীত ২৩শে জুন, ৬৫৬

খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হজরত আলীকে কঠোর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। হজরত উসমানের হত্যাজনিত ত্রাস ও অরাজকতা শেষ হইতে না হইতেই নূতন সমস্যার উদ্ভব হইল। এতদিনে জনসাধারণ উপলব্ধি করিতে পারিল শান্ত ও নির্বিরোধ বৃদ্ধ খলীফার হত্যা মুসলমানদের জন্য এক দূরপনেয় কলঙ্ক-বিশেষ। তাই জনসাধারণের মধ্যে গুঞ্জন উঠিল এই মহাপাতকের শাস্তি বিধান সমাজ ও সরকারের অবশ্য কর্তব্য। একাধিক লোক এই জনপ্রিয় দাবীর সমর্থনে আওয়াজ তুলিলেন। কেহবা হজরত আলীকে বেকায়দায় ফেলিয়া স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য, আবার কেহবা ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার তাগিদে সরল বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া উসমানের হত্যাকারীদের সমুচিত শাস্তিবিধানের জন্য মুখর হইয়া উঠিল। বনু-উমাইয়া ও বনু-হাশিমের কলহ, বেদুঈনদের বিদ্রোহ-প্রবণতা আইন ও শৃঙ্খলার বন্ধনকে পূর্বেই শিথিল করিয়া ফেলিয়া-

ছিল। ইহার সহিত 'উসমান-হত্যার প্রতিশোধের' দাবী মিলিত হইয়া পরিস্থিতিকে জটিল ও ঘোরালো করিয়া তুলিল। সিরিয়ার শাসনকর্তা মু'আবিয়া উমাইয়া বংশের লোক ছিলেন। তিনি হাশিমী বংশের খলীফা আলীর নিকট উসমানের হত্যার প্রতিশোধ দাবী করিলেন।

শাসনকর্তা পরিবর্তন

হজরত উসমানের খিলাফতের শেষের দিকে রাজ্যের সর্বত্র শাসনকর্তা পরিবর্তনের দাবী উঠিয়াছিল। হজরত আলী মনে করিয়াছিলেন যে, জন-সাধারণের এই দাবী মানিয়া লইলেই নূতন শাসনকর্তাগণের সহযোগিতায় পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা সম্ভব হইবে। কিন্তু সকল শাসনকর্তার অপসারণ ও পদচ্যুতি তখনকার পরিস্থিতিতে সমীচীন কিনা তাহা তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই। বহু প্রবীণ ব্যক্তি হজরত আলীকে শাসনকর্তা পরিবর্তন না করিতে উপদেশ দিলেন। হজরত আলীর পিতৃব্য পুত্র আবদুল্লাহ-ইবন-আব্বাস তাঁহাকে বলিলেন যে, মু'আবিয়াকে সিরিয়া হইতে অপসারণ করা আদৌ যুক্তিযুক্ত হইবেনা কারণ মু'আবিয়া উসমান কর্তৃক নিযুক্ত হন নাই। তিনি হজরত উমর কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া সিরিয়ার জনসাধারণ তাঁহার একান্ত অনুগত। ইবন-আব্বাস আরও বলিলেন, রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে সময় ও সুযোগ বুঝিয়া পরে মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইবে। কিন্তু হজরত আলী এই সকল যুক্তি মানিতে চাহিলেন না। তিনি রাজ্যের সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তার অপসারণ তাঁহার শাসন-সংস্কারের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করিলেন এবং ইবন আব্বাসকেই সিরিয়ার শাসন-কর্তার পদে অধিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন। কিন্তু ইবন আব্বাস অসম্ভব জ্ঞানে তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন।

প্রাদেশিক শাসনকর্তা পরিবর্তন

হজরত আলী রাজ্যের সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তার অপসারণের আদেশ দিয়া প্রত্যেক প্রদেশে তাঁহার মনোনীত শাসনকর্তা পাঠাইলেন। প্রায় প্রত্যেক স্থলে ইঁহারা বিরূপ সম্বর্ধনা লাভ করিলেন। আলী যাঁহাদিগকে কূফা ও সিরিয়ায় প্রেরণ করিয়াছিলেন তাঁহারা নূতন পদে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে না পারিয়া প্রাণভয়ে মদীনায় পলায়নপর হইলেন। বসরার নূতন শাসনকর্তা লক্ষ্য করিলেন যে, জনসাধারণের মধ্যে আলী ও উসমানের সমর্থক দল প্রায় সমান সংখ্যক। মিসরের নব-নিযুক্ত শাসনকর্তা উসমানের হত্যাকারীদিগকে শাস্তিবিধান করিবার অঙ্গীকার সাপেক্ষে তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। হজরত

আলী তালহা ও জুবাইরের সহিত পরামর্শ করিয়া সিরিয়ায় মু'আবিয়ার নিকট ও কুফায় আবু মূসার নিকট আনুগত্যের শপথ দাবী করিয়া পত্র প্রেরণ করিলেন। আবু মূসা আলীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইলেন কিন্তু সিরিয়ার সহিত সকল যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া গেল এবং আলীর পত্রের কোন প্রত্যুত্তর আসিল না। অধিকন্তু মু'আবিয়া হজরত উসমানের রক্ত-রঞ্জিত জামা ও নায়লার কর্তিত অঙ্গুলী দামিস্কের মসজিদে দেখাইয়া উসমানের হত্যার প্রতিশোধের জন্য জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। এই সময় হজরত আলীর দূত সেখানে গিয়া পৌঁছিল। সিরিয়ায় দিনের পর দিন যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল, দূত তাহা প্রত্যক্ষ করিল এবং মু'আবিয়ার প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। অবশেষে মু'আবিয়া এক অদ্ভূত উত্তর পাঠাইলেন। পত্রে শিরোনামা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। হজরত আলী পত্রবাহককে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, দামিস্কে ষাট হাজার সৈন্য হজরত উসমানের জামার পার্শ্বে অশ্রু বিসর্জন করিতেছে এবং তাহারা হজরত আলীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। হজরত আলী ক্রুদ্ধ হইয়া মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আদেশ দিলেন। কিন্তু মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার পূর্বে হজরত আলীকে আরেকটি বিপদের সম্মুখীন হইতে হইল।

আলী ও মু'আবিয়ার মধ্যে যখন সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল, তখন তালহা ও জুবায়র মদীনা ত্যাগ করিয়া মক্কায় চলিয়া গেলেন। মক্কায় ইতিমধ্যে হজরত উসমানের হত্যার প্রতিশোধকামী জনসাধারণ সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। হজরত আয়িশা তখন মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনিও উসমানের হত্যায় নিতান্ত মর্মাহত হইয়া ইহার প্রতিকার দাবী করিলেন। এক্ষণে বিক্ষুব্ধ জনতা

বসরায় বিদ্রোহ

তালহা, জুবাইর ও আয়িশার নেতৃত্বে সমবেত হইল এবং তিন সহস্র লোক প্রথমে বসরা আক্রমণ করিবার জন্য যাত্রা করিল। বসরায় আলীর মনোনীত শাসনকর্তা ইবন হুনাইফ ও তালহা-জুবাইরের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা আরম্ভ হইল। বিদ্রোহী পক্ষ হইতে হজরত উসমানের হত্যাকারীদের শাস্তির দাবী করা হইল। প্রতিপক্ষ হইতে হজরত আয়িশার অন্তঃপুর ত্যাগ ও তালহা ও জুবাইর কর্তৃক আলীর প্রতি আনুগত্য ত্যাগের অভিযোগ করা হইল। তালহা ও জুবাইর প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, তাহাদিগকে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ

করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। এই সকল বাক-বিতণ্ডা হইতে হাতাহাতি ও যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং বিদ্রোহীরা জয়লাভ করিল। ইবন হুনাইফ বন্দী হইলেন। বসরা বিদ্রোহীদের দখলে আসিল। জনসাধারণ তালহা ও জুবাইর উভয়ের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিল। হজরত উসমানের হত্যার সহিত সংশ্লিষ্ট সকল লোককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। ইতিমধ্যে হজরত আলী বসরা আক্রমণ করিলেন।

হজরত আলী বসরার পথে যাত্রা করিয়া কুফায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসানকে সৈন্য সংগ্রহের জন্য পাঠাইলেন। কুফাবাসীরা তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়া বিপুল সংখ্যায় হজরত আলীর সহিত যোগদান করিল। এইভাবে দশ সহস্র সৈন্য লইয়া হজরত আলী বসরা আক্রমণ করিলেন। তালহা ও জুবাইর অনুরূপ সংখ্যক সৈন্যবাহিনী লইয়া হজরত আলীর মুকাবিলা করিলেন। হজরত আয়িশা একটি উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন। যুদ্ধের প্রারম্ভেই হজরত আলী তালহা ও যুবাইরের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন। হজরত উসমানের হত্যাকারীদের শাস্তির ব্যাপারে তিনি তাঁহাদের সহিত সম্পূর্ণ একমত বলিয়া প্রকাশ করিলেন এবং ইহার জন্য তিনি সময় চাহিলেন। এইভাবে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আশা লইয়া উভয়পক্ষ পরস্পরের শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

উষ্ট্রের যুদ্ধ, ডিসেম্বর ৬৫৬

কিন্তু হজরত আলীর সৈন্য দলে উসমানের হত্যার সহিত সংশ্লিষ্ট বহুলোক ছিল। তাহারা ভাবিল যে, যুদ্ধের সকল সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। তাই পরদিন প্রত্যুষে তাহারা অতর্কিতে তালহা ও জুবাইরের দলকে আক্রমণ করিল। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তালহা ও যুবাইর যুদ্ধে নিহত হইলেন। হজরত আয়িশার উষ্ট্রকে ঘিরিয়া বহুক্ষণ যুদ্ধ চলিল। অবশেষে তাঁহার উষ্ট্র আহত হইল এবং যুদ্ধ থামিয়া গেল। হজরত আলী আয়িশাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলেন। আয়িশা প্রথমে মক্কায় উমরা পালন করিলেন। অতঃপর মদীনায় অবসর যাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। ইহার পর তাঁহাকে আর কোন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে দেখা যায় নাই। উষ্ট্রের যুদ্ধে উভয় পক্ষে মোট দশ সহস্র মুসলমান নিহত হইল। আলী তাঁহার পিতৃব্যপুত্র আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসকে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া কুফার দিকে যাত্রা করিলেন। তিনি আর মদীনায় ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন না। কুফায় তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল।

উষ্ট্রের যুদ্ধ ৬৫৬ খ্রীঃ

কুফায় কিছুদিন হজরত আলীর শান্তিতে কাটিল। দূর-দারাজ হইতে লোকেরা নূতন রাজধানীতে আসিয়া তাঁহার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিল। কিছুদিন পর আলী একজন বেদুঈন সর্দারকে দামিস্কে মু'আবিয়ার নিকট এক পত্র লইয়া পাঠাইলেন। ইহাতে উষ্ট্রের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি মু'আবিয়াকে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন। কিছুকাল দূতকে অপেক্ষা করাইয়া মু'আবিয়া এক মৌখিক উত্তর পাঠাইয়া বলিলেন যে, হজরত উসমানের হত্যাকারীদের সমুচিত শাস্তিবিধান না হইলে তিনি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিবেন না। দূত হজরত আলীকে আরও জানাইল যে, সিরিয়াবাসীরা খলিফার হত্যাকারীদিগকে নিপাত না করিয়া পানি স্পর্শ করিবে না কিংবা শয্যায় শয়ন করিবে না বলিয়া বজ্রকঠোর শপথ গ্রহণ করিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া আলী মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। অচিরে ৫০,০০০ লোকের এক বিপুলবাহিনী তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইল। এই বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া আলী সিরিয়ার দিকে যাত্রা করিলেন। মু'আবিয়াও সংবাদ পাইয়া বিরাট দলবলসহ অগ্রসর হইলেন। সিফফীন নামক প্রান্তরে উভয় পক্ষ পরস্পরের মুকাবিলা করিল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে আলী পুনরায় শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আশায় মু'আবিয়াকে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন। কিন্তু মু'আবিয়া পূর্বের মতই উসমানের হত্যার বিচার দাবী করিলেন। অবশেষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আলী বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করিলেন। তাঁহার সেনাপতি আশ্‌তার প্রচণ্ডবেগে মু'আবিয়ার সৈন্যদের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া ফেলিল। মু'আবিয়ার সেনাপতি সুচতুর আমর-ইবনুল-আস্‌ পরাজয়ের গ্লানি এড়াইবার জন্য এক কৌশল আবিষ্কার করিলেন। তিনি মু'আবিয়ার সৈন্যগণকে বর্শা ফলকে কুরআনের পাতা ঝুলাইয়া শান্তি প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তাহারা তাঁহার উপদেশ মত বর্শার ফলকে কুরআনের পাতা ঝুলাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "আল্লার কানুন আমাদের মধ্যে মীমাংসক হউক।" আলী তাহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, ইহারা পরাজয়ের ভয়ে চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আলীর সৈন্যদল কুরআনের নামে আবেগপ্রবণ হইয়া উঠিল এবং যুদ্ধ বন্ধ না করিলে তাহারা আলীর পক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে বলিয়া ভয় দেখাইল। তাঁহার সেনাপতি আশতার যুদ্ধ বন্ধ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ ৬৫৭ খ্রীঃ

কিন্তু সৈন্যরা তুমুল বিক্ষোভ আরম্ভ করিল। অবশেষে অনেক অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে যুদ্ধ বন্ধ করিতে হইল। আলী ও মু'আবিয়ার পক্ষ হইতে একজন করিয়া সালিশ নিযুক্ত হইল। আলীর পক্ষ হইতে আবু মূসা আল্-আশআরী ও মুআবিয়ার পক্ষ হইতে চতুর আমর-ইবনুল-আস্ সালিশ নিযুক্ত হইলেন। হজরত আলী আবু মূসাকে সালিশ নিযুক্ত করিতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু এই ব্যাপারেও তাঁহাকে সৈন্যবাহিনীর মতানুসারে কাজ করিতে হইয়াছিল।

দুমার সালিশ ৬৫৮ খ্রীঃ

আলীর দলের বেদুঈন সৈন্যগণ যুদ্ধ বিরতির পর অন্যভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা ভাবিল সালিশগণ আলী ও মু'আবিয়ার মধ্যে এক-জনকে খলিফা সাব্যস্ত করিবেন। কিন্তু তাহাদের নালিশ ছিল কুরাইশদের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে। তাহারা ছিল সাম্য ও গণতন্ত্রের সমর্থক। কাজেই কুরাইশ বংশের যে কেহ খলীফা থাকুক না কেন, তাহাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হইবে না। এইরূপ ভাবিয়া আলীর সৈন্যবাহিনীর ১২০00 লোক মূল বাহিনী হইতে পৃথক হইয়া হারুরা নামক স্থানে শিবির সংস্থাপিত করিল। তাহারা এখন সালিশ নিযুক্তির বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করিল। ইহারাই পরবর্তীকালে খারিজী বা দলত্যাগী নামে অভিহিত হইল। ৬৫৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে দুমাতুল জন্দল নামক স্থানে সালিশদ্বয় মিলিত হইলেন। চতুর ও ধূর্ত আমর সরল প্রকৃতি আবু মূসাকে নানা যুক্তি-তর্ক জালে জড়াইয়া ফেলিলেন এবং কৌশলে নিজের অভিসন্ধি চরিতার্থ করিয়া লইলেন। আমর প্রথমে মু'আবিয়ার খিলাফতের দাবী লইয়া তর্ক জুড়িয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি কুরাইশ বংশের লোক, অন্যায়ভাবে নিহত হজরত উসমানের আত্মীয়। সুতরাং তিনি খিলাফতের প্রকৃত হকদার। আমর আবু মূসাকে মু'আবিয়ার অধীনে উচ্চপদের লোভ দেখাইলেন। কিন্তু আবু মূসা কিছুইতেই মু'আবিয়ার দাবী স্বীকার করিতে রাজী হইলেন না। আমর একে একে আরও অনেকের নাম প্রস্তাব করিলেন। অবশেষে আমর আবু মূসাকে তাঁহার ব্যক্তিগত মতের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আবু মূসা সরল বিশ্বাসে এই অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, আলী ও মু'আবিয়া উভয়কে পদচ্যুত করিয়া জনসাধারণের ইচ্ছানুসারে অন্য কাহাকেও খলীফা নিযুক্ত করা হউক। আমর খুশী হইয়া এই মতে সায় দিলেন এবং তাঁহারা বাহিরে অপেক্ষমান জনতার নিকট তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবার জন্য আগাইয়া

আসিলেন। তিনি প্রথমে আবু মূসাকে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে বলিলেন। আবু মূসা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিলেন যে, মুসলিম জগতের শান্তি ও নিরাপত্তার খাতিরে আলী ও মু'আবিয়া উভয়কে পদচ্যুত করা হউক এবং জনসাধারণের ভোটে তৃতীয় ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচিত করা হউক। অতঃপর আমর মঞ্চে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিলেন "আবু মূসা আলীকে পদচ্যুত করিয়াছে আমি কিন্তু মু'আবিয়াকে খিলাফতে অধিষ্ঠিত করিলাম, তিনি উসমানের উত্তরাধিকারী, তাঁহার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং খিলাফতের প্রকৃত দাবীদার।" সমবেত জনসাধারণ বজ্রাহতের মত আমরের ঘোষণা শ্রবণ করিল। প্রকৃতপক্ষে আলী ছিলেন খলীফা। দুমায় সালিশীর নামে প্রহসনের ফলে তাঁহারই ক্ষতি হইল সর্বাধিক। মু'আবিয়া ছিলেন একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তা। তিনি এক্ষণে খিলাফতের পদে আলীর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বসিলেন। সিরিয়ার লোকেরা তাঁহাকে খলীফা বলিয়া মানিয়া লইল। কিন্তু তিনি হজরত আলীর মৃত্যুর পূব পর্যন্ত প্রকাশ্যে খলীফা উপাধি গ্রহণ করিতে সাহস পান নাই। হজরত আলী কূফায় ফিরিয়া আসিয়া মু'আবিয়া, আমর ও তাঁহাদের দলের লোকদের নামে অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মু'আবিয়াও আলী, তাঁহার পুত্রদ্বয় ও সেনাপতি আশতারের নামে অনুরূপ অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

দুমার সালিশের রায় প্রকাশিত হওয়ার পরই আলী মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে মনস্থ করিলেন কিন্তু খারিজীদের বিদ্রোহের ফলে তাহা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। তাহারা 8000 লোক নাহরাওয়ান নামক স্থানে সমবেত হইল। আলী তাহাদিগকে নানাভাবে বুঝাইয়া শান্ত করিতে চাহিলেন এবং তাঁহার সহিত সিরিয়ায় মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে আহ্বান করিলেন। কিন্তু তাহারা নানাপ্রকার ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হইয়া নাগরিকদের জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিতে লাগিল। আলী নাহরাওয়ানে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলেন। ইহাদের কেহ কেহ পালাইয়া আত্মরক্ষা করিল কিন্তু অধিকাংশ লোক যুদ্ধে নিহত হইল। নাহরাওয়ানের যুদ্ধের পর আলী সিরিয়ায় যুদ্ধ যাত্রা করিতে চাহিলেন কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ অল্প সময়ের জন্য কূফায় ফিরিয়া যাইতে চাহিল কিন্তু একবার ফিরিয়া আসিলে তাহারা আর সিরিয়ায় যাইতে রাজী হইল না।

খারিজীদের বিদ্রোহ : নাহরাওয়ানের যুদ্ধ ৬৫৮ খ্রী:

আবু বকরের পুত্র মুহম্মদ মিসরে হজরত আলীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু মিসরে ক্রমশঃ মুআবিয়ার সমর্থকদল সংখ্যাধিক্য লাভ করিতেছিল। সিফফীনের যুদ্ধের পর মু'আবিয়া আমর ইবনুল-আসকে মিসর জয়ের জন্য পাঠাইলেন। হজরত আলী সেনাপতি আশতারকে মিসরে প্রেরণ করিলেন কিন্তু পথিমধ্যে একজন মিসরীয় সর্দার তাঁহাকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করেন। এই হত্যা মু'আবিয়ার প্ররোচনায় সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া সন্দেহ করা হয়। আমর ও মুহম্মদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মুহম্মদ নিহত হইলেন। আলী বহু চেষ্টা করিয়াও কূফা হইতে মুহম্মদের সাহায্যার্থে কোন সৈন্য পাঠাইতে পারিলেন না। কূফাবাসীরা তাহাদের নিষ্ক্রিয়তা ও ঔদাসীন্যের দ্বারা বারে বারে হজরত আলীর জন্য পরাজয়ের গ্লানি ডাকিয়া আনিল। মিসর মু'আবিয়ার অধিকারে চলিয়া গেল।

মিসরে বিদ্রোহ জুলাই, ৬৫৮

হজরত আলীর খিলাফতের শেষের দিকে বসরা ও পারস্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিল। দক্ষিণ পারস্যের খারিজী বিদ্রোহ তন্মধ্যে প্রধান। হজরত আলী বহু কষ্টে এই সকল বিদ্রোহ দমন করিলেন। সেনাপতি জিয়াদ এই সকল বিদ্রোহ দমনে হজরত আলীকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া মু'আবিয়াও সিরিয়া হইতে ইরাকে এবং আরবে বহুবার সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়া আলীকে বিব্রত করিতে চেষ্টা করিলেন। ৬৬০ খ্রিস্টাব্দে আলী ও মু'আবিয়া পরস্পরের সহিত শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। তাঁহারা একে অপরের রাজ্য আক্রমণ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা বিদ্রোহী খারিজীগণকে আরও উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তাহাদের খোদায়ী হুকুমত প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের বাস্তবায়ন বিলম্বিত হইবে মনে করিয়া তিনজন খারিজী ৪০ হিজরীর রমজান মাসে কাবাগৃহে পরস্পরের মধ্যে কঠোরভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল যে, তাহারা একই দিনে কুফা, দামিস্ক ও ফুসতাতের মসজিদে আলী, মু'আবিয়াও আমরকে বিষমাখা তরবারী দ্বারা ঘায়েল করিয়া হত্যা করিবে। তাহাদের মতে ইহারা তিনজনই মুসলিম জগতের যাবতীয় দুর্দশা ও অশান্তির জন্য দায়ী ছিল। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাহারা একযোগে এই তিনজনের প্রাণনাশের চেষ্টা করে। আমর অসুস্থতার জন্য ঐ দিন মসজিদে অনুপস্থিত ছিলেন। মু'আবিয়া মারাত্মকভাবে আহত

আলীর মৃত্যু, জানুয়ারী ৬৬১,

হইয়া প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন কিন্তু আলী আবদুর রহমান ইবন মুলজাম নামক খারিজী কর্তৃক আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের ইতিহাসে খুলাফা-ই-রাশিদীনের যুগের অবসান হয়।

ধার্মিক প্রবর হজরত আলী জ্ঞান গরিমায়, বিদ্যাবত্তায় ও বীরত্বে অতুলনীয় ছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে বহু যুদ্ধে তিনি অসীম সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া রসুলুল্লার নিকট হইতে আল্লার শার্দুল (আসাদুল্লাহ) উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বীরত্ব নিম্নলিখিত প্রবাদ বাক্যে রূপ লাভ করিয়াছে: লা সাইফা ইল্লা জুল-ফাকার ওয়ালা ফাতা ইল্লা আলী—জুল-ফাকারের মত তরবারী নাই, আলীর মত বীর নাই। তাঁহার বীরত্ব যেমন অতুলনীয় ছিল, তাঁহার জ্ঞানও তেমনি ছিল অপরিসীম। তাঁহার লেখনী খুরধার এবং বাগ্মীতা অসাধারণ ছিল। তিনি বন্ধুর প্রতি অকপট ও শত্রুর প্রতি মহানুভব ছিলেন। তাঁহার নামে আরবী ভাষায় বহু কবিতা, প্রবাদ-বাক্য, উপদেশাবলী ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। নাজাফে তাঁহার সমাধিতে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী ভিড় জমাইয়া থাকে। সুন্নীদের তিনি চতুর্থ খলীফা এবং শিয়াদের তিনি প্রথম ইমাম।

আলীর চরিত্র

বাস্তব জীবনে অকৃতকার্যতা

কিন্তু বাস্তব জীবনে হজরত আলীর জ্ঞান ও বীরত্ব তাঁহার কোন কাজে আসে নাই। তাঁহার খিলাফতের প্রথম হইতে সিরিয়ার শাসনকর্তা মুআবিয়া কৌশলে তাঁহার কৃতকার্যতার পথে নানা বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। মুআবিয়া নিজেকে খলীফা উসমানের আত্মীয় ও তাঁহার হত্যাকারীদের প্রতিশোধ গ্রহণকারী বলিয়া জনসমক্ষে প্রচার করিতে লাগিলেন। উসমানের হত্যার প্রতিকার না হইলে তিনি আলীর আনুগত্য স্বীকার করিবেন না বলিয়া স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন। হজরত আলী উসমানের হত্যাকারীদের অনুরোধে খিলাফতের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিলে তিনি খলীফা-হন্তাদের শাস্তি বিধান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন কিন্তু রাজ্যে ক্রমাগত অশান্তি বাড়িয়াই চলিল। সুযোগ বুঝিয়া মুআবিয়া

মুআবিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা

তাঁহার বিরুদ্ধে যাবতীয় কৌশল ও চাতুরী প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। বস্তুতঃ ছলচাতুরীতে আলী মু'আবিয়ার সমকক্ষ ছিলেন না।

হজরত আলী প্রাথমিক মুসলমানদের অন্যতম ছিলেন এবং খলীফা আবু বকর ও উমরের মতই ইসলামের মৌলিক নীতির অনুসারী ছিলেন। খিলাফতের পদকে তিনি ধর্মীয় পদ বলিয়া মনে করিতেন এবং ন্যায় ও সত্যের ভিত্তিতে উহা পরিচালনা করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু মু'আবিয়া ও তাঁহার সহকর্মীরা হজরত আলীর সহিত তাঁহাদের দ্বন্দ্বকে হাশিমী-উমাইয়া দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার লড়াই বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। তাই তাঁহারা হজরত আলীকে বিপর্যস্ত করিবার জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করিতে কুন্ঠাবোধ করেন নাই। সিফফীনের যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয়ের গ্লানি এড়াইবার জন্য আমরের পরামর্শে মু'আবিয়া কুরআনের নাম ভাঙ্গাইয়া যুদ্ধ বন্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রয়োজনমত উৎকোচ প্রদান ও বিষপ্রয়োগে মু'আবিয়া কার্যসিদ্ধি করিতেন।

হজরত আলী তাঁহার সেনাপতি, শাসনকর্তা ও কর্মচারিগণের নিকট টাকা পয়সার সঠিক হিসাব দাবী করিতেন। কিন্তু মু'আবিয়া এই সকল ব্যাপারে কোন বিশেষ কড়াকড়ি করিতেন না। এই জন্য হজরত আলীর নিকটাত্মীয়রাও মাঝে মাঝে তাঁহার উপর ক্ষুণ্ন হইত। অন্যপক্ষে কূটনীতিক মু'আবিয়া আরবদের মধ্যে সুচতুর ব্যক্তিগণকে টাকা পয়সার প্রলোভন ও পদমর্যাদার লালসা দেখাইয়া দলে টানিয়া লইয়াছিলেন।

হজরত আলী কুফায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন কিন্তু কুফার আরবগণ বিপদের সময় তাঁহাকে সাহায্য করিতে আগাইয়া আসে নাই। সিরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের জন্য বার বার অনুরোধ করিয়াও তিনি কুফাবাসীদের নিকট হইতে যথাযোগ্য সাড়া পান নাই। অন্যপক্ষে সিরিয়ায় মু'আবিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তি বহুকাল যাবৎ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সিরিয়াবাসীরা মু'আবিয়ার একান্ত অনুগত ছিল। তারপর সুচতুর আমরের সহযোগিতায় মিসর জয় করার পর তাঁহার ক্ষমতা আরও বাড়িয়া গেল।

দুমার সালিশীর ব্যাপারে খারিজীদের বিদ্রোহ হজরত আলীকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহারা হজরত আলীর পক্ষ ত্যাগ করিয়া বিদ্রোহী হওয়ায় আলীকে তাহাদের সহিত যুদ্ধে অনেক শক্তি ক্ষয় করিতে হইয়াছিল। এই সকল কারণে হজরত আলীর খিলাফতকাল দারুণ অশান্তিতে কাটিয়াছিল। অন্যপক্ষে মু'আবিয়া সিরিয়া ও মিসরে নিজের ক্ষমতা

সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া খিলাফতের পদ দখল করিবার জন্য সকল প্রস্তুতি সমাপ্ত করিলেন। হজরত আলীর মৃত্যুর পর তিনি নিজেকে সমগ্র মুসলিম জগতের খলীফা বলিয়া ঘোষণা করিলেন (৬৬১ খ্রীঃ)।

বিস্তারিত পাঠ্য

উইলিয়ম মুর--কলিফেইট
হিট্টি,--হিষ্ট্রী অব দি এরাব্‌স্
জুরজিজায়দান--তমদ্দুন ইসলাম, ৪র্থ খণ্ড

১২

খুলাফা-ই-রাশিদীনের যুগে রাজনীতি ও সমাজ

খুলাফা-ই-রাশিদীনের যুগ ইসলামের স্বর্ণযুগ।* এই যুগে যাঁহারা খিলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং যাঁহারা নানা শাসনকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন তাঁহাদের সকলেই হজরত রসুলের অত্যন্ত অনুগত ও অনুরক্ত ছিলেন। তাহাদের কাজকর্ম ও চাল-চলনে রসুলের দৃষ্টান্ত ও কুরআনের শিক্ষা সরাসরি প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। এই সময় ধর্ম, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়বিচারের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার সহিত পুরাতন বেদুঈন গুণাবলী, যেমন বীরত্ব ও সহিষ্ণুতা মিলিত হইয়া এই যুগের মুসলমানগণকে অজেয় করিয়া তুলিয়াছিল। তাই তাহারা মাত্র দশ বৎসরের ভিতর তাহাদের মরুভূমির অখ্যাতনামা বাসস্থান হইতে বহির্গত হইয়া দুর্বারগতিতে মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল অংশে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হয়।

রাজ্যজয়

প্রাথমিক মুসলমানদের রাজ্যজয় পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ইসলামের যাদুর মোহময় স্পর্শে সমগ্র আরবদেশ বীর যোদ্ধাদের লালনভূমিতে পরিণত হইল। খালিদ ইবন ওয়ালিদ, সাদ, আমর প্রভৃতি নাম যে কোন যুগের যে কোন জাতির গৌরবের বস্তু।

খলীফা

খুলাফা-ই-রাশিদীনের যুগে খলীফা ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা। তিনি জনসাধারণের সমর্থনক্রমে নির্বাচিত হইয়া তাহাদের নিকট যাবতীয় কার্যকলাপের জন্য জবাবদেহী হইতেন। খলীফার রাজকীয় বেশভূষা কিংবা দৌবারিক-প্রহরী ছিল না। জনসাধারণের জন্য তাঁহার দ্বার অবারিত ছিল। একজন দীনতম নাগরিক সরাসরিভাবে খলীফার নিকট তাহার অভিযোগ উত্থাপন করিতে পারিত কিংবা খলীফার আচরণের সমালোচনা করিতে পারিত। খলীফা রাষ্ট্রের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য শুরার (মন্ত্রণাসভা) পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। হজরত মুহম্মদের প্রধান সহচরগণ এই শুরার সদস্য ছিলেন। খলীফা খুব সাদাসিধা জীবনযাপন

* জুরজিজায়দান, তমদ্দুন ইসলাম, ৪থ খণ্ড, পৃঃ ২৭

করিতেন এবং শুরার সদস্যদের অনুমোদনক্রমে নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য সামান্য বৃত্তি গ্রহণ করিতেন। প্রথম খলীফা হজরত আবু বকরের মৃত্যুর পর তাঁহার ব্যক্তিগত তহবিলে মাত্র একটি দীনার পাওয়া গিয়াছিল। মৃত্যুর সময় তিনি অছিয়ত করিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি খলীফা থাকাকালীন যে অর্থ বৃত্তি বাবদ রাষ্ট্রীয় তহবিল হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের একখণ্ড জমি বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ যেন রাষ্ট্রীয় তহবিলে (বয়তুলমাল) প্রত্যর্পণ করা হয়।

খলিফাদের নীতি

কুরআনের অনুশাসন ও হজরত রসুলুল্লার জীবনাদর্শ মোতাবেক তাঁহারা শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। রাষ্ট্রীয় তহবিল বয়তুলমাল নামে অভিহিত হইত এবং ইহা জনসাধারণের সম্পত্তি ছিল। খলীফা জনসাধারণের নামে তাহাদের স্বার্থে এই তহবিল তদারক করিতেন। রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে ধর্মীয় নীতি এবং জনসাধারণের মঙ্গল খলীফার ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক স্বার্থের উপর প্রাধান্য পাইত।

ভ্রাতৃত্বের আদর্শ

ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ এই যুগে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হইয়াছিল। ইহারই কল্যাণে আরবগণ প্রাচীন গোত্রীয় বিভেদ ও দলাদলি ভুলিয়া একটি সাধারণতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইসলামী রাষ্ট্রে অভিজাত, অনভিজাত, প্রভু, ভৃত্য ও ধনী দরিদ্রের নাগরিক ও সামাজিক অধিকার সমান ছিল। আইনের চোখে সকলেই সমান ছিল। হজরত উমর মদ্যপানের অপরাধে আপন পুত্রকে ইসলামী আইন মোতাবেক শাস্তি বিধান করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। জাবাল্লা নামক একজন লোক সিরিয়ার গাস্সান রাজ বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া হজরত উমরের খিলাফতের সময় কাবা শরীফে তওয়াফ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তওয়াফের সময় একজন সাধারণ মুসলমান জাবালার কাপড় মাড়াইয়া দেওয়ায় জাবালা তাহাকে চপেটাঘাত করিয়াছিল। হজরত উমরের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি জাবালার এই আচরণের শাস্তিস্বরূপ উক্ত সাধারণ মুসলমানকে জাবালার গালে অনুরূপ চপেটাঘাত করার অনুমতি দান করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া জাবালা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়া নিজের দেশে ফিরিয়া যান। ইসলাম ধর্মের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বে যাহাদের আস্থা ছিল না তাহাদের জন্য মুসলমান সমাজে কোন স্থান ছিল না।

খুলাফা-ই-রাশিদীনের আমলেই সর্বপ্রথম মুসলিম রাষ্ট্রের কাঠামো সুনির্দিষ্ট

রূপ লাভ করে। হজরত উমরের শাসন ব্যবস্থায় আমরা ইহার পরিচয় পাই।

রাজ্যশাসন

জনসাধারণের সার্বিক মঙ্গল বিধান এই শাসন-ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল। হজরত উমরই সর্বপ্রথম প্রদেশ সমূহে প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজী নিযুক্ত করেন। তিনি জমির উৎপাদিকা শক্তির ভিত্তিতে রাজস্ব-ব্যবস্থা কায়েম করেন এবং সৈন্যবাহিনী সুগঠিত করেন। অমুসলমানদের (জিম্মীদের) অধিকার ও কর্তব্য সুনির্ধারিত করেন। খুলাফা-ই-রাশিদীনের আমলে হজরত উমরের শাসন-ব্যবস্থা অনুসারেই রাষ্ট্রশাসন পরিচালিত হইত। পরবর্তীকালে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের রাজ্যশাসন প্রণালী হজরত উমরের শাসন-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল।

খুলাফা-ই-রাশিদীনের শাসনামলে জনসাধারণের জীবনযাত্রা সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর ছিল। হজরত উমরের কঠোর অনুশাসনের ফলে আরবগণ

সমাজ জীবন

বিলাসব্যসন পরিহার করিয়া চলিত। মেয়েদের মধ্যে তখনও অবরোধ প্রথার সৃষ্টি হয় নাই। তাহারা অবাধে চলাফেরা করিতে পারিত এবং খলীফাগণের বক্তৃতা ও আলেমদের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিতে পারিত। কিন্তু চারিদিকে রাজ্য বিস্তারের ফলে সৈন্যবাহিনী ও সাধারণ লোকদের মধ্যে ক্রমশঃ সম্পদ বৃদ্ধির কারণে এই যুগের শেষের দিকে ক্রমশঃ জীবন-যাত্রার মান উন্নত হইতে থাকে এবং অনেকের মধ্যে জাঁকজমক ও বিলাসিতা পরিলক্ষিত হয়।

বিস্তারিত পাঠ্য

সৈয়দ আমীর আলী,-হিস্ট্রী অব সারাসেন্‌স্
জুরজিজায়দান,-তমদ্দুন ইসলাম, ৪র্থ খণ্ড

১৩

উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মু'আবিয়া

(৬৬১ খ্রীঃ—৬৮০ খ্রীঃ)

হজরত আলীর মৃত্যুর পর কূফার জনসাধারণ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হাসানকে খলীফা নির্বাচিত করিল। মু'আবিয়া হজরত আলীর জীবদ্দশায়ই সিরিয়া ও মিসরে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। হজরত আলীর মৃত্যুতে তিনি সমগ্র মুসলিম জগতের খিলাফত দাবী করিলেন এবং হাসানের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ইরাকে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন। হাসান তাঁহার বিশ্বস্ত সেনাপতি কয়েসকে ১২০০০ সৈন্যের এক বাহিনীসহ মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন এবং অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনী সহ স্বয়ং মাদায়িনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে এক গুজব রটিল যে, মু'আবিয়ার সহিত যুদ্ধে কয়েস পরাজিত ও নিহত হইয়াছেন। ইহাতে মাদায়িনে

হাসানের খিলাফত ত্যাগ

হাসানের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তাহারা হাসানের শিবির লুন্ঠন করিয়াই নিরস্ত হইল না বরং তাঁহাকে মু'আবিয়ার হাতে ধরাইয়া দিয়া সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য চেষ্টিত হইল। হাসান তাঁহার অনুগামীদের এই বিসদৃশ আচরণে মনক্ষুণ্ণ হইয়া খিলাফতের দাবী প্রত্যাহার করিয়া মু'আবিয়ার সহিত সন্ধি করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি মদীনায় শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন এবং এই মর্মে প্রস্তাব করিলেন যে, কুফায় তাঁহার পিতার যে ধন-ভাণ্ডার রহিয়াছে তাহা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং পারস্যের একটি এলাকার রাজস্ব তাঁহার জন্য নির্ধারিত করিতে হইবে। মু'আবিয়া হাসানের এই দাবী মানিয়া লইয়া তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এইভাবে মাত্র পাঁচ ছয় মাস খিলাফতে অধিষ্ঠিত থাকার পর হাসান কুফা ত্যাগ করিয়া মদীনায় চলিয়া গেলেন। মু'আবিয়া কুফায় প্রবেশ লাভ করিয়া পূর্বাঞ্চলের প্রদেশসমূহের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিলেন এবং মুসলিম জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী খলীফা হিসাবে দামিস্কে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখন হইতে দামিস্ক মুসলিম জগতের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করিল। হাসান মদীনায় আপন পরিবারবর্গসহ শান্তিতে বসবাস করিতে লাগিলেন। অনধিক আট বৎসরকাল এইভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর

তাঁহার এক স্ত্রী তাঁহাকে বিষ প্রয়োগে নিহত করেন। এই হত্যায় উমাইয়াগণের ষড়যন্ত্র ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।

মু'আবিয়ার শাসনকালে মুসলিম রাজ্য শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। হজরত উসমানের হত্যার পর হইতে মুসলিম জগতে যে আভ্যন্তরীণ বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা চলিয়া আসিতেছিল মু'আবিয়া দৃঢ়হস্তে তাহা দমন করিয়া রাজ্যে পুনরায় শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনেন। এই ব্যাপারে তিনি কয়েকজন সুযোগ্য শাসক ও রাজনীতিকের সমর্থন ও সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল সুযোগ্য শাসকের মধ্যে আমর, মুগীরা ও জিয়াদের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

আমর

ইঁহারা তায়িফের সাকিফ গোত্রের লোক। আমর সিফীফনের যুদ্ধে মু'আবিয়াকে নিশ্চিত পরাজয়ের হাত হইতে রক্ষা করেন। তাঁহার ধূর্ততার সাহায্যে তিনি প্রতিপক্ষকে যুদ্ধ থামাইতে বাধ্য করিলেন এবং কূটনৈতিক বুদ্ধিতে আলীর প্রতিনিধিকে দুমার সালিশে পরাভূত করিয়া আলীর জন্য বিপদ ডাকিয়া আনিলেন। অতঃপর মিসরে আলীর শাসনকর্তাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া তিনি সেখানে মু'আবিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

মুগীরা

মু'আবিয়া মুগীরাকে বিদ্রোহ-প্রবণ কুফা নগরীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি দক্ষতার সহিত কুফার শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

জিয়াদ

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের মধ্যে জিয়াদ ছিলেন সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ ও দূরদর্শী। জিয়াদ হজরত আলীর অধীনে বসরা ও পারস্যের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি প্রথমে মু'আবিয়ার বশ্যতা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। অবশেষে মুগীরার মধ্যস্থতায় জিয়াদ ও মু'আবিয়ার মধ্যে সমঝোতা স্থাপিত হয়। মু'আবিয়া জিয়াদকে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে আপন ভাই বলিয়া স্বীকৃতি দান করিলেন। জিয়াদের সুযোগ্য শাসনে বসরায় শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। মুগীরার মৃত্যুর পর জিয়াদ কুফার শাসনকর্তৃত্বও লাভ করেন। উত্তরে অক্ষু নদী হইতে পূর্বে সিন্ধু নদী পর্যন্ত এবং দক্ষিণে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল তাঁহার শাসনাধীন ছিল। তিনি কুফা ও বসরায় বিভিন্ন শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করেন। কুফার সৈন্য-বাহিনীকে তিনি চারিভাগে ভাগ করিয়া প্রতি বিভাগের উপর একজন সরকারী সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে বিভিন্ন গোত্রের লোকদিগকে একত্র করিয়া এক এক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং

গোত্রীয় দলাদলি ও প্রাধান্যের বিলোপ সাধনের জন্য ইহাদের কর্তৃত্ব গোত্রীয় প্রধানদের উপর ন্যস্ত না করিয়া সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীর উপর ন্যস্ত করা হয়। অনুরূপভাবে বসরায় পাঁচটি সামরিক বিভাগের সৃষ্টি করা হয়। গোত্রীয় দলাদলি নিরসনের জন্য জিয়াদ অনেকগুলি কূফী ও বসরী পরিবারকে খুরাসানে বসবাস করিতে উৎসাহিত করেন।

রাজ্যবিস্তার

মু'আবিয়ার শাসনামলে পূর্বাঞ্চলে ও আফ্রিকায় রাজ্যবিস্তার ঘটে। হিরাত ও কাবুলে পুনরায় খলীফার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। গজনী, বল্খ্ ও কান্দাহারে অভিযান প্রেরিত হয়। ৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে জিয়াদের এক পুত্র অক্ষুনদী অতিক্রম করিয়া বুখারা অধিকার করেন। দুই বৎসর পর অপর সেনাপতি সমরকন্দ ও তিরমিজ দখল করেন। মিসরের শাসনকর্তা আমর ৬৬১ সালে 'উক্বাকে উত্তর আফ্রিকার বার্বারদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। উক্বা এই অঞ্চলের বার্বারগণকে পরাজিত করিয়া সেখানে খলীফার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ৬৭০ খ্রীস্টাব্দে মু'আবিয়া উক্বাকে ১০,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী দ্বারা শক্তিশালী করেন এবং ঐ বৎসরই উকবা তিউনিসের দক্ষিণে প্রসিদ্ধ সামরিক বন্দর কায়রোয়ান দখল করেন। এই নগর তখন হইতে উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হইল। ৬৭৫ খ্রীস্টাব্দে উকবা পশ্চিমদিকে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেন এবং একে একে আফ্রিকার শহরগুলি অধিকার করিয়া আটলান্টিক সাগরের তীরে উপস্থিত হইলেন। সমুদ্রের উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা তাঁহার ও তাঁহার অশ্বের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহার অশ্ব আবক্ষ নিমজ্জিত হইয়া পড়িল। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন:

উকবার আফ্রিকা বিজয়

"হে সর্বশক্তিমান প্রভু, যদি মহাসমুদ্র আজ আমাকে বাধা প্রদান না করিত, তবে আরও দূর দূরান্তে তোমার নামের মহিমা প্রচার করিতাম এবং তোমার শত্রুগণকে আঘাত করিতাম।"

আলী ও মু'আবিয়ার মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলিতে থাকাকালীন বাইজান্টাইন সীমান্তে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ ছিল। বার্বারদের সহিত যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া গ্রীকগণ মুসলিম রাজ্যে প্রবেশ লাভ করে কিন্তু তাহারা মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়। মুসলমানগণ আর্মিনিয়ায় শীত যাপন করে এবং জলপথে ও স্থল পথে যুদ্ধ পরিচালনা করে। ৬৭০ খৃস্টাব্দে কনষ্টান্টিনোপলের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হয়। এই যুদ্ধে মু'আবিয়ার পুত্র ইয়াজীদ সাহায্যকারী সৈন্য লইয়া পরে

বাইজাণ্টাইনদের সহিত যুদ্ধ

যোগদান করেন। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। মুসলমানগণকে দূরদেশে অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। গ্রীকগণ 'গ্রীক অগ্নি' (Naptha) ব্যবহার করিয়া শহরের নিরাপত্তা রক্ষা করে। ইহার পরও মু'আবিয়া হতোদ্যম হন নাই। তিনি প্রায় প্রতি বৎসর কনষ্টান্টিনোপলের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। ৬৭৩ খ্রীস্টাব্দে কনষ্টান্টিনোপলের নিকটস্থ সিজিকাস (Cyzicus) দ্বীপ অধিকৃত হয় এবং সাত বৎসর যাবৎ মুসলমানগণ ঐ দ্বীপ নিজেদের অধিকারে রাখিতে সক্ষম হয়। মু'আবিয়ার পুত্র ইয়াজীদের রাজত্বকালে এই দ্বীপ আবার গ্রীকদের অধিকারে চলিয়া যায়।

মু'আবিয়া লক্ষ্য করিলেন যে, হজরত উসমানের মৃত্যুর পর হইতেই খলীফা নির্বাচন লইয়া গৃহ-বিবাদ ও দলাদলি অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে।

উত্তরাধিকারী মনোনয়ন

মুসলিম জগতের ঐক্য বিনষ্ট হইয়াছে এবং যে মদীনার আনসার ও মুহাজিরগণ খলীফা নির্বাচনে অগ্রগামী ভূমিকা গ্রহণ করিতেন, সে মদীনা এখন আর মুসলিম রাজ্যের রাজধানী নাই। আলীর সহিত তালহা ও জুবাইরের যুদ্ধ এবং হজরত উসমানের হত্যার প্রসঙ্গ লইয়া আলীর সহিত তাঁহার বিবাদের অনুরূপ ঘটনা মুসলিম রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যাহত করিতে পারে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া এবং প্রধানতঃ খিলাফতের পদ নিজের বংশে স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার পুত্র ইয়াজীদকে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি নিজের জীবদ্দশায় জনসাধারণের নিকট হইতে ইয়াজীদের প্রতি আনুগত্যের শপথ (বাইআত) গ্রহণ করাইয়া খিলাফতে তাঁহার উত্তরাধিকার সুনিশ্চিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান সহকারী জিয়াদ ও মুগীরা উভয়েই এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। ইঁহাদের উভয়ের মৃত্যুর পর ৬৭৬ খৃস্টাব্দে মু'আবিয়া জনসাধারণের সমর্থনের বিষয় স্থির নিশ্চিত হইয়া তাঁহার সিদ্ধান্তের কথা জনসমক্ষে ঘোষণা করেন। তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী সকল প্রদেশ ও প্রধান নগরী হইতে প্রতিনিধিসমূহ দামিস্কে আসিয়া সমবেত হইল। ইহারা সকলেই ইয়াজীদের প্রতি ভাবী খলীফা হিসাবে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। সিরিয়া ও ইরাক এইভাবে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিল। অতঃপর মু'আবিয়া এক সহস্র অশ্বারোহীসহ বাহ্যতঃ উমরা পালনের জন্য মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। কিন্তু তাঁহার আসল উদ্দেশ্য ছিল ইয়াজীদের উত্তরাধিকার ব্যাপারে মক্কা ও মদিনাবাসীদের সমর্থন লাভ। প্রথমে তিনি মদীনায় গমন করেন। মদীনার

প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ, যেমন—আলীর পুত্র হুসাইন, আবু বকরের পুত্র আবদুর রহমান, উমরের পুত্র আবদুল্লাহ্ ও জুবাইরের পুত্র আবদুল্লাহ মদীনা ত্যাগ করিয়া মক্কায় চলিয়া যান। অবশিষ্ট নাগরিকগণ ইয়াজীদের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিল। ইহার পর মু'আবিয়া মক্কায় গিয়া উমরা পালন করিলেন। তারপর তিনি এক বক্তৃতায় তাঁহার আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া মক্কাবাসীদের সহযোগিতা কামনা করিলেন। প্রথমে আবদুল্লাহ ইবন জুবাইর আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিলেন যে, উত্তরাধিকারী মনোনয়ন পূর্ববর্তী সকল রীতির বিরোধী। ইহার পর সকলে বলিয়া উঠিলেন, এই ব্যাপারে তিনটি নিয়ম এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। প্রথমতঃ হজরত মুহম্মদ তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ব্যাপার মদীনার জনসাধারণের হাতে ছাড়িয়া যান। দ্বিতীয়তঃ, হজরত আবু বকর উমরকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন অথচ উমর তাঁহার কোন আত্মীয় ছিলেন না। তৃতীয়তঃ হজরত উমর এক নির্বাচকমণ্ডলীর হাতে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ভার অর্পণ করেন। মদীনার প্রধান ব্যক্তিগণ মু'আবিয়াকে এই তিন পন্থার যে কোন একটি পন্থা অনুসরণ করিতে বলেন। মু'আবিয়া ইঁহাদের সহিত নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া বিফল মনোরথ হইলেন; পরিশেষে তরবারীর ভয় দেখাইয়া আনুগত্য আদায় করিলেন।

মৃত্যু এপ্রিল, ৬৮০

মু'আবিয়া দীর্ঘকাল শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত রাজত্ব করিয়া ৭৫ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিশ বৎসর খলীফা হিসাবে শাসন করিয়া তিনি উমাইয়া বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। মু'আবিয়া তীক্ষ্ণধী, বিদ্বান, অসীম ধৈর্যশীল, বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ

চরিত্র ও কৃতিত্ব

ও বাগ্মী ছিলেন। ঐতিহাসিক আল-মাসউদী তাঁহার দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার একটি বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন:—

"মু'আবিয়া দিনে ও রাত্রিতে পাঁচবার সাধারণকে প্রবেশের অনুমতি দিতেন। প্রভাতে ফজরের নামাজ পড়িয়া তিনি গাল্পিকের নিকট গল্প শ্রবণ করিতেন। তৎপর কুরআন পড়িয়া দরবারে বসিতেন এবং মন্ত্রীদের সহিত রাজকার্যের বিষয় আলোচনা করিতেন। তারপর সামান্য প্রাতরাশ গ্রহণ করিতেন। তারপর মসজিদে একটি বেষ্টনীর মধ্যে চেয়ারে বসিয়া সর্বসাধারণের অভিযোগ শ্রবণ করিতেন। তারপর পুনরায় প্রাতরাশ গ্রহণ করিতেন। ঐ সময় সচিব তাঁহাকে চিঠিপত্র

পাঠ করিয়া শুনাইতেন। তারপর অভাবগ্রস্তদিগকে খাওয়ান হইত। জোহরের নামাজ পড়িয়া তিনি বিশেষ বিশেষ লোককে প্রবেশের অনুমতি দিতেন। ইহারা তাঁহার জন্য উপঢৌকন লইয়া আসিতেন। এই মজলিসে আবার তিনি মন্ত্রীদেরকে উপদেশ দিতেন। আসরের নামাজের পর আবার সাধারণের জন্য তিনি দরবারে বসিতেন। ইহার পর সান্ধ্যভোজ হইত। তারপর মগরিবের নামাজ পড়িতেন। এশার নামাজের পর আবার বিশেষ বিশেষ লোকদের জন্য দরবারে বসিতেন। তারপর রাত্রির এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত আরব ও অন্যান্য দেশীয় রাজা বাদশাহদের কাহিনী শুনিতেন। তারপর সামান্য মিষ্টি খাইয়া শয়ন করিতেন।"

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ অভিযোগ করেন যে, মু'আবিয়া খিলাফত-প্রজাতন্ত্রকে রাজতন্ত্রে (মুল্‌ক) পরিবর্তিত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার নিজ বংশে খিলাফতকে বংশানুক্রমিক করিবার জন্য স্বীয়পুত্র ইয়াজীদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। এইভাবে তিনি জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত খিলাফতের পরিবর্তে মুসলিম জগতে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ববর্তী খলীফাগণ সাদাসিধাভাবে চলাফেরা করিতেন এবং নির্বিঘ্নে যেখানে সেখানে গমন করিতেন কিন্তু মু'আবিয়া রাজা বাদশাহদের মত দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। মসজিদে তাঁহার জন্য একটি বিশেষ বেষ্টনী ছিল। তিনি সেখানে থাকিয়া নামাজ পড়িতেন। হজরত আলীর হত্যার পর সাবধানতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন। তিনি বয়তুলমাল বা সরকারী তহবিলকে নিজের ব্যক্তিগত তহবিলে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ববর্তী খলীফাগণ এই তহবিলকে সর্বসাধারণের সম্পত্তি হিসাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন এবং নিজেদের খরচ-পত্রের জন্য একটি নির্দিষ্ট ভাতা গ্রহণ করিতেন। এই সকল কারণে সনাতনধর্মী মুসলমানগণ মু'আবিয়াকে ভাল চক্ষে দেখিতে পারেন না। ঐতিহাসিকগণ এইজন্য তাঁহার প্রশংসার চেয়ে তাঁহার নিন্দাবাদই বেশী করিয়াছেন।

উপরোক্ত অভিযোগ কমবেশী সত্য হইলেও মুআবিয়া যে, একজন যুগোপযোগী সুদক্ষ শাসক ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি যখন খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তখন মুসলিম রাষ্ট্রের অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও

দলাদলি চরম আকার ধারণ করিয়াছিল। যে পবিত্র ধর্মবন্ধন মুসলমান জাতি ও মুসলিম রাষ্ট্রকে একক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছিল। এই আবহাওয়ায় মু'আবিয়াকে রাষ্ট্রীয় সংহতির জন্য নবতর ভিত্তির অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তবুও এই কথা মনে করা ভুল হইবে যে, তিনি রাষ্ট্রের ধর্মীয় ভিত্তিকে সম্পূর্ণ উড়াইয়া দিয়াছিলেন কারণ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে তিনি ধর্মের যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানে নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। পরবর্তী আব্বাসীয় খলীফা হারুনুর রশীদের মত তিনি বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধাভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং এই যুদ্ধে তিনি গাজী অর্থাৎ ধর্মযোদ্ধার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ববর্তী খলীফাদের মত জুমা-জামাতে ইমামতী করিতেন।

রাষ্ট্রের ধর্মীয় ভিত্তি

তিনি বাস্তবধর্মী শাসক হিসাবে রাষ্ট্রের উল্লিখিত ধর্মীয় ভিত্তির সহিত আরও অনেক জাগতিক ও ব্যবহারিক রীতিনীতির যোগাযোগ সাধিত করেন। তাঁহার রাষ্ট্রীয় শক্তির মূল উৎস ছিল এক সুশিক্ষিত ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী। সিরিয়াবাসীরা এই সেনাবাহিনীতে যোগদান করিয়া তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল। ইরাকের লোকেরা তাহাদের খলীফাকে বার বার সঙ্কট সময়ে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। হজরত আলী ও তাঁহার পুত্র হাসান লঘুচিত্ত ও বিশ্বাসঘাতক কূফাবাসীদের নিষ্ক্রিয়তার জন্যই অনেক কষ্টভোগ করিয়াছিলেন কিন্তু সিরিয়াবাসিগণ সর্বদা মু'আবিয়াকে অকুন্ঠভাবে সমর্থন করিয়াছিল। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়েল হাউসেনের মতে সিরিয়ায় রোমক সাম্রাজ্য ও খ্রীস্টধর্মের ঐতিহ্য সিরিয়াবাসীদিগকে রাজভক্ত করিয়া তুলিয়াছিল অন্যপক্ষে ইরাকের অধিবাসিগণের সেইরূপ কোন ঐতিহ্য ছিল না।

রাষ্ট্রের নবতর ভিত্তি

শাসন-নীতি

মু'আবিয়া রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। ঐতিহাসিক ফখরী বলেন, "যেখানে ধৈর্যের প্রয়োজন সেখানে তিনি ধৈর্যশীল ছিলেন, যেখানে কঠোরতার প্রয়োজন--সেখানে তিনি কঠোর ছিলেন; কিন্তু ধৈর্যই তাঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।" যেখানে শক্তি প্রয়োগ নিতান্ত প্রয়োজন, সেখানেই কেবল তিনি শক্তি প্রয়োগ করিতেন। কথিত আছে, মু'আবিয়া বলিতেন, "যেখানে চাবুকের ব্যবহার যথেষ্ট, সেখানে আমি আমার তরবারি ব্যবহার করি না, যেখানে বাক্যপ্রয়োগ যথেষ্ট, সেখানে

চাবুকও প্রয়োগ করি না। যদি আমার সহচরদের সহিত চুলের মত সূক্ষ্মতম বন্ধনও অবশিষ্ট থাকে, আমি ইহাকে ছিন্ন হইতে দেই না। যখন সে সজোরে টানে, তখন আমি ঢিল দেই, আর যদি সে ঢিল দেয়, তখন আমি টানি।" মু'আবিয়া নিজের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন। কুরাইশ বংশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে তিনি নানা উপাচারে সন্তুষ্ট রাখিতেন। একবার তিনি কোন 'আনসার'কে ৫০০ স্বর্ণ-মুদ্রা উপহার পাঠাইয়াছিলেন। আনসার আপন পুত্রকে ঐ মুদ্রাসহ মু'আবিয়ার নিকট এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, সে যেন মু'আবিয়ার মাথার উপর তাহা ছুঁড়িয়া মারে। পুত্রটি মু'আবিয়ার অনুমতিক্রমে ঐ মুদ্রা পিতার আদেশমত মু'আবিয়ার মাথায় ছুঁড়িয়া মারিল। মু'আবিয়া তখন ঐ মুদ্রা দ্বিগুণ করিয়া আনসারের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহার এইরূপ ব্যবহারের জন্যই আনসার ও মুহাজিরগণের পুত্ররা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল।

মু'আবিয়া শাসন ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করেন। তিনি বাইজান্টাইন শাসন-ব্যবস্থার অনুকরণে সিরিয়াবাসীদের সহযোগিতায় একটি সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। এই রাজকীয় শাসন ব্যবস্থার সহিত তিনি আরবীয় পদ্ধতির যোগাযোগ সাধন করেন। তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত ও মনোনীত আরব নেতাদের সহিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজের ইচ্ছা বলবৎ ও কার্যকরী করিতে চেষ্টা করেন। কাজেই তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে রাজাও ছিলেন না। একজন বাইজান্টাইন লেখক মু'আবিয়াকে উপদেষ্টা মণ্ডলীর প্রধান (First Councillor) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মু'আবিয়া তাঁহার শাসন ব্যবস্থায় দুইটি নূতন বিভাগ প্রবর্তন করেন। ইহার একটি হইল বারিদ (ডাক বিভাগ)। তেজী ঘোড়া অদল বদল করিয়া এই ব্যবস্থা চালু হইত এবং ইহার সাহায্যে দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদান সম্ভব হইত। অপরটি হইল রেজিষ্টারী বিভাগ (দীওয়ানুল খাতাম)। যখন খলীফার তরফ হইতে কোন ফরমান বা প্রত্যাদেশ বাহিরে প্রেরণ করা হইত তখন এই বিভাগে ইহার একটি নকল রাখিয়া দেওয়া হইত। সরকারী চিঠিপত্রের জাল আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে সরকারী দলীল-পত্রাদির বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য মু'আবিয়া এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

শাসন-ব্যবস্থা

মু'আবিয়া সর্বপ্রথম আরব নৌবহর গঠন করেন। সিরিয়ায় বাই-জান্টাইনগণ কর্তৃক পরিত্যাক্ত জাহাজের কারখানাগুলির সদ্ব্যবহার করিয়া

মু'আবিয়া আরব নৌবহর সৃষ্টি করেন। হজরত উসমানের সময় ৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি সিরিয়ার প্রাদেশিক শাসনকর্তা তখনই তিনি বাই-জান্টাইনদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম নৌযুদ্ধে জয়লাভ করেন। তিনি কনষ্টান্টি-নোপলের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার প্রত্যেকটির সহিত নৌ-বাহিনীও প্রেরিত হইত।

মু'আবিয়া তাঁহার রাজ্যের কয়েস বংশীয় ও ক'ল্ব্ বংশীয় যুযুধান আরব-দের মধ্যে ক্ষমতাসাম্য রক্ষার চেষ্টা করিতেন। তিনি নিজে কয়েস বংশীয় হইলেও কাল্ব্ বংশের স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলন এবং ঐ স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র ইয়াজীদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া উভয় গোত্রকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করেন। তিনি তাঁহার খ্রীস্টান প্রজাদের প্রতি সহনশীল ও উদার ছিলেন। তিনি খ্রীস্টানগণকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার একজন খ্রীস্টান উপদেষ্টা ছিল, তাঁহার চিকিৎসক ছিলেন খ্রীস্টান এবং সভাকবিও খ্রীস্টান ছিলেন। ভূমিকম্পে বিনষ্ট হইয়া যাওয়ার পর তিনি এডেসার গির্জাকে পুনর্নির্মাণ করেন। মেরনাইট ও জেকবাইট খ্রীস্টানগণ নিজেদের বিবাদ মীমাংসার জন্য খলীফাকে সালিশ মানিত।

বিস্তারিত পাঠ্য

হিট্টি---হিষ্ট্রী অব দি এরাব্স্
ম্যুর: হিষ্ট্রী অব দি কলিফেইট
আল-ফখ্রী, আদাবুস সুলতানিয়া ওয়াদ-দুযালুল-ইসলামিয়া
ওয়েল হাউসেন, এরাব কিংডম এণ্ড ইট্স্ ফল

১৪

কারবালার শোচনীয় হত্যাকাণ্ড

মু'আবিয়ার মৃত্যু যখন আসন্ন তখন তিনি মৃত্যুশয্যা হইতে পুত্র ইয়াজীদের উদ্দেশ্যে উপদেশ রাখিয়া যান। ইয়াজীদ তখন শিকারের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিলেন। মু'আবিয়া বলেন, "কুরাইশ বংশের চারি ব্যক্তি ব্যতীত আর কাহারও নিকট হইতে তোমার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভয় করি না। ইঁহারা হইলেন, আলীর পুত্র হুসায়ন, উমরের পুত্র আবদুল্লাহ, জুবায়রের পুত্র আবদুল্লাহ ও আবু বকরের পুত্র আবদুর রহমান। উমরের পুত্রকে ধর্মভীরুতা সম্পূর্ণ পাইয়া বসিয়াছে, তিনি যদি সর্বশেষ লোক হন তবে তিনি তোমার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিবেন। আলীর পুত্র হুসায়ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ লোক নহেন, ইরাকের লোকেরা তাঁহাকে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে বাধ্য না করিয়া ছাড়িবে না। যদি তিনি বিদ্রোহী হন এবং তুমি তাঁহার উপর জয়ী হও তবে তাঁহাকে ক্ষমা করিও কারণ তিনি নিকটাত্মীয় এবং হজরত মুহম্মদের বংশধর ও উত্তরাধিকারী। আবু বকরের পুত্র তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণকে যাহা করিতে দেখিবেন তাহাই করিবেন। তিনি শুধু নারী সাহচর্য ও খেলাধূলা পছন্দ করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি তোমার জন্য সিংহের মত ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে এবং শৃগালের মত তোমার বিরুদ্ধে ধূর্ত আচরণ করে এবং ক্ষমতা পাইলেই তোমাকে আক্রমণ করে সে হইল আবদুল্লাহ্ ইবন জুবায়র। তুমি যদি তাহাকে কাবুতে পাও তবে তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিবে এবং তোমার লোকদেরকে রক্তপাত হইতে যথা সম্ভব রক্ষা করিবে।"

ইয়াজীদের রাজত্ব ৬৮০-৬৮৩খৃঃ

ইয়াজিদ খলীফা হইয়াই মদীনায় যাঁহারা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে নাই তাঁহাদের নিকট হুকুমনামা পাঠাইলেন। উমরের পুত্র ও ও আব্বাসের পুত্র ইয়াজীদের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলেন। আবদুল্লাহ ইবন জুবায়র ও হুসায়ন কিছু সময় চাহিয়া মক্কায় চলিয়া গেলেন। কুফার অধিবাসীরা হুসায়নকে কুফায় যাইবার জন্য আহ্বান করিল। মক্কায় তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনগণ তাঁহাকে কুফায় যাইতে নিষেধ করিলেন। কুফাবাসীদের চরিত্র সম্বন্ধে ইঁহারা সম্যক অবগত ছিলেন। তাহাদের চরিত্রে স্থিরতার অভাব ছিল। হঠাৎ তাহারা অতি উৎসাহী আবার

পরক্ষণেই উদাসীন ও অসাড় হইয়া পড়িত। আবদুল্লাহ্ ইবন জুবায়র হুসায়নকে স্বীয় পথ হইতে অপসারণ করিতে চাহিয়াছিলেন। সেইজন্য কেবলমাত্র তিনিই হুসায়নকে কুফায় যাইতে উৎসাহিত করেন। কুফা-বাসীরা ইয়াজীদের জীবনযাত্রা, মদ্যাসক্তি ও পাপাচরণে চরম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া হুসায়নকে উমাইয়া সবকারের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া বহুপত্র প্রেরণ করিল। তাহারা পরস্পরেব সহিত কঠোর-ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়া হুসায়নের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইল। হুসায়ন ইয়াজীদের ও উমাইযা সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে শুধু অনিচ্ছুক ছিলেন না তিনি তাহাদেব স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। কুফাবাসীদের আমন্ত্রণে তাই তিনি সোৎসাহে সাড়া দিলেন।

হুসায়ন প্রথমে তাঁহার পিতৃব্যপুত্র মুসলিমকে কুফাব অবস্থা জানিবার জন্য পাঠাইলেন। মুসলিম হানি নামক একজন নেতৃস্থানীয ব্যক্তির গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে কুফাবাসীদের এইসব কার্যকলাপের বিষয় ইয়াজীদের কর্ণগোচর হইলে তিনি জিয়াদের পুত্র উবায়দুল্লাহকে কুফার শাসনকর্তা করিয়া পাঠাইলেন। উবায়দুল্লাহ মুসলিমের অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে মুসলিম হানির গৃহে অবস্থান করিতেছেন, উবায়দুল্লাহ্ ইহাদের উভয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং আশ্রিত ও আশ্রয়-দাতা উভয়কে নৃশংসভাবে হত্যা করিলেন। মুসলিমেব মৃত্যু সংবাদ হুসায়নের নিকট পৌঁছিবার পূর্বেই তিনি তাঁহার পরিবারবর্গ, আত্মীয়স্বজন ও কয়েকজন অনুরক্ত ভক্ত সহ কুফার দিকে যাত্রা করিলেন। আরবের মরুভূমি অতিক্রম করিয়া ইরাক সীমান্তে উপস্থিত হইতে না হইতেই মুসলিমের মৃত্যু সংবাদ তাঁহার কানে আসিল। তখনও তিনি ইচ্ছা কবিলে মক্কায় ফিরিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। কূফার পরিস্থিতির বিষয় ক্রমাগত দুঃসংবাদ আসিতে লাগিল। কবি ফারাজদাক ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি হুসায়নের একজন ভক্ত ছিলেন। তিনি বলিলেন, "(কুফা) নগবীর অন্তর আপনার পক্ষে রহিয়াছে কিন্তু ইহার তরবারি আপনার বিরুদ্ধে।" এই সকল দুঃসংবাদের ফলে হুসায়নের সঙ্গে যোগদানকারী বেদুঈন সৈন্যগণ একে একে তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। এক্ষণে হুসায়নের সঙ্গে ৩০ জন অশ্বারোহী ও ৪০ জন পতাদিক ব্যতীত আর কোন লোক রহিল না।

হুসায়নের গতিরোধ করিবার জন্য উবায়দুল্লাহ্ উমর ইবন সা'দকে 4000 অশ্বারোহী সহ প্রেরণ করিলেন। এইভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া হুসায়ন কুফা হইতে পঁচিশ মাইল দূরবর্তী কারবালা নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করিলেন। হুসায়ন শত্রুপক্ষের সহিত বহু আলাপ আলোচনার পর তিনটি প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন এবং ইহার যে কোন একটি গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদিগকে অনুরোধ করিলেন; (১) তাঁহাকে হয মক্কায ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হউক নতুবা (২) তাঁহাকে দামিস্কে ইযাজীদের নিকট পেঁাছাইয়া দেওয়া হউক অথবা (৩) সীমান্তে ইসলামের দুশমনদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অনুমতি দেওয়া হউক। কিন্তু ওবায়দুল্লাহ ইহার কোন প্রস্তাবেই রাজী হইলেন না। তিনি হুসায়নকে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করিতে আদেশ করিলেন। হুসায়ন ও তাঁহার দলকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিবার জন্য উবাযদুল্লাহ্ উমরকে আদেশ করিলেন যেন নদীর সঙ্গে তাঁহাদের যোগাযোগ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। উমাইয়া সেনাপতির ধারণা হইল যে তৃষ্ণায় কাবু হইয়া হুসায়ন আত্ম সমর্পণ করিবেন। কিন্তু হুসায়ন তাঁহার পূর্ব প্রস্তাবে অবিচল রহিলেন। উবায়দুল্লাহ্ তখন শামীর নামক একজন নির্দয় ব্যক্তিকে উমরের নিকট পাঠাইয়া হুসায়নকে মৃত অথবা জীবিত যে অবস্থায়ই হউক কুফায় লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। এই আদেশ পাইয়া উমর হুসায়নের শিবির অবরোধ করিলেন। হুসায়ন তাঁহার স্বল্পসংখ্যক অনুচর ও আত্মীয়স্বজনকে লইয়া যুদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। পরিবার ও আত্মীয় স্বজনকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরাইয়া লইয়া যাওয়ার জন্য হুসায়নকে একদিন সময় দেওয়া হইল কিন্তু তাহারা কেহই ঐ মুহূর্তে হুসায়নকে ছাড়িয়া যাইতে রাজী হইল না।

দশই মুহররম সকালবেলা হুসায়ন তঁাহার ক্ষুদ্র বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দী করিলেন। কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। অবশেষে শত্রুপক্ষের তীর নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোক ও শিশুদের ক্রন্দনের মধ্য দিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইল। একদিকে যথাযোগ্য সমর সাজে সজ্জিত বিরাট উমাইয়া বাহিনী, অপরদিকে ন্যায় ও সত্যের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ মুষ্টিমেয় নাগরিক। শত্রুপক্ষের তীর অগণিত সংখ্যায় হুসায়নের দলের লোকজনের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। হুসায়নের দশ বৎসর বয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র কাসিম শরাহত হইয়া শহীদ হইল। কিছুক্ষণের জন্য কেহই হুসায়নকে আক্রমণ করিতে সাহস পাইল না।

হুসায়ন তৃষ্ণার্ত হইয়া নদীর ধার ঘেঁষিয়া চলিলেন। শত্রুরা তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। এইবার নিষ্ঠুর শামীর নৃশংসভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি তীর বিদ্ধ হইয়া ভূপতিত হইলেন ও নিহত হইলেন। তাঁহার দলের লোকেরাও কেহ রক্ষা পাইল না। হুসায়নের দুই পুত্র, ছয় ভ্রাতা, হাসানের দুইপুত্র এবং আরও অনেকে শাহাদৎ বরণ করিলেন। তাহাদের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল এবং এইরূপ সত্তরটি কর্তিত মুণ্ড এবং স্ত্রী ও শিশু সন্তানগণকে কুফায় উবায়দুল্লাহ্‌র নিকট প্রেরণ করা হইল। নবী করীমের দৌহিত্রের রক্তাক্ত শির যখন উবায়দুল্লাহর পদপ্রান্তে নিক্ষিপ্ত হইল তখন জনসাধারণের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হইল। উবায়দুল্লাহ যখন আপন যষ্টির সাহায্যে হুসায়নের মস্তককে নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতেছিল তখন একজন বৃদ্ধ আর্তনাদ করিয়া উঠিল, "ধীরে, ওহে ধীরে। এইটি হজরতের দৌহিত্র, আল্লার কসম্ আমি মুহম্মদের পবিত্র মুখ দ্বারা এই ওষ্ঠদ্বয়ে চুম্বন করিতে দেখিযাছি।" হুসায়নের ভগ্নী, তাঁহার শিশু পুত্র আলী আসগর ও দুই কন্যাকে ইয়াজীদের নিকট প্রেরণ করা হইল। এই শিশু সন্তান ও স্ত্রীলোকগণকে যথাযোগ্য সম্মানের সাহিত মদীনায় প্রেরণ করা হইল।

কারবালার তাৎপর্য

কারবালার ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে এক শোচনীয় মর্মান্তিক ঘটনা। হুসায়ন ও তাঁহার মুষ্টিমেয় অনুচরগণের প্রতি উমাইয়া সরকার যে নৃশংস ব্যবহার করিয়াছিল তাহার সংবাদ দাবানলের মত মুসলিম জগতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। হজ উপলক্ষে মক্কা ও মদীনায় সমাগত নরনারী নবীর পরিবারের বিধবা স্ত্রী ও এতিম শিশু সন্তানগণকে দেখিয়া তাহাদের হৃদয়বিদারক কাহিনী মুসলিম জগতের নিভৃততম কোন পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিল। সমগ্র মুসলিম জাহানের আন্তরিক সহানুভূতি ও অনুকম্পা তাহাদের উপর নিবদ্ধ হইল এবং উমাইয়া শাসকদের প্রতি সকলের বিদ্বেষ ও রোষ প্রবল আক্রোশে ফাটিয়া পড়িল। হুসায়ন ন্যায় ও সত্যের প্রতীক এবং উমাইয়া শাসক ইয়াজিদ অন্যায় ও অসত্যের প্রতীক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। উমাইয়া শাসনের পতনের মূলেও এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড প্রচণ্ড শক্তি হিসাবে কাজ করিয়াছিল। ধর্মপ্রাণ ও বিশ্বাসী মুসলমানগণ এই কারণে উমাইয়া শাসনকে কখনও মনে প্রাণে

মানিয়া লইতে পারেন নাই। কারবালার শোচনীয় ঘটনা মুসলমানদের মনে এমন গভীর রেখাপাত করিয়াছিল যে পরবর্তী যুগে মুসলমানদের চিন্তাধারায়, কাব্য কবিতায় ও শিল্প সাহিত্যে ইহার প্রতিফলন ঘটে। মুসলমানদের উপর কোন গুরুতর বিপদ আপতিত হইলে ইহাকে কারবালার সহিত তুলনা করা হয়। বিশেষ করিয়া শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে এই উপলক্ষে পৃথিবীর সর্বত্র এক প্রবল শোকোচ্ছ্বাস বহিয়া যায়। তাহারা বুক চাপড়াইয়া, মিছিল বাহির করিয়া, মর্সিয়া গাহিয়া এবং যুদ্ধাদি প্রদর্শন করিয়া কারবালার মর্মান্তিক স্মৃতি পালন করে। কারবালার ঘটনার নামে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের চক্ষু অশ্রুসজল ও অন্তর শোকাকুল হইয়া উঠে।

কারবালার যুদ্ধের পর রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইয়াজীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তন্মধ্যে মদীনার বিদ্রোহ প্রধান। মদীনার অধিবাসিগণ ইয়াজীদের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং নগরীর এক হাজার উমাইয়া অধিবাসীকে কিছুকাল আবদ্ধ রাখিয়া সদ্ব্যবহারের প্রতিশ্রুতিতে মুক্তি দেয়। এই সংবাদ পাইয়া ইয়াজিদ মুসলিম ইবন উকবা নামক একজন সেনাপতিকে এক বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মুসলিম তিনদিন পর্যন্ত মদীনায় অবাধ লুঠতরাজ ও হত্যাকাণ্ড চালাইলেন। এই যুদ্ধকে হাররার যুদ্ধ বলা হয় (আগষ্ট, ৬৮৩)। এইভাবে মদীনার বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করিয়া সিরীয় বাহিনী মক্কার দিকে যাত্রা করিল।

হাররার যুদ্ধ

মক্কায় আবদুল্লাহ ইবন জুবায়র সিরীয় সেনাবাহিনীকে বাধাদান করিতে অগ্রসর হইলেন। আবদুল্লাহ ধার্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। মক্কার জনসাধারণ তাঁহাকে খলীফা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। তাহারা ইয়াজীদের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আবদুল্লাহকে সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিল। কিন্তু পবিত্র নগরীর বিরুদ্ধে কোন মুসলমান সেনাবাহিনী যুদ্ধ করিতে পারে ইহা জনসাধারণের ধারণার বহির্ভূত ছিল। তাই তাহারা অবাক বিস্ময়ে উমাইয়া সৈন্যবাহিনীর ধৃষ্টতামূলক আচরণ প্রত্যক্ষ করিল। ইহাদের প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবন জুবায়রের সহায়ক ও অনুচরগণ নিজদিগকে অসহায় বোধ করিতে লাগিল। দুই মাস ধরিয়া আক্রমণকারিগণ শহর অবরোধ করিয়া রাখিল। শত্রুরা কাবাঘরে আগুন ধরাইয়া দিল এবং পবিত্র হারাম শরীফ ভস্মীভূত হইল। অবরোধের তৃতীয় মাসে দামিস্ক হইতে ইয়াজীদের

মক্কা অবরোধ
সেপ্টম্বর ৬৮৩
অক্টোবর ৬৮৩

মৃত্যু সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ থামিয়া গেল। ইয়াজীদের মৃত্যুর পর সিরীয় বাহিনী এতই ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল যে তাহারা ইবন জুবায়রকে সিরিয়ায় গমন করিয়া খিলাফতের ভার গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাইল। ইবন জুবায়র পবিত্র নগরী ত্যাগ করিয়া সিরিয়ায় যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি মক্কায় থাকিয়া কাবা শরীফের সংস্কার ও পুনঃনির্মাণেরকাজে আত্মনিয়োগ করিলেন।

ইয়াজীদ চল্লিশ বৎসর বয়সে সাড়ে তিন মাস রাজত্ব করার পর মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন। ঐতিহাসিক আল-ফখ্‌রী বলেন, "ইয়াজীদ সাড়ে তিন বৎসর রাজত্ব করেন। প্রথম বৎসর তিনি আলীর পুত্র হুসায়নকে হত্যা করেন; দ্বিতীয় বৎসর তিনি মদীনা আক্রমণ করেন এবং তিন দিন যাবৎ লুঠতরাজ চালান, তৃতীয় বৎসর তিনি কাবা আক্রমণ করেন।" ইয়াজীদ কবিতা রচনা করিতেন। তিনি মদ্যপ এবং বিলাস প্রিয় ছিলেন। মক্কা ও মদীনা আক্রমণ এবং নবীর বংশধবদেব প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের জন্য মুসলমানগণ তাঁহার রাজত্বকালকে ঘৃণার সহিত স্মরণ কবিয়া থাকে।

১৫

উমাইয়া রাজ্যের সংগঠক আবদুল মালিক

(৬৮৫-৭০৫ খৃঃ)

ইয়াজীদের অকাল মৃত্যুতে মু'আবিয়ার বংশধরগণ দুর্বল হইয়া পড়িল। তাহারা বেশীদিন খিলাফতের পদে টিকিয়া থাকিতে পারিলনা। ইয়াজীদের পুত্র দ্বিতীয় মু'আবিয়া মাত্র তিন মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মু'আবিয়ার বংশের লোকেরা ইয়াজীদের আর এক পুত্র খালিদকে খলীফা নির্বাচিত করিতে চাহিল কিন্তু উমাইয়া দরবারের প্রধান ব্যক্তিগণ মারওয়ানকে খলীফা করিতে চাহিলেন। অবশেষে স্থির হইল যে মারওয়ান খলীফা হইবেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পব খালিদকে খিলাফত দান করা হইবে।

মু'আবিয়ারবংশ

উমাইয়া বংশের দুর্বলতার সুযোগে ইবন জুবায়র মুসলিম রাজ্যে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠেন। তাঁহার সাধুতা ও ধর্ম-পরায়ণতার জন্য কেবল মক্কা ও মদীনার জনসাধারণই যে তাঁহাকে খলীফা বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল তাহা নহে। মিসর ও সিরিয়ার কোন কোন অঞ্চলেও তাঁহার আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। ইরাকের কুফা ও বসরা নগরী ও তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল। এমন কি উমাইয়াদের রাজধানী দামিস্ক নগরেও জাহ্হাক নামক একজন সেনাপতি ইবন জুবায়রের পক্ষ অবলম্বন করিল।

ইবন জুবায়র

খলীফা হইয়াই মারওয়ানকে জাহহাকের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। মারজ-ই-রাহিত নামক স্থানে উভয়পক্ষে যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে মারওয়ান জাহ্হাককে পরাজিত করিয়া সমগ্র সিরিয়ায় উমাইয়াদের আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন (৬৮৪খৃঃ)। কিন্তু এই কৃতকার্য-তার পরে তিনি শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি খালি-দের খিলাফতের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া নিজ পুত্র আবদুল মালিককে খলীফা মনোনীত করেন। ইতিমধ্যে তিনি খালিদের মাতা অর্থাৎ ইয়াজিদের

মারওয়ান নবেম্বর ৬৮৩ —মে, ৬৮৫

বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজ পুত্রের দাবী প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় উক্ত মহিলা মারওয়ানকে হত্যা করেন (৬৮৫)। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আবদুল মালিক খিলাফতেব পদে তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন।

খলীফা হইয়া আবদুল মালিককে বহু বিদ্রোহী ও প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবিলা করিতে হইয়াছিল। আবদুল্লাহ ইবন জুবায়র মক্কায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। উমাইয়া বংশের আমর ইবন সা'দ খিলাফতেব পদে আবদুল মালিকের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। মুখতার নামক একজন দুঃসাহসিক ব্যক্তি হুসায়নের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হইযা কুফায বিদ্রোহী হইলেন। মুদার বংশীয় (উত্তরাঞ্চলেব) আরব ও হিম্‌যার বংশীয (দক্ষিণাঞ্চলের) আরবদের মধ্যে খুরাসানে কলহ চলিতেছিল। খারিজীগণও বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। আবদুল মালিক এই সকল বিপদাপদ কাটাইযা বিদ্রোহাদি কঠোর হস্তে দমন করিযা সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যকে উমাইয়াদের কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করেন। তিনি এইভাবে উমাইযা সাম্রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

কুফার খারিজীগণ হুসায়নের হত্যাব প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কুফায় সমবেত হইল। তাহাবা অনুশোচনাকারী (বা তাওযাবুন) নামে অভিহিত হইত।

অনুশোচনাকারীগন

তাহাবা কাববালাষ হুসাযনেব সমাধিতে উপস্থিত হইযা একবাত্রিতে বিলাপ কবিযা কাঁদিতে কাঁদিতে ফাতিমা ও আলীর পুত্রকে বিপদের সময় একাকী ফেলিযা যাওযাব জন্য চরম অনুশোচনা প্রকাশ করিল। তাবপব তাহারা সিরিযা বাসিগণকে আক্রমণ করিল কিন্তু খলীফার সৈন্যগণ তাহাদিগকে যুদ্ধে পবাজিত করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। এই সময় মুখতার রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে কুফার কারাগারে আবদ্ধ

মুখতার

ছিলেন। তিনি অনুশোচনাকাবীদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া কবিতা রচনা করিলেন এবং কিছুকাল পর কারামুক্ত হইয়া তিনি মুহম্মদ আল-হানাফিয়া* নামক হজরত আলীর এক পুত্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কারবালার হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উমাইয়াদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। তিনি কিছুদিনের মধ্যে কুফার প্রতিপত্তিশালী লোকজনকে বশীভূত করিয়া কুফায় আধিপত্য স্থাপন করেন। সম্পূর্ণ

* ফাতিমার মৃত্যুর পর হজরত আলী হানিফা বংশের একজন রমণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইবনুল হানাফিয়া এই মহিলার ছেলে।

ইরাক, আরব এবং পারস্যের কোন কোন অংশে মুখতার স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। কুফা হইতে মুখতার তাঁহার সেনাপতি ইবনুল আশতারকে উমাইয়া সেনাপতি উবায়দুল্লার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। মুখতারের সেনা-বাহিনী কুফা ত্যাগ করিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুফায় এক তুমুল গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে হুসায়নের সমর্থকগণ হুসায়নের হত্যাকারিগণকে হত্যা করিল। ইহাদের মধ্যে শামীর, উমর সহ প্রায় ২৮৪ জন লোক প্রাণ হারাইল। অপরদিকে ইবনুল আশতার জাব নদীর তীরে সংঘটিত এক যুদ্ধে কারবালার প্রধান নায়ক উবায়দুল্লাকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। এইভাবে মুখতার কারবালার শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ কবিলেন।

জাব নদীর যুদ্ধ ৬৮৬ খৃ:

মুখতারের অভূতপূর্ব কৃতকার্যতা ও সাফল্যে স্তম্ভিত হইয়া ইবন জুবায়র তাঁহার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া পড়েন। মুখতার ইবন জুবায়রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইলেও তাঁহার আন্তরিকতা সম্বন্ধে ইবন জুবায়রের সন্দেহ ছিল। ইবন জুবায়ব মুখতারের আন্তরিকতা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে মক্কায ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইহাতে মুখতার বিদ্রোহী হইলেন। আবদুল মালিকের পরম সৌভাগ্য যে তাঁহার শত্রুরা পরস্পর কলহে লিপ্ত হইযা একে অন্যের শক্তি ক্ষয় করিতে আরম্ভ করিল। ইবন জুবায়রের ভ্রাতা মুস'আব বসরার শাসনকর্তা ছিলেন। ইবন জুবাযর এখন মুস'আবকে মুখতারের বিরুদ্ধে কুফায প্রেরণ করিলেন। মুখতার তাঁহার আট হাজাব সমর্থক সহ দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কয়েক মাস যাবৎ মুখতার ও তাঁহার অনুচরগণ শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিল কিন্তু অবশেষে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া মুখতার নিজ সৈন্যদলকে দুর্গের বাহিরে আসিয়া সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার আদেশ দান করিলেন। কিন্তু অল্পসংখ্যক লোকই তাঁহার সহিত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়া মৃত্যুবরণ করিল। মুখতার ও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার সমর্থকগণ মুস'আবের নিকট আত্ম সমর্পণ করিল। কথিত আছে মুখতারের সৈন্যবাহিনীতে মাত্র ৭০০ জন লোক ছিল আরব আর বাকী সকলেই ছিল অনারব। মুস্‌আবের আদেশে মুখতারের সম্পূর্ণ সেনাবাহিনীকে হত্যা করা হয়। মুখতারের অভ্যুত্থান এবং অনারব মুসলমানদের নেতা হিসাবে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে তাঁহার যুদ্ধ বিগ্রহ ইসলামের ইতিহাসে অনারবদের (মাওয়ালী) অসন্তোষের প্রথম স্তর সূচিত

মুখতার ও ইবন জুবায়রের কলহ

মাওয়ালী বিদ্রোহ

করে। এই আরব অনারব দ্বন্দ্ব পরবর্তীকালে চরম আকার ধারণ করে।

খারিজী বিদ্রোহ

মুসলিম রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে খারিজীগণ বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহারা নিরপরাধ জনসাধারণের উপর হামলা চালাইয়া তাহাদের জীবন দুর্বিসহ করিয়া তুলিল। রাই ও ইস্পাহান অঞ্চলে তাহাদের আধিপত্য স্থাপিত হইল এবং আহওয়াজ ও কিরমানে তাহাদের দৌরাত্ম্য অপ্রতিহত রহিল। মুস'আব তাঁহার সেনাপতি মুহাল্লাবের সাহায্যে এই সকল অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ৬৮ হিজরীতে (৬৮৮খৃঃ) মক্কায় সমাগত হজযাত্রীদের মধ্যে যে বিভিন্ন দলের লোক ছিল তাহা হইতে তদানীন্তন মুসলিম জগতের বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা অনুমান করা যায়। ঐ বৎসর চারিজন রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ হইতে চারিটি পতাকা আরাফাত ময়দানে প্রদর্শিত হয়। একটি আবদুল্লাহ্ ইবন জুবায়রের, একটি আবদুল মালিকের, একটি মুহম্মদ ইবনুল হানাফিয়ার ও অপরটি খারিজীদের। পতাকার চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছিল উক্ত রাষ্ট্রপ্রধানদের সমর্থকদল। হজের পবিত্র মওসুমে এই যুযুধান দলগুলি পবিত্র মক্কা নগরীতে পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে বিরত ছিল।

৬৮৯ খৃষ্টাব্দে যখন আবদুল মালিক রাজধানী হইতে দূরে বিদ্রোহ দমনে ব্যাপৃত ছিলেন তখন আমর ইবন সাঈদ নামক খলীফার এক পিতৃব্য পুত্র দামিস্কে নিজেকে খলীফা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আবদুল মালিক

আমর ইবন সাঈদের বিদ্রোহ ৬৮৯ খৃঃ

রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমরের সহিত যুদ্ধ করিলেন এবং তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। ইহার কিছুদিন পর আবদুল মালিক আমরকে প্রাসাদে ডাকাইয়া আনিয়া নৃশংস-ভাবে হত্যা করেন।

এক্ষণে আবদুল মালিক তাঁহার দুই শত্রু মুস'আব ও মুসআবের ভ্রাতা আবদুল্লাহ ইবন জুবায়রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে মনস্থ করিলেন। প্রথমে আবদুল মালিক মুস'আবের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। মুস'আব

মুস'আবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ৬৯১ খৃঃ

তাঁহার ভ্রাতা আবদুল্লার পক্ষে বসরা ও কুফায় শাসনকার্য পরি-চালনা করিতেন। উভয়পক্ষে যুদ্ধ হইল। খলীফা আবদুল মালিক টাকা পয়সার সাহায্যে মুস'আবের দলের বহুলোককে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। মুস'আব নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তাঁহার পক্ষীয় একজন কুফাবাসী তাঁহাকে হত্যা করে (৬৯১ খৃঃ)। মুসআবের মৃত্যুর পর কুফাবাসীরা আবদুল মালিকের বশ্যতা স্বীকার করিল।

এই সময় মুস'আবের বিখ্যাত সেনাপতি মুহাল্লাব ও আবদুল মালিকের বশ্যতা স্বীকার করেন। এইভাবে কুফা, বসরা ও পূর্বাঞ্চলের অনেক স্থান আবদুল মালিকের অধীনে আসে।

মুস'আবের মৃত্যুর পর আবদুল মালিক আবদুল্লাহ ইবন জুবায়রের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন। ইয়াজীদের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের পর ইবন জুবায়র মক্কায় কাবার জীর্ণ সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার ধার্মিকতা, সাধুতা ও কাবা শরীফের তত্ত্বাবধানে তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ তাঁহাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। আবদুল মালিক ইবন জুবায়রের বিরুদ্ধে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ নামক একজন নির্দয় ও অসমসাহসী সেনাপতিকে পাঠাইলেন। হাজ্জাজ প্রথম জীবনে তায়িফে স্কুল শিক্ষক ছিলেন। পরে আবদুল মালিকের অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়া পতনোন্মুখ উমাইয়া রাজ্যকে বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য মসী ছাড়িয়া অসি ধারণ করিলেন। হাজ্জাজ মক্কার নিকট উপস্থিত হইয়া ইবন জুবায়রের নিকট এই শর্তে এক ক্ষমাপত্র প্রেরণ করিলেন যে ইবন জুবায়র আত্মসমর্পণ করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না। কিন্তু ইবন জুবায়র এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। হাজ্জাজ আবদুল মালিকের অনুমতি লইয়া পবিত্র নগরী অবরোধ করিলেন। চতুর্দিক হইতে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। বজ্র নিনাদে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া পবিত্র নগরীর দালান কোঠা ধ্বসিয়া পড়িল। সাত মাস ধরিয়া অবরোধ চলিতে থাকে। ইবন যুবায়র নিতান্ত হতোদ্যম হইয়া তাঁহার শতবর্ষ বয়স্কা বৃদ্ধা মাতা আসমার (হজরত আবু বকরের কন্যা) নিকট পরামর্শ চাহিলেন। বৃদ্ধা মাতা পুত্রকে উপদেশ দিলেন যে যদি নিজের পন্থা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয় তবে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া যাওয়াই কর্তব্য। তদনুসারে ইবন জুবায়র বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া মৃত্যু বরণ করেন। এইভাবে ধার্মিক প্রবর আবদুল্লাহর জীবনাবসান ঘটে (৬৯২)। তিনি তের বৎসর ধরিয়া উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী খলীফা হিসাবে মক্কায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ছিলেন। ঐ বৎসর হইতে আবদুল মালিক মুসলিম জগতের অবিসংবাদিত খলীফা বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

ইবন জুবায়রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

আবদুল মালিক হাজ্জাজকে প্রথমে আরবদেশের শাসনকর্তার পদ দান করেন। মক্কায় শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের পর হাজ্জাজ মদীনায় গমন

করেন এবং মদীনাবাসিগণকে কঠোর ভাষায় নিন্দাবাদ করেন। পর বৎসর (৬৯৩ খৃ:) পারস্য সীমান্তে খারিজীরা বিদ্রোহী হইলে খলীফা সেনাপতি মুহাল্লাবকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। কুফা ও বসরার সৈন্য বাহিনীকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে আদেশ করা হইল। কিন্তু ঐ সময় ইরাকের শাসনকর্তার মৃত্যু হইলে কুফা ও বসরার সৈন্যগণ মুহাল্লাবের পক্ষ ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। আবদুল মালিক ইরাকবাসীদের এইরূপ অন্যায় আচরণের বিষয় চিন্তা করিয়া এক্ষণে হাজ্জাজকে ইরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। হাজ্জাজ আরবদেশ হইতে মাত্র বারজন সঙ্গীসহ রাত্রিতে দ্রুত মরুভূমি অতিক্রম করিযা অতর্কিতে প্রত্যূষে কুফায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শিরস্ত্রাণে মুখমণ্ডল ঢাকা পড়িয়াছিল। একজন প্রাচীন আরব কবিব কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি মিম্বরে দাঁড়াইয়া মুখমণ্ডল হইতে আবরণ উন্মোচন করিলেন। তখন লোকেরা তাঁহাকে চিনিতে পারিল। তাবপর কুফাবাসিগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন: "হে কুফাবাসিগণ, আমি নিশ্চিত যে বহু মস্তক আমি কাটিবার উপযুক্ত দেখিতেছি এবং নিশ্চয়ই আমিই উহা করিব। আমার মনে হয় আমি শিরস্ত্রাণ ও শ্মশ্রুর মধ্যবর্তী স্থানে রক্ত দেখিতেছি।" অতঃপর তিনি কুফাবাসিগণকে তিনদিনের মধ্যে মুহাল্লাবের সেনাবাহিনীতে যোগদান করিতে আদেশ করিলেন। অন্যথায় তাহাদিগকে কঠোর শাস্তির ভয প্রদর্শন করিলেন। হাজ্জাজ রাষ্ট্রদ্রোহিতাব অপরাধে অগণিত লোককে হত্যা করেন এবং উমাইয়া খলীফাদের জন্য রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। কথিত আছে যে হজরত মুহম্মদের বিখ্যাত সাহাবা আনাস ইবন মালিকের পুত্র সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহী হইলে হাজ্জাজ তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দান করেন। হাজ্জাজ পিতা আনাসের ভূ-সম্পত্তি ও বাজেয়াফত করেন এবং তাঁহাকে অকথ্য ভাষায় নিন্দাবাদ করেন। অবশ্য পরে খলীফার আদেশে হাজ্জাজকে আনাসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়। হাজ্জাজের কঠোর শাসনে সমস্যাসঙ্কুল নগরী কুফা ও বসরায় বিদ্রোহ প্রশমিত হয় ও আইন শৃঙ্খলা পুনরায় স্থাপিত হয়। হাজ্জাজ ৭০২ খৃষ্টাব্দে কুফা ও বসরার মাঝামাঝি ওয়াসিত নামক একটি শহর পত্তন করেন এবং সেখান হইতে উভয় শহরের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখেন।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ইরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত ৬৯৪

ওয়াসিত

খারিজী বিদ্রোহ:

হাজ্জাজ ইবন ইউসুফকে খারিজীদের সঙ্গেও যুদ্ধ করিতে হয়। খারিজীগণ জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত খলীফা ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট বশ্যতা স্বীকার করিবে না। তাহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল। একদলের নেতা শাবীব কুফার নগর-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া নগরে প্রবেশ লাভ করে এবং এক মসজিদে সমবেত বহু নামাজীকে হত্যা করে। হাজ্জাজ খলীফার নিকট হইতে নূতন সৈন্য আনিয়া বহু কষ্টে ইহাদিগকে দমন করেন। তাঁহার সেনাপতি মুহাল্লাব আজরাকী গোত্রের খারিজীদিগকে কঠোর হস্তে দমন করেন। ইহারা বিশ বৎসর ধরিয়া ইরাক ও পারস্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া আসিতেছিল।

পূর্বদিকে রাজ্য বিস্তার

পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্তা হাজ্জাজ শুধু যে অরাজকতা দমন করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহারই পরিচালনায় পূর্বদিকে রাজ্য বিস্তার আরম্ভ হয়। সিজিস্তানের শাসনকর্তা আবদুর রহমান ইবন আশ'আসকে কাবুলের রাজার (জানবিল মতান্তরে রাতবিল) বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। ইবনুল আশ্‌আস্‌ তাঁহার "ময়ূর বাহিনী" (শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা সমন্বিত বলিয়া এইরূপ অভিহিত) সহ রাজা

কাবুল

জানবিলকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হাজ্জাজের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া ইবনুল আশআস বিদ্রোহী হন। হাজ্জাজ তাঁহাকে সীমান্ত অঞ্চলে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে বলিলেন কিন্তু সেনাপতি ধীরে সুস্থে বুঝিয়া শুঝিয়া অগ্রসর হইতে চাহিলেন। ইবনুল আশআস ছিলেন কিন্দা রাজবংশের লোক; সেইজন্য তাঁহার অহমিকা ছিল বেশী। ইহা ছাড়া ইরাকের লোকদের নেতা হিসাবে সিরিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে তাঁহার বহু রকম অভিযোগ ছিল। ইরাকীদের ভাতা ও বৃত্তি সিরীয়গণের অনুরূপ ছিল না। ইবনুল-আশ্'আস্‌ হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া বার বার তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ইরাকে নিজের আধিপত্য স্থাপনে প্রয়াসী হন। এমন কি খলীফা ও তাঁহার সহিত আপোষ রফা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু আশ্‌আসের অনুচরগণ খলীফার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে মনস্থ করিল। অবশেষে আশআস পরাজিত হইয়া প্রথমে কিরমানে গমন করেন ও পরে কাবুলে জানবিলের শরণাপন্ন হন। সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মুহাল্লাবের পুত্র ইয়াজীদ পিতার মৃত্যুর পর খুরাসানের শাসনকর্তা

নিযুক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ গোত্রীয় দলাদলির ফলে ইয়াজীদকে পদচ্যুত করিয়া কুতায়বা ইবন মুসলিমকে খুরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কুতায়বা বীর যোদ্ধা ছিলেন এবং খুরাসানে তাঁহার অধীনে ৪৭,০০০ আরব সৈন্য ও ৭,০০০ অনারব সৈন্য ছিল। ইহাদের সাহায্যে কুতায়বা অচিরে মধ্য এশিয়ার রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হন।

কুতায়বা ইবন মুসলিম

আবদুল মালিকের সময় এশিয়া মাইনর ও আফ্রিকায় মুসলমানদের সহিত গ্রীকদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের ফলে আর্মিনিয়ার লোকেরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবদুল মালিকের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আরব মুদ্রা প্রবর্তনের ফলে গ্রীকেরা আবদুল মালিকের মুদ্রা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। কিন্তু এই যুদ্ধ অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। আফ্রিকায় সেনাপতি উকবার উল্লেখযোগ্য বিজয়ের পর মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। ৬৮৩ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকার বার্বারগণ বিদ্রোহী হইয়া গ্রীকদের সহিত মিলিত হয় এবং উকবাকে তাঁহার সমগ্র সৈন্যবাহিনীসহ হত্যা করে। বার্বারগণ মুসলিম রাজধানী কায়রোয়ান দখল করে। ৬৮৮ খৃষ্টাব্দে আবদুল মালিক উত্তর আফ্রিকা পুনরধিকার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফলকাম হয় নাই। ৬৯৩ খৃষ্টাব্দে আবদুল মালিক এক বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ সেনাপতি হাসান ইবন নুমানকে কায়রোয়ানে প্রেরণ করেন। হাসান কায়রোয়ান হইতে কার্থেজে গমন করেন এবং সমবেত বার্বার ও গ্রীক সেনাবাহিনীকে পরাজিত করিয়া পুনরায় কায়রোয়ানে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু ঐ সময় বার্বারদের মধ্যে একজন পুরোহিতনীর (কাহিনা) উদ্ভব হয়। সে বার্বারগণকে উত্তেজিত করিয়া হাসানকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। হাসান বার্কায় পশ্চাদপসরণ করিয়া পাঁচ বৎসর পর্যন্ত নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া কাটান। অতঃপর খলীফার নিকট হইতে নূতন সৈন্য পাইয়া তিনি কাহিনাকে পরাজিত ও নিহত করেন। কায়রোয়ান পুনরায় অধিকৃত হয়। বার্বারদের মধ্যে ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করিতে থাকে।

গ্রীকদের সহিত যুদ্ধ

আফ্রিকা

মারওয়ানের অছিয়ত অনুসারে আবদুল মালিকের ভ্রাতা আবদুল আজিজেরই পরবর্তী খলীফা হওয়ার কথা। কিন্তু আবদুল মালিক ভ্রাতার

দাবীকে অগ্রাহ্য করিয়া নিজপুত্র ওয়ালীদকে খলীফা মনোনীত করিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। এই ব্যাপারে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ও আবদুল মালিককে সমর্থন করেন কিন্তু আবদুল আজিজ কিছুতেই নিজের দাবী পরিত্যাগ করিতে রাজী হইলেন না। কিন্তু পর বৎসর আবদুল আজিজের মৃত্যু হইলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র ওয়ালীদের প্রতি খিলাফতের উত্তরাধিকারী হিসাবে আনুগত্য প্রকাশ করা হয়।

ওয়ালীদ উত্তরাধিকারী মনোনীত

আবদুল মালিক একুশ বৎসর রাজত্ব করার পর ষাট বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন (৮ সেপ্টেম্বর ৭০৫)। রাজত্বের প্রথম সাত বৎসর ইবন জুবায়র মক্কায় তাঁহার সহিত খিলাফতে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আবদুল মালিক মৃত্যুশয্যা হইতে পুত্রগণকে উপদেশ দিয়া যান যে তাঁহারা যেন হাজ্জাজের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন কারণ হাজ্জাজই মুসলিম জগতের সর্বত্র মিম্বর সমূহ হইতে উমাইয়া খলীফার নাম উচ্চারিত হইতে সাহায্য করেন এবং তাঁহাদের শত্রুগণকে দমন করেন।

আবদুল মালিকের মৃত্যু, ৭০৫ খৃঃ

উমাইয়া সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়করণ, রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন ও বহির্শত্রুর আক্রমণ হইতে রাষ্ট্রকে রক্ষা করা ব্যতীত আবদুল মালিক তাঁহার বিবিধ শাসন সংস্কার এবং সংস্কৃতি সেবার জন্য ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত। শাসন সংস্কারের মধ্যে সরকারী ভাষা হিসাবে আরবীর প্রবর্তন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরবগণ প্রথমে তাহাদের মরুভূমির বাসস্থান হইতে বাহিরে আসিয়া হিসাব রক্ষা ও রাজস্ব আদায়ের কাজ কিছুই বুঝিতে পারিত না। তাই তাহারা সিরিয়ায় গ্রীক-ভাষাভাষী কর্মচারী এবং ইরাক ও পারস্যে পারস্য-ভাষাভিজ্ঞ কর্মচারিগণকে নিজ নিজ পদে বহাল রাখিয়া তাহাদের সাহায্যে সরকারী কাজকর্ম চালাইত। আবদুল মালিকের সময় এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং আরবগণ রাজস্ব আদায় ও হিসাব রক্ষার কাজে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, ফলে আবদুল মালিক এই উভয় ভাষার পরিবর্তে আরবী ভাষা প্রবর্তনের আদেশ দান করেন। ইহার ফলে তখন হইতে স্থানীয় ভাষার পরিবর্তে আরবীই সরকারী কাজকর্মের ভাষা বলিয়া গৃহীত হয়। এই ব্যবস্থা আবদুল মালিকের সময় আরম্ভ হইয়া তাঁহার পুত্র ওয়ালীদের সময়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই ব্যবস্থার ফলে যে সকল অনারব আরবী ভাষা জানিত না তাহারা

শাসন সংস্কার

আরবি ভাষা প্রবর্তন

স্বভাবতঃই চাকুরী হারাইল কিন্তু অনেক অনারব আবার আরবী ভাষা আয়ত্ত করিয়া চাকুরীতে বহাল থাকিয়া যায়। এই ব্যবস্থার ফলে রাজ্যে ভাষাগত ঐক্য স্থাপিত হয় এবং আরবী ভাষা আরব-অনারব সকলের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ভাষায় পরিগণিত হয়।

আরবী মুদ্রা প্রবর্তন

ইসলাম পূর্ব যুগে হিজাযে রোমান ও পারসিক মুদ্রা প্রচলিত ছিল। পুরাতন হিময়ার যুগের পেচক চিহ্নিত কিছু মুদ্রাও দেখা যাইত। খুলাফা-ই-রাশিদীনের যুগে এবং উমাইয়া যুগের প্রথমদিকে বিদেশী মুদ্রার উপর কিছু মুসলমানী লেখা ও নামধাম অঙ্কিত করিয়া সেই গুলিকেই সরকারী মুদ্রা বলিয়া চালান হইত। আবদুল মালিকের পূর্বে সামান্য সংখ্যক স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রবর্তিত হইয়াছিল কিন্তু তাহাও বাইজান্টাইন বা পারসিক মুদ্রার অনুকরণে তৈরী হইয়াছিল। আবদুল মালিক সর্বপ্রথম ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে দামিস্কের টাকশালে স্বর্ণের দীনার ও রৌপ্যের দিরহাম প্রস্তুত করান এবং এইগুলিতে আরবী লেখা অঙ্কিত করান। পরবর্তী বৎসর হাজ্জাজ কুফায় রৌপ্যমুদ্রা অঙ্কিত করেন। এই সকল মুদ্রায় মুসলিম কলেমা ও কুরআনের বিভিন্ন আযাত লিখিত হইত।

ডাক ব্যবস্থা

আবদুল মালিক মুসলিম রাজ্যে নিয়মিত ডাক ব্যবস্থা চালু করেন। এই ব্যবস্থায় তিনি পর্যায়ক্রমে দ্রুতগামী অশ্বের ব্যবহার করেন। বিশেষতঃ সরকারী প্রয়োজনে সংবাদ ও জিনিসপত্র আদান প্রদানের জন্য ডাক বিভাগ চালু করা হয়। সংবাদ আদান প্রদান ছাড়াও ডাক বিভাগের কর্মচারিগণ খলীফাকে নিজ নিজ এলাকার জরুরী তথ্যাদিও সরবরাহ করিত।

অর্থনৈতিক সংস্কার

আবদুল মালিকের শাসনামলে এক সুদূর প্রসারী অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করা হয়। মুসলমান আইন অনুসারে কোন মুসলমানকেই জাকাত ব্যতীত অন্য কোন প্রকার রাজস্ব দিতে হইত না। এই আইনের সুবিধা ভোগ করার উদ্দেশ্যে ইরাকে ও খুরাসানে বহু অনারব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তাহারা তাহাদের গ্রামের বাস্তুভূমি ও জোতজমা ত্যাগ করিয়া শহরে ভিড় জমাইতে আরম্ভ করিল এবং মুসলিম সেনাবাহিনীতে যোগদান করিয়া সৈনিকদের জন্য বরাদ্দকৃত ভাতা দাবী করিল। ইহার ফলে রাষ্ট্রীয় তহবিল শূন্য হইবার উপক্রম হইল। কারণ মুসলমান হওয়ার পর তাহারা ভূমি-রাজস্ব ও দিতে চাহিল না বরং সেনাবাহিনীতে যোগদানের ফলে তাহাদিগকে রাষ্ট্রীয় তহবিল হইতে ভাতা

দিতে হইত। আবদুল তাঁহার সুযোগ্য সহকারী হাজ্জাজের সাহায্যে এই সকল লোককে গ্রামে নিজ নিজ জমিতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিলেন এবং তাহারা যে পরিমাণ রাজস্ব মুসলমান হইবার পূর্বে দিত তাহাই প্রদান করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করা হইল। অনারব মুসলমানগণ (মাওলানী) ইহাতে নিতান্ত অসন্তুষ্টবোধ করিল। এই অসন্তোষ পরবর্তীকালে তীব্র আন্দোলনে রূপ লাভ করিয়া উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে পরম আক্রোশে আত্মপ্রকাশ করিল।

আবদুল মালিক কেবল যে সুযোগ্য শাসক ছিলেন তাহা নহে শিল্প ও সাহিত্যে তাঁহার অনুরাগ ছিল প্রগাঢ়। তিনি কবি ও কবিতার সমাদর করিতেন। তাঁহার সময় আরবী কাব্য বিশেষ উন্নতি লাভ করে। তাঁহার সভায় অনেক বিখ্যাত কবি ছিলেন। ইঁহারা উমাইয়া খলীফার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া কবিতা রচনা করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে জরীর, ফারাজদাক ও আখতাল প্রধান ছিলেন। আবদুল মালিকের সময় স্থাপত্য শিল্পেরও উৎকর্ষ সাধিত হয়। ৬৯১—২ খৃষ্টাব্দে তিনি জেরুজালেমে 'প্রস্তর গম্বুজ' (কুব্বাতুস্-সাখ্রা) নামক মসজিদ নির্মাণ করেন। ঐ সময়ে মক্কা শরীফ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল্লাহ ইবন জুবায়রের অধীনে থাকায় তিনি রাজ্যের জনসাধারণকে জেরুজালেমে হজ্জ করিতে আহ্বান করেন।

শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি

চরিত্র ও কৃতিত্ব : যদিও খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সময় আবদুল মালিক উমাইয়া খলীফাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল ছিলেন তথাপি রাজত্বের শেষে তিনি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া উঠেন। চতুর্দিকে শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়াও তিনি মনোবল ও সৎসাহস হারান নাই। তিনি উমাইয়া বংশকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করেন এবং বিভিন্ন শাসন সংস্কারের সাহায্যে রাজ্যে স্থিতিশীলতা আনয়ন করেন। যদি তাঁহার পুত্র (প্রথম) ওয়ালীদের সময় উমাইয়া সাম্রাজ্য উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে তথাপি তিনিই রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া ওয়ালীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও সুখ্যাতির পথ সুগম করেন। তাঁহার সময় রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় এবং উত্তর আফ্রিকায় বিদ্রোহী বার্বারগণ পুনরায় উমাইয়া খলীফাদের প্রাধান্য স্বীকার করে। বস্তুতঃ পূর্বাঞ্চলে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের নেতৃত্বে ইসলামের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিজয়ের অধ্যায় আবদুল মালিকের রাজত্বের

শেষভাগেই আরম্ভ হইয়া ওয়ালীদের সময় পরিপূর্ণতা লাভ করে। আবদুল মালিকের সম্বন্ধে বলা হয় যে তিনি খলীফা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। খলীফা হওয়ার সংবাদ যখন তাঁহার নিকট পৌঁছে তখন তিনি কুরআন শরীফ পাঠরত ছিলেন, তিনি কুরআনকে একদিকে সরাইয়া দিয়া মন্তব্য করিলেন যে "তোমার সাথে আমার এই শেষ।" তাঁহার সম্বন্ধে আরও বলা হয় যে তিনি জনসাধারণকে খলীফার সম্মুখে কথা বলিতে নিষেধ করেন। ইবন জুবায়রের মৃত্যুর পর তিনি ঘোষণা করেন যে "কেহ যেন সুবিচার ও আল্লার ভয়ের জন্য আমাকে আদেশ না করে অন্যথায় আমি তাহার স্কন্ধ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিব।" দূরদর্শী ও শাসক আবদুল মালিকের সম্বন্ধে উপরোক্ত মন্তব্য।" আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে অতিরঞ্জিত, কারণ আব্বাসীয় যুগে উমাইয়া-বিদ্বেষী ঐতিহাসিকদের নিকট হইতেই আমরা এই সকল কথা জানিয়া থাকি।

বিস্তারিত পাঠ

হিট্টি, হিষ্ট্রী অব দি এরাবস্
ম্যুর, কেলিফেট ইট্স্ রাইজ ডিক্লাইন এণ্ডফল
জুরজি জায়দান, তমদ্দুন, ৪র্থ খণ্ড।

১৬

উমাইয়া রাজ্যবিস্তারঃ ওয়ালীদ ও হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ

ওয়ালীদ (৭০৫—৭১৫ খৃঃ)

আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহার পুত্র ওয়ালীদ খলীফা হইলেন। তাঁহার শাসনকালে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিদ্যমান ছিল। আবার তাঁহার রাজত্বকালেই উমাইয়া সাম্রাজ্যের সীমানা বিভিন্ন দিকে বিস্তার লাভ করে। ওয়ালীদের সময় ঘটনাক্রমে এমন কয়েকজন যোদ্ধা ও বীর পুরুষের আবির্ভাব হইল যাঁহারা ইসলামের প্রাথমিক যুগের সুপ্রসিদ্ধ বীর পুরুষদের মত অসম সাহসী ও দুর্জেয় ছিলেন। ইঁহারা খলীফা ওয়ালীদের সময় রাজ্যজয়ে প্রশংসনীও ভূমিকা গ্রহণ করেন।

উমর ইবন আবদুল আজীজ

ওয়ালীদ তাঁহার পিতৃব্যপুত্র উমরকে আরবদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর আবদুল আজিজেরই খলীফা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আবদুল মালিকের পূর্বেই আবদুল আজিজের মৃত্যু হওয়ায় ওয়ালীদের উত্তরাধিকার সহজ ও নিষ্কণ্টক হইয়াছিল। পিতৃব্য আবদুল আজিজের পরিবারের প্রতি বিশেষ বিবেচনা প্রদর্শন করিয়া ওয়ালীদ উমর ইবন আবদুল আজিজকে আরবদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁহার শাসনামলে মক্কা ও মদীনায় শান্তি বিরাজমান ছিল। মদীনায় কয়েকজন আলিমের সমবায়ে গঠিত একটি মন্ত্রণাসভার সাহায্যে তিনি আরব দেশ শাসন করিতেন। তিনি মদীনার মসজিদের সংস্কার সাধন করেন। ওয়ালীদের আদেশ মত উমর হজযাত্রীদের যাতায়াত সহজ, আরামদায়ক ও নিরাপদ করেন। স্থানে স্থানে মরুভূমি অঞ্চলে পানির কূপ খনন করা হয় এবং মক্কা ও মদীনায় পানির ফোয়ারা তৈয়ার করা হয়। হজের সময় খলীফা পবিত্র নগরদ্বয়ের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং উমরের ভূয়সী প্রশংসা করেন। উমরের সুশাসনে আকৃষ্ট হইয়া বহু লোক হাজ্জাজের শাসনাধীন এলাকা হইতে মক্কা ও মদীনায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। হাজ্জাজ এই ব্যাপার খলীফার গোচরীভূত করিয়া হিজায হইতে উমরের অপসারণ দাবী করিলেন। খলীফা উমরকে অপসারিত করিয়া মক্কা ও মদীনায় ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ইহারা হাজ্জাজের ইচ্ছানুযায়ী

ইরাক হইতে আশ্রয়প্রার্থী লোকদিগকে কঠোর হস্তে দমন করেন এবং ইহাদিগকে হিজায হইতে তাড়াইয়া দেন।

রাজ্য বিস্তার

হাজ্জাজের সুযোগ্য পরিচালনায় পূর্বাঞ্চলে উল্লেখযোগ্য রাজ্য জয় ঘটে সেনাপতি কুতায়বা ইবন মুসলিমের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি হাজ্জাজের আদেশক্রমে মধ্য এশিয়ার রাজ্য বিস্তারে

মধ্য এশিয়ায়

অগ্রসর হন। ইতিপূর্বে সেনাপতি মুহাল্লাব অক্ষু নদী আমুরিয়া জয়হুন অতিক্রম করিয়া পূর্বদিকে তুর্কোমানদের সহিত যুদ্ধ করিলেও এই অঞ্চলে ওয়ালীদের খিলাফতের পূর্বে স্থায়ী রাজ্যজয় সম্ভব হয় নাই। মুসলমান ঐতিহাসিক ও ভৌগলিকগণ ঐ অঞ্চলকে 'মা 'ওরারাউন-নাহার' বা নদীর পর পারস্থ অঞ্চল নামে অভিহিত করিত। সেনাপতি কুতায়বা সর্বপ্রথম ঐ অঞ্চলে তুর্কীদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করেন এবং সেখানে মুসলিম অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ৭০৫ খৃষ্টাব্দে কুতায়বা তুখারিস্তানের নিম্নাঞ্চল ও উহার রাজধানী বলখ (ব্যাকট্রিয়া) জয় করেন। তিনি ৭০৬—৯খৃষ্টাব্দে সুগদিয়ানা অঞ্চলে বুখারা ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকা জয় করেন। ৭১০ হইতে ৭১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি সুগদিয়ানার সমরকন্দ এলাকা এবং খাওয়ারিজম (খিবা) দখল করেন। বুখারা, বলখ ও সমরকন্দে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোক ও বৌদ্ধ মঠ বিরাজমান ছিল। বলখের যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে ছিলেন এক মহিলা যিনি বারমাক উপাধি ধারী এক বৌদ্ধ পুরোহিতের স্ত্রী ছিলেন। তাঁহারই গর্ভজাত পুত্র খালিদ ইবন বারমার ভবিষ্যৎ উজীর বংশ বারমাকীদের ঊর্ধতন পুরুষ। কুতায়বা ৭১৩—৭১৫ সালে জাক্সার্টের (Jaxartes) (সির দরিয়া, সায়হুন) নদী অতিক্রম করিয়া ফরগণার অধীনস্থ খোজান্দা, শাশ (তাসখন্দ) ও অন্যান্য নগর অধিকার করিয়া চীন সীমান্তে কাশগড় পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। এই অঞ্চলে মোঙ্গল বংশোদ্ভূত লোকেরা বসবাস করিত। কুতায়বার এই সকল উল্লেখযোগ্য বিজয়ের ফলে মধ্য এশিয়ায় মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্রস্থল বুখারা, সমরকন্দ ও খাওয়ারিজমে মুসলিম শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার ফলে মোঙ্গল জাতি ও মোঙ্গল সভ্যতার সহিত সর্বপ্রথম মুসলমানদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

হাজ্জাজ তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র ও জামাতা মুহম্মদ ইবন কাসিমকে সিন্ধুর

রাজা দাহিরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। ইহার কারণ এই যে সিংহলের রাজা খলীফার নিকট আটখানি জাহাজ বোঝাই করিয়া বহু মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন। এই জাহাজগুলি পথিমধ্যে সিন্ধুর জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। হাজ্জাজ খলীফার পক্ষ হইতে সিন্ধুর রাজা দাহিরের নিকট লুণ্ঠিত দ্রব্যের ক্ষতি পূরণ দাবী করেন। দাহির ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করিলে হাজ্জাজ ইবন কাসিমকে সিন্ধু অভিযানে প্রেরণ করেন। মুহম্মদ ইবন কাসিম ৭১০ খৃষ্টাব্দে এক বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ মাকরান ও বেলুচিস্থান অধিকার করিয়া ৭১২ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুতে উপস্থিত হন। তাঁহার সৈন্যবাহিনীতে ছিল ৬০০ ইরাকী ও সিরিয় বাসী যোদ্ধা। ইহা ছাড়া সম সংখ্যক উষ্ট্রারোহী ও তিন সহস্র মালবাহী উষ্ট্র এই সৈন্যবাহিনীর সহিত যোগদান করিয়াছিল। তাঁহাদের সঙ্গে অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে ছিল 'দুলহান'* নামক একটি ক্ষেপণাস্ত্র। ইহা চালনা করিতে ৫০০ লোকের প্রয়োজন হইত। স্থানীয় জাঠ ও মেড জাতীয় লোকেরা দাহিরের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ছিল। এই জন্য তাহারাও মুহম্মদ ইবন কাসিমের দলে যোগদান করিয়াছিল। দেবল বন্দরে পৌঁছিয়া আরবগণ দেখিল যে সেখানকার বড় মন্দিরের চূড়ায় একটি লাল পতাকা উড়িতেছে। দেবলের অধিবাসীরা মনে করিত যে যতক্ষণ এই পতাকা উড়িতে থাকিবে ততক্ষণ দেবল অধিকার করা যাইবে না। আরবগণ ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া এই পতাকা অবনমিত করিল। হিন্দুগণ ইহাতে নিরাশ হইয়া যুদ্ধে পরাজিত হইল। দেবল মুসলমানদের অধিকারে আসিল। ইহার পর নীরুন অধিকৃত হইল। অতঃপর ইবন কাসিম সিন্ধু নদী অতিক্রম করিয়া দাহিরকে রাওর নামক স্থানে আক্রমণ করিলেন। দাহির মুসলমানদের সাহিত প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া পরাজিত ও নিহত হইলেন। হিন্দু রমণিগণ জহর ব্রত পালন করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। রাওরের পর ব্রাহ্মণাবাদ অধিকৃত হয়। ইহার পর আলোর দুর্গ অধিকৃত হয়। ইবন কাসিম তারপর মুলতান অধিকার করেন। মুলতানের সওদাগর, বণিক ও কারিগরগণ এবং জাট ও মেড সম্প্রদায়ের লোকগণ মুহম্মদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহার পক্ষে যোগদান করিল।

মুহম্মদ ইবন কাসিমের সিন্ধু জয়

---

* আরাদ্দাস

মুহম্মদ ইবন কাসিম এইভাবে দেবল হইতে মুলতান পর্যন্ত অঞ্চলে সর্বপ্রথম মুসলিম শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন।

ওয়ালীদের রাজত্বকালে ৭০৮ খৃষ্টাব্দে মূসা ইবন নুসাইর নামক একজন সুদক্ষ সেনাপতি পশ্চিম আফ্রিকার শাসন কর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মূসা সুদূর পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। ম্যাজরকা ও সারসিডিনিয়া দ্বীপে সমুদ্রাভিযান প্রেরিত হয়। তাঁহার সহকারী তারিককে পশ্চিমাঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া কায়রোওয়ানে ফিরিয়া আসিলেন।

স্পেন বিজয়

এই সময় স্পেনে রডারিক নামক একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। রডারিক উইতিজা নামক রাজাকে হত্যা করিয়া স্পেনের সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন। এইজন্য প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অনেকে রডারিকের শাসন পছন্দ করিত না। রডারিকের সভাসদগণও সিংহাসন লাভের আশায় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত ছিল। স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলের শাসনকর্তা কাউন্ট জুলিয়ান বিশেষভাবে রডারিকের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি স্পেনের ডারিকের রাজত্বের অবসান ঘটাইবার জন্য মুসলমানগণকে উৎসাহিত করিতে থাকেন। সেনাপতি মূসা ৭১০ খৃষ্টাব্দে তারিফ নামক একজন সৈন্যাধ্যক্ষ চারিটি জাহাজে করিয়া কয়েক শত সৈন্যসহ আফ্রিকা হইতে স্পেনে প্রেরণ করেন। তারিফ স্পেনে পদার্পন করিয়া দক্ষিণাঞ্চলের অবস্থান ও পরিস্থিতি সম্পর্কে উৎসাহজনক খবর লইয়া আসিলে মূসা ৭১১ খৃষ্টাব্দে তারিক ইবন জিয়াদকে ৭০০০ সৈন্যের একটি বাহিনীসহ স্পেন অভিযানে প্রেরণ করেন। জুলিয়ান কর্তৃক সরবরাহকৃত চারটি জাহাজে করিয়া তারিক প্রনালী অতিক্রম করিয়া একটি পাহাড়ী অঞ্চল দখল করিলেন। তাঁহার নামানুসারে এই পাহাড়ের নাম জাবালুত তারিক (তারিকের পাহাড়) বা জিব্রাল্টার নামে অভিহিত হয়। স্পেনের রাজা রডারিক সংবাদ পাইয়া মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এদিকে তারিক ও মূসার নিকট আরও সেন্য চাহিয়া পাঠাইলে মূসা ৫০০০ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সর্বমোট ১২০০০ সৈন্য লইয়া তারিক রডারিকের লক্ষাধিক বাহিনীর সম্মুখীন হইলেন। ওয়াদীলাক্কো নদীর তীরে যুদ্ধ হইল (১৯শে জুলাই, ৭১১)। যুদ্ধের সময় রডারিকের প্রতিদ্বন্দ্বী কয়েকজন নেতা দলবলসহ তাঁহার সৈন্যদল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তাহার

ওয়াদীলাক্কোর যুদ্ধ ১৯শে জুলাই ৭১১

ভাবিয়াছিল রডারিকের পতন ঘটিলে আরবগণ ধনসম্পদ লইয়া স্পেন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। তখন তাহারা সহজে সিংহাসন দখল করিয়া লইবে। যুদ্ধে রডারিকের সৈন্যবাহিনী পরাজিত হইল। রাগরিক স্বয়ং পলায়নপর হইলেন এবং নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। আরবগণ একে একে একিজা (Echijah), কর্ডোভা, মালাগা ও গ্রানাডা শহর দখল করিয়া লইল। তারিক অতঃপর স্পেনের রাজধানী টলেডো আক্রমণ করিলেন কিন্তু শহরের সকল খৃষ্টান অধিবাসীরা ভয়ে নগর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, শুধু ইহুদীগণ নগরে অবস্থান করিতেছিল। তাহারা মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া খৃষ্টানদের নির্যাতন হইতে অব্যাহতি লাভ করিল। স্পেনের খৃষ্টানগণ প্রায় প্রত্যেক শহর ও জনপদ ত্যাগ করিয়া পর্বতে ও জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু মুসলমানরা সম্মানজনক ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দিয়া ইহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইল। এইভাবে তারিক মধ্যম ও পূর্ব স্পেন জয় করিয়া স্পেনের অর্ধাংশে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন।

তারিকের বিজয় সংবাদ আফ্রিকায় মুসার নিকট পৌঁছিলে তিনি ঈর্ষান্বিত হইয়া স্পেনের বিজয় গৌরবে অংশীদার হওয়ার উদ্দেশ্যে ১৮০০ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী সহ স্পেনে পদার্পন করিলেন। তিনি ইচ্ছাপূর্বক তারিকের অধিকৃত অঞ্চল এড়াইয়া উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইলেন এবং মেডিনা সিডোনিয়া, কারমোনা, সেভিল, মেরিডা প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া টলেডোতে উপস্থিত হইলেন। তারিক এখানে মুসার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। মুসা তারিকের নিকট গনীমতের মালের হিসাব দাবী করিয়া তাঁহাকে চাবুক দ্বারা প্রহার করেন। অবশেষে উভয়ের মধ্যে সমঝোতা স্থাপিত হয় এবং তাঁহারা সমবেতভাবে সারগোসা, তারাগোনা, বারসিলোনা ও উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য শহর দখল করেন। অনূ্যন দুই বৎসরের মধ্যে উত্তরদিকে পিরেনীজ পর্বতমালা পর্যন্ত সমগ্র স্পেন মুসলমানদের অধিকারে আসে। মুসা ইহার পর পিরেনীজ পর্বত অতিক্রম করিয়া নারবোন, আভিঞ্জন ও লিওন অধিকার করিয়া ফ্রান্স আক্রমণ করিতে চাহিলেন কিন্তু খলীফা ওয়ালীদ তাঁহাকে ফ্রান্সে প্রবেশ করিতে নিষেধ করায় তিনি স্পেনের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে গ্যালিসিয়া অধিকার করেন। এই সময় ওয়ালীদ তাঁহাকে রাজধানীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মুসা ও তারিকের মধ্যে বিরোধ ও মনোমালিন্যের ফলে খলীফা তাঁহাদিগকে

ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। স্পেন পরিত্যাগ করিবার পূর্বে মুসা তাঁহার পুত্র আবদুল আজিজকে স্পেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া যান।

মুসা স্থলপথে স্পেন হইতে সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হইলেন। তিনি মুকুট পরিহিত ও মুল্যবান সাজে সজ্জিত চারিশত পরাজিত ভিসিগথ রাজ রাজড়া, অগণিত ক্রীতদাস, অসংখ্য যুদ্ধবন্দী ও বেশুমার মালমাত্তা লইয়া বিজয়গর্বে উত্তর আফ্রিকার উপর দিয়া দামিস্কের দিকে যাত্রা করিলেন। তাঁহার এই বিজয় মিছিল প্রাচীন রোমক সেনাপতিগণের বিজয় মিছিলের সহিত তুলনীয়। দামিস্কে পৌঁছিলে খলীফা তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জানান। মুসা যে সকল দ্রব্যসম্ভার খলীফাকে উপহার দেন তন্মধ্যে ছিল 'সুলায়মানের নির্ঘণ্ট' নামে একটি প্রাচীন অতুলনীয় শিল্পবস্তু। খলীফা ওয়ালীদের মৃত্যুর পর নূতন খলীফা সুলায়মান মুসাকে সুনজরে দেখেন নাই। তিনি তাঁহাকে বরখাস্ত করিয়া তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন।

ওয়ালীদের শাসনকাল উমাইয়া খিলাফতের এক গৌরবময় অধ্যায়। কি দেশজয়ে কি আভ্যন্তরীণ উন্নতিতে তাঁহার শাসনকাল ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়। তাঁহার সময় মুসলিম সাম্রাজ্য সমধিক বিস্তার লাভ করিয়াছিল। একদিকে চীনের প্রান্তসীমা ও অপরদিকে আটলান্টিকের উপকূল ভূমি পর্যন্ত এই সাম্রাজ্যর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইউরোপের স্পেন ও পাক-ভারতের সিন্ধু অঞ্চল মুসলমানদের অধিকার ভুক্ত হইল। ওয়ালীদের সময় আরব নৌ বাহিনীর প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এই সময় আরব নৌ বহর পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়। এইগুলি যথাক্রমে সিরিয়া, আফ্রিকা, মিসর, নীলনদী ও উহার মোহনায় অবস্থিত ছিল। ওয়ালীদ স্থাপত্য ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিশেষ খ্যাত। তিনি জেরুজালেমের মসজিদ ও মদীনার মসজিদ-ই নব্বীর পুনঃনির্মাণ করেন এবং দামিস্কের জুমা মসজিদকে সম্প্রসারিত করিয়া উহাতে মিনার ও গম্বুজ, মিহরাব এবং খিলান (Arch) সন্নিবেশিত করেন। মসজিদের প্রাচীর সমূহ মর্মর প্রস্তর ও মোজাইকে সুসজ্জিত করা হয়। মক্কা, মদীনা, জেরুজালেমের সহিত দামিস্কের মসজিদকে ইসলামের চতুর্থ পবিত্রস্থান বলিয়া গণ্য করা হয়।

ওয়ালীদ স্কুল ও হাসপাতাল নির্মাণ করেন এবং বৃদ্ধ, অন্ধ ও বিকলাঙ্গ-দের জন্য সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করেন। তিনি লোকজনকে শিল্প ও

বাণিজ্যে উৎসাহিত করেন। রাজ্যের সর্বত্র রাস্তাঘাট নির্মাণ ও কূপ খনন করিয়া পথিকদের এবং বিশেষতঃ হজ্জযাত্রীদের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেন।

ওয়ালীদ ৭১৫ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে ইনতিকাল করেন। তাঁহার দশবৎসর খিলাফতের সময় মুসলিম সাম্রাজ্য সমধিক বিস্তার লাভ করে ও রাজ্যের নানাবিধ সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। উইলিয়াম ম্যুরের মতে "খিলাফতের ইতিহাসে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ওয়ালীদের রাজত্ব অপেক্ষা অধিকতর গৌরবময় যুগ আমরা দেখিতে পাই না।"

বিস্তারিত পাঠ

হিট্টী, হিস্ট্রী অব্ দি এরাবস্
উইলিয়াম ম্যুর, দি কেলিফেট

১৭

সুলায়মান ও উমর ইবন আবদুল আজীজ

ওয়ালীদের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা সুলায়মান খলীফা হইলেন। সুলায়মানের শাসনামলে মুসলমানদের বিজয়াভিযান একপ্রকার বন্ধ হইয়া যায়। নূতন খলীফা স্পেন বিজয়ী বীর মূসাকে কারারুদ্ধ করেন। মূসার পুত্র আবদুল অজীজ স্পেনে আততায়ীর হাতে প্রাণ হারাইলেন। স্পেন বিজয়ী অপর বীর তারিক ও চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। সিন্ধু বিজেতা মুহম্মদ ইবন কাসিম ও খলীফার আদেশে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করেন। সুলায়মানের এই সকল কার্যকলাপে অতীষ্ঠ হইয়া মধ্য এশিয়া বিজয়ী সেনাপতি কুতায়বা খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলেন। কিন্তু যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হইলেন। খলীফা ওয়ালীদের আমলে ইয়াজীদ ইবন মুহাল্লাবকে খুরাসানের শাসন কর্তার পদ হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছিল। কুতায়বার মৃত্যুর পর সুলায়মান ইয়াজীদকে পুনরায় খুরাসানের শাসনকর্তার পদে বহাল করেন। ইয়াজীদ নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে গুর্গাও ও তাবারিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া বহু লোককে বন্দী করেন এবং অনেক গনীমাৎ লাভ করেন। খলীফার নিকট এই সকল গনীমতের অংশ পাঠাইয়া তিনি বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। খলীফা ওয়ালীদের সময় বাইজান্টাইন রাজধানী কনষ্টান্টিনোপলের বিরুদ্ধে জলপথে ও স্থলপথে অভিযান প্রেরণ করা হইয়াছিল। খলীফার ভ্রাতা মাসলামা এই অভিযানে প্রধান সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু এই অভিযান শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইল, মুসলমানগণ এক বৎসরকাল কনষ্টান্টিনোপালের সম্মুখে অবস্থান করিয়া খাদ্যাভাব, তুষার পাত ও মহামারীতে ভুগিয়া অভিযান উঠাইয়া লইতে বাধ্য হইল।

সুলায়মান
৭১৫-৭১৫ খৃঃ

খলীফা সুলায়মান প্যালেষ্টাইনে রামলা নামক একটি নগর নির্মান করিয়া সেখানে অবস্থান করিতে থাকেন। সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে তিনি দাবিক নামক প্রত্যন্ত নগরে যাতায়াত করিতেন, সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয় (সেপ্টেম্বর ৭১৯)। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার এক নাবালক পুত্রকে খলীফা মনোনীত করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু পরিশেষে রাজা ইবন হায়া নামক একজন দরবেশের প্রভাবে তাঁহার পিতৃব্যপুত্র

উমরকে মনোনীত করিয়া যান। সাধু প্রকৃতির উমরকে খলীফা মনোনয়ন করায় ঐতিহাসিকগণ সুলায়মানকে "মঙ্গলের কুঞ্জী" বলিয়া অভিহিত করেন।

খলীফা সুলায়মান রাজকীয় আরাম আয়েশে জীবন যাপন করিতে বেশী পছন্দ করিতেন। রাজ্যজয় কিংবা রাজ্য শাসনে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল না। সেইজন্য তাঁহার সময়ে উমাইয়াদের গৌরব ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। তিনি আড়াই বৎসর কাল খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

উমর ইবন আবদুল আজিজ

(৭১৭—৭২০)

খলীফা ওয়ালীদের সময় উমর আরবদেশের শাসনকর্তা হিসাবে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং এই কারণে তিনি ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজের বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন। উমর তাঁহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল উমাইয়া খলীফা হইতে ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। এইজন্য তাঁহার শাসনকাল অপরাপর উমাইয়া খলীফার শাসনকাল হইতে পৃথক ধরনের ছিল। ধার্মিক, নিষ্ঠাবান, অনাড়ম্বর ও শান্তিপ্রিয় খলীফা আড়াই বছরের কিঞ্চিদধিককাল খিলাফতের দায়িত্বপূর্ন পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শান্তি সমৃদ্ধি ও জনকল্যাণের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মপরায়ণতা ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা তাঁহাকে প্রাথমিক যুগের খলীফা হজরত আবু বকর ও হজরত উমরের সমপর্যায়ভুক্ত ও সমমর্যাদা সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। এইজন্য পরবর্তীকালে মুসলমান ঐতিহাসিক ও লেখকগণ তাঁহাকে খুলাফায়ে রাশেদীনের পঞ্চম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি উমাইয়া যুগের খলীফা হইলেও জীবনীতিতে ও শাসন পদ্ধতিতে তিনি হজরত উমরকে অনুসরণ করিয়া চলিতেন। মাতার দিক দিয়া তিনি মহামতি উমরের সহিত সম্পর্কযুক্তও ছিলেন। তিনি 'উমাইয়া সাধু' এবং 'দ্বিতীয় উমর' নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন।

খলীফা হইয়াই তিনি তাঁহার সততা ও সাধুতা দ্বারা সকলকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিয়া দেন। খিলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি সহিসগণ খলীফার আস্তাবল হইতে উত্তমজাতের ঘোড়া

আনিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিল এবং ইহাদের মধ্য হইতে নিজের জন্য অশ্ব মনোনয়ন করিতে বলিল। কিন্তু তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি নিজের পূর্বতন অশ্ব নিয়াই সন্তুষ্ট থাকিলেন। অন্যপক্ষে রাজকীয় আস্তাবলের সমস্ত অশ্ব নিলামে বিক্রী করিয়া তিনি সমুদয় অর্থ জনসাধারণের তহবিলে ('বায়তুলমালে,) জমা দিলেন। তাঁহার স্ত্রী ফাতিমা খলীফা আবদুল মালিকের কন্যা ছিলেন। ফাতিমা পিতা আবদুল মালিক ও ভ্রাতা ওয়ালীদের নিকট হইতে মূল্যবান গহনাদি উপঢৌকন পাইয়াছিলেন। খলীফা হওয়ার পর উমর স্ত্রীকে যাবতীয় গহনাদি বায়তুলমালে জমা দিবার নির্দেশ দেন এবং তিনি প্রসন্নচিত্তে স্বামীর অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। কবি, বক্তা ও তোষামদকারীরা তাঁহার দরবার পরিত্যাগ করিল এবং সাধু সজ্জন ও আলিম-উলামা তাহাদের স্থান পূর্ণ করিলেন। শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরাই তাঁহার প্রিয়ভাজন ছিলেন।

এই সব প্রারম্ভিক সৎকাজ তাঁহার সংস্কারধর্মী মনের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার সূচনামাত্র। কি আভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে কি বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যাপারে তিনি উমাইয়া রাজ্যে আমূল পরিবর্তন আনয়ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে নানা দল ও মতের সৃষ্টি ধর্মীয় ঐক্যের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সহনশীলতার নীতি অবলম্বন করিয়া তিনি অনৈক্য ও বিরোধের অবসান ঘটাইতে চেষ্টা করেন। উমাইয়া শাসন আরম্ভ হওয়ার সময় হইতেই মসজিদে মসজিদে খুৎবায় হজরত আলীর নামে অভিসম্পাত বর্ষিত হইত। উমর এই প্রথা তুলিয়া দিয়া হজরত আলীর বংশধর ও সমর্থকদের মনোরঞ্জন করিতে চাহিলেন। আলীর বংশধরগণ হজরত রসূলুল্লাহের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে 'ফাদাক, নামক বাগানের মালিকানা লাভ করিয়াছিলেন। উমাইয়া খলীফা মারওয়ান ঐ বাগানটি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছিলেন। দ্বিতীয় উমর উক্ত বাগানটি পুনরায় আলীর বংশধরদের হাতে প্রত্যর্পণ করেন। অনুরূপ তাল্হার বংশধরগণও মক্কায় কিছু ভূ-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন ; উমর ঐ সম্পত্তিও ফিরাইয়া দেন। গোঁড়া খারিজী সম্প্রদায় উমাইয়া খলীফাগণকে কখনও স্বীকৃতি দান করে নাই। কিন্তু উমরের শাসনামলে তাহারা সকল ধ্বংসাত্মক কার্য বন্ধ করিয়া উমরের খিলাফতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল। কারণ উমর অভিনিবেশ সহকারে তাহাদের অভাব অভিযোগ শ্রবণ করিতেন।

তিনি নিজে গোঁড়া মুসলমান হইলেও অমুসলমানদের প্রতি সহনশীল ছিলেন। ইসলাম ধর্ম প্রসারে তিনি অতিশয় আগ্রহী ছিলেন। স্বীয় ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা পরধর্মের প্রতি তাঁহাকে অনুদার করে নাই। দামিস্কের খৃষ্টানগণ তাঁহার নিকট আবেদন করিল যে সেণ্টজনের যে গির্জা ওয়ালীদের সময় মসজিদে রূপান্তরিত হইয়াছিল উহা যেন তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। উমর ঐ গীর্জার পর্বতে তাহাদিগকে সেণ্ট টমাসের গির্জা দান করেন। নাজরানের খৃষ্টানগণ হজরত উমরের সময় কুফায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের সংখ্যা ৪০,০০০ হইতে ৪০০০ এ কমিয়া আসিয়াছিল কিন্তু এতদসত্ত্বেও সরকার কর্তৃক তাহাদের উপর ধার্য কর কমান হয় নাই। উমর তাহাদের কর দুই সহস্র বস্ত্রখণ্ডের পরিবর্তে দুইশত বস্ত্রখণ্ড ধার্য করিলেন। অমুসলমানদের এই সকল ন্যায্য অভাব অভিযোগের প্রতিকার করিতে তিনি কুন্ঠা বোধ করিতেন না। কিন্তু স্বধর্মে নিষ্ঠাবান উমর ইসলামের গৌরব অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে নূতন গীর্জা বা মন্দির নির্মাণ করিতে দিতেন না কিংবা অমুসলমানগণকে দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করিতেন না।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি অস্ত্রের সাহায্যে রাজ্যজয়ের পন্থা পরিহার করেন। তাঁহার মতে উমাইয়া খলীফাগণ বাহুবলে যে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের জাগতিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য, ইসলামের গৌরব রক্ষার জন্য নহে। কাজেই এই সকল রাজ্যজয়ের পরিকল্পনা ধর্মতঃ পরিত্যাজ্য। খলীফা হইয়াই তিনি বিদেশে যুদ্ধরত মুসলিম সেনাবাহিনীর সমূহকে রাজধানীতে ফিরাইয়া আনার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিলেন। কনষ্টাণ্টিনোপলে যুদ্ধরত খলীফার ভ্রাতা মাসলামাকে তাঁহার বাহিনী উঠাইয়া আনিতে আদেশ করা হইল। তিনি বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়া ইসলাম প্রচারের চেষ্টা করেন। উত্তর আফ্রিকার বার্বারদের মধ্যে তিনি বিশেষ কৃতকার্যতা লাভ করেন। স্পেনে সারাগোসায় একটি মসজিদ নির্মান করা হয়। তিনি সিন্দুর হিন্দু শাসকদের নিকট ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাইয়া পত্র লিখিলেন। ইহাতে তাহাদিগকে আরবদের সহিত সমান অধিকারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল। ফলে তাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল কিন্তু হিশামের শাসনামলে তাহারা আবার ধর্মান্তরিত হইল।

দ্বিতীয় উমর কেবলমাত্র বিশ্বাসী ও সাধু সজ্জন ব্যক্তিগণকেই প্রাদেশিক

শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করিতেন ; অন্যান্য উমাইয়া খলীফাদের মত কোন গোত্র বা দলের ভিত্তিতে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন না। তিনি কাজীকে গভর্ণরের চেয়ে গুরুত্ব দান করিতেন। গভর্ণরগণ রাজস্বের হিসাব দেখাইতে না পারিলে তাহাদিগকে বরখাস্ত করিতেন। তিনি সুলায়মানের অনুগ্রহভাজন ইয়াজীদ ইবন মুহাল্লাবের নিকট খুরাসানের রাজস্বের হিসাব তলব করিলেন এবং তাঁহাকে লোহিত সাগরের একটি দ্বীপে নির্বাসিত করিলেন।

খুরাসান হইতে ইয়াজীদকে অপরাসিত করিয়া তিনি সেখানে রাজস্ব সংস্কার প্রবর্তন করেন। তাঁহার এই সংস্কার রাজস্ব বৃদ্ধির চেয়ে ধর্মপ্রচার সহায়তা করিয়াছিল ! খুরাসানের নও-মুসলিমগণ খলীফার নিকট অভিযোগ করিল যে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাহাদিগকে কর দিতে হইত এবং তাহাদিগকে আরব মুসলমানদের সম-মর্যাদা দান করা হইত না। উমর আদেশ জারী করিলেন যে নও-মুসলিমগণকে কর হইতে অব্যাহতি দান করা হইবে। খলীফার এই ফরমান পাইয়া দলে দলে লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ এই সব লোকের খৎনার জন্য পীড়াপীড়ি করিলে উমর অসন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন "আল্লাহ তাঁহার রসূলকে ধর্মের প্রতি আহ্বান করার জন্য পাঠাইয়াছিলেন খৎনা করার জন্য নহে।" মিসরের একজন পদস্থ কর্মচারী অভিযোগ করিলেন যে লোক মুসলমান হইলে রাজস্ব কমিয়া যাইবে। তদুত্তরে উমর বলিয়াছিলেন, "আল্লাহ তাঁহার রসূলকে ধর্মপ্রচারক হিসাবে পাঠাইয়াছিলেন রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে নহে।" এইভাবে নানা উপায়ে ধর্ম প্রচারে উৎসাহিত করিয়া রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া আরব-অনারব মুসলমানদের মধ্যে বৈষম্য দূর করিয়া তিনি সুখী ও স্বাচ্ছন্দ সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন।

একদিকে যেমন ইসলাম ধর্ম গ্রহণে তিনি লোকজনকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন অপরদিকে তেমনি খলীফা প্রথম উমরের ন্যায় তিনি মুসলমানদিগকে অমুসলমানদের জমি ক্রয় করিতে নিষেধ করেন তিনি মদীনার আলিমদের সহিত পরামর্শ করিয়া দুইটি আইন জারী করিলেন। প্রথম আইনে বিজিত অঞ্চলে অমুসলমানদের জমিকে মুসলিম রাষ্ট্রের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং দ্বিতীয় আইন অনুসারে উপরোক্ত জমি ১০০ হিজরী সনের (৭১৮—৭১৯ খৃঃ) পর অমুসলমানদের নিকট

হইতে মুসলমানদের নিকট হস্তান্তর নিষিদ্ধ ঘোষিত হইল। ইহার কারণ মুসলমানগণকে তখনও জমিরজন্য খারাজ (রাজস্ব কর) দিতে হইত না এবং মুসলমানদেব হাতে জমি হস্তান্তরের ফলে রাষ্ট্র উপরোক্ত জমি হইতে কোন কর প্রাপ্ত হইবে না।

উমর ইবন আবদুল আজীজ তাঁহার বংশের অপরাপর খলীফার চেয়ে খুলাফা-ই-রাশিদীনেব জীবনাদর্শ দ্বারা বেশী প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তিনি হজরত আবু বকর ও উমরের মত নিরাড়ম্বর ও সহজ সরল জীবনযাত্রা পছন্দ করিতেন। উমাইয়া খলীফাগণের মত রাষ্ট্রীয় তহবিলকে খলীফার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি খুলাফা-ই-রাশিদীনের মতই নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য সামান্য ভাতা গ্রহন করিতেন। উমাইয়া যুগের সংঘাত, কলহ-কোন্দল, রক্তপাত, ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে তাঁহার খিয়াফতকাল স্বল্পকালের জন্য শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পশরা বহন করিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু সে শুধু স্বল্পকালের জন্যই, তাঁহার মৃত্যুর পরেই উমাইয়া যুগের পুরাতন রীতি পদ্ধতি পূর্ণোদ্দমে চালু হয় এবং উমরের শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়।

কোন কোন ঐতিহাসিক অভিযোগ করিয়াছিলেন যে উমর তাঁহার সংস্কারের দ্বারা শুধু উমাইয়া খিলাফতে পতনই ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। হজরত আলীর বংশধরগণ তাঁহার নীতির ফলে উমাইয়া স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আরও সচেতন হইয়া উঠে এবং মাওয়ালী (অনারব মুসলমানগণ) মুসলমানগণ আপন আপন ন্যায্য দাবী দাওয়া ও অধিকারের জন্য সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন চালাইবার অনুপ্রেরণা লাভ করিল। কিন্তু এইজন্য উমরকে দোষারোপ করা যায় না। উমাইয়ানের পতনের জন্য তাহাদের অবিচার ও অসাম্য নীতিই দায়ী। উমর এই অসাম্য দুর করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্তী শাসকগণ পূর্বতন পুনঃ প্রবর্তন করায় এই বংশের পতন দ্রুত ঘনাইয়া আসিয়াছিল। উমর মাত্র উনচল্লিশ বৎসর বয়সে ৭২০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পরলোক গমন করেন।

বিস্তারিত পাঠ

উইলিয়ম মুর, কলিফেট
গুয়েলহাউসেন, এরাব কিংডম এণ্ড ইট্‌স্ ফল
জুরজী জায়দান, বমদ্দুন ইশলাম ৪র্থ খণ্ড

১৮

দ্বিতীয় ইয়াজীদ ও হিসাম

দ্বিতীয় ইয়াজিদ আবদুল মালিকের পুত্র ছিলেন। খলীফা দ্বিতীয় ইয়াজিদের আমলে দ্বিতীয় উমর কর্তৃক প্রবর্তিত অনেক বিধি ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। উমরের ন্যায়নীতি ও সুব্যবহারের ফলে পূর্ববর্তী উমাইয়াগণের নিষ্ঠুর আচরণের কথা জনসাধারণ ভুলিয়া না যাইতেই ইয়াজীদ খলীফা হইলেন। যে খারিজীগণ দ্বিতীয় উমরের সময় তাহাদের অসি কোষবদ্ধ করিয়াছিল তাহারা আবার উমাইয়াগণের বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করিল। ইয়াজীদ ইবন মুহালিব কারাগার হইতে পালাইয়া নূতন খলীফা ইয়াজীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। খলীফার বাহিনী বিদ্রোহী সেনাপতিকে ফুরাতের পশ্চিম তীরে সংঘটিত এক যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিল। রাজ্যেরসর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা ছড়াইয়া পড়িল। বংশগত বিভেদ ও রেষারেষি —ইয়ামনী ও মুদার বংশীয় আরবদের কলহ নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করিল উমরের সুশাসনে গোত্রীয় কলহ অল্পকালের জন্য বন্ধ ছিল। এক্ষণে তাহা বহু গুণে বৃদ্ধি পাইয়া রাজ্যের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিল।

দ্বিতীয় ইয়াজীদ (৭২০-৭২৪)

ইয়াজীদের শাসনামলে সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে আব্বাসীয়দের স্বপক্ষে প্রচারণা আরম্ভ হইল। আব্বাসীয় গুপ্তাচরগণ খুরাসানে হজরতের পিতৃব্য আব্বাসের বংশধরগণের খিলাফতের দাবী প্রচার করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে সাম্রাজ্য যখন শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়াপড়িতেছিল তখন ইয়াজীদ তাঁহার অন্তঃপুরের হাবাবা নাম্নী এক গায়িকার মৃত্যুতে শোকাভিভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন (জানুয়ারী, ৭২৪)।

ইয়াজীদের মৃত্যুর পর আবদুল মালিকের অপর এক পুত্র হিশাম খলীফা হইলেন। তিনি ইয়াজীদ অপেক্ষা অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। দ্বিতীয় উমরের ন্যায় তিনিও দরবার হইতে অশোভন ও ধর্ম বিগর্হিত কার্যকলাপ বন্ধ করিয়া রাজধানীতে সুষ্ঠু জীবন যাত্রা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার খৃষ্টান প্রজাদের প্রতি তিনি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি খাল খনন, প্রসাদ নির্মাণ ও উদ্যান তৈরীতে মনোনিবেশ করেন। কৃষির উন্নতি বিধানে তিনি বিশেষ আগ্রাহী ছিলেন।

হিশাম (৭২৪-৭৪৩ খৃঃ)

তিনি অপচয় পছন্দ করিতেন না। খলীফা হওয়ার পর বৎসর তিনি যখন মক্কায় হজ্জ করিতে গেলেন তখন তাঁহাকে খুৎবায় আলীর নামে অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে অনুরোধ করা হইল। তদুত্তরে হিশাম বলিলেন যে তিনি হজ্জ্ব পালন করিতে আসিয়াছিলেন, কাহারও নিন্দা করিতে বা কাহাকেও অভিশাপ দিতে আসেন নাই। কিন্তু তাঁহার এই সকল সৎগুণ সাম্রাজ্যের অধোগতি রোধ করিতে পারিল না। আব্বাসীয় প্রচারক ও ধর্মান্ধ খারিজী-দের কার্যকলাপের ফলে উমাইয়া বংশের অধঃপতন শনৈঃ শনৈঃ ত্বরান্বিত হইতে লাগিল। তাঁহার কর্তব্য নিষ্ঠা, অমিতব্যয়িতা এবং ন্যায়ানুগ শাসন বহুধা বিভক্ত সাম্রাজ্যকে শেষ রক্ষা করিতে পারিল না। তদুপরি তাঁহার কয়েকটি প্রধান দোষ ও ছিল। তিনি গভর্ণর ও কর্মচারী নিয়োগে সব সময় দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। অধিকন্তু অনেক কর্মচারীর বিরুদ্ধে বৃথা সন্দেহ পোষণ করিয়া তিনি তাঁহাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিতে কুন্ঠা বোধ করেন নাই। তাঁহার মিতব্যয় অর্থগৃধ্নুতার নামান্তর ছিল। তাঁহার সময় কোষাগার পরিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনবোধেও তিনি অর্থব্যয় করিতে চাহিতেন না। ইহার ফলে তাঁহার সুনাম ও জনপ্রিয়তা বহুলাংশে ক্ষুণ্ন হয়। কর বৃদ্ধির সাহায্যে রাজ্যের আয় বৃদ্ধিই তাঁহাব একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

তাঁহার সময় যে স্বল্প সংখ্যক লোক দীর্ঘ সময়ের জন্য উচচ রাজপদে বহাল ছিলেন খালিদ আল্-কাসরী তাঁহাদের অন্যতম। তিনি হিশামের খিলাফতের প্রথম হইতে পনর বৎসর পর্যন্ত ইরাকের গভর্ণর ছিলেন। তিনি উদার মতাবলম্বী ছিলেন এবং আরবদের ইয়ামনী ও মুদার বংশীয় শাখার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করিয়া সুষ্ঠুভাবে শাসন কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। খৃষ্টান ও ইহুদীদের প্রতি তাঁহার ব্যবহাব সদয় ও ন্যায়ানুগ ছিল; তিনি তাহাদের গির্জা ও মন্দিরগুলি মেরামত করিয়া দেন এবং তাহাদিগকে বিভিন্ন রাজকার্যে নিযুক্ত করেন।

খালিদ আল-কাসরী

হিশামের শাসনামলে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ ও গোলযোগ দেখা দেয়। খুরাসানে ইয়ামনী ও মুদার বংশীয় আরবদের মধ্যে এক মারাত্মক যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। এই বিদ্রোহ প্রশমিত হওয়ার পর বুখারা ও সুগদিয়ানা অঞ্চলে নওমুসলিমগণ বিদ্রোহী হয়। তথাকার শাসনকর্তা নও মুসলিমগণকে জিযিয়া হইতে অব্যাহতি দিবার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে এই বিদ্রোহ দেখা দেয়। যাযাবর তুর্কোমানদের দলপতি খাকান এই বিদ্রোহীদের সহায়তা করেন। হারিস

খুরাসান ও সুগদিয়ানার বিদ্রোহ

নামক একজন আরব নেতা ও এই বিদ্রোহে যোগদান করেন। খালিদের ভ্রাতা আসাদ খুরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া এই সকল বিদ্রোহ দমনে চেষ্টিত হইলেন। আসাদ বিদ্রোহী হারিসের দলবলকে নির্মূল করেন এবং হারিস বিধর্মী তুর্কীদের সহিত যোগদান করিয়া রক্ষা প্রাপ্ত হন। অতঃপর আসাদ বলখে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি ৭১৭ খৃষ্টাব্দে খাকানকে পরাজিত করিয়া বহু মুসলমান বন্দীকে মুক্ত করেন। অল্পকাল পরেই খাকান তাঁহার অধীনস্থ এক সর্দারের হাতে নিহত হন। পর বৎসরেই আসাদের মৃত্যু হয়। ইহার পর নাসর ইবন সাইয়ার খুরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি পুনরায় মার্ভে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। নাসরের

নাসর ইবন সাইয়ার

সময় অক্ষু নদীর পূর্বদিকে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। খাকানের মৃত্যুতে তুর্কোমানগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং এতদঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ সহজতর হয়। দূরদর্শী নাসর সুগদিয়ানগণের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করিয়া তাহাদিগকে বশে আনিতে সমর্থ হইলেন। জিজিয়া ও খারাজ সম্পর্কিত বহুদিনের বাক-বিতণ্ডার অবসান ঘটাইয়া নাসর উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে কেবল অমুসলমানগণই জিযিয়া কর প্রদান করিবে। মুসলমানগণকে, আরব হউক বা অনারব (মাওয়ালী) হউক ভূমির জন্য খারাজ বা ভূমি রাজস্ব আদায় করিতে হইবে। এইভাবে তিনি মধ্য এশিয়ায় শান্তি স্থাপন করেন।

পাক-ভারতের সিন্ধু অঞ্চলে জুনায়দ নামক শাসনকর্তার দুর্ব্যবহারে অতীষ্ঠ হইয়া স্থানীয় হিন্দুগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইহার ফলে সিন্ধুর তীরে

সিন্ধু

মাহফুজা ও মনসুরা নামক দুইটি নূতন দুর্গ নির্মাণ করা হয়। ইহাদের সাহায্যে বিদ্রোহ প্রশমিত হয় এবং দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশে মুসলিম অধিকার বিস্তৃত হয়। খলীফার দুই পুত্র মু'আবিয়া ও সুলায়মান এশিয়া মাইনরে বাইজান্টাইনদের সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এই যুদ্ধে আল-বাত্তাল নামক একজন বীর সেনানী বিশেষ

এশিয়া মাইনর

কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া অবশেষে ৭৪০ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং পরাজিত ও নিহত হন। আর্মিনিয়ায় ও কাস্পিয়ান সাগরের তীরে খাজার উপজাতি লুটতরাজ করিতে থাকে। খলীফার ভ্রাতা মাসলামা ও পিতৃব্য পুত্র মারওয়ান (পরবর্তীকালে দ্বিতীয় মারওয়ান ও

শেষ উমাইয়া খলীফা) পর পর খাজারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে দমন করেন। আফ্রিকায় নও মুসলিম ও খারিজী সম্প্রদায় বিদ্রোহী হইয়া খলীফার সেনাবাহিনীকে বার বার পর্যুদস্ত করিতে থাকে। আরবগণ ১১৭/৭৩৫ সালে ৩ লক্ষ বার্বারদের এক বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করেন। এই সময় আরব নৌবাহিনী সিসিলি আক্রমণ করে, সিরাকুজ অধিকার করে এবং সার্ডিনিয়া জয় করে। ফ্রান্সে কয়েকটি নূতন স্থান অধিকৃত হয়।

খাজর বাইজান

আফ্রিকা

১১৩/৭৩১ সালে আবদুর রহমান আল-গাফিকী স্পেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি অতি সুযোগ্য শাসক ছিলেন। সর্বশ্রেণীর লোক জাতিধর্ম নির্বিশেষে তাঁহার নিকট সমান ও নিরপেক্ষ বিচার পাইত। তিনি উত্তরাঞ্চলে জোরদার অভিযান আরম্ভ করিয়া পয়েটিয়ার্স পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ করতলগত করেন। ফ্রাঙ্কদের নেতা চার্লস মার্টেল খৃষ্টানদের সাহায্যার্থে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। টুরস্ ও পয়েটিয়ার্সের মধ্যবর্তী স্থানে মুসলমান সেনাবাহিনী ও চার্লস মার্টেলের সেনাবাহিনী পরস্পর মুখামুখী হইল। হালকা খণ্ডযুদ্ধে সাতদিন কাটিয়া গেল। অষ্টম দিবসে মুসলমানগণ ফ্রাঙ্কবাহিনীকে আক্রমণ করিল। তাহাদের পাল্টা আক্রমণে মুসলিম বাহিনী বিপর্যস্ত হইল। সেনাপতি আবদুর রহমান অন্যান্য যোদ্ধাসহ নিহত হইলেন। রাত্রির অন্ধকার ঘনীভূত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলিল। আরবগণ রাত্রির অন্ধকারে শিবির উঠাইয়া লইয়া গেল। গোত্রগত কঁলহের ফলে তাহারা ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইল না। বহু আরব নেতা এই যুদ্ধে শহীদ হওয়ায় আরবগণ এই যুদ্ধকে 'বালাতুল-শুহাদা বা 'শহীদী চত্বর' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।

টুরসের যুদ্ধ ৭৩২ খৃঃ

ইরাকের শাসনকর্তা খালিদ আল-কাসরীর কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার উদার ও ন্যায়পরায়ণ শাসনে ইরাকে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। কিন্তু তাঁহার একদল শত্রু তাঁহার বিরুদ্ধে খলীফার মনকে বিষাইয়া তুলিল। ফলে হিশাম খালিদের পনর বৎসরের প্রশংসনীয় শাসনের কথা বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন (৭৩৮ খৃঃ) এবং ইউসুফ নামক নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোককে ইরাকের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। তাঁহার দুর্ব্যবহারে উত্যাক্ত হইয়া হুসায়নের পৌত্র জায়দ বিদ্রোহী হইলেন। কুফাবাসীরা তাঁহাকে দলে দলে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি

দিলেও প্রয়োজনের সময় খুব অল্প লোকই তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। উমাইয়া বাহিনীর সহিত যুদ্ধে তিনি তীরবিদ্ধ হইয়া নিহত হইলেন। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে গোপনে সমাহিত করিল কিন্তু নিষ্ঠুর ইউসুফ তাঁহার কবর হইতে মৃতদেহ বাহির করিয়া হিশামের নিকট তাঁহার মস্তক প্রেরণ করিলেন। জায়দের মৃত্যুর ফলে আব্বাসীয়গণের ভবিষ্যৎ নিষ্কন্টক হইল এবং খিলাফতের প্রতি তাহাদের দাবী জোরদার হইল।

কুফার জায়দের বিদ্রোহ ৭৪০ খৃঃ

হিশামের শাসনামলে আব্বাসীয়গণের খিলাফতের দাবী উত্তরোত্তর শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে। ইঁহারা হজরতের পিতৃব্য আব্বাসের বংশধর ছিলেন। আব্বাসের চারি পুত্র ছিল তন্মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস হাদিসবিদ হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। ইনি হজরত আলীর বিশেষ বিশ্বাসভাজন ছিলেন। কারবালায় হুসায়নের হত্যার পর ৬৮৬-৭ খৃষ্টাব্দে ভগ্নহৃদয়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র আলী হজরত আলীর বংশধরগণের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ৭৩৫ খৃষ্টাব্দে আলীর মৃত্যুর পর তৎপুত্র মুহম্মদ আব্বাসীয়গণের নেতা হইলেন। মুহম্মদ অতিশয় উচচাভিলাষী ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনিই আব্বাসীয়গণের মধ্যে সর্বপ্রথম খিলাফত লাভ করার আশা হৃদয়ে পোষণ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক নূতন মতবাদ প্রচার করেন যে কারবালায় হুসায়নের হত্যার পর মুসলমানদের ধর্মীয় নেতৃত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে হুসায়নের পুত্র আলীর (জয়নুল আবিদীনের) উপর না বর্তাইয়া মুহম্মদ ইবনুল হানাফিয়ার (আলীর হানিফা বংশীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র) উপর বর্তাইয়াছে। আল-হানাফিয়ার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আবুল হাশিম নেতৃত্ব পদ লাভ করেন। তিনি উক্ত পদ আব্বাসীয় বংশের মুহম্মদ ইবন আলী ইবন আবদুল্লাহকে প্রদান করেন। আব্বাসীয় প্রচারকগণ এই বিশ্বাসে আস্থা স্থাপন করিয়া গোপনে মুহম্মদের জন্য প্রচারণা চালাইতে থাকে। তবে তাহারা আলীর অনুরক্ত ও ভক্তগণের সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে এই বলিয়া প্রচারণা চালাইত যে তাহারা আহ্‌ল-বায়ত অর্থাৎ নবীর বংশধরগণের খিলাফতের দাবী অগ্রগণ্য করার উদ্দেশ্যে অসাধু ও ধর্মবিরোধী উমাইয়া রাজত্বের বিরুদ্ধে বিপ্লবের আয়োজন করিতেছে। ৭৪২--৪৩ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার পুত্র ইব্রাহীম, আবুল আব্বাস ও আবু জাফরকে যথাক্রমে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান।

আব্বাসীয়গণের খিলাফতের দাবী

হিশামের বিশ বৎসরের খিলাফত কাল এইভাবে নানা গোলযোগ ও বিদ্রোহের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয়। ৭৪৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। আরব ঐতিহাসিকগণ হিশামকে মু'আবিয়া ও আবদুল মালিকের পর উমাইয়া বংশের "তৃতীয় ও শেষ রাজনীতিক" বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু তাঁহার কার্যকলাপ পতনোন্মুখ উমাইয়া সাম্রাজ্যকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারিল না।

বিস্তারিত পাঠ্য

মুর, কলিফেট
আমীর আলী, হিষ্ট্রি অব সারাসেন্‌স

১৯

শেষ উমাইয়া খলীফাগন

দুশ্চরিত্রতার জন্য দ্বিতীয় ওয়ালীদ তাঁহার পিতৃব্য হিশামের দরবার হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। হিশামের মৃত্যুর পর তিনি দামিস্কের খলীফা হইলেন এবং হিশামের আত্মীয়স্বজন ও প্রিয়পাত্র-গণকে নানাভাবে নির্যাতন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারই প্ররোচনায় ইরাকের শাসনকর্তা ইউসুফ পদচ্যুত খালিদকে নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। জায়দের পুত্র ইয়াহিয়াও হিশামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করেন। মদ্যপান, সঙ্গীত ও ঘোড়দৌড়ে অপরিসীম আসক্তি দামিস্কের জনসাধারণের নিকট তাঁহাকে অপ্রিয় করিয়া তোলে। অবশেষে তাঁহার অশোভন আচরণে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উমাইয়াগণ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে এবং খলীফা প্রথম ওয়ালীদের পুত্র ইয়াজীদের (তৃতীয় ইয়াজীদ নামে পরিচিত) নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। জনসাধারণ দ্বিতীয় ওয়ালীদকে রাজধানীর উপকন্ঠে এক দুর্গে অবরোধ করে এবং তাঁহাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। বিদ্রোহীরা অতঃপর তৃতীয় ইয়াজীদকে খলীফা বলিয়া ঘোষণা করে।

দ্বিতীয় ওয়ালীদ ৭৪৩-৪৪

খলীফা তৃতীয় ইয়াজীদ ধার্মিক ও কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি সীমান্ত সুরক্ষিত করিবেন, নগর সমূহের রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, জনসাধারণের করভার লাঘব করিবেন এবং অসাধু কর্মচারিগণকে অপসারিত করিবেন। কিন্তু তাঁহার শাসনকাল মাত্র ছয় মাস স্থায়ী হইয়াছিল এবং সর্বত্র অবস্থা এত গোলযোগ পূর্ণ ছিল যে রাজ্যে কোন রকম সংস্কার প্রবর্তন সম্ভব পর ছিল না। ইয়াজীদ একটিমাত্র সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা হইল সৈনিকদের বেতন হ্রাস। এইজন্য তিনি 'আন-নাকিস' বা ব্যয় সংকোচনকারী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইয়াজীদের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা ইব্রাহীম মাত্র দুইমাস দশদিন রাজত্ব করেন। ইহার পর প্রথম মারওয়ানের পৌত্র দ্বিতীয় মারওয়ান খলীফা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। ইনিই শেষ উমাইয়া খলীফা।

এপ্রিল ৭৪৪-সেপ্টেম্বর, ৭৪৪

খলীফা দ্বিতীয় মারওয়ান আর্মিনিয়ার শাসনকর্তা হিসাবে ইতিপূর্বে যথেষ্ট যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং উত্তরদিক হইতে যে সকল যাযাবর জাতি মুসলিম রাজ্যে হানা দিয়া অশান্তির সৃষ্টি করিতেছিল তাহাদিগকে তিনি বার বার বিতাড়িত করেন। অসাধারণ ধৈর্যগুণের জন্য তিনি আল-হিমার (গর্দভবৎ ধৈর্যশীল) উপাধি দ্বারা আখ্যায়িত হইয়াছিলেন। তিনি অপেক্ষাকৃত সাধু ও সংযমী ছিলেন। উমাইয়া প্রাসাদের বিলাস ব্যসনে তাঁহার আসক্তি ছিল না। ইতিহাস পাঠে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। অধিক বয়সে শাসনকার্যের ভার প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার কর্মক্ষমতা অপরিবর্তিত ছিল এবং রাজ্যের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্রোহ দমনে তিনি ক্ষিপ্র-হস্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্যের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে যে গুণের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল তাহারই অভাব তাঁহার মধ্যে সবিশেষ পরিলক্ষিত হয়। যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ আরবগণকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া তাহাদের প্রাণশক্তিকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিল সেই হিময়ারও মুদার দ্বন্দ্বে খলীফা শেষোক্ত দলের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়া এবং হিময়ারগণের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিয়া সাম্রাজ্যের ধ্বংস ত্বরান্বিত করিলেন।

দ্বিতীয় মারওয়ান ৭৪৪-৭৫০

চরিত্র

খলীফা হওয়ার অল্পকাল পরেই হিম্‌স্ ও প্যালেষ্টাইনে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ দেখা দিল। ধর্মোন্মত্ত খারিজিগণ এই সময় উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচারণা আরম্ভ করিল। তাহারা সমগ্র ইয়ামন, হিজায ও ইরাক পদদলিত করিয়া খলীফার কর্তৃত্বের অবসান ঘোষণা করিল। এই সকল বিদ্রোহ দমনে মারওয়ান অসাধারণ নৈপুণ্য ও সাহসের পরিচয় দেন। তিনি ক্রমান্বয়ে হিম্‌স্ ও প্যালেষ্টাইনে বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত করেন এবং ইরাকে খারিজীদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে দজলার অপর পারে বিতাড়িত করেন। ইতিমধ্যে খারিজীদের একদল মদীনা অধিকার করে। মারওয়ানের সহকারী যুদ্ধে খারিজীদিগকে পরাজিত করিয়া হিজায ও ইয়ামন মুক্ত করেন। হিজায ও ইয়ামনে পরাজিত খারিজীরা হাজরা মউতে এবং ইরাক হইতে বিতাড়িত খারিজীগণ পারস্যে আশ্রয় গ্রহণ করে।

খারিজী বিদ্রোহ

মারওয়ান যখন রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্রোহ দমনে ব্যাপৃত ছিলেন তখন খুরাসানে হিময়ার ও মুদারগণের পারস্পরিক কলহ উমাইয়া রাজ্যের

ধ্বংস অত্যাসন্ন করিয়া তুলিল। খুরাসানের শাসনকর্তা নাসর ছিলেন মুদার বংশীয় এবং হিময়ারগণ তাঁহার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। আরবদের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সহিত যুক্ত হইল অনারবদের অসন্তোষ। উমাইয়া শাসকগণ অনারব মুসলমানগণকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিতেন না। রাজ্যের সকল সুযোগ সুবিধা আরবদেরই একচেটিয়া ছিল। সমাজে অনারব মুসলমানদের স্থান ছিল আরবদের নীচে। ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের নীতি উপেক্ষা করিয়া উমাইয়া শাসকগণ আরব ও অনারবদের মধ্যে বিভেদের দুর্লংঘ্য প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছিল। পারসিক মুসলমানগণ যত যোগ্য ও উপযুক্ত হউক না কেন তাহারা আরব রমনীর পানিগ্রহণ করিতে পারিত না। আরবগণ অশ্বারোহণে যুদ্ধ করিত অনারবগণকে পায়ে হাটিয়া যুদ্ধ করিতে হইত। অনারবগণ গণীমতের অংশীদার হইলেও রাজকোষ হইতে বৃত্তি পাইত না। তাহাদিগকে রাষ্ট্রে নানারকম কর দিতে হইত। এই সকল বিভেদ ও অসন্তোষের পূর্ণ সুযোগ লইয়া আব্বাসীয় নেতা ও তাহাদের সমর্থকদল ক্রমান্বয়ে আহল-বায়ত অর্থাৎ রসুলের বংশধরদের খিলাফতের দাবী জনসাধারণের সমক্ষে পেশ করিতেছিল।

মাওয়ালী

এই সময় খুরাসানে আব্বাসীয় দলের সমর্থক এক প্রতিভাবান ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। তিনি হইলেন আবু মুসলিম খুরাসানী। তিনি অনারব ছিলেন এবং আব্বাসীয় ইমাম মুহম্মদ কর্তৃক আব্বাসীয়গণের পক্ষে প্রচারণার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণ প্যালেষ্টাইনে অবস্থিত হুমায়মা নামক আব্বাসী প্রচার কেন্দ্র হইতে খুরাসান পর্যন্ত গোপনে বহুবার যাতায়াত করিলেন এবং ১২৯ হিজরীর রমজান মাসে উমাইয়া রাজ্যের চতুর্দিকে গোপন দূতসমূহ প্রেরণ করিয়া বিরাট বিপ্লবের জন্য খুরাসানে মাহেন্দ্র ক্ষণের অপেক্ষায় চাহিয়াছিলেন। অবশেষে সুযোগ বুঝিয়া ১২৯ হিজরী সালের ২৫শে রমজান (৯ই জুন, ৭৪৭) আব্বাসীয় বিপ্লবের সময় ধার্য করিয়া পর্বতের উপর এক উৎসবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন। চতুর্দিক হইতে অগণিত লোক শোক চিহ্ন প্রকাশক কৃষ্ণবর্ণ পোষাক পরিধান করিয়া দলে দলে সমবেত হইতে লাগিল। আবু মুসলিমের কাল পতাকা তলে সমবেত বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ নগর হইতে নগরান্তরে বিপ্লবের পতাকা উড্ডীন করিতে লাগিল। হিরাত ও অন্যান্য শহর হইতে উমাইয়া দুর্গ রক্ষীদল বিতাড়িত হইল। আবু মুসলিমের সেনাবাহিনীর সহিত মুকাবিলা

আবু মুসলিম

করিতে না পারিয়া রাজপ্রতিনিধি নাসর খলীফার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মারওয়ান এই সময়, খারিজীদের সহিত মেসোপটেমিয়ায় যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। মার্ভ আবু মুসলিমের অধিকার ভুক্ত হইল। ইতিমধ্যে আব্বাসী ইমাম ইব্রাহীম ইবন মুহম্মদ আবু মুসলিমের নিকট একটি পত্রে আব্বাসী আন্দোলনের ধীর গতি সম্বন্ধে অভিযোগ করেন। উক্ত পত্র খলীফা মারওয়ানের হস্তগত হইলে তিনি ইব্রাহীমকে হুমায়মা কেন্দ্র হইতে বন্দী করিয়া হার্‌রানে লইয়া গেলেন। তথায় বন্দী অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়। ইব্রাহীমের ভ্রাতা আবুল আব্বাস ও আবু জাফর তাঁহাদের পরিবারের অন্যান্য লোকজনসহ কুফায় পালাইয়া আত্মগোপন করিলেন।

আবু মুসলিম তাঁহার অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও সদ্ব্যবহারের সাহায্যে বহুলোককে আপন করিয়া লইলেন। তিনি তাঁহার অনুচরদের মধ্য হইতে দ্বাদশ সদস্যের একটি উপদেষ্টা সভার সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তিনি খিলাফতের দাবীদার কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে আন্দোলন পরিচালনা না করিয়া আলীর বংশীয় ও আব্বাসীয় উভয় দলের লোকজনকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হাশিমী বংশের নামে আন্দোলন চালাইতে থাকেন। কারণ আলী ও আব্বাস উভয়েই হাশিমের অধঃস্তন পুরুষ ছিলেন। আবু মুসলিমের সেনাপতি কাহতাবা নাসরকে স্থান হইতে স্থানান্তরে অনুসরণ করিয়া পরাজিত করেন। খুরাসান হইতে গুরগাঁওয়ে এবং সেখান হইতে রাই ও হামাদানে পলায়ন পর অবস্থায় তিনি পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন (৭৪৮ খৃঃ)। উমাইয়া খলীফাদের অধীনে বহুদিন যাবৎ খুরাসানের শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করার পর ৮৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সেনাপতি কাহতাবা সহকারী আবু আওন ও খালিদ ইবন বারমাক (বারমাকী উজীর পরিবারের উর্ধতন পুরুষ) সহ রাই অধিকার করেন এবং ইবন কাহতাবা নিহাওয়ান্দ অবরোধ করিলেন। কাহতাবা নগরীর সাহায্যার্থে প্রেরিত এক লক্ষ উমাইয়া সৈন্যের এক বিরাট বাহিনীকে পথিমধ্যে বাধাদান করিয়া পরাজিত করেন। তিন মাস অবরোধের পর নিহাওয়ান্দ আত্ম-সমর্পণ করিল। অতঃপর কাহতাবা কুফার দিকে যাত্রা করিলেন। উমাইয়া সেনাপতি ইবন হুবায়রার নেতৃত্বে সিরীয় বাহিনী কারবালার সন্নিকটে কাহতাবার মুকাবিলা করিল। সিরীয় বাহিনী পরাজিত হইল। কিন্তু কাহতাবা নিজেও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইলেন। ইবন কাহতাবা সেনা-

পত্তির পদ গ্রহণ করিয়া কুফার দিকে অগ্রসর হইলেন এবং প্রায় বিনা বাধায় কুফা দখল করিলেন। আবু সালামা নামক একজন হাশিমী প্রচারককে 'রসূলের বংশের ওয়াজীর' বলিয়া ঘোষণা করা হইল। আবু সালামা ও ইবন কাহতাবার যুক্ত নামে কুফার জনসাধারণের প্রতি একটি ঘোষণা প্রচার করিয়া বলা হইল যে পরদিন জামে মসজিদে একজন খলীফা নির্বাচন করা হইবে। নির্দিষ্ট দিনে বনু আব্বাসের কৃষ্ণবর্ণ পোষাকে সজ্জিত জনসাধারণ দলে দলে জামে মসজিদে সমবেত হইল। আবু সালামা জুমার নামাজের শেষে খলীফা নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে আবুল আব্বাস খলীফা হওয়ার জন্য যাবতীয় গুণে গুণান্বিত। সমবেত জনমণ্ডলী উচ্চৈঃস্বরে তকবীর ধ্বনি করিয়া প্রস্তাবে তাহাদের সম্মতি জ্ঞাপন করিল। আবুল আব্বাসকে তাঁহার গুপ্তস্থান হইতে আনয়ন করিবার জন্য দূত প্রেরণ করা হইল। তিনি মসজিদে পৌঁছিলে তাঁহার হস্তধারণ করিয়া বায়আৎ করার জন্য লোক-জনের মধ্যে তুমুল প্রাণ চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইল। এইভাবে আবুল আব্বাস খলীফা নির্বাচিত হইলেন।

আবুল আব্বাস খলীফা নির্বাচিত ২৯শে নভেম্বর ৭৪৯

ইতিমধ্যে কাহতাবার সহকারী আবু আওন শাহরাজোরের নিকট মার-ওয়ানের পুত্র আবদুল্লাকে পরাজিত করিয়া মসুল অধিকার করেন। খলীফা মারওয়ান শেষবারের মত আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করিবার সঙ্কল্প করিয়া স্বয়ং ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী লইয়া যাত্রা করিলেন। আব্বাসীয় খলীফা আবুল আব্বাস তাঁহার পিতৃব্য আবদুল্লাকে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করিয়া আবু আওনের সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন। উভয় সৈন্যদল জাব নদীর তীরে পরস্পরের সম্মুখীন হইল, সিরীয় বাহিনী নদীর ডাইন তীরে ও আব্বাসীয় বাহিনী নদীর বাম তীরে। মারওয়ান নদীর উপর সেতু নির্মাণ করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। প্রথম আক্রমণে আব্বাসীয়গণ পিছু হটিয়া গেল। কিন্তু ইহার পর আব্বাসীয়গণের প্রচণ্ড আক্রমনের ধাক্কায় সিরীয় বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিল। মারওয়ান সেতুটি কাটিয়া দিয়াও তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন রোধ করিতে পারিল না। তাহারা অধিক সংখ্যায় তরবারির আঘাতে ধরাশায়ী হইল এবং ততোধিক সংখ্যায় জাব নদীর গর্ভে নিমজ্জিত হইল। এই যুদ্ধে উমাইয়াদের গৌরব রবি চিরতরে অস্তমিত

জাবের যুদ্ধ ২৫শে জানুয়ারী ৭৫০

হইল। সমগ্র সিরিয়া আব্বাসীয়দের করতলগত হইল এবং একে একে সকল সিরীয় নগরী আবদুল্লাহ ও তাঁহার খুরাসানী বাহিনীর সম্মুখে তাহাদের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল। কেবলমাত্র দামিস্ক নগরী তাহাদের গতিরোধ করিলে নগরী অবরুদ্ধ হইল। ৭৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল উমাইয়া রাজধানী অধিকৃত হইল এবং সেখানে আব্বাসীয় পতাকা উড্ডীয়মান হইল। আবদুল্লাহ্ পলাতক খলীফা মারওয়ানকে অনুসরণ করিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠাইলেন। তাহারা মিসরে নীল নদের পশ্চিম উপকূলে বুসির নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র গির্জায় পলাতক খলীফাকে পাইয়া তাঁহাকে হত্যা করে (৫ই আগষ্ট ৭৫০)।

আবুল আব্বাস হাশিমীয়গণের প্রতি উমাইয়া নির্যাতনের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যে ভীষণ শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তিনি এত নিষ্ঠার সহিত পালন করিলেন যে তিনি আস্-সাফ্ফাহ অর্থাৎ রক্তপাতকারী এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে পরাজিত উমাইয়া বংশের লোকদিগকে নির্মমভাবে অনুসরণ করিয়া হত্যা করা হয়। প্যালেষ্টাইনে আবু ফুৎরুস নদীর তীরে আবদুল্লাহ ইবন আলী মারওয়ানের আশিজন আত্মীয় কুটুম্বকে সাধারণ ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহার শিবিরে আনয়ন করিয়া নির্মমভাবে হত্যা করেন। উমাইয়া বংশের যে স্বল্পসংখ্যক লোক আব্বাসীয় নিধনযজ্ঞ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল তন্মধ্যে হিশামের দৌহিত্র আবদুর রহমান অন্যতম। তিনি স্পেনে পালাইয়া গিয়া একটি নূতন উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দামিস্ক ও সিরিয়ার অন্যান্য স্থানে অবস্থিত উমাইয়া খলীফাদের সমাধিগুলি ও প্রতিহিংসা পরায়ণ আব্বাসীয়দের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। কেবলমাত্র ধার্মিক প্রবর দ্বিতীয় উমরের সমাধির উপর কোন প্রকার অত্যাচার করা হয় নাই। এইভাবে উমাইয়া বংশের খিলাফতের অবসান হইয়া আব্বাসীয়দের খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হইল।

বিস্তারিত পাঠ্য

ম্যুর, কলিফেট
আমীর আলী, হিষ্ট্রী অব সারাসেন্স্

২০

উমাইয়া বংশের পতন

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে উমাইয়াগণের যে ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে মাঝে মাঝে তাহাদের পতনের কারণ সমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। বিশদ আলোচনার সুবিধার জন্য এক্ষণে আমরা কারণগুলি পরস্পর সন্নিবেশিত করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইবন খলদুনের মতবাদ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার মতে কোন রাজবংশের আয়ু শত বৎসরের অধিক স্থায়ী হয় না। উমাইয়া বংশের শাসনকাল ছিল নব্বই বৎসরের মত।

উমাইয়া বংশের পতনের সর্ব প্রধান কারণ শাসকদের দুর্বলতা। একই বংশে বহুদিন ধরিয়া পুরুষানুক্রমে যোগ্য শাসকের জন্ম হয় না। হিশামের চারিজন উত্তরাধিকারীর মধ্যে মারওয়ান ব্যতীত অপর সকলেই শাসনকার্যের অযোগ্য ও আরাম আয়েশ প্রিয় ছিলেন। উমাইয়া শাসকগণের অনেকেই রাজকার্য ও ধর্মচর্চার চেয়ে শিকার, মদ্য-পান ও গান বাজনায় বেশী সময় অতিবাহিত করিতেন। অর্থের প্রাচুর্য ও ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীর প্রতুলতা রাজবংশকে বিলাসিতা ও স্বেচ্ছাচারিতার পথে ঠেলিয়া দিয়াছিল। হারেমে সংখ্যাতিরিক্ত ক্রীতদাসী রাজবংশের রক্তের বিশুদ্ধতা বিনষ্ট করিয়াছিল। শেষ উমাইয়া খলীফাদের মধ্যে কেহ কেহ অনারব ক্রীতদাসীর গর্ভজাত ছিলেন। মদ্য ও সঙ্গীতের প্রতি অতিশয়াসক্তি এবং হেরেম প্রথা আরবদের নৈতিক অধঃপতন ত্বরান্বিত করিয়াছিল।

শাসকদের দুর্বলতা

অনাদিকাল হইতে আরবগণ মুদারী (কয়েস) বা উত্তর আরব এবং হিময়ার (ইয়ামনী) বা দক্ষিণ আরব এই দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত ছিল। এই দুই শাখার আরবগণ কালক্রমে রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইরাকে, সিরিয়ায়, খুরাসানে, স্পেনে এবং অন্যান্য স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। ইরাকে দাজলা ও ফুরাত নদীর তীরে প্রধানতঃ মুদার বংশীয় এবং সিরিয়ায় প্রধানতঃ ইয়ামনী আরবগণ অধিক সংখ্যায় বসতি স্থাপন করে। অনুরূপ খুরাসানে উভয়শাখার আরবগণ বিভিন্ন স্থানে বসবাস

আরবদের অন্তর্দ্বন্দ্ব

করিতে থাকে। ইহারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সযত্নে ও সজ্ঞানে রক্ষা করিয়া চলিত এবং কালক্রমে দুইটি যুযুধান শাখায় বিভক্ত হইয়া পরস্পরের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। উমাইয়া শাসকগণ একদলের পক্ষাবলম্বন করিয়া অপর দলকে নির্যাতন করিত। মু'আবিয়া সহ অধিকাংশ খলীফা ইয়ামনী আরবদের মুখপাত্র হিসাবে তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণে চেষ্টিত ছিলেন। খলীফা প্রথম ওয়ালীদের সময় মুদারবংশীয় কয়েস শাখা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু ওয়ালীদের ভ্রাতা সুলায়মান ইয়ামনী আরবগণকে বেশী অনুগ্রহ দেখাইতেন। দ্বিতীয় ইয়াজিদ ও দ্বিতীয় ওয়ালীদ ছিলেন মুদার বংশের পৃষ্ঠপোষক; আবার তৃতীয় ইয়াজিদ ইয়ামনীদের সহায়তায় ক্ষমতা দখল করিয়াছিলেন। এইভাবে উমাইয়া খলীফাগণ দল বিশেষের ক্রীড়নক হিসাবে রাজ্যে সংহতি রক্ষার চেয়ে বিভেদের পথই সুপ্রশস্ত করিতেছিলেন। উত্তর ও দক্ষিণ আরবদের এই বিভেদ সামান্য উস্কানীতেই বিরাট কলহে রূপান্তরিত হইতে থাকে এবং শেষ খলীফা মারওয়ানের সময় এই অন্তর্দ্বন্দ্বই রাজ্যের অপরাপর সমস্যার মুকাবিলা করিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিয়াছিল।

উত্তরাধিকার সমস্যা

মুসলিম রাষ্ট্রে উত্তরাধিকারের জন্য নির্ধারিত কোন নিয়ম ছিল না। প্রাথমিক খলীফাগণের সময় মদীনার জনসাধারণ এবং হজরত মুহম্মদের সাহাবা খলীফা নির্বাচনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। সাম্রাজ্যের বিস্তারের ফলে এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হওয়ায় যে কোন খলীফার মৃত্যুর পর খিলাফত লইয়া বিভ্রান্তি ও অরাজকতার উৎপত্তি হইতে পারে মনে করিয়া এবং খিলাফত নিজের বংশে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে সুচতুর মু'আবিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ইয়াজীদকে নিজ উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন। কিন্তু প্রাচীন আরব প্রথা অনুযায়ী বয়োজ্যেষ্ঠ দলপতি নির্বাচন অথবা ইসলামের বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যনীতি বংশগত উত্তরাধিকারের নীতির পরিপন্থী ছিল। এইজন্য এইনীতি সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয় নাই। তাছাড়া গদীনশীন খলীফা পর্যায়ক্রমে দুই পুত্রকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতেন, আবার এক পুত্র খলীফা হইয়া ভ্রাতাকে বঞ্চিত করিয়া স্বীয় পুত্রকে খলীফা মনোনয়ন করিতেন। এইভাবে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন লইয়া কলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হইত।

হজরত আলীর সমর্থক শিয়া সম্প্রদায় উমাইয়া খলীফাগণকে মানিয়া লইতে পারে নাই বিশেষতঃ কারবালার শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের পর তাহারা

উমাইয়াগণের বিরোধিতা করিতে থাকে। হজরত রসুলুল্লার বংশধর হিসাবে আলীর সন্তানগণ শিয়াদের প্রিয়পাত্র হিসাবে বিশেষ সমাদৃত হইতেন। হাসান ও হুসায়নের বংশধরগণ মদীনায় বসবাস করিতেন এবং মক্কা-মদীনায় আগত হজ্জযাত্রীদের মনোযোগ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেন। এইভাবে শীয়া সম্প্রদায় ছাড়া অন্যান্য মুসলমানগণ ও তাহাদের প্রতি বিশেষভাবে ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত এবং উমাইয়া খলীফাগণকে তাহাদের ধর্ম বিগর্হিত কার্যকলাপের জন্য নিন্দা করিত।

শিয়া সম্প্রদায়

অনারব মুসলমানগণ বিশেষতঃ পারস্যদেশীয় মুসলমানগণ নানা কারণে উমাইয়াদের বিরুদ্ধাচরণ করিত। তাহারা উমাইয়া রাষ্ট্রে আরব মুসলমান-দের সমান সুযোগ সুবিধা পাইত না। কোন কোন সময় ইসলাম গ্রহণের পরেও তাহারা জিয্য়া হইতে অব্যাহতি পাইত না। কোন অনারব মুসলমান আরব মহিলার পানি প্রার্থী হইতে পারিত না। যুদ্ধক্ষেত্রে তাহারা পায়ে হাঁটিয়া যুদ্ধ করিত এবং তাহারা গণীমতের অংশী-দার হইলেও রাষ্ট্রীয় ভাতায় তাহাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অন্য পক্ষে ইসলাম ধর্ম এই অসাম্য ও বিভেদ নীতির ঘোরতর বিরোধী ছিল। খারিজী, মুরজিয়া ও শিয়া সম্প্রদায় মাওয়ালীদের সমান অধিকারের দাবী সমর্থন করিত। আব্বাসী প্রচারকগণও তাহাদের দাবী দাওয়া মানিয়া লইয়াছিল। খুরাসানের আব্বাসী নেতা আবু মুসলিম স্বয়ং অনারব ছিলেন এবং অগণিত মাওয়ালী মুসলমান আব্বাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে তাঁহার পতাকা-তলে সমবেত হইয়াছিল।

মাওয়ালি

এইভাবে শিয়া, মাওয়ালী ও আব্বাসীয় দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে আবু মুসলিমের নেতৃত্বে খুরাসানের মার্ভ নগরীতে ৭৪৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন আব্বাসীয় কৃষ্ণ পতাকা উন্মোচিত ও উত্তোলিত হইল। ৭৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর কুফার জুমা মসজিদে আবুল আব্বাস খলীফা নির্বাচিত হইলেন। ৭৫০ সালের ২৫শে জানুয়ারী জাবের যুদ্ধে আব্বাসীয় বাহিনী মারওয়ানের নেতৃত্বে পরিচালিত সিরীয় বাহিনীকে পরাজিত করিয়া আব্বাসীয় বংশের শক্তি সুদৃঢ় করে। উমাইয়াদের গৌরব-রবি চিরদিনের জন্য অস্তাচলে ডুবিয়া গেল। আরবদের প্রভুত্বের অবসান হইয়া অনারব-দের প্রাধান্যের পথ সুপ্রশস্ত হইল।

বিস্তারিত পাঠ্য

হিট্টি, হিষ্ট্রী অব দি এরাব্স্
মুর, কলিফেট

২১

উমাইয়া যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি

উমাইয়া যুগের প্রধান কীর্তি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তার। কিন্তু এই যুগেই জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলমানদের কমবেশী অবদান রহিয়াছে। গ্রীক, আর্মিনীয়, পারসিক ও পাক-ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে মুসলমানগণ নূতন নূতন জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলন আরম্ভ করে। এই যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল তাহা পরবর্তী আব্বাসীয় যুগে বিরাট মহীরূহে রূপান্তরিত হইয়া শাখা প্রশাখায় পল্লবিত ও ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়া উঠে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্মেষের জন্য উমাইয়া যুগ ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। এই যুগের খলীফাগণ বিশেষ ধরণের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহশীল ছিলেন। তন্মধ্যে কবিতা, গান, স্থাপত্য ও চিত্রকলা প্রধান। উমাইয়া খলীফাগণ কবি ও চারণ, গায়ক ও গায়িকার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তাঁহারা মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করেন। শাসকের পৃষ্ঠ-পোষকতা ছাড়াও জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এই যুগে মুসলমানদের দান অকিঞ্চিৎকর নহে।

এই যুগেই সর্বপ্রথম কুরআন ও হাদীসের চার্চ আরম্ভ হয়। কুরআন ও হাদীসের চর্চাই পরবর্তীকালে ফিক্‌হ বা মুসলিম আইনের জন্ম দেয়। উমাইয়া যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীসবিদ ছিলেন ইমাম হাসান আল-বসরী। মুসলমানদের বহু ধর্মীয় আন্দোলন বসরীর নিকট হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিল। সুফীরা তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, মুতাজিলাগণ তাঁহাকে তাহাদেরই একজন মনে করে। সুন্নী মুসলমানগণ তাঁহার বিভিন্ন বাণী ভক্তিভরে উদ্ধৃত করিয়া থাকে। এই যুগের অপর একজন হাদীসবিদ ছিলেন ইবন শিহাব জুহ্‌রী। কুফার আবদুল্লাহ ইবন মাসুদ বহু হাদীস বর্ণনা করেন। অপর হাদীস বিদ ইবন শারাহবিল আশ-শাবী বিখ্যাত ইমাম আবু হানীফার শিক্ষক ছিলেন। মক্কা ও মদীনায় হাদিসবিদগণের মধ্যে মদীনার আনাস ইবন মালিক এবং আবদুল্লাহ্‌ ইবন উমর ও মক্কার আবদুল্লাহ্‌ ইবন আব্বাস বিখ্যাত।

হাদীস : বসরা ও কুফা

মক্কা ও মদীনা

কুফা ও বসরায় এই যুগে আরবী ব্যাকরণের উদ্ভব হয়। অমুস-লমানদের কুরআন পাঠ ও কুরআনের অর্থ অনুধাবন করার জন্য ব্যাকরণের উৎপত্তি হয়। আরবী ব্যাকরণের স্থাপয়িতা আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়ালী বসরার অধিবাসী ছিলেন। তিনি এই বিষয়ে হজরত আলীর নিকট হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। অপর বৈয়াকরণ খলীল আরবী ছন্দপ্রকরণ ও অভিধান প্রণয়ন করেন। তাঁহারই শিষ্য সিবাওয়াইহ্ প্রথম পূর্ণাঙ্গ আরবী ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। বসরার দেখাদেখি কুফায়ও প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যায়াকরণ মতবাদ গড়িয়া উঠে।

আরবী ব্যাকরণ

উমাইয়া খলীফাগণ প্রাচীন আরব রাজা বাদশাহদের কাহিনী শুনিতে পছন্দ করিতেন। মু'আবিয়ার আহ্বানে দক্ষিণ আরবের আবিদ ইবন শারইয়াহ 'কিতাবুল-মুলুক ওয়া খবারুল মাদীন' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ ও কা'ব-আল আহবার নামক ধর্মান্তরিত ইহুদীদের মাধ্যমে অনেক ইহুদী গল্প ও গাঁথা ইসলামী সাহিত্যে স্থান লাভ করে।

ইতিহাস

উমাইয়া যুগে খলীফাদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতার ফলে কাব্য ও কবিতায় চরম উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই যুগে রাজনৈতিক কবিতার জন্ম হয়। মিসকিন আদ-দারিমী নামক জনৈক কবি মু'আবিয়া কর্তৃক ইয়াজীদের খলীফা মনোনয়ন সম্পর্কে কবিতা রচনা করিয়া জনসাধা-রণের মধ্যে প্রচার করিতে থাকেন। হাম্মাদ নামক একজন সংগ্রাহক জহিলিয়া যুগের কবিতা সঙ্কলন করেন। উমাইয়াদের চারণ কবিদের মধ্যে ফারাজ-দাক, জরীর ও আখতাল বিখ্যাত। শেষোক্তজন খৃষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং জোরালো ভাষায় উমাইয়াদের খিলাফতের দাবী সমর্থন করিতেন। জরীর ও ফারাজদাক পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এবং ব্যাঙ্গরসাত্মক কবিতায় সুনিপুণ ছিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিগণ জরীর কর্তৃক নিন্দিত হইতে পারিলেও নিজদিগকে ধন্য মনে করিতেন। রাজনৈতিক কবিতা ছাড়া প্রেমের কবিতা ও এই যুগে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। এই জাতীয় কবিদের মধ্যে উমর ইবন রাবিয়া ও জামীল প্রধান। মজনু ও লায়লার প্রেমের উপাখ্যানের উৎপত্তি এই যুগেই হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়।

কবিতা

উমাইয়া যুগে বাগ্মীতার জন্য কয়েকজন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। শুক্রবারের নামাজের পূর্বে খুৎবা (বক্তৃতা) করার প্রথা

বাগ্মিতা প্রদর্শনের সুযোগ দেয়। গভর্নর ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ এতদুপলক্ষে রাজভক্তি ও সামরিক চেতনার উপর জোর দিতেন। ধর্মীয় বক্তৃতার মধ্যে ইমাম হাসান আল-বসরীর বক্তৃতা, এবং রাজনৈতিক বক্তৃতার মধ্যে জিয়াদ ও হাজ্জাজের বক্তৃতা এই যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সম্পদ। খলীফার কর্মাধ্যক্ষগণ সরকারী প্রত্যাদেশ ও চিঠিপত্রে ব্যবহারের জন্য একটি ভাষা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এই জাতীয় লিখন পদ্ধতির জন্মদাতা আবদুল হামীদ শেষ উমাইয়া খলীফাদের কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন।

বাগ্মিতা ও পত্র লিখন

আল-কেমী, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রারম্ভ এই যুগেই হইয়াছিল বলিয়া ধরা হয়। খালিদ ইবন ইয়াজীদ গ্রীক বিজ্ঞান হইতে উপরোক্ত বিষয়সমূহের জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করা হইত। ইমাম জাফর আস-সাদিককে আল-কেমী ও জ্যোতিষের গ্রন্থ প্রণেতা বলিয়া মনে করা হইত। বর্তমান গবেষণার ফলে এইগুলি কাল্পনিক বলিয়া প্রমাণিত হইলেও বিদেশী প্রভাবের ফলে এই যুগে এইসব বিজ্ঞানের শাখায় আরবগণ মনোনিবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া নিঃসন্দেহে ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে। এই যুগের ইহুদী ও খ্রীস্টান চিকিৎসকগণ খলীফাদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে গ্রীক ও সিরীয় ভাষায় লিখিত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গ্রন্থসমূহ আরবীতে অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন।

বিজ্ঞান

এই যুগে অদৃষ্টবাদ ও মানুষের স্বাধীন কর্মক্ষমতাকে কেন্দ্র করিয়া দুইটি বিপরীত ধর্মীয় মতবাদ গড়িয়া উঠে। যাহারা অদৃষ্টবাদকে সমর্থন করিত তাহাদিগকে 'জাবরিয়া' ও যাহারা মানুষের স্বাধীন কর্মক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিল তাহাদিগকে 'কাদরিয়া' বলা হইত। উমাইয়া খলীফাগণ নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে মোটামুটিভাবে জাবরিয়া মতবাদের সমর্থক হইলেও পরবর্তী যুগের খলীফাগণ ক্রমবর্ধমান কাদরিয়া মতবাদকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় মু'আবিয়া ও তৃতীয় ইয়াজীদ এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কাদরিয়াদের অনুরূপ মতামতে বিশ্বাসী মুতাজিলা সম্প্রদায়ের উদ্ভব এই যুগেই হইয়াছিল। কথিত আছে, ইমাম হাসান আল-বসরীর শিষ্য ওয়াসিল ইবন আতা উস্তাদের সহিত একটি আইনের প্রশ্নে বিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়া মুতাজিলা (অর্থাৎ দল-ত্যাগী) আখ্যা লাভ করেন। মুতাজিলাগণও মানবীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী

ধর্মীয় আন্দোলন

ছিল এবং পরবর্তীকালে আল্লাহ্র একক অস্তিত্বে বিশেষ গুরুত্বারোপ করিয়া তাহারা নিজদিগকে 'আহলুল-আদল ওয়াত-তাওহীদ' (সুবিচার ও একত্ববাদে বিশ্বাসী) বলিয়া অভিহিত করিত।

বিখ্যাত মহীয়সী সাধ্বী রাবিয়া বসরী এই যুগেই তাঁহার সাধনা ও তপস্যার জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। এই যুগে মুসলমানদের মধ্যে কতকগুলি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়। প্রধানতঃ খলীফা বা ইমাম নির্বাচনের প্রশ্নে মতবিরোধের ফলেই এই দলগুলির জন্ম হয়। খারিজী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় সিফ্ফিনের যুদ্ধের পর। আলীর (রাঃ) দল হইতে বহুসংখ্যক লোক সরিয়া পড়ে এবং খারিজী বা দলত্যাগী আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই সম্প্রদায়ের মতে, খলীফা সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত হইবে। তাহাদের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য তাহারা বল প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিল এবং এইজন্য তাহারা মুসলিম রাজ্যে বহু রক্তের নদী প্রবাহিত করিয়াছিল।

মুরজিয়া নামক এক সম্প্রদায় পাপিষ্ঠ মুসলমানদিগকে কাফির বলিয়া আখ্যায়িত করিতে চাহিত না। তাহারা এই সকল লোকের বিচারের ভার আল্লাহর উপর ছাড়িয়া দিবার পক্ষপাতী ছিল। ইহাদের অপর মতবাদ রাজনৈতিক ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত শাসকদের (উমাইয়া খলীফাগণের) স্বীকৃতি দান। এই দলের মতে, উমাইয়াগণ শুধু যে মুসলমান ছিলেন, ইহাই তাঁহাদের খলীফা হওয়ার জন্য যথেষ্ট। অন্যপক্ষে শীয়া-সম্প্রদায় নির্বাচন অথবা বল প্রয়োগে ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আলী (রাঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে বংশানুক্রমে ইমামের (ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা) পদ সুনির্ধারিত থাকিবে, এই বিশ্বাসে অটল ছিল।

স্থাপত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত

উমাইয়া খলীফাগণ স্থাপত্য শিল্পে অনুরাগী ছিলেন। খলীফা প্রথম ওয়ালীদ ছিলেন এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্মাতা। তাঁহার পিতা আবদুল মালিক জেরুজালেমের বিখ্যাত 'কুব্বাতুস-সাখরা' (প্রস্তর গুম্বুজ) নির্মাণ করেন। ইবন জুবায়র কর্তৃক অধিকৃত মক্কা-মদীনা হইতে হজযাত্রীদিগকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে তিনি ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কীর্তি ওয়ালীদ কর্তৃক নির্মিত দামিস্কের জুমা মসজিদ। ইহাতে জুমা মসজিদের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য, যেমন--মিনার, প্রদীপের কুলুঙ্গী, মিম্বর, গুম্বুজ ও ঘোড়ার নালের আকৃতি খিলান ইত্যাদির একত্র সমাবেশ ইহাকে অপূর্ব সুষমামণ্ডিত করিয়া পরবর্তী-

কালে মসজিদ নির্মাণের জন্য আদর্শ স্থানীয় করিয়া তুলিয়াছিল। উমাইয়া খলীফাগণ সিরিয়ার মরু অঞ্চলে প্রমোদ-ভবন তৈয়ার করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত 'কায়সার আমরা' প্রাসাদ অপূর্ব কলা-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। এই প্রাসাদের দেওয়াল-চিত্র বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। কোন কোন প্রতীক-চিত্রে বিজয়, দর্শন, ইতিহাস, কবিতা প্রভৃতি ভাব রূপায়িত হইয়াছে। আবার কোন কোন চিত্রে নর্তক-নর্তকী ও গায়ক-গায়িকার নগ্নমূর্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। উমাইয়া খলীফাগণ সঙ্গীতের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। খলীফাগণের মধ্যে কেহ কেহ সঙ্গীতকলায় পারদর্শীও ছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ ও গায়কদের মধ্যে সাঈদ ও মা'বাদের নাম উল্লেখযোগ্য। মদীনার জমীলা বিখ্যাত গায়িকা ও বহু গায়ক-গায়িকার শিক্ষাদাত্রী ছিলেন। দ্বিতীয় ইয়াজীদের প্রিয়পাত্রী সাল্লামা ও হাবাবা নাম্নী গায়িকাদ্বয় জমীলার শিষ্যা ছিলেন।

বিস্তারিত পাঠ্য

নিকলসন, লিটারারি হিস্ট্রি অব দি এরাব্‌স্
হিট্টি, হিস্ট্রি অব দি এরাব্‌স্

২২

উমাইয়া শাসন ও সমাজ

উমাইয়া সাম্রাজ্যের প্রদেশ-বিভাগ মোটামুটি বাইজান্টাইন ও সাসানীয় প্রদেশের অনুরূপ ছিল। নিম্নলিখিত নয়টি প্রদেশ পাঁচজন রাজ-প্রতিনিধির দ্বারা শাসিত হইত:

(১) সিরিয়া-প্যালেস্টাইন
(২) কুফা (ইরাকসহ)
(৩) বসরা-পারস্য, সিজিস্তান, খুরাসান, বাহরাইন, উমান এবং সম্ভবতঃ নাজদ ও ইয়ামামা এই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
(৪) আর্মিনিয়া
(৫) হিজাজ
(৬) কিরমান ও পাক-ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল
(৭) মিসর
(৮) ইফ্রিকিয়া
(৯) ইয়ামন ও দক্ষিণ আরব

মু'আবিয়া বসরা ও কুফাকে একত্রিত করিয়া কুফায় রাজধানীসহ একজন রাজপ্রতিনিধির অধীনে ন্যস্ত করিলেন। পারস্য ও পূর্ব-আরব এই ইরাকের রাজপ্রতিনিধির অধীনে ছিল। পরবর্তীকালে ইরাকের রাজ-প্রতিনিধির অধীনে খুরাসান ও ট্রান্সঅক্সিয়ানার জন্য মার্ভে একজন সহকারী গভর্নর এবং সিন্ধু ও পাঞ্জাবে অপর একজন সহকারী গভর্নর নিযুক্ত হয়। অনুরূপ হিজাজ, ইয়ামন এবং মধ্য-আরব মিলিয়া এক রাজপ্রতিনিধির শাসনাধীন ছিল। জজীরা, আর্মিনিয়া, আজরবাইজান ও পূর্ব-এশিয়া মাইনরের কিয়দংশ মিলিয়া তৃতীয় অঞ্চল গঠিত হইল। মিসর চতুর্থ রাজ-প্রতিনিধির অধীনে ছিল। মিসরের পশ্চিমের উত্তর-আফ্রিকা অঞ্চলই স্পেন, সিসিলি ও পার্শ্ববর্তী দ্বীপাঞ্চল লইয়া পঞ্চম রাজপ্রতিনিধির অঞ্চল গঠিত হইল। ইফ্রিকিয়া নামে অভিহিত এই অঞ্চলের রাজধানী কায়রোয়ান।

এইসব বড় বড় অঞ্চলের রাজনৈতিক অধিকর্তার উপাধি ছিল আমীর অথবা সাহিব। রাজনৈতিক ও সামরিক সকল ক্ষমতা আমীরের হস্তে

ন্যস্ত ছিল, কিন্তু রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রায়শঃ সাহিবুল খারাজ নামক একজন বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত হইতেন। তিনি শুধু খলীফার নিকট আপন কাজের জন্য জবাবদিহী থাকিতেন। কখনও কখনও রাজ-প্রতিনিধিরা স্বয়ং রাজধানীতে অবস্থান করিয়া নিজ নিজ অঞ্চলে নিজেদের প্রতিনিধি (নায়িব) প্রেরণ করিতেন।

রাজ্যের রাজস্ব খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়ের মতই ভূমি-রাজস্ব (খারাজ), জিযিয়া, যাকাত ও খুমুস (গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ) হইতে গৃহীত হইত। প্রদেশের রাজস্ব প্রথমে প্রদেশেই সংগৃহীত হইয়া প্রাদেশিক কোষাগারে রক্ষিত হইত। প্রাদেশিক শাসনের যাবতীয় ব্যয়, যেমন—সৈন্যদের বেতন, ভাতাভোগীদের ভাতা, কর্মচারীদের বেতন, জনহিতকর কাজ, যেমন—রাস্তাঘাট, খাল, দালানকোঠা নির্মাণ, মসজিদ-মাদ্রাসার ব্যয় প্রভৃতি নির্বাহ হইত। উদ্বৃত্ত রাজস্ব খলীফার নিকট কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা দেওয়া হইত।

বিচার-বিভাগ কাজীদের দ্বারা পরিচালিত হইত। বড় বড় শহরের জন্য কাজী নিযুক্ত হইত। আইনজ্ঞ (ফকীহ) লোকদের মধ্য হইতে কাজী নিযুক্ত হইত। ইঁহাদের কুরআন ও হাদীসে সম্যক জ্ঞান থাকিত। মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য মুসলিম আইন অনুসারে ইঁহারা বিচার করিতেন। কারণ অমুসলমানগণ নিজ নিজ আইন অনুসারে তাহাদের ধর্মীয় নেতার বিচারাধীন থাকিত। বিচারের কাজ ছাড়া কাজীগণ ওয়াক্ফ্-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন।

পুলিসের অধিনায়ককে সাহিবুশ-শুরতা বলা হইত। মু'আবিয়া সরকারী প্রত্যাদেশ ও চিঠিপত্রের বিশুদ্ধতা সুনিশ্চিত করার জন্য দীওয়ানুল খাতাম নামক বিভাগ প্রবর্তন করেন। এই বিভাগে যাবতীয় সরকারী আদেশ ও চিঠিপত্রের অনুলিপি রক্ষিত হইত। ইহার ফলে আবদুল মালিকের সময়ের মধ্যে দামিস্কে সরকারী দলীলপত্রের এক বিরাট সম্ভার গড়িয়া উঠে। মু'আবিয়ার অপর কীর্তি দীওয়ানুল বারীদ বা ডাকবিভাগ সংগঠন। আবদুল মালিকের সময় এই বিভাগের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। সরকারী কাজের জন্য প্রদেশসমূহে গ্রীক ও সিরীয় ভাষার পরিবর্তে আরবী ভাষার ব্যবহার, খাঁটি আরবী মুদ্রার প্রবর্তন প্রভৃতি শাসন সংস্কারের জন্য আবদুল মালিকের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

উমাইয়াদের সময় বাইজানটাইনদের অনুরূপ বেতনভুক নিয়মিত সেনা-বাহিনী রাখা হইত। মু'আবিয়া আরবদের একটি নৌ-বহরও গঠন করিয়া-ছিলেন। যুদ্ধের সময় সৈন্যগণ অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশী বেতন-ভাতা পাইত। পদাতিক ও অশ্বারোহী ব্যতীত সেনাবাহিনীতে গোলন্দাজ বাহিনীও থাকিত। এক সময় উমাইয়া বাহিনী ৬০,০০০ লোকের দ্বারা গঠিত ও বাৎসরিক ৬০,০০০,০০০ দিরহাম ব্যয়ে পরিপোষিত হইত। পরবর্তীকালে এই সৈন্যসংখ্যা ১,২০,০০০-এ উন্নীত হয়।

খলীফার জীবনযাত্রা

উমাইয়া খলীফাগণ রাজকীয় প্রাসাদে সাড়ম্বরে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন। খলীফা শুক্রবারে জুমার নামাজে ও দৈনিক পাঁচবার নামাজে নেতৃত্ব করিতেন। মু'আবিয়া, আবদুল মালিক ও দ্বিতীয় উমর এই কর্তব্য যথাযথ পালন করিতেন। অন্যান্য খলীফাগণ দৈনিক নামাজে নেতৃত্ব করিতে শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেন। জুমার নামাজের সময় খলীফা খুৎবা (বক্তৃতা) দিতেন। কোন কোন খলীফা জুমার নামাজের ইমামতিও পছন্দ করিতেন না।

নামাজে নেতৃত্ব করা ছাড়া খলীফা আমীর-উমরার সহিত সর্বসাধারণ্যে অথবা বিশেষকক্ষে সাক্ষাৎদান করিতেন। সাধারণ দরবারে তিনি উচ্চ সিংহাসনে সমাসীন থাকিতেন। খলীফার পরিবারের সদস্যগণ বসিতেন তাঁহার ডাইনে এবং সভাসদ ও আমীর-উমরা তাঁহার বামে উপবিষ্ট থাকিতেন। তাঁহার সম্মুখে অগণিত জনসাধারণ, রাজধানীর গণ্যমান্য ব্যক্তি, সওদাগর, শিল্পী, কবি ও অন্যান্য লোক তাঁহার দর্শনপ্রার্থী হইয়া তাঁহাকে সালাম জানাইতেন। বিশেষ দরবারে (খাস দরবারে) তিনি আমীর-উমরা, উমাইয়া বংশের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও অন্যান্য অনুগ্রহভাজনদের সহিত মিলিত হইতেন। এই সকল সাক্ষাৎকার উপলক্ষে খলীফা জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকে সুসজ্জিত হইতেন।

সন্ধ্যার পর খলীফাগণ লঘু পরিবেশে গল্পের আসর বা গান-বাজনার মজলিসে কালাতিপাত করিতেন। মু'আবিয়া প্রাচীনকালের রাজা-বাদশাহদের, বিশেষত: দক্ষিণ-আরবের বাদশাহদের কাহিনী শ্রবণ করিতে ভাল-বাসিতেন। তিনি ইয়ামন হইতে আবীদ ইবন শারইয়াহ নামক একজন গাল্পিককে আহ্বান করেন এবং তাঁহার মুখে প্রাচীন লোকদের কাহিনী শুনিতে শুনিতে অধিক রাত্রি জাগরণ করিতেন। মু'আবিয়ার পুত্র ইয়াজীদের আমল হইতে নৈশ-অনুষ্ঠানে সুরাপান প্রচলিত হয়। মক্কা ও মদীনা এই সময় সঙ্গীতচর্চার কেন্দ্র হইয়া উঠে। খলীফার আহ্বানে

গায়ক-গায়িকা ও নর্তক-নর্তকী মক্কা-মদীনা হইতে দামিস্কে আসিত এবং তাহাদের শিল্পনৈপুণ্যে নৈশ-মজলিস সরগরম করিয়া তুলিত। এই সকল অনুষ্ঠানে একদিকে যেমন সুরাপান অব্যাহত থাকিত, অপরদিকে তেমনি এইসবের মাধ্যমে কাব্য ও সঙ্গীতের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়।

খলীফা ও তাঁহার সভাসদগণ মৃগয়া, ঘোড়দৌড়, পাশাখেলা ও পোলো-খেলা পছন্দ করিতেন। মোরগের লড়াই এই সময় প্রচলিত ছিল এবং অনেকে ইহাতে বেশ আনন্দ উপভোগ করিতেন। শিকারের জন্য পোষা শিকারী কুকুর ব্যবহার করা হইত। এই উদ্দেশ্যে পোষা চিতার ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। উমাইয়া খলীফাগণ ঘোড়দৌড়ে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। ভাল জাতের ঘোড়া প্রতিপালন এবং সেগুলিকে দৌড়-প্রতিযোগিতার জন্য ব্যবহার করার শখ অনেকেরই ছিল। খলীফা প্রথম ওয়ালীদ জনসাধারণের জন্য ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। খলীফা সুলায়মানও ঘোড়দৌড়ে আমোদ পাইতেন। হিশামের সময়ে অনুষ্ঠিত এক ঘোড়দৌড়ে খলীফা ও অন্যান্যদের ঘোড়াসমেত মোট ৪০০০ ঘোড়া অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এই খলীফার একজন দুহিতাও দৌড়ের জন্য অশ্ব পুষিতেন।

উমাইয়া যুগে মেয়েরা স্বাধীনভাবে ও অবাধে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিত। দ্বিতীয় ওয়ালীদের সময় পর্যন্ত এই স্বাধীনতা অব্যাহত থাকে। ইহার পর ধীরে ধীরে বাইজান্টাইনদের অনুকরণে মেয়েদের জন্য অবরোধ প্রথা চালু হয়। অন্তঃপুরে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খোজা প্রহরী নিযুক্ত হয়। এইটাও একটা বাইজান্টাইন প্রথা। এই যুগে মেয়েরা শিল্প ও সাহিত্য চর্চায় বিশেষ আগ্রহ দেখাইত। মদীনায় হুসায়নের কন্যা সৈয়দা সুকায়না তাঁহার সঙ্গীত ও কাব্যে অনুরক্তি, তাঁহার অপূর্ব সৌন্দর্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার বাসভবন কবি-সাহিত্যিক, আইনজ্ঞ ও অন্যান্য গুণী ব্যক্তিদের সমাবেশে সুষমামণ্ডিত হইয়া উঠিত। সুকায়নার মত তালহার কন্যা আয়িশা তায়িফে তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি, সৌন্দর্য ও সুরুচির জন্য সমসাময়িকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেন।

আরবদের পোশাক-পরিচ্ছদ বিশেষ পরিবর্তন লাভ করে নাই। তবে এক্ষণে আঁটসাট 'কাবা'র প্রচলন হইতে দেখা যায়। পেশা অনুযায়ীও পোশাকের কিঞ্চিদধিক তারতম্য হইতে থাকে। যেমন ফকীহের

(আইনজ্ঞের) পোশাক, কেরানীর পোশাক অথবা সৈনিকের পোশাক হইতে ভিন্ন ছিল। বিভিন্ন কাজের জন্যও বিভিন্ন পোশাকের প্রচলন ছিল। যেমন অশ্বারোহণে আঁটসাট জামা ও আঁটসাট পায়জামা ব্যবহৃত হইত; আর বাড়ীতে ঢিলাঢালা ও লম্বা পোশাক পরিধান করা হইত। দামিস্কের জীবনযাত্রা লঘু ও চটুল পরিবেশে বিশেষ স্বকীয়তার দাবীদার ছিল। দর্শক সচরাচর দেখিবে, দামিস্কের অধিবাসী ঢিলাঢালা পায়জামা, লাল চোখা জুতা ও প্রকাণ্ড শিরস্ত্রাণ পরিহিত হইয়া মরুভূমির আতপ-দগ্ধ ও কুফিয়া নামক লাল শিরস্ত্রাণ পরিহিত বেদুঈনের সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইতেছে। এখানে-সেখানে সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত দামিস্কবাসিকে সাদা রেশমের তৈয়ারী আবা পরিহিত ও তরবারী কিংবা বর্শায় সজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যাইবে। স্বল্পসংখ্যক বুরকা পরিহিতা মহিলা রাস্তা পার হইতেছে; কেহ কেহ জাফরিমণ্ডিত বাতায়ন পথে উঁকি মারিয়া হাটবাজার ও রাস্তাঘাট দেখিতেছে। শরবত ও মিষ্টি বিক্রেতাগণ তারস্বরে হাঁকিতেছে এবং অগণিত গাধা ও উট বিভিন্ন পশরা লইয়া মৃদুমন্দ গতিতে চলিয়া যাইতেছে। এইসব চিত্তাকর্ষক ও প্রাণবন্ত দৃশ্য দামিস্কের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। অদ্যাপি এই জীবনযাত্রার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই।

বিস্তারিত পাঠ্য

হিট্টি, হিস্ট্রি অব দি এরাব্স্
আমীর আলী, হিস্ট্রি অব দি সারাসেন্স্



২৩

আব্বাসীয় যুগঃ নূতন দিগন্ত

(৭৫০-১২৫৮)

আবুল আব্বাস আস্-সাফ্ফাহ যে বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহাকে প্রকৃত খিলাফত আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আব্বাসীয় প্রচারণায় উমাইয়া বংশের খিলাফতকে রাজতন্ত্র ও ধর্মবিবর্জিত বলিয়া জনসমক্ষে চিত্রিত করা হইয়াছে। খলীফা এক্ষণে তাঁহার ধর্মীয় ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা আরম্ভ করিলেন। তিনি অধর্ম ও অনৈস-লামিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত জিহাদ ঘোষণা করিলেন। তিনি ধর্মীয় আইন-কানুনের জ্ঞানসম্পন্ন আলিম ও ফকীহগণকে দরবারে সম্মান-জনক আসন দান করিতেন এবং তাঁহাদের পরামর্শমত শাসনকার্য চালাইতেন। নূতন বংশের খলীফাগণ তাঁহাদের উপাধি ও পদবীতে, বেশ-ভূষায় ও বাহ্যিক আচরণে ধর্মের প্রাধান্য প্রদর্শন করিতে চেষ্টিত ছিলেন। ধর্মীয় বিধি-নিষেধ কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে নূতন কর্মচারী নিযুক্ত হইল। বিরুদ্ধবাদিদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলীফাদের মধ্যে ধর্মীয় পার্থক্য নামেমাত্র ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে আব্বাসীয় খলীফাগণও তাঁহাদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক স্বার্থকে ধর্মীয় স্বার্থের উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিতেন। তাঁহারা বিলাসস্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া দিনাতিপাত করিতেন। রাজকীয় বেশভূষা ও জাঁক-জমক, দরবারের জৌলুস, খলীফার একক প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়ে আব্বাসীয়গণ খুলাফায়ে রাশেদীনের চেয়ে প্রাচীন পারসিক সম্রাটদের সহিত বেশী তুলনীয়। বাগদাদে রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পর হইতে প্রাচীন পারসিক রাজতন্ত্র খলীফাগণকে বেশী প্রভাবিত করিতে থাকে।

উমাইয়া যুগের সহিত আব্বাসীয় যুগের প্রধান পার্থক্য এই যে, উমাইয়া যুগে রাষ্ট্রের সর্বক্ষমতা আরবগণের একচেটিয়া ছিল, কিন্তু আব্বাসীয় খলীফাগণ অনারবদের বাহুবলে ক্ষমতা দখল করিয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহাদের সময় রাষ্ট্রে আরবদের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইল। মাওয়ালী মুসলমানগণ রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান পদে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি লাভ করিতে থাকে।

খলীফাদের দেহরক্ষীরা খুরাসানের অধিবাসী ছিল। খলীফার উজীরগণ পারসিক ছিলেন। আরবীয় রাষ্ট্রের পরিবর্তে বিভিন্ন জাতি ও বংশের আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র স্থাপিত হইল। ইসলামের পতাকাতলে আন্তর্জাতিক ইসলামের নামে ইরানীদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইতে চলিল।

আব্বাসীয় যুগের অপর বৈশিষ্ট্য হইল যে, মুসলিম সাম্রাজ্যের কোন কোন অঞ্চল এক্ষণে স্বাধীন হইতে লাগিল। কাজেই সমগ্র মুসলিম জগৎ খলীফার প্রাধান্য মানিয়া চলিত না। স্পেন ও উত্তর-আফ্রিকা, উমান, সিন্ধু ও খুরাসান নূতন খলীফাকে স্বীকার করিত না। মিসরের আনুগত্যও নামেমাত্র ছিল।

আব্বাসীয় যুগে বহু জাতি ও বর্ণের লোকদের সমবেত চেষ্টায় এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নতি ও সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থান ঘটে। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের ফলে বহু নগর-বন্দর গড়িয়া উঠে। বিভিন্ন কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্য মুসলিম সাম্রাজ্য ছাড়াইয়া সুদূর ভারত, সিংহল, মালয়, জাভা, সুমাত্রা ও চীনদেশ পর্যন্ত চলিয়া যাইত। ঐ সকল অঞ্চল হইতেও বিভিন্ন পণ্যাদি মুসলিম সাম্রাজ্যে আনীত হইত। রাশিয়া, ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন, জার্মানী প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাপ্তমুদ্রা হইতে এই সকল দেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য চালু ছিল বলিয়া জানা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে আর্থিক উৎকর্ষ এবং পণ্য বিনিময়ের সাথে সাথে সংস্কৃতির আদান-প্রদান এই যুগে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অভাবিতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করে। গ্রীক, পারসিক ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে মুসলমানগণ সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া স্বকীয় মৌলিক অবদান রাখিয়া যায়। এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অনারব মুসলমান এবং অমুসলিমদের দান সর্বাধিক।

২৪

আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা ঃ সাফ্‌ফাহ ও মনসুর

নূতন খলীফা আব্বাসীয় বংশের জন্য কুফাকে নিরাপদ মনে করিতে পারিলেন না। কারণ কুফার অধিবাসিগণ আলীর (রাঃ) বংশধরদের সমর্থক ছিল। তাই তিনি ফুরাত নদীর তীরবর্তী আল-আনবার নামক স্থানে বাসস্থান নির্মাণ করিয়া পূর্ব-পুরুষের নামানুসারে উহার নাম রাখিলেন হাশিমীয়া। উমাইয়া পরিবারের সকল লোককে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলার যে-পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। উমাইয়া বংশের মৃত খলীফাগণও অপমানের হাত হইতে রক্ষা পান নাই, তাহাও পূর্বে বলা হইয়াছে। এই সকল কার্যকলাপের ফলে দামিস্ক, হিম্‌স্‌, কিন্নিসরিন, প্যালেস্টাইন ও মেসোপটেমিয়ায় ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিল। কিন্তু একে একে এই সকল শহরে আব্বাসীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। ইরাকের উমাইয়া শাসনকর্তা ইয়াজীদ ইবন হুবায়রা ওয়াসিতে উমাইয়া অধিকার অব্যাহত রাখেন। আব্বাসীয় সেনাপতি হাসান ইবন কাহতাবা এবং খলীফার ভ্রাতা আবু জাফর ওয়াসিত অবরোধ করেন। এগার মাস অবরোধের পর ইয়াজীদ ইবন হুবায়রা নিরুপায় হইয়া আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিলেন। ইতিমধ্যে শেষ উমাইয়া খলীফা মারওয়ানের মৃত্যু সংবাদও আসিয়া পৌঁছিল। ইয়াজীদ তাঁহার নিজের, পরিবারবর্গের ও অনুচরদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পাইয়া আবু জাফরের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু খুরাসান হইতে আবু মুসলিম খলীফার নিকট ইয়াজীদ ও তাঁহার অনুচরবর্গের হত্যার দাবী করিয়া পরামর্শ পাঠাইলেন। খলীফা আবু জাফরকে বার বার এই মর্মে পত্র লিখিলেন। কিন্তু আবু জাফর ইহাতে রাজী হইলেন না। অবশেষে খলীফা দুইজন আজ্ঞাবহ ব্যক্তিকে পাঠাইয়া ইবন হুবায়রা ও তাঁহার পুত্রকে হত্যা করাইলেন। খলীফার অপর ভ্রাতা ইয়াহিয়া মসুলের অধিবাসীদিগকে নানাভাবে নির্যাতন করিয়া মসুলকে আব্বাসীয়দের অধিকারভুক্ত করেন। অনুরূপভাবে সিন্ধু, উমান ও খুরাসানে বিদ্রোহ প্রশমিত হয়।

সাফ্‌ফাহ
৭৪৯-৭৫৪
খ্রীঃ

হাশিমীবংশের ওয়াজীর আবু সালামার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আস্‌-সাফ্‌ফাহের সহিত অচিরেই আবু সালামার মনোমালিন্য উপস্থিত

হয়। খলীফা খুরাসানে আবু মুসলিমের নিকট উপদেশ চাহিয়া পাঠাইলে, আবু মুসলিম আবু সালামার হত্যার পরামর্শ দান করিলেন। আবু সালামাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করিয়া গুজব ছড়াইয়া দেওয়া হইল যে, খারিজীগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে।

আস্-সাফ্ফাহ তাঁহার আনবারস্থ প্রাসাদে অনধিক ত্রিংশ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি বার্মাকী বংশের খালিদকে অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া বার্মাকী বংশের ভবিষ্যৎ সুখ ও সমৃদ্ধির পথ সুপ্রশস্ত করেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতা আবু জাফরকে এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ঈসাকে পর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান।

আবু জাফর আল্ মনসূর

(৭৫৪—৭৭৫)

আস্-সাফ্ফাহর মৃত্যুর সময় তাঁহার ভ্রাতা আবু জাফর হজ উপলক্ষে মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন। আবু জাফর কুফায় প্রত্যাবর্তন করিয়া জামে মসজিদে নামাজ পড়াইলেন এবং তৎপর আনবারে গমন করিয়া আল্-মনসূর উপাধি ধারণ করিয়া খিলাফতের ভার গ্রহণ করিলেন। আল-মনসূরই আব্বাসীয় বংশের খিলাফতের প্রকৃত স্থাপয়িতা। আব্বাসীয় বংশের পঁয়ত্রিশজন খলীফার মধ্যে সকলেই তাঁহার বংশধর ছিলেন।

খলীফা হওয়ার পর পরই তাঁহার পিতৃব্য আবদুল্লাহ্ ও খুরাসানের শাসনকর্তা আবু মুসলিমের সহিত তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হয়। আবদুল্লাহ্ বিখ্যাত জাবের যুদ্ধে উমাইয়া-বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন এবং বহু সৈন্য-সামন্ত তাঁহার অনুগত ছিল। মারওয়ানের বিরুদ্ধে জয়ী হইলে তিনি খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত হইবেন, আস্-সাফ্ফাহ্ তাঁহাকে এইরূপ প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন। তাই মনসূরের খিলাফত লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিদ্রোহী হইলেন। খলীফা আবু মুসলিমকে আবদুল্লাহ্র বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। নাসিবিনের যুদ্ধে (নভেম্বর, ৭৫৪ খ্রীঃ) আবু মুসলিম আবদুল্লাহকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন। সাত বৎসর বন্দী অবস্থায় থাকার পর তাঁহাকে একটি জলপরিবৃত ও লবণের ভিত্তির উপর নির্মিত একটি গৃহে লইয়া যাওয়া হয়। পরবর্তী বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে লবণের ঘর ধ্বসিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

নাসিবিনের যুদ্ধের পর আবু মুসলিম খুরাসানে প্রত্যাবর্তন করিতে চাহিলে মনসূর তাঁহাকে রাজধানীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। খুরাসানে আবু মুসলিমের প্রতিপত্তি ছিল অসীম। তিনি অঙ্গুলি হেলনের সাহায্যে আব্বাসীয় বংশের পতন ঘটাইতে পারিতেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনসূর প্রমাদ গণিলেন। আবু মুসলিমকে এমতাবস্থায় খুরাসানে ফিরিয়া যাইতে দেওয়া যায় না। মনসূর দরবারে ডাকিয়া তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন (৭৫৫ খ্রীঃ)। আবু মুসলিমের মৃত্যুর পর মনসূর নিজেকে প্রকৃত খলীফা বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার শুভানুধ্যায়িগণ তাঁহাকে মোবারকবাদ জানাইতে আসিল। আবু মুসলিমের প্রচেষ্টা ও প্রচারণার ফলে আব্বাসীয়গণ শাসনক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ ক্ষমতাবান ব্যক্তির সান্নিধ্যে খলীফা কখনও নিজেকে নিরাপদ মনে করিতে পারিলেন না। পরস্পর অবিশ্বাস ও সন্দেহের পরিণতি-স্বরূপ এইরূপ একজন যোগ্য সহকারীর জীবন বিনষ্ট হইল।

৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে খলীফা মক্কায় পবিত্র হজ সমাধা করিতে গিয়াছিলেন। হজ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি একটি নূতন বিপদের সম্মুখীন হইলেন। রাওয়ান্দিয়া নামক এক সম্প্রদায়ের লোক অবতারবাদ ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস করিত। তাহারা খলীফার প্রাসাদ পরিবেষ্টন করিয়া চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, 'এই আমাদের প্রভুর গৃহ, যিনি আমাদিগকে আহার করিতে খাদ্য ও পান করিতে পানীয় প্রদান করেন।' এইরূপে তাহারা খলীফাকে খোদা বলিয়া মানিতে চাহিল, কিন্তু খলীফার পক্ষে তাহাদের অধার্মিক কার্যকলাপ ও আচরণ বরদাস্ত করা সম্ভব ছিল না। ইহাতে এই সকল লোক বিদ্রোহী হইলে খলীফা কঠোর হস্তে তাহাদিগকে দমন করেন। আবু মুসলিমের মৃত্যুর পর খুরাসানে তাঁহার সমর্থক দল বিদ্রোহী হইল। তাহারা আবু মুসলিমকে ইমাম বলিয়া মানিত এবং সানবাদ নামক একজন লোকের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। মনসুর ইহাদিগকে দমন করিয়া খুরাসানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপে মনসূর উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন ব্যতীত সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে তাঁহার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

মনসূরের সময় বিভিন্ন সীমান্ত অঞ্চলে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে। বাইজান্টাইনদের সহিত যুদ্ধে মালাভিয়া ও ম্যাসিসা পুনরধিকৃত হয়। বাকু অঞ্চলেও তিনি কর ধার্য করেন। কাস্পিয়ানের তীরবর্তী তাবারিস্তান অঞ্চলে পুরাতন পারসিক ইস্পাহ্‌বেদ উপাধিধারী পরিবার স্বাধীনভাবে রাজত্ব

করিতেছিল। খলীফার পুত্র মাহদী ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাবারিস্তানে খলীফার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। পাক-ভারত সীমান্তে কান্দাহার অধিকৃত হয় এবং মনসূরের সৈন্যবাহিনী কাশ্মীরেও আক্রমণ চালায়। ভারত মহাসাগরের জলদস্যুগণকে দমন করিবার জন্য মনসূর সিন্ধু নদীর মোহনায় নৌবহর প্রেরণ করেন।

মনসূরের সময় আব্বাসীয়গণ ও আলীর (রাঃ) বংশধরগণের মধ্যে সর্বপ্রথম বিভেদের সৃষ্টি হয়। ইতিপূর্বে তাহারা মিলিয়া মিশিয়া উমাইয়া বংশের রাজত্বের অবসান ঘটাইয়াছিল। আলীর (রাঃ) বংশধরগণ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, আহল-বায়তের নামে প্রচারণা চালাইয়া আব্বাসীয়গণ নিজেদের বংশে খিলাফত স্থায়ী করিয়া লইয়াছে। মনসূর ইহাদিগকে রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক মনে করিয়া আলীর (রাঃ) পৌত্র আবদুল্লাহ্‌কে পরিবার-পরিজনসহ বন্দী করিলেন। আবদুল্লাহ্‌র দুই পুত্র ইব্রাহীম ও মুহম্মদ পলাইয়া আত্মগোপন করিলেন। মদীনায় মুহম্মদের সমর্থনে বিদ্রোহ দেখা দিল। অচিরেই মুহম্মদ মদীনায় আত্মপ্রকাশ করিলেন। মনসূর পত্রযোগে তাঁহাকে বিদ্রোহ হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা ইব্রাহীম আহওয়াজ ও বসরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। মনসূর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ঈসাকে মুহম্মদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ঈসার আগমন সংবাদে নগরবাসী ভীত হইয়া পলায়ন করিল। মুহম্মদ যুদ্ধ করিয়া তীরবিদ্ধ হইয়া নিহত হইলেন। মুহম্মদ 'নাফস যাকিয়া' পবিত্রাত্মা নামে তাঁহার অনুসারীদের নিকট পরিচিত।

ইব্রাহীম বসরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে প্রসিদ্ধ সাহাবা আনাস ইবন মালিকসহ বহু লোক তাঁহাকে সমর্থন করিলেন। বিদ্রোহিগণ ফারস, আহওয়াজ ও ওয়াসিত দখল করিল। অতঃপর ইব্রাহীম কূফার দিকে রওয়ানা হইলেন। খলীফা মনসূর এই সময় বাগদাদ নগরীর পত্তন করিতেছিলেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ তখন রাজধানীর বাহিরে পারস্য, আফ্রিকা ও আরবে যুদ্ধরত ছিল। ঈসা তড়িৎগতিতে মদীনা হইতে কূফায় গমন করিলেন। নগরীর উপকণ্ঠে উভয় সৈন্যদল পরস্পরের মুকাবিলা করিল। খলীফা মনসূর গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে তাঁহার জায়-নামাজে শুইয়া একই বেশে দিবারাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে ইব্রাহীমের সেনাদল প্রশংসনীয় উদ্যম ও রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া খলীফার বাহিনীকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু অচিরেই ইব্রাহীম তাঁহার ভ্রাতা মুহম্মদের মত তীরবিদ্ধ হইয়া ভূপতিত হইলেন (৭৬২ খ্রীঃ)।

মনসুর ৭৬২ খ্রীস্টাব্দে নূতন রাজধানী বাগদাদের গোড়াপত্তন করেন। এই নগরীর নাম তিনি দিলেন দারুস-সালাম বা 'শান্তি সদন'। দাজলার পশ্চিম তীরে অবস্থিত এই নগরী বাগদাদ নামক সাসানীয় যুগের একটি গ্রামে স্থাপিত হয়। বাগদাদ অর্থ 'খোদাদত্ত'। দাজলা নদী এই নগরীকে সুদূর চীনের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে ; অনতিদূরে অবস্থিত ফুরাত নদী ইহাকে সিরিয়া, রাক্কা ও অন্যান্য স্থানের সহিত যুক্ত করিয়াছে। চারি বৎসরে সমাপ্ত এই নগরী নির্মাণে এক লক্ষ স্থপতি, কারিগর ও শ্রমিকের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং ৪৮,৮৩,০০০ দিরহাম অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল। বৃত্তাকার এই নগরীর চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া দুইটি প্রাচীর, তারপর একটি গভীর পরিখা ও একটি আভ্যন্তরীণ প্রাচীর বিদ্যমান ছিল। এই প্রাচীরের মধ্যে সমান ব্যবধানে চারিটি তোরণ রাজ্যের চারিটি প্রধান রাজপথের সহিত বাগদাদকে সংযুক্ত করিয়াছিল। এই নগরাভ্যন্তরে খলীফার প্রাসাদ ও জামে মসজিদ অবস্থিত ছিল। নগরের বাহিরে খলীফা কাসরুল-খুল্‌দ এবং রুসাফা নামক আরও দুইটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত প্রাসাদ তাঁহার উত্তরাধিকারী পুত্র মাহদীর জন্য নির্মিত হইয়াছিল। বাগদাদ সামরিক দিক হইতেই যে কেবল গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাহা নহে, একাধিক কারণে এই নগরী বিশ্ববিখ্যাত নগরী হিসাবে খ্যাতিলাভ করে। সিরিয়া ছিল উমাইয়াদের শক্তির উৎস। কুফা ও বসরার জনসাধারণ বহুকাল যাবৎ নানা কারণে রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল। বাগদাদ সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া একদিকে যেমন বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদ ছিল, অপরদিকে তেমনি রাজ্যের সকলদিকে নযর রাখা খলীফার পক্ষে সহজ ছিল। নদীপথে ও স্থলপথে দেশ-বিদেশের সহিত বাণিজ্যের যোগাযোগ বাগদাদকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিল। বাগদাদের অনতিদূরেই প্রাচীন সভ্যতার অন্ততঃ চারটি প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত ছিল, যথা—টেসিফোন (Ctesiphon), ব্যবিলন, নিনিভা এবং উর। সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া বাগদাদ এই সকল নগরীর সভ্যতার যোগ্য উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইল। পূর্বাঞ্চল হইতে, বিশেষতঃ পারস্য হইতে নূতন নূতন ভাবধারা বাগদাদের জীবন পদ্ধতি, রাষ্ট্রীয় সংস্থা, খলীফার দরবারের চাল-চলন, আদব-কায়দা এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বহুলাংশে প্রভাবিত করিতে থাকে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসাবে মনসুর গ্রীক ও পারস্য ভাষায় লিখিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থাবলী আরবী ভাষায়

তরজমা করার জন্য একটি দফতর খুলিয়া দেন। এই তরজমার কাজ খলীফা আল-মামূনের সময় সম্প্রসারিত হয়।

খলীফা মনসূর ৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে হজ পালন করিতে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে কুফার নিকট পীড়িত হইয়া পড়েন। মক্কা হইতে তিন মাইল দূরে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং মক্কায় তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। তিনি পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে বাইশ বৎসর শাসনকার্য চালাইবার পর পরলোক গমন করেন।

খলীফা মনসুর কঠোর পরিশ্রমী, কর্তব্যপরায়ণ ও মিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় কর্তব্যে নিজেকে এত অধিক ব্যাপৃত রাখিতেন যে, খলীফা হওয়ার সময় তাঁহার মাথার কেশরাশি সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ ছিল, কিন্তু খলীফা হওয়ার নয় মাসের মধ্যে তাঁহার একটি চুলও কৃষ্ণবর্ণ রহিল না। তিনি ধর্মীয় কর্তব্যপালনে নিষ্ঠাবান ছিলেন। তিনি পূর্বাহ্নে রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্ম সমাধা করিতেন, অপরাহ্নে পরিবারের লোকজনের সহিত কথাবার্তা বলিতেন ও আমোদ-প্রমোদ করিতেন। সন্ধ্যার পর দিবসের পত্রাদি শ্রবণ করিতেন এবং উজীরদের সহিত পরামর্শ করিতেন। অধিক রাত্রে শয়ন করিয়াও তিনি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিতেন। তিনি স্বয়ং সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করিতেন এবং তাহাদিগকে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা সুসজ্জিত রাখিতেন। তিনি সামান্য প্রতিবাদীর মত কাজীর আদালতে হাজির হইয়া কাজীর বিচার মানিয়া লইতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। তাঁহার মিতব্যয় প্রায় অর্থগৃধ্নুতার শামিল ছিল। ইহার ফলে যে প্রচুর অর্থ তিনি সঞ্চিত রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পুত্রের দশ বৎসরের ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত ছিল। তিনিই আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত স্থাপয়িতা। তাঁহারই দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার ফলে তাঁহার বংশধরগণ পাঁচ শতাব্দী ধরিয়া মুসলিম জগতের খলীফা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন। সুন্নী মতবাদকে রাষ্ট্রের প্রধান অবলম্বন হিসাবে স্বীকৃতি দান করিয়া তিনি রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন।

বিস্তারিত পাঠ্য

হিট্টি, হিস্ট্রি অব দি এরাব্স্
ম্যুর, কলিফেট
আমীর আলী, হিস্ট্রি অব দি সারাসেন্স্

২৫

আল-মাহ্‌দী ও হাদী

আল-মাহ্‌দী (৭৭৫—৭৮৫ খ্রীস্টাব্দ)

মনসূরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মুহম্মদ আল-মাহ্‌দী খলীফা হইলেন। ঐতিহাসিক উইলিয়ম ম্যুরের মতে তাঁহার রাজত্বকাল "প্রাথমিক আব্বাসীয়-দের অমার্জিত অথচ তেজোদৃপ্ত শাসন এবং পরবর্তী গৌরবময় যুগের মাঝামাঝি তথা প্রস্তুতিস্বরূপ ছিল।" মাহ্‌দী নম্রস্বভাবের ও মহানুভব চরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি দাগী আসামী ব্যতীত অন্য সকল বন্দীকে কারাগার হইতে মুক্তিদান করেন। ইমাম হাসানের বংশধর ইব্রাহীমের পুত্র হাসানকে কারাগার হইতে মুক্তিদান করেন এবং তাঁহাকে উপযুক্ত ভাতা দান করেন। পিতার পরিত্যক্ত অর্থে তিনি অনেক জন-হিতকর কাজ করেন এবং অনেক জ্ঞানী-গুণী ও অভাবগ্রস্তকে সাহায্য দান করেন। মক্কা ও মদীনার মসজিদগুলিকে তিনি সম্প্রসারিত ও সুষমামণ্ডিত করেন। হজযাত্রীদের জন্য তিনি সরাইখানাগুলিতে পানির কূপ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সুবন্দোবস্ত করেন। এই সকল স্থান এক্ষণে আরামদায়ক ও নিরাপদ হইল। তিনি ৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে মক্কায় হজ করিতে গিয়া হিজাজের লোকদিগকে ৩০,০০০,০০০ দিরহাম অর্থ দান করেন এবং একমাত্র মক্কাতেই ১৫০,০০০টি জামা দান করেন। তিনি রাজ্যের প্রধান প্রধান শহরের পুরাতন মসজিদগুলির সংস্কার সাধন করেন। প্রতি বৎসর কাবা শরীফে খলীফার তরফ হইতে একটি মূল্যবান গেলাফ পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থা তাঁহার পরবর্তী খলীফাদের আমলেও চালু ছিল। তিনি মদীনা হইতে ৫০০ জন আনসারকে বাগদাদে লইয়া আসেন এবং তাঁহাদিগকে দেহরক্ষীর পদে নিযুক্ত করেন। এই সকল লোকের ভরণ-পোষণের জন্য তিনি তাঁহাদিগকে জমি দান করেন। তিনি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত লোকদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেন এবং ঋণের দায়ে কারারুদ্ধ লোকদিগকে সাহায্য দান করেন। তাঁহার পুত্র হারুনুর-রশীদের সময় বাগদাদ ব্যবসা-বাণিজ্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে চরম উন্নতি লাভ করে, তাঁহার খিলাফতের সময়েই তাহার সূচনা হয়। এই সময়েই

পাতাল, সরাইখানা, রাস্তাঘাট, খালবিল ও সেতু নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল কাজ জনকল্যাণে তাঁহার আগ্রহের পরিচয় দেয়। যে পরিপূর্ণ নিরাপত্তার সহিত বণিক-ব্যবসায়ী, পরিব্রাজক, তীর্থযাত্রী এবং জ্ঞানপিপাসু পণ্ডিত ব্যক্তিগণ রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অবলীলাক্রমে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইত, তাহা তাঁহার শাসন ক্ষমতা ও সাংগঠনিক নৈপুণ্যের পরিচায়ক। বিদ্বজ্জনের সমাদর ও পৃষ্ঠপোষকতায় কেবলমাত্র তাঁহার সুযোগ্য পুত্র মামূনই তাঁহাকে ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু হারূন নানাভাবে পুত্রের এই অভাবনীয় কৃতকার্যতার পথ সুপ্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

বৈদেশিক সম্পর্ক

হারূনুর রশীদের সুনাম ও সুখ্যাতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে দুইজন যশস্বী রাজপুরুষের নাম জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। ইঁহাদের একজন ছিলেন পাশ্চাত্যের ফ্রাঙ্কদের সম্রাট শার্লিম্যান (Charlemagne) এবং অপরজন প্রাচ্যের খলীফা হারূনুর রশীদ। সমপরিমাণ সুনাম ও সুখ্যাতির অধিকারী হইলেও একথা সর্বজনবিদিত যে, হারূন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতিতে তাঁহার পাশ্চাত্য-দেশীয় সমসাময়িকের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই দুই কীর্তিমান রাজপুরুষ পরস্পর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। বলাবাহুল্য, উভয় সম্রাট নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থে পরস্পরের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাইজান্টাইন সম্রাটের সহিত শার্লিম্যানের সম্পর্ক ভাল ছিল না। অন্যপক্ষে স্পেনের উমাইয়া শাসকগণ হারূনুর রশীদের শত্রু ছিলেন। তাই শার্লিম্যান বাইজান্টাইন সম্রাটের বিরুদ্ধে হারূনকে মিত্ররূপে পাইতে এবং হারূন শার্লিম্যানকে স্পেনের উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে বন্ধু হিসাবে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিলেন। উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল যে, তাঁহারা আপন আপন মিত্রপক্ষের সুবিধার জন্য শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশীর অসুবিধার সৃষ্টি করিবেন এবং প্রতিবেশিগণ তাঁহাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিবেন। দুই সম্রাটের মধ্যে দূত বিনিময় ও উপঢৌকন আদান-প্রদান ঘটে। একজন ফ্রাঙ্ক লিখকের বিবরণমতে শার্লিম্যানের দূতগণ হারূনের নিকট হইতে কারুকার্যখচিত কাপড়, গন্ধদ্রব্য, একটি হস্তী এবং একটি ঘড়ি সমেত বহু উপহার দেশে লইয়া যান। ৭৯৭ এবং ৮০৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এই দূত বিনিময় ঘটে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মুসলমান লিখকগণ এই দূত বিনিময়ের বিষয়

কিছুই উল্লেখ করেন নাই। তবে কোন এক 'ভারতের রাজা' কর্তৃক হারুনের নিকট উপঢৌকন প্রেরণের বিষয় এক মুসলমান লিখক উল্লেখ করিয়াছেন। চীনদেশের এক সম্রাটও হারুনের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বাইজানটাইন-দের সহিত যুদ্ধ

হারুনের রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা বাইজান্টাইনদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ। সাম্রাজ্ঞী আইরিনীর নিকেফোরাস নামক উত্তরাধিকারী যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি ও সন্ধি মানিতে অস্বীকার করিয়া হারুনুর রশীদের নিকট এক অসম্মানসূচক লিপি প্রেরণ করেন:

রোমক সাম্রাট নিকেফোরাসের নিকট হইতে আরবদের রাজা হারুনের নিকট—আমার পূর্ববর্তী সাম্রাজ্ঞী তোমাকে 'কিস্‌তীর'* মর্যাদা দান করিয়া নিজেকে 'বোড়ের'* আসনে বসাইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রচুর ধনৈশ্বর্য তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। এইসবই রমণীসুলভ দুর্বলতা ও নির্বুদ্ধিতার জন্যই হইয়াছে। এক্ষণে আমার এই পত্র পাঠমাত্র তাঁহার নিকট হইতে গৃহীত সমুদয় অর্থ প্রত্যর্পণ কর; অন্যথায় অসিই তোমার ও আমার মধ্যে মীমাংসক হইবে।

ঐতিহাসিক বলেন, হারুন এই পত্র পাঠমাত্র ক্রোধে এত উত্তেজিত হইলেন যে, তাঁহার সহিত কথা বলা দূরের কথা, কেহ তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতেও সাহস করিল না। তাঁহার সভাসদগণ ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলেন এবং অমাত্যবর্গ নির্বাক হইয়া মন্ত্রণাদানে বিরত রহিলেন।

হারুন অতঃপর গ্রীক সম্রাটের পত্রের উল্টা পৃষ্ঠায় লিখিলেন:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আমীরুল মুমিনীন হারুনের নিকট হইতে গ্রীকদের কুকুর নিকেফোরাসের নিকট—

কাফির মায়ের পুত্র, আমি তোমার পত্র পাঠ করিয়াছি। ইহার উত্তর কানে শুনিবে না, চোখে দেখিবে। সালাম।

হারুন আপন প্রতিজ্ঞানুযায়ী তৎক্ষণাৎ তাঁহার সামরিক ঘাঁটি রাক্কা হইতে একের পর এক অভিযান প্রেরণ করিয়া নিকেফোরাসকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এই সকল অভিযানের ফলে নিকেফোরাস বার বার

* 'কিস্‌তী' ও বোড়ে'র দ্বারা হারুন কর্তৃক অধুনা প্রবর্তিত দাবা খেলার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

পরাজিত হইয়া সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু বার বার সন্ধিভঙ্গ করিয়া হারুনের ক্রোধের উদ্রেক করিলেন। অবশেষে ৮০৬ খ্রীস্টাব্দের যুদ্ধে খলীফা ১৩৫,০০০ সৈন্য লইয়া হেরাক্লিয়া ও টায়ানা দখল করিলেন এবং নিকেফোরাসকে কর প্রদানে এবং তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গকে জিযিয়া দানে বাধ্য করিলেন। পর বৎসর গ্রীকগণ পুনরায় সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আবির্ভূত হইয়া মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করিল। এইভাবে বার বার সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করিয়া গ্রীকগণ বিশ্বাসঘাতকতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল।

হারুন কঠোরহস্তে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন করেন। তবে আফ্রিকা ক্রমশঃ আব্বাসীয়দের হাত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছিল। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাঞ্জীরে ইদ্রিসী বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উত্তর আফ্রিকায় বহু উত্থান-পতনের পর হারুনের বিশ্বস্ত সেনাপতি হারসামা শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরিশেষে জিয়াদাতুল্লাহ্ আল-আগলাব নামক এক দুঃসাহসিক ব্যক্তি হারুনের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, তাঁহাকে ও তাঁহার বংশধরগণকে বাৎসরিক করদানের বিনিময়ে আফ্রিকার শাসন কর্তৃত্ব দেওয়া হউক। হারসামাও হারুনকে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে রাজী করাইলেন। অচিরে আফ্রিকায় আগলাবী বংশের রাজত্ব স্থাপিত হয়।

বিদ্রোহ

হারুনের রাজত্বকালে সিরিয়ায় হিময়ার ও মুদার বংশীয় আরবদের মধ্যে কলহ আরম্ভ হয়। হারুন উভয় সম্প্রদায়ের কলহ দূর করিয়া শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন। মসুলে এক বিদ্রোহ দেখা দিলে উহা কঠোর হস্তে প্রশমিত হয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ নাসিবিনে খারিজী অভ্যুত্থান। খারিজী নেতা ওয়ালীদ ইবন তারিফের নেতৃত্বে খারিজীগণ আর্মিনিয়া ও অজারবাইজান লুণ্ঠন করিয়া দজলা নদী পার হইয়া ইরাকে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। হারুন খারিজীদের এই বিদ্রোহ দমন করেন এবং তাহাদের নেতা ওয়ালীদ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। লায়লা নাম্নী ওয়ালীদের এক ভগ্নীর নেতৃত্ব গ্রহণ ও পুরুষের বেশে যুদ্ধে যোগদানের জন্য এই যুদ্ধ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। পুরুষের বেশে যুদ্ধ পরিচালনার সময় খলীফার সৈন্যদলে নিযুক্ত একজন সৈনিক বালিকাকে চিনিতে পারায় লায়লা আবার তাঁহার নারীসুলভ জীবনে ফিরিয়া যান। লায়লা ভ্রাতার মৃত্যুতে একটি শোক-গাথাও রচনা করিয়াছিলেন।

আরব জোয়ান অব আর্ক

ইমাম হাসানের বংশধর ইব্রাহীম ও মুহম্মদের আর এক ভ্রাতা ইয়াহিয়া কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী দায়লাম অঞ্চলে একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। হারুন বারমাকী বংশের ফযলকে ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। বারমাকিগণ শীয়া ছিলেন এবং আলাবীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। ফযলের সহিত আলোচনার পর স্থির হইল যে, ইয়াহিয়া খলীফা কর্তৃক সদ্ব্যবহারের অঙ্গীকারে হারুনুর রশীদের সহিত দরবারে দেখা করিবেন। যথারীতি অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষরের পর ইয়াহিয়াকে বাগদাদে সম্মানের সহিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়, কিন্তু অচিরেই অঙ্গীকারপত্রের একটি ত্রুটির অজুহাতে উহাকে নাকচ করিয়া ইয়াহিয়াকে কারারুদ্ধ করা হয়।

আলীর (রাঃ) বংশধরদের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা

হারুনুর রশীদ তাঁহার রাজত্বের প্রথমভাগে তাঁহার পুত্র আল-আমীনকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। আমীন ছিলেন জুবায়দার পুত্র। কয়েক বৎসর পর হারুনের পারসিক পত্নীর গর্ভজাত অপর পুত্র আল-মামুনকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করা হয়। আল-মামুনকে জাফর বারমাকীর অভিভাবকত্বে খুরাসান ও পূর্বাঞ্চলের শাসনভার দেওয়া হয়। ৮০২ খ্রীস্টাব্দে হারুন যখন মক্কায় হজ করিতে যান, তখন তিনি উভয় পুত্রকে ১০ লক্ষ দীনার উপঢৌকন দেন এবং দুইটি দলীল উজীরদের উপস্থিতিতে সম্পাদন করিয়া কাবা শরীফে রাখিয়া দেন; এই দুইটি দলীলে উভয় পুত্রের উত্তরাধিকারের বিষয় লিখিত হয়। হারুন তাঁহার তৃতীয় পুত্র কাসিমকে মেসোপটেমিয়া ও গ্রীক সীমান্তের শাসনভার দান করেন। এতৎসঙ্গে তিনি ইহাও বলিয়া দেন যে, আমীন ইচ্ছা করিলে কাসিমকে উক্ত অঞ্চলে স্বাধীনভাবে শাসন করিবার ক্ষমতা দিতে পারেন। কয়েক বৎসর পর যখন হারুন সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তিনি উইল করিয়া যান যে, তাঁহার সঙ্গের সেনাবাহিনী ও যুদ্ধাস্ত্র মামুনের ভাগে পড়িবে। এইভাবে খলীফা হারুন মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার সাম্রাজ্য পুত্রদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া গৃহ-বিবাদের বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন।

উত্তরাধিকারী মনোনয়ন

বারমাকী বংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

হারুনুর রশীদের রাজত্বকালের বর্ণনা বারমাকী বংশের একটি বর্ণনা ব্যতীত নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কারণ হারুনের কৃতকার্যতা ও

কৃতিত্ব বহুলাংশে এই যশস্বী পরিবারের সহযোগিতা ও আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। তাঁহারা একদিকে যেমন খলীফার রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতির প্রধান সহায়ক ছিলেন, অন্যদিকে তাঁহাদের শাসনক্ষমতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা ও বদান্যতার জন্য পরিশেষে তাঁহারা সুদূরপ্রসারী যশোগৌরবের অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। খালিদ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মধ্য-এশিয়ার বিজয়ী সৈন্যাধ্যক্ষ কুতায়বা খালিদকে বন্দী অবস্থায় বলখ হইতে লইয়া আসেন। খালিদের পিতা ছিলেন বল্‌খের একটি বৌদ্ধ মন্দিরের পুরোহিত। আব্বাসীয় আন্দোলনের সময় উমাইয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে খালিদ আব্বাসীয়গণকে সাহায্য করিয়াছিলেন। খলীফা মনসুরের রাজত্বকালে খালিদ তাবারিস্তানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি একটি বাইজানটাইন দুর্গ অধিকার করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। খলীফা মনসুর খালিদকে তাঁহার প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি উজীর উপাধি না পাইলেও বিখ্যাত বারমাকী উজীর পরিবারের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান এবং তাঁহার বংশধরগণ আব্বাসীয় শাসনামলে প্রথম উজীর পদে উন্নীত হন। খলীফা মাহ্‌দী তাঁহার পুত্র হারুনের শিক্ষার ভার খালিদের পুত্র ইয়াহিয়ার উপর ন্যস্ত করেন। হারুন ইয়াহিয়াকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। হাদীর রাজত্বকালে তিনি হারুনকে খিলাফতের উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিলে ইয়াহিয়া তাহাতে বাধা দেন। সেইজন্য হাদী ইয়াহিয়াকে কারারুদ্ধ করেন। হারুন খলীফা হইয়া ইয়াহিয়া বারমাকীকে তাঁহার সততা ও বিশ্বস্ততার জন্য অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন উজীর হিসাবে নিযুক্ত করেন। এইভাবে পারসিক শাসন-ব্যবস্থার অনুকরণে সর্বপ্রথম মুসলিম রাজ্যে উজীর নিযুক্ত হয় এবং একটি পারসিক পরিবারই উক্ত পদ লাভ করেন।

ইয়াহিয়ার দুই পুত্র ফযল ও জাফর হারুনের অধীনে বিভিন্ন রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা ৭৮৪ খ্রীস্টাব্দ হইতে ৮০৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৭ বৎসর সাম্রাজ্যের সকল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন। সাম্রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চল যথাক্রমে ফযল ও ইয়াহিয়ার কর্তৃত্বাধীনে ছিল। ইহার পর হারুন প্রথমে ফযলকে এবং পরে জাফরকে উজীর নিযুক্ত করেন। খলীফা যখন জাফরকে উজীর নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত করেন, তখন তিনি ইয়াহিয়াকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি "তাঁহার অঙ্গুরীয় দক্ষিণ হস্ত

হইতে বাম হস্তে অপসারণ করিতেছেন"। জাফর হারুনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং খলীফার নৈশ বিহারের সঙ্গী ছিলেন। তিনি বহুকাল যাবৎ উজীর ছিলেন।

পূর্ব-বাগদাদে অবস্থিত এবং জাফরের নামানুসারে 'জাফরী' নামে অভিহিত সুরম্য প্রাসাদে বারমাকিগণ জাঁকজমকের সহিত বসবাস করিতেন। দজলার তীরে অবস্থিত এই প্রাসাদ সুপ্রশস্ত উদ্যানে সুশোভিত ছিল। উচ্চ রাজকার্যে অধিষ্ঠিত এই পরিবারের সদস্যগণ অপরিসীম ধনরত্নের অধিকারী ছিলেন। তাঁহারা খলীফার সহিত বদান্যতায় প্রতিযোগিতা করিতেন এবং তাঁহাদের আশ্রিত ব্যক্তি, চারণ অথবা সমর্থকদলকে সচরাচর যাহা দান করিতেন, তাহা এইসব গ্রহীতাকে বিত্তবান করিয়া তুলিত। তাঁহাদের বদান্যতা আরবী ভাষাভাষী অঞ্চলে তাঁহাদের নামকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। রূপকথার হাতিমের মত 'বারমাকী' দানশীল শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং "বদান্যতায় জাফরের মত" আরবী ভাষায় ব্যবহৃত একটি অতি পরিচিত উপমা। বহু খাল ও মসজিদ নির্মাণ এবং জনহিতকর কাজ বারমাকীদের প্রচেষ্টা ও বদান্যতার ফলে সম্ভব হইয়াছিল। ফযল সর্বপ্রথম রমযান মাসের রাত্রিতে মসজিদে প্রদীপ জ্বালাইবার প্রথা চালু করেন। জাফর তাঁহার বাগ্মিতা, সাহিত্যিক দক্ষতা ও লিখন ক্ষমতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার এই সকল গুণের জন্যই ঐতিহাসিকগণ বারমাকিগণকে 'আহলুল কলম' বা কলমধারী উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। জাফব উপরন্তু বেশভূষায় নেতৃস্থানীয় ছিলেন এবং উঁচু গ্রীবাবন্ধনী পরিধান করার রেওয়াজ প্রবর্তন করেন।

৮০৩ খ্রীস্টাব্দে হঠাৎ হারুনুর রশীদ জাফরের মৃত্যুদণ্ড এবং ফযল ও ইয়াহিয়ার কারাবাসের আদেশ জারী করিলেন। ইহার পর হইতে এই বংশের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। 'এই বংশের লোকেরা বহু বৎসর আব্বাসীয়গণের খিদমত করিয়া এবং শুধুমাত্র হারুনুর রশীদের রাজত্বকালে সতের বছর পর্যন্ত অকুণ্ঠ ও বিশ্বস্তভাবে চাকুরী করিয়া রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ হইতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদের পতন সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মত-বিরোধের অন্ত নাই। কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করিয়াছেন যে, জাফরের সহিত হারুনের ভগ্নী আব্বাসার অনভিপ্রেত প্রণয় হারুনের এই ক্রোধের কারণ। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ঐতিহাসিকগণ এই কাহিনীকে সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।

২৭

গৃহযুদ্ধ : আমীন

(৮০৮-৮১৩ খ্রীস্টাব্দ)

হারুন যেভাবে সাম্রাজ্যকে পুত্রদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে গৃহবিবাদের বীজ লুক্কায়িত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর সময় আমীন ছিলেন রাজধানী বাগদাদে, মামূন ছিলেন খুরাসানের রাজধানী মার্ভে এবং কাসিম ছিলেন রাক্কায়। পিতার ইচ্ছানুসারে আমীন খলীফা হইলেন। হারুন উইল করিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি খুরাসানে যে সৈন্যদল ও কোষাগার লইয়া আসিয়াছিলেন, মামূন উহার মালিক হইবেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া আমীন পূর্বাহ্ণেই গুপ্তচর পাঠাইয়া সৈন্য-বাহিনী ও সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র খুরাসান হইতে বাগদাদে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। এইভাবে প্রথম হইতেই দুই ভ্রাতার মধ্যে সম্পর্ক তিক্ততর হইতে থাকে।

গৃহযুদ্ধের অপর প্রধান কারণ রাজ্যে আরব-অনারবের বিরোধ। বারমাকীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কিভাবে দরবারের আরবগণকে ঈর্ষান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এক্ষণে আমীন ও মামূনকে কেন্দ্র করিয়া আরব-অনারব বিরোধ আবার মাথাচাড়া দিয়া উঠে। আমীন ছিলেন আরবমাতা জুবায়দার পুত্র, আর মামূন ছিলেন পারসিক মহিলার পুত্র। সাম্রাজ্ঞী জুবায়দার নেতৃত্বে আরব সভাসদগণ আমীনের পক্ষাবলম্বন করেন। অন্যপক্ষে মার্ভে মামূনের শাসন রাজ্যের পারসিকগণের পছন্দনীয় ছিল। তাঁহার মাতা পারসিক হওয়ায় খুরাসানের লোকেরা তাঁহাকে 'ভগিনীর পুত্র' বলিয়া সমাদর করিত। আমীনের উজীর ছিলেন ফযল ইবন রবী নামক একজন আরব সভাসদ। অপরপক্ষে মামূনের উজীর ছিলেন একজন পারসিক; তাঁহার নাম ছিল ফযল ইবন সহল। একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তিনি অধুনা পতিত বার্মাকীদের আশ্রিত ছিলেন। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, আমীন ও মামূন উভয়েই যথাক্রমে রাজ্যের আরব ও অনারব দলের নেতা বলিয়াই পরিগণিত হইলেন।

দুই ভ্রাতার পার্থক্য পরস্পরের বিরোধকে আরও ত্বরান্বিত করিয়াছিল। বাগদাদের রাজকীয় পরিবেশে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিগণের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়াও চরিত্রগত পার্থক্যের কারণে আমীন ও মামুন হারূনের দরবারের দুই পৃথক ভাবধারা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। আমীনের চঞ্চল ও আমোদ-প্রিয় মন দরবারের বাহ্যিক চাকচিক্য, জাগতিক আরাম-আয়েশ ও নানা বিলাস-ব্যসনে রাজকীয় জীবনের চরম সার্থকতা খুঁজিয়া পাইয়াছিল। তিনি গায়ক-গায়িকা, নর্তক-নর্তকী, বিদূষক, তোষামোদকারী, ঐন্দ্রজালিক ও জ্যোতিষিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া জীবনযাপন করিতে ভালবাসিতেন। দূর-দূরান্ত হইতে অনুপমা সুন্দরী নর্তকী ও খ্যাতিসম্পন্না গায়িকাগণকে দরবারে ডাকিয়া পাঠান হইল। অন্তঃপুরে খোজা প্রহরী নিযুক্ত হইল। দজলায় প্রমোদ বিহারের উদ্দেশ্যে তিনি সিংহ, হস্তী, ঈগল, সর্প ও অশ্বাকৃতি পাঁচখানা স্বর্ণখচিত ও সুশোভিত বজরা তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। গায়ক-গায়িকা এবং নর্তক-নর্তকী সমভিব্যাহারে পানোৎসবে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া সমগ্র রাজকার্যের ভার তিনি উজীর ফযল ইবন রবীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। নৃত্যগানের অনুষ্ঠানের জন্য তিনি একটি উৎসব-গৃহকে মনোরম গালিচা, গদী ও ঝালরে সুশোভিত করিয়াছিলেন। এই উৎসব-গৃহে অনুষ্ঠিত একটি উপভোগ্য ও উপাদেয় নৃত্যের বর্ণনা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। একশত সুন্দরী বালিকা মুক্তা-খচিত ও হীরক-শোভিত চমকপ্রদ পোশাকে সুসজ্জিত হইয়া মৃদু সঙ্গীত লহরীর তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে খর্জুরপত্র দোলাইয়া একবার সম্মুখে আসিত, আবার পশ্চাতে চলিয়া যাইত। তারপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া বারংবার গোলকধাঁধার সৃষ্টি করিত এবং বার বার গমনাগমন ও পার্শ্ব পরিবর্তন করিত এবং অঙ্গভঙ্গী করিত—যেন আলোর ও রঙের পরিমণ্ডল। অপরপক্ষে মামুন তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন পুরাপুরি আয়ত্ত করিয়া-ছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য শাসনে খুরাসানের জনসাধারণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিল। তিনি ফযল ইবন সহল নামক সুযোগ্য পরামর্শদাতার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিখ্যাত সেনাপতি হারসামা ও তাহির তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, কর্তব্য-পরায়ণতা ও উদার রাজস্বনীতি তাঁহাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল।

পরিশেষে এই গৃহযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে রাজকার্যে আমীনের উদাসীনতা, উজীর ফযল ইবন রবীর প্রভাবে পড়িয়া মামুনের প্রতি তাঁহার

অসদাচরণ এবং অর্থব্যয়ে আমীনের অপরিণামদর্শিতার কথা উল্লেখ করিতে হয়। আমীন সৈন্যদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহাদিগকে দুই মাসের বেতন অগ্রিম দিয়া দিলেন। তাঁহার বিলাস-ব্যসন ও জাঁকজমকের জন্য রাজকোষ হইতে প্রচুর অর্থ অকাতরে ব্যয়িত হইত। হারুন যখন মৃত্যুর পূর্বে খুরাসানে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ফযল ইবন রবী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি মামূনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সৈন্যদল, যুদ্ধাস্ত্র ও টাকা-পয়সা বাগদাদে লইয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে মামূনকে খিলাফতের উত্তরাধিকার হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করিবার জন্য তিনি আমীনকে নানাভাবে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন। আমীন প্রথম এই ধরনের পরামর্শ কানে তুলিলেন না, কিন্তু অন্যান্য সভাসদগণের কুপরামর্শে পড়িয়া তিনি মামূনকে বাগদাদে আসিবার জন্য পরওয়ানা পাঠাইলেন। মামূন তাঁহার এই দুরভিসন্ধিমূলক আহ্বানে সাড়া না দেওয়ায় আমীন তাঁহাকে খুরাসানের শাসনকর্তার পদ হইতে বরখাস্ত করিলেন। তিনি কাসিমকেও পশ্চিমাঞ্চলের শাসনকর্তার পদ হইতে বঞ্চিত করিলেন।

মামূনের উত্তরাধিকারের দাবী অস্বীকার করিয়া আমীন তাঁহার শিশুপুত্র মূসাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন। কাবাগৃহ হইতে আমীন ও মামূনের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত দলীলগুলি অপসারণ করিয়া ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলা হইল। আলী ইবন ঈসার নেতৃত্বে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের একটি দল রাইয়ে প্রেরিত হইল! মামূন পূর্বাহ্নেই তাঁহার রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাপতি তাহিরের হস্তে আলী ইবন ঈসা শোচনীয়রূপে পরাজিত ও নিহত হইলেন (৮১১খ্রীঃ)। বাগদাদ হইতে প্রেরিত আরও কয়েকটি সৈন্যদল তাহির কর্তৃক পরাজিত হইল। তাহির হারসামাকে হুলওয়ানে রাখিয়া আহওয়াজের দিকে রওয়ানা হইলেন। এক্ষণে মামূন আমীরুল মুমিনীন উপাধি গ্রহণ করিলেন এবং সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে খলীফা বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। মামূন ফযল ইবন সহলকে সকল সামরিক ও বেসামরিক ক্ষমতা দিয়া প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। 'হামাদান হইতে তিব্বত এবং কাস্পিয়ান সাগর হইতে পারস্যোপসাগর পর্যন্ত' অঞ্চলে তাঁহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল।

ফযল ইবন রবী পূর্বাঞ্চলের এই সকল ঘটনার কথা শুনিয়া আমীনকে এই বিপদের সময় সক্রিয় হইবার জন্য উপদেশ দিলেন, কিন্তু আমীন তাঁহার গলগ্রহ ও অনুগ্রহপুষ্ট লোকদের কথার তুবড়ীতে মাতিয়া ছিলেন। অবশেষে

পরাজয়ের গ্লানির প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি খলীফা হারূন কর্তৃক মামুনকে প্রদত্ত এক লক্ষ দিরহাম বাজেয়াপ্ত করিলেন। আমীনের চাঁইগণ তাঁহাকে পরামর্শ দিল যে, বাগদাদে অবস্থানরত মামুনের দুই পুত্রকে যেন হত্যা করা হয়। কিন্তু ভ্রাতার সহিত যত শত্রুতাই থাকুক না কেন, আমীন এই রকম উপদেশ-দানকারিগণকে কারারুদ্ধ করিয়া শাস্তি প্রদান করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

ঠিক এই সময় সিরিয়ায় আলী ইবন আবদুল্লাহ নামক মু'আবিয়ার এক বংশধর, যিনি মাতার দিক হইতে আলীর (রাঃ) বংশের সহিতও সম্পর্কযুক্ত ছিলেন, বিদ্রোহী হইলেন এবং দুই-তিন বৎসর পর্যন্ত সিরিয়ায় গোলযোগ চলিতে থাকে। সিরিয়ায় বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরিত হুসায়ন নামক একজন সেনাপতি (নিহত আলী ইবন ঈসার পুত্র) বাগদাদে ফিরিয়া আসিলে আমীন তাঁহাকে মধ্যরাত্রিতে তলব করিলেন। সেনাপতি খলীফার এই আদেশ শুধু প্রত্যাখ্যানই করিলেন না, বরং বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি ভাঁড় কিংবা গায়ক নহেন, কাজেই রাত্রিতে খলীফার সহিত দেখা করিতে তিনি অপারগ। প্রত্যূষে এই সেনাপতি আমীন ও তাঁহার মাতাকে বন্দী করিয়া মামুনকে খলীফা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই সাফল্য ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল। বাগদাদের জনসাধারণ বিদ্রোহী হইয়া আমীনকে পুনরায় খিলাফতে অধিষ্ঠিত করিল এবং হুসায়নকে বন্দী করিল। পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, উজীর ফযল ইবন রবীও হুসায়নের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি আত্মগোপন করিলেন।

রাজধানীতে যখন এই সকল ঘটনা আমীনকে বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত করিয়া তুলিতেছিল, তখন মামুনের সেনাপতি তাহির দজলা নদী পার হইয়া ওয়াসিত দখল করিলেন। ইতিমধ্যে জনৈক আলীর (রাঃ) বংশধর মক্কার শাসন-কর্তা আমীনের কার্যকলাপের নিন্দা করিয়া, বিশেষতঃ আমীন কর্তৃক কাবা শরীফে রক্ষিত দলীলগুলির অমর্যাদার তীব্র সমালোচনা করিয়া মার্ভে মামুনের নিকট চলিয়া যান। ওয়াসিতের পর কুফা, বসরা ও মসুল পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ মামুনের বশ্যতা স্বীকার করিল। কেবল রাজধানী বাগদাদই আমীনের হাতে রহিল। এক্ষণে বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আমীন অনেক টাকা-পয়সা ঢালিয়া লোকজনকে তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করিতে প্ররোচিত করিতে প্রয়াসী হইলেন। অচিরে তাহির বাগদাদের আনবার ফটকের সম্মুখে শিবির সংস্থাপিত করিলেন। সেনাপতি হারসামা দজলার অপর

তীরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পূর্ণ এক বৎসর বাগদাদ নগরী অবরুদ্ধ হইয়া রহিল। এই সময় বাগদাদবাসীদের দুঃখের অন্ত ছিল না। তাহাদের খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ বন্ধ হইয়া গেল। লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্মিত সুরম্য অট্টালিকাসমূহ ধূলিসাৎ হইয়া গেল এবং যে নগরী বিগত অর্ধ-শতাব্দী ধরিয়া সমগ্র পৃথিবীর ধনরত্ন আহরণ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছিল, এই যুদ্ধের ফলে তাহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল।

নগরীর একাংশ যখন তাহিরের দখলে চলিয়া গেল, তখন আমীনের সেনাপতিগণ একে একে দলত্যাগ করিয়া তাহিরের শিবিরে ভিড়িয়া পড়িল। আমীন বৃথাই তাঁহার রাজকোষ খালি করিয়া দিলেন এবং পরিশেষে স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র গলাইয়া নগর রক্ষার শেষ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তাহির আমীনের প্রধান সেনাপতিগণের সহযোগিতায় বিপুল শক্তি সঞ্চয় করিয়া নগরীর অনধিকৃত অংশ আক্রমণ করিলেন। আমীন তাঁহার মাতা ও পরিবারবর্গসহ মনসুর কর্তৃক নির্মিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এক্ষণে আত্মসমর্পণ ব্যতীত আমীনের আর কোন উপায় রহিল না। কিন্তু আমীন তাহিরের নিকট আত্মসমর্পণে অনিচ্ছুক ছিলেন। অবশেষে বহু আলাপ-আলোচনার পর স্থিরীকৃত হইল যে, আমীন হারসামার নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন, কিন্তু রাজদণ্ড, সিলমোহর এবং রাজকীয় বেশভূষা তাহিরের নিকট প্রেরিত হইবে। তদনুসারে হারসামা তাঁহার নৌকায় করিয়া আমীনকে দজলার পূর্ব তীরে লইয়া যাইতে রাজী হইলেন। অশ্রুবিগলিত নেত্রে দুই পুত্রকে পক্ষপুটে লইয়া হতভাগ্য আমীন নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। হারসামা তাঁহাকে যথোচিত মর্যাদার সহিত নৌকায় উঠাইয়া যাত্রা শুরু করিলেন। কিন্তু সেনাপতি তাহিরের অনুচরগণ নৌকাটি আক্রমণ করিয়া নিমজ্জিত করিয়া ফেলিল। আমীন সাঁতরাইয়া একটি গৃহে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু রাত্রিতে একদল পারসিক তাঁহাকে হত্যা করিল। (সেপ্টেম্বর, ৮১৩ খ্রীঃ)।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আমীন ও মামূনের গৃহবিবাদকে কেন্দ্র করিয়া রাজ্যের আরব ও অনারবদের মধ্যে এক ভীষণ শক্তি পরীক্ষা হইল। আমীনের পরাজয় আরবদের পরাজয় ও মামুনের জয় অনারব ও পারসিক-দের বিজয় সূচিত করে। আমীনের পরাজয়ের জন্য তাঁহার অপরিণামদর্শিতা, বিলাস-ব্যসনে কালক্ষেপ ও তাঁহার পরামর্শদাতাগণের দুরভিসন্ধিই দায়ী। বাগদাদের জনসাধারণ আমীনকে খুবই ভালবাসিত এবং তাহারা

শেষ পর্যন্ত আমীনের জন্য মরিয়া হইয়া লড়িয়াছিল; কারণ তাহারা খুরাসানীদের কর্তৃত্ব ও মামুনের পারসিক প্রীতি পছন্দ করিত না। কিন্তু আমীনের যোগ্য কোন সেনাপতি ছিল না। আলী ইবন ঈসার মৃত্যুর পর যাহারা তাঁহার দলে ছিল, তাহারা তাহিরের সম্মুখে টিকিয়া থাকিতে না পারিয়া ক্রমশঃ মামুনের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার সম্মুখে মস্তক অবনত করিল।

বিস্তারিত পাঠ্য তালিকা

ম্যুর, কলিফেট
আমীর আলী, হিস্ট্রি অব দি সারাসেন্‌স্

২৮

মামুন (৮১৩—৮৩৩ খ্রীঃ)

মামুন সর্ববিষয়ে ভ্রাতা আমীনের বিপরীতধর্মী ছিলেন। তাঁহার জীবনযাত্রা সকল অমিতাচার হইতে মুক্ত ছিল। ইসলাম বিরোধী কোন কার্যকলাপ তাঁহার দরবারে বা সান্নিধ্যে কখনও অনুষ্ঠিত হইত না। তাঁহার রাজত্বকাল প্রশংসনীয়, ন্যায়ানুগ ও গৌরবময় ছিল। তিনি রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে অবস্থান করিয়া বাগদাদের বস্তুতান্ত্রিক ও ইন্দ্রিয়সর্বস্ব জীবনের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অধিকন্তু উজীর ফযল ইবন সহল নিজ স্বার্থে মামুনকে বাগদাদে যাইতে দিতে চাহিতেন না। তিনি মার্ভে খলীফার উপর সকল প্রকার কর্তৃত্ব খাটাইতেন এবং বাগদাদে গিয়া তাঁহার এই কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, এই ভয়ে মামুনকে মার্ভে রাখিয়া তিনি রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকট গোপন করিলেন। মার্ভে থাকিয়া মামুন একদিকে যেমন ফযলের খপ্পরে পড়িলেন, অন্যদিকে তেমনি আলীর (রাঃ) বংশধরদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। আলাবীদের প্রতি তাঁহার এই দূর্বলতা শুধু যে কেবল রাজধানী বাগদাদের জনসাধারণের ঘৃণার কারণ ছিল, তাহাই নহে, তাঁহার এই সকল ধ্যান-ধারণা আব্বাসীয় বংশের ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করিয়া তুলিল। তাই তাঁহার রাজত্বের প্রথম ছয় বৎসর বাগদাদের ও পশ্চিমাঞ্চলের বিদ্রোহ ও অরাজকতা রাজ্যের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিল। আমীনের মৃত্যুর পরেই বাগদাদে না আসিয়া তিনি মারাত্মক ভুল করিলেন।

বাগদাদে ও রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে যে অরাজকতা ও বিদ্রোহ চলিতেছিল, এখানে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। প্রথমে বাগদাদের জনসাধারণ ও স্থানীয় সৈন্য বাগদাদের শাসনকর্তা তাহিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইল। আমীনের হত্যা ও সম্রাজ্ঞী জুবায়দার নির্বাসনের জন্য তাহারা তাহিরের বিরোধিতা করিল। তখন উজীর ফযলের ভ্রাতা হাসানকে বাগদাদে প্রেরণ করা হইল এবং তাহিরকে সিরিয়ার শাসনকর্তা করিয়া রাক্কায় পাঠান হইল। নাসর ইবন সাবাহ নামক এক ব্যক্তি মেসোপটেমিয়ায় বিদ্রোহী হইয়া পাঁচ বৎসর বাগদাদ

বিদ্রোহ

হইতে প্রেরিত সেনাদলকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। আবু সারাইয়া নামক একজন দুর্ধর্ষ তস্কর কুফা অধিকার করিয়া সেখানে ইবন তাবাতাবা নামক একজন আলীর (রাঃ) বংশধরকে খলীফা বলিয়া ঘোষণা করিল। সেনাপতি হারসামা আবু সারাইয়াকে পরাজিত করিলেন। রাজ্যের এই শোচনীয় পরিস্থিতিতে মর্মাহত হইয়া হারসামা মার্ভে খলীফার নিকট গিয়া সকল অবস্থা অকপটে বলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। উজীর ফযলের সকল চক্রান্ত খলীফার সম্মুখে উদঘাটিত করিতে মনস্থ করিয়া তিনি মার্ভে যাত্রা করিলেন। দুষ্টমতি ফযল হারসামার আগমনের উদ্দেশ্য অনুমান করিয়া পূর্বাহ্নেই খলীফার মনকে হারসামার বিরুদ্ধে বিষাইয়া তুলিয়াছিল। খলীফার সান্নিধ্যে কিছু বলিবার পূর্বেই উজীরের নির্দেশে তাঁহাকে বন্দী করা হইল এবং পরে হত্যা করা হইল। হারসামার মৃত্যু সংবাদে বাগদাদে পুনরায় বিদ্রোহ দেখা দিল। সৈন্যগণ হাসানকে 'অগ্নি উপাসকের পুত্র অগ্নি উপাসক' বলিয়া গালাগাল করিল এবং খলীফা মাহদীর এক পুত্র মনসুরকে হাসানের পরিবর্তে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিল। ঠিক এমন সময় মামুনের এক অচিন্তনীয় অবিমৃষ্যকারিতার ফলে বাগদাদে ও পশ্চিমাঞ্চলে আবার বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

মামুন আলীর (রাঃ) বংশধরগণের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। এই সহানুভূতির বশবর্তী হইয়া তিনি ৮১৭ খ্রীস্টাব্দে শিয়াদের অষ্টম ইমাম আলী আর-রিজাকে মার্ভে ডাকাইয়া তাঁহাকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পরিতাপের বিষয়, উজীর ফযলও খলীফার এই মারাত্মক সিদ্ধান্তে সায় দিলেন। মামুন রাজ্যের সর্বত্র আলীর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করারও নির্দেশ দিলেন এবং আব্বাসীয় কৃষ্ণবর্ণের পরিবর্তে ফাতিমীয়গণের সবুজবর্ণকে রাজকীয় পোশাকের বর্ণ হিসাবে গ্রহণ করিলেন। মামুনের এই সকল আদেশে বাগদাদের আব্বাসীয়গণ প্রমাদ গণিল। যে শিয়াগণকে তাহারা বরাবর ঘৃণার চোখে দেখিত, তাহাদের কর্তৃত্ব আসন্ন মনে করিয়া তাহারা বিরাট আক্রোশে ফাটিয়া পড়িল। তাহারা এক্ষণে মাহদীর অপর পুত্র ইব্রাহীমকে খলীফা বলিয়া ঘোষণা করিল। বাগদাদ ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অরাজকতা দেখা দিল। দস্যু-তস্করেরা প্রকাশ্য দিবালোকে বাগদাদের রাজপথে লুণ্ঠন ও অত্যাচার আরম্ভ করিল। নগরবাসীরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য শান্তিরক্ষা বাহিনী গঠন করিল। দক্ষিণ ইরাক এবং

আলী আর-রিজা উত্তরাধিকারী ঘোষিত ৮১৭ খ্রীঃ

হিজাযেও অনুরূপ শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। ফযলের স্বার্থপর নীতি ও সাম্রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে মামূনের অজ্ঞতা মুসলিম সাম্রাজ্যকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। ইমাম আলী আর-রিজা তখন মার্ভে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি রাজ্যের এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়া স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া মামূনের নিকট গমন করিলেন এবং প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার নিকট সবকিছু অকপটে ব্যক্ত করিলেন। আমীনের শোচনীয় মৃত্যুর পর হইতে ক্রমান্বয়ে কিভাবে পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে, তাহা তিনি প্রকাশ করিলেন। উজীরের সত্য গোপন, বাগদাদে ইব্রাহীমের নির্বাচন এবং খিলাফতে তাঁহার মনোনয়নের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সকলই তিনি বর্ণনা করিলেন। হাসান ও তাঁহার ভ্রাতা ফযলের কুশাসনে কিভাবে দেশ রসাতলে যাইতেছে, যোগ্য সেনাপতি তাহিরকে কিভাবে কোণঠাসা করিয়া সিরিয়ায় প্রেরণ করা হইয়াছে এবং প্রভুভক্ত হারসামাকে কি অন্যায়ভাবে উজীরের চক্রান্তে হত্যা করা হইয়াছে, এই সকল কথা শুনিয়া মামূনের জ্ঞান-চক্ষু উন্মোচিত হইল। দরবারের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় লোকও উজীরের প্রতিশোধ হইতে খলীফার আশ্বাসপ্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে মুখ খুলিলেন এবং আলী আর-রিজার প্রতিটি কথার যথার্থতা প্রতিপাদন করিলেন। মামূনের মনে আর কোন প্রকার সন্দেহ রহিল না যে, বাগদাদে যাওয়াই এ সকল গোলযোগ ও দুরবস্থার একমাত্র প্রতিকার। তিনি অবিলম্বে বাগদাদ যাত্রার আদেশ দিলেন। যে-সকল লোক খলীফার নিকট আলী আর-রিজার সমর্থনে কথা বলিয়াছিল, প্রতিহিংসাপরায়ণ উজীর তাহাদের অনেককে নানাভাবে নাজেহাল করিল। খলীফা মার্ভে হইতে একদিনের পথে সাররাখ নামক স্থানে পৌঁছিলে শত্রুদের প্ররোচনায় উজীর তাঁহার হাম্মামখানায় আততায়ী কর্তৃক নিহত হইলেন। পথিমধ্যে মামূন তুস নগরীতে কিছুকাল বিশ্রাম করিবার জন্য থামিলেন। এখানে দুর্ভাগ্যক্রমে আলী আর-রিজার মৃত্যু হয়। মামূন তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুতে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার সমাধির উপর স্মৃতিসৌধ নির্মাণের আদেশ দিলেন। এই স্থান শিয়াদের বিখ্যাত তীর্থ এবং মাশহাদ নামে পরিচিত। নাহরাওয়ানে আসিয়া মামূন আবার থামিলেন। বাগদাদের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, আব্বাসীয় বংশের লোকেরা এবং অন্যান্য আরও অনেকে এখানে আসিয়া মামূনের সহিত মিলিত হইলেন। রাক্কা হইতে তাহিরও আসিলেন। এখানে

সকলের অনুরোধক্রমে সবুজ পোশাকের পরিবর্তে আবার আব্বাসীয় কৃষ্ণবর্ণ পোশাক সরকারী বলিয়া বিধিবদ্ধ হয়। মামুন সভাসদগণকে কৃষ্ণবর্ণ পোশাক উপহার দিলেন।

ইহার পর মামুন বাগদাদের দিকে যাত্রা করিলেন। ইব্রাহীমের শাসনে সকলেই অসন্তুষ্ট ছিল। মামুনের সেনাবাহিনীর আগমনে ইব্রাহীম পলায়নপর হইলেন। আট বৎসর পর তিনি একটি কবিতায় মামুনের প্রশস্তি লিখিয়া তাঁহার অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন।

পরিশেষে ৮১৯ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে মামুন বিজয়ীবেশে বিনা বাধায় বাগদাদে প্রবেশ লাভ করিলেন। উৎসব-মুখরিত রাজধানীতে বহুদিন পর শান্তির ছায়া নামিয়া আসিল। সকল বিশৃঙ্খলা থামিয়া গেল এবং সুসজ্জিত রাজপথে লোকজন উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বাহির হইয়া আসিল। মামুন বিদ্রোহী নগরীর প্রতি অসীম ক্ষমা ও সহনশীলতার পরিচয় দিলেন। ভ্রাতার উজীর ফযল ইবন রবী, ইব্রাহীমের উজীর ঈসা ও অন্যান্য বিপক্ষীয় লোকগণকে মামূন উদার ও মহানুভব ব্যবহারের সাহায্যে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। তিনি নগরীর ধ্বংস সংস্কারে ও শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করিলেন। বিদ্রোহকালীন বাগদাদের অবস্থা সম্পর্কে মামুনের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন: বাগদাদে তিন শ্রেণীর লোক আছে—এক শ্রেণীর লোক মজলুম (অত্যাচারিত), এক শ্রেণী জালিম (অত্যাচারী), আর তৃতীয় শ্রেণী উপরোক্ত কোন দলের অন্তর্ভুক্ত নহে এবং ইহারাই সকল অনিষ্টের মূল। অরাজকতার সময় সাধারণ লোকের নিষ্ক্রিয়তা ও উদাসীনতা সম্পর্কে মামূনের উক্তি যে-কোন যুগেই সমভাবে প্রযোজ্য।

মামুনের বাগদাদে প্রবেশ ও শাসনের সুব্যবস্থা

বাগদাদে শান্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর মামূন রাজ্যের অন্যান্যস্থানে উপযুক্ত শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। মক্কা ও মদীনার শাসনভার একজন আলীর (রাঃ) বংশধরের উপর ন্যস্ত হইল। কুফা ও বসরার শাসনভার খলীফার দুই ভ্রাতাকে দেওয়া হইল। তাহিরকে পুনরায় বাগদাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইল এবং তাহিরের পুত্র আবদুল্লাহকে রাক্কার শাসনভার দেওয়া হইল। কিছুদিন পর তাহিরকে রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করা হইল। দুই বৎসর পর তাহিরের মৃত্যু হইলে তাঁহার আর এক পুত্র তাল্‌হা পিতার স্থলাভিষিক্ত হইলেন।

অন্যান্য স্থানের শাসনের সুব্যবস্থা

আবদুল্লাহ্ নাসর ইবন সাবার বিদ্রোহ দমন করিলেন এবং মেসোপটেমিয়ার শান্তি স্থাপন করিলেন। তখন মিসরেও বিদ্রোহ চলিতেছিল। আবদুল্লাহ নাসরকে দমন করার পর মিসরের বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত করিয়া সেখানেও শান্তি স্থাপন করিলেন। এই সময় স্পেন হইতে বহু মুসলমান পরিবার বিতাড়িত হইয়া মিসরে আসিয়া পৌঁছিল। তাহারা মিসরে শান্তিভঙ্গ করিলে তাহাদিগকে মিসর ত্যাগ করিতে আদেশ করা হইল। এই সকল লোক ক্রীট দ্বীপে গিয়া উহা দখল করিল। ইতিমধ্যে উত্তর আফ্রিকার জিয়াদতুল্লাহ্ আগলাব সিসিলি দ্বীপ অধিকার করেন। ইয়ামনে ও খুরাসানেও বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। সর্বত্রই বিদ্রোহিগণ মামূনের নিকট উদার ব্যবহার প্রাপ্ত হন।

মামূন ফযল ইবন সহলের ভ্রাতা হাসানকে উজীরের পদে উন্নীত করিলেন। ফযলের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের পর মামূন হাসানকে এই পদোন্নতির প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কন্যা বুরানের সহিত মামূনের বিবাহ স্থিরীকৃত হয়। ২১০ হিজরীর রমজান মাসে বাগদাদে বিশেষ আড়ম্বর ও ধুমধামের সহিত এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এই বিবাহের আড়ম্বর হইতে তৎকালীন বাগদাদের জাঁকজমক সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। উজীর তাঁহার বাসস্থানে বরযাত্রীকে সতরদিন ধরিয়া মহা সমারোহে আপ্যায়িত করেন। রাজমাতা জুবায়দা ও রাজপরিবারের অন্যান্য মহীষী এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের অনুপম রূপমাধুরী ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য কবিদের কাব্যস্পৃহা জাগাইয়াছিল। অপূর্ব রূপ-লাবণ্যময়ী বধূ সকলের সেরা সুন্দরী ছিলেন। বধূর দাদীমা একটি স্বর্ণের বারকোষ হইতে এক সহস্র মুক্তার দানা বর-কনের উপর বর্ষণ করেন; তারপর এইগুলিকে খুঁজিয়া লইয়া মালা তৈয়ার করা হয় এবং উহা নবপরিণীতার কণ্ঠ শোভিত করে। একমণ আম্বর দ্বারা প্রস্তুত একটি বাতি স্বর্ণের শামাদানে প্রজ্বলিত করিয়া বাসরগৃহ আলোকিত করা হয়। বরযাত্রী যখন বিদায় গ্রহণ করিতেছিল, তখন উজীর তাহাদিগকে খিলাত (পোশাক) উপহার দিলেন এবং তাহাদের উপর মৃগনাভির গোলা বর্ষণ করেন। প্রতিটি গোলার ভিতরে একটি উপঢৌকনের নাম লিখিত ছিল। লোকেরা ঐ লেখা অনুযায়ী কেহ একটি জায়গীর, একটি ক্রীতদাস অথবা অন্য কোন সম্পত্তি পাইল। এই বিবাহের ব্যয় নির্বাহের জন্য খলীফা উজীরকে ফারিস ও আহওয়াজের এক বৎসরের রাজস্ব দান

বুরানের সহিত বিবাহ
৮২৫ খ্রীঃ

করিলেন। বুরান কেবল যে তাঁহার সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, তাহা নহে, তিনি বিবিধ গুণে গুণান্বিতা ছিলেন এবং রাজকার্যে তাঁহার স্বামীর উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতেন। তিনি বদান্যতার জন্যও বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এবং মামুনের মৃত্যুর পরেও পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকিয়া সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগই প্রত্যক্ষ করেন নাই, ইহার পতনোন্মুখ অবস্থাও অবলোকন করিয়াছিলেন।

মামুনের রাজত্বের প্রথম ভাগে যখন চতুর্দিকে বিদ্রোহ ও অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল, তখন বাবক নামক এক তস্কর কাস্পিয়ানের তীরে অবস্থিত মাজান্দারানের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে ঘাঁটি নির্মাণ করিয়া পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবাধ লুঠতরাজ চালাইতেছিল। সে খুররামী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং পুনর্জন্ম ও অন্যান্য অদ্ভুত মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। সে দলবলসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নরহত্যা ও লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত হইত না, বরং স্ত্রীলোকদিগকে বন্দী করিয়া তাহার ঘাঁটিতে আটক রাখিত। বাগদাদ হইতে প্রেরিত বহু সেনাবাহিনী একের পর এক হয় ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিল, না হয় পার্বত্য অঞ্চলে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। এইভাবে বহু বৎসর পর্যন্ত সে উক্ত অঞ্চলে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করিয়াছিল। মামুনের সময় তাহাকে দমন করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। অধিকন্তু বাবক গ্রীকদের সহিত সহযোগিতা করিয়া তাহাদিগকে মুসলিম রাজ্য আক্রমণে উৎসাহিত করিতে লাগিল। মামুন ৮৩০ খ্রীস্টাব্দে টরসাস অঞ্চলে গমন করিয়া গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিলেন এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য করিলেন। পৌনঃপুনিক গ্রীক আক্রমণের বিরুদ্ধে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মামুন সীমান্তে টায়ানা নামক স্থানে একটি সুবিশাল সুরক্ষিত সামরিক ঘাঁটির নির্মাণ কার্য আরম্ভ করেন। এই ঘাঁটির প্রাথমিক প্রস্তুতি সমাপ্ত করিয়া তিনি পুত্র আব্বাসকে ইহার তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া টরসাসে প্রত্যাবর্তন করেন। শরতের এক গরমের দিনে ভ্রাতা আবু ইসহাকের সহিত তিনি পার্বত্য অঞ্চলে একটি নির্ঝরিণীর পার্শ্বে বসিয়া উহার স্বচ্ছ শীতল জলে পদ সিক্ত করিতেছিলেন। সেখানে উভয় ভ্রাতা প্রাণ ভরিয়া সদ্য আনীত টাটকা খেজুর খাইলেন এবং বরফ-শীতল পানি পান করিলেন। রাত্রেই তাঁহারা জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। মামুন এই জ্বর হইতে আর উঠিলেন না। পীড়িতাবস্থায় ভ্রাতা আবু ইসহাককে 'মুতাসিম' উপাধি

নাস্তিক বাবক

গ্রীকদের সহিত যুদ্ধ

দান করিয়া উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন। ৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের ৯ই আগস্ট টরসাসে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৪৮ বৎসর। পাঁচ বৎসর খুরাসানের শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করার পর তিনি বিশ বৎসর খলীফা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মামূনের রাজত্বকালের ঘটনাবলী গতানুগতিক ও বৈচিত্র্যহীন। তন্মধ্যে প্রথম আট বৎসর রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে ঘোরতর অরাজকতা বিরাজমান ছিল। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকাল দুইটি বিষয়ের জন্য ইসলামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। প্রথমতঃ মামূন কর্তৃক মুতাজিলা মতবাদ সমর্থন ও দ্বিতীয়তঃ তাঁহার রাজত্বকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি। এই উভয় বিষয়ে মামূনের সক্রিয় ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মামূন উদার মনোভাবের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার দরবারে ভিন্ন ভিন্ন মতের ধর্মীয় নেতাগণকে ডাকিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। গ্রীক দর্শনের প্রভাবে এই যুগে মুসলমানদের মনে যে আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল, খলীফা মামূন তাহা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া মানব মনের বহু জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টিত হইলেন। যে অবিচলিত নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞা সহকারে তিনি পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহাদের সূক্ষ্ম ও জটিল মতবাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেন, ইহাতে তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও মনের প্রসারতার পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচনার প্রধান বিষয়-বস্তুর মধ্যে ছিল স্রষ্টার সহিত মানুষের সম্পর্ক এবং স্রষ্টার প্রকৃতি। এই সকল আলোচনার শেষে মামূন সচরাচর প্রচলিত সনাতন মতবাদের বিরোধিতা করিয়া মুতাজিলা মতবাদে দীক্ষিত হইলেন। এই মতবাদ অনুযায়ী মানুষ নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজকর্ম করিতে পারে, ইহা পূর্ব হইতে নির্ধারিত নহে। আল্লাহর গুণাবলী তাঁহার সত্তা হইতে পৃথক নহে। কুরআন সৃষ্ট বস্তু। এই সকল মতবাদে মামূনের বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকে। পরিশেষে মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের সমর্থক মামূন স্বীয় মতবাদ প্রচারে ও প্রসারে অসহিষ্ণু মনোভাব প্রদর্শন করিলেন এবং সরকারী ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করিয়া তিনি জোরপূর্বক জনসাধারণের উপর বিশেষ করিয়া নেতৃস্থানীয় উলামা ও কাজীদের উপর এই মত চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিলেন। তিনি যখন সীমান্তে যুদ্ধরত ছিলেন, তখন বাগদাদের শাসনকর্তার নিকট এই মর্মে এক ফরমান পাঠাইলেন যে, তিনি

যেন প্রধান পণ্ডিতগণকে উপরোক্ত মতবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়া তাঁহাদের উত্তরগুলি খলীফার অবগতির জন্য পাঠাইয়া দেন (৮৩৩ খ্রীঃ)। বাগদাদের অধিকাংশ পণ্ডিত ও কাজীগণ বিশ্বাসবলেই হউক অথবা সুবিধার খাতিরেই হউক, খলীফার মতে মত প্রকাশ করিয়া বিপদমুক্ত হইলেন। কিন্তু কেহ কেহ নিজ নিজ মতবাদে অটুট রহিলেন এবং সরকারী নীতি মানিয়া লইতে অস্বীকার করিলেন। শেষোক্ত দলের মধ্যে ছিলেন ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল। সনাতন ধর্মের জন্য তাঁহার ত্যাগ স্বীকার ও সকল নির্যাতনের মুখে স্বীয় মতে অবিচলিত আস্থা ইতিহাসের এক চমকপ্রদ অধ্যায়। ইসলামের যে অন্তর্নিহিত সহনশীলতা মুতাজিলা মতবাদের জন্ম দিয়াছিল এবং যাহার বলে মামুন উক্ত মতবাদকে বাছিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, মামুনের শেষ বয়সের কার্যকলাপ তাহারই কণ্ঠরোধ করিয়া চিন্তার স্বাধীনতার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিল।

মামুনের রাজত্বকাল মুসলিম জ্ঞান সাধনার শ্রেষ্ঠ যুগ। সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এই সময় অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়।

জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি

মামুন এই সকল প্রতিভাবান লোকদের জন্য বিশেষ ভাতা ও পুরস্কারের বন্দোবস্ত করেন। তিনি নিজে কবি ছিলেন এবং কবির সমাদর করিতেন। তাঁহার সময় বহুকাল ধরিয়া অবহেলিত পারস্য সাহিত্যেরও উন্নতি হয়। পারসিক কবি আব্বাস তাঁহার রাজত্বকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কবি, ভাষাবিদ ও ব্যাকরণবিদ ছাড়াও বিখ্যাত হাদিস সংগ্রাহক ইমাম বুখারী, হযরত রসুলুল্লার (সঃ) জীবনী লিখক বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল-ওয়াকিদী এবং দুইটি সুন্নী মতবাদের স্থাপয়িতা ইমাম শাফিয়ী ও ইবন হাম্বল এই যুগের লোক। মামুন ইহুদী ও খ্রীস্টান পণ্ডিত ও ভাষাবিদগণকে সমাদরে তাঁহার দরবারে স্থান দিতেন। ৮৩০ খ্রীস্টাব্দে তিনি বাগদাদে 'বায়তুল হিকমা' নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেন। ইহা একাধারে একটি পাঠাগার, জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ও সর্বোপরি

অনুবাদ সংস্থা ৮৩০ খ্রীঃ

তর্জমা প্রতিষ্ঠান ছিল। ইতিপূর্বে মনসুর ও হারুনের রাজত্বকালে কিছু কিছু বিদেশী ভাষার গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হইয়াছিল। কিন্তু অনুবাদের কাজ ধীরগতিতে ও ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল-খুশীমত চলিত। মামুনের সময় হইতে এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তর্জমার কাজ ত্বরান্বিত ও সুবিন্যস্ত হয়। মামুন সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, ও মিসরের বিভিন্ন খ্রীস্টান সন্ন্যাসাশ্রম হইতে পুরাতন গ্রীক দর্শন, ইতিহাস

ও বিজ্ঞানের গ্রন্থমালা তন্ন তন্ন করিয়া আহরণ করিলেন এবং এই সকল গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করার ব্যবস্থা করেন। এই সকল অনুবাদক বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহারা প্রাচীন গ্রন্থসমূহের আক্ষরিক ও হুবহু অনুবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, অচিরেই তাঁহারা নিজেদের মৌলিক গবেষণার ফল উহার সহিত সংযোজিত করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে মহামূল্য অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। তর্জমার ক্ষেত্রে কোন কোন সময় গ্রীক ও সিরীয় ভাষায় অভিজ্ঞ লোক প্রথমতঃ গ্রীক হইতে সিরীয় ভাষায় অনুবাদ সম্পন্ন করিতেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে অন্য লোক সিরীয় ভাষা হইতে আরবীতে অনুবাদ করিতেন।

অনুবাদক-গণের কাজ

মামূনের অনুবাদ সংস্থার পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধান ছিলেন হুনায়ন ইবন ইসহাক। তিনি ইবাদী বা নেস্টোরীয় খ্রীস্টান ছিলেন। ইবন মাসাওয়াইহ্ নামক একজন চিকিৎসকের কম্পাউণ্ডার হিসাবে তিনি কর্মজীবন আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রভু তাঁহাকে একজন অপদার্থ মনে করিয়া বাজারে টাকা বদলের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে বলেন। ইহাতে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া তিনি প্রথমে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ মুসা ইবনে শাকিরের তিন পুত্রের সহকারী হিসাবে গ্রীক-ভাষাভাষী অঞ্চলে পুরাতন হস্ত-লিখিত পুঁথির অনুসন্ধানে চলিয়া যান। পরে তিনি মামূনের চিকিৎসক জিব্রিল ইবন বখতীষুর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। অতঃপর মামুন তাঁহাকে বায়তুল হিকমার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। হুনায়ন গ্রীক বিজ্ঞানের পুঁথি-পুস্তক তর্জমার ব্যাপারে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই কাজে বহু শিক্ষার্থী ও সহকারী তাঁহার সহযোগিতা করিত। হুনায়নের পুত্র ইসহাক এবং ভ্রাতুষ্পুত্র হুবায়ন ইবনুল হাসানও তাঁহার প্রধান সহযোগী ছিলেন। সাধারণতঃ হুনায়ন প্রথমে গ্রীক পুস্তক সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করিতেন এবং পরে তাঁহার সহযোগীরা সিরীয় ভাষা হইতে সেগুলিকে আরবী ভাষায় তর্জমা করিতেন। এইভাবে যে-সকল পুস্তক ঐ সময় আরবী রূপ লাভ করে, তন্মধ্যে গ্যালেনের এ্যানাটমী (Anatomy), প্ল্যাটোর রিপাবলিক (Republic), এ্যারিস্টটলের ক্যাটেগরীজ (Categories), ফিজিকস (Physics) ও ম্যাগনা মোরেলিয়া (Magna Moralia) প্রসিদ্ধ। এই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়া সুরক্ষিত না হইলে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার হইতে এই অমূল্য সম্পদ মানুষের অজ্ঞাতে হারাইয়া যাইত। অনুবাদকগণ তাঁহাদের কাজের জন্য প্রচুর পারিশ্রমিক

পাইতেন। হুনায়ন যখন শকিরের পুত্রগণের অধীনে কাজ করিতেন, তখন তিনি ও অন্যান্য অনুবাদকগণ প্রতি মাসে ৫০০ দীনার পাইতেন। মামুনের দরবারে হুনায়নের বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তিনি যে-সকল বই তর্জমা করিতেন, তাহার সমান ওজনের স্বর্ণ তাঁহাকে দেওয়া হইত। হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ইবন মাতার নামক অপর বৈজ্ঞানিক টলেমীর আল-মাজেস্ট (Almagest) তর্জমা করেন। ইহার পর হুনায়নও এই বইয়ের একটি তর্জমা তৈরী করেন।

মানমন্দির

মামুন বাগদাদের শাম্মাসিয়া ফটকের নিকট একটি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক মানমন্দির নির্মাণ করেন। এই মানমন্দিরের পরিচালক ছিলেন সিন্দ ইবন আলী ও ইয়াহিয়া ইবন আবি মনসুর। এখানে খলীফার জ্যোতির্বিদগণ গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধিই লক্ষ্য করিতেন না, বরং আলমাজেস্টের সূত্রগুলিও পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। এই সকল সূত্রের মধ্যে দিবারাত্রির সমতা ও সৌর বৎসরের দৈর্ঘ্য প্রধান। এই প্রসঙ্গে যে-সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইত, তন্মধ্যে বৃত্তের চতুর্থাংশ (Qudrant) এস্ট্রলেব, সূর্যঘড়ি ও ভূগোলক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মামুনের জ্যোতির্বিদগণ পৃথিবীর আকৃতি ও উহার পরিধি নির্ভুলভাবে নিরূপণ করেন। তাঁহারা প্রথমে মধ্যরেখার (Meridian) মাত্রা নিরূপণ করিয়া পৃথিবীর পরিধি ও ব্যাস নির্ণয় করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, এই সকল বৈজ্ঞানিক পৃথিবী গোল, এই মৌলিক ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া সকল পরীক্ষা চালাইতেন। অথচ ইহার বহু পরের যুগেও ইউরোপে ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে পৃথিবীকে চ্যাপ্টা মনে করা হইত। এই পরীক্ষায় বৈজ্ঞানিকগণ প্রায় আধুনিক কালের পরিমাপের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছিলেন। ইবন শাকিরের পুত্রগণ এই পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মামুনের মানমন্দির ছাড়াও শাকিরের পুত্রগণ তাঁহাদের বাগদাদস্থ বাসস্থানে নিজস্ব মানমন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ আল খওয়ারিজমীও এই যুগের লোক। তিনি এ্যালজেব্রার জনক। আবুল হাসান নামক বৈজ্ঞানিক দূরবীন আবিষ্কার করিয়াছিলেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সকল মূল্যবান অবদানের জন্য মামুনের রাজত্বকাল ইসলামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

বিস্তারিত পাঠ্য

আমীর আলী, হিস্ট্রি অব দি সারাসেন্‌স্
ম্যুর, কলিফেট
হিট্টি, হিস্ট্রি অব দি এরাবস্

২৯

মুতাসিম ও মুতাওয়াক্কিল

মুতাসিম (৮৩৩—৮৪২ খ্রীঃ)

মামুনের ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার ভ্রাতা আবু ইসহাক মুতাসিম উপাধি ধারণ করিয়া খলীফা হইলেন। সৈন্যগণ প্রথমে মামুনের পুত্র আব্বাসকে খলীফা নির্বাচিত করিতে চাহিল। কিন্তু মুতাসিম আব্বাসকে টায়ানা হইতে টরসাসে ডাকিয়া আনিলেন এবং আব্বাস পিতৃব্যের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলে সৈন্যবাহিনীও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। খলীফা হইয়াই মুতাসিম টায়ানার সামরিক ঘাঁটি ছাড়িয়া দিতে সিদ্ধান্ত করিলেন। তিনি টায়ানা হইতে টরসাসে যাবতীয় সেনাবাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র এবং মালপত্র গুটাইয়া লইয়া আসিলেন। ইহা ছাড়া তিনি তুর্কীদের সমন্বয়ে একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করিলেন। এই সকল সৈন্য তাহাদের নিজ সৈন্যাধ্যক্ষ দ্বারা পরিচালিত হইত। কালক্রমে ইহারা এতই শক্তিশালী হইয়া পড়িল যে, তাহারা রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করিত এবং খেয়াল-খুশীমত খলীফাকে সিংহাসনে বসাইত ও সিংহাসনচ্যুত করিত। ইহাদের অত্যাচারে বাগদাদ-বাসীদের জান-মাল বিপন্ন হইল। অনন্যোপায় হইয়া খলীফা বাগদাদের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত সামাররা নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল (৮৩৬—৮৯৪ খ্রীঃ) সাতজন খলীফার সময়ে রাজধানী সামাররায় ছিল।

সামাররায় রাজধানী স্থানান্তরিত

খলীফা হইয়াই মুতাসিম গ্রীকদের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া বন্দী বিনিময় করিলেন। এই সময় নিম্ন মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে জাঠগণ গোলযোগ আরম্ভ করে এবং বাগদাদের সকল সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেয়। উজায়ফ নামক একজন আরব সেনাপতি কয়েক সহস্র জাঠকে বন্দী করিয়া বাগদাদে লইয়া আসেন। ইহাদিগকে এশিয়া-মাইনরে নির্বাসিত করা হয় এবং সেখান হইতে ইউরোপে গিয়া ইহারা জিপসী নামে পরিচিত হয়।

যুদ্ধবিগ্রহ ও বিদ্রোহ

নাস্তিক বাবকের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। তাহাকে দমন করার

উদ্দেশ্যে মুতাসিম আফসীন নামক তুর্কী সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। দুই বৎসর পর্যন্ত ক্রমাগত যুদ্ধ চালাইয়া আফশীন বাবকের ঘাঁটিসমূহ দখল করিতে সক্ষম হন। বাবক আর্মিনিয়ায় পলায়ন করিয়া একজন আর্মিনীয় সর্দার কর্তৃক ধৃত হইয়া আফসীনের হাতে সমর্পিত হয়। প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ দোর্দণ্ড প্রতাপে কাস্পিয়ানের তীরবর্তী অঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব চালাইবার পর এই তস্করপ্রধান ধৃত হইল। আফসীন তাহার আড্ডা হইতে বিপুল ধনসম্পদ উদ্ধার করেন এবং সাত হাজার খ্রীস্টান ও মুসলমান স্ত্রীলোককে মুক্তি দান করিয়া নিজ নিজ গৃহে প্রেরণ করেন। আফসীন বাবক ও তাহার অনুচরগণকে বন্দী করিয়া সামাররায় লইয়া আসিলে খলীফা আফসীনকে রাজকীয় সম্বর্ধনা দান করেন। বাবকসহ বন্দীদিগকে হাতীর পিঠে রাজপথে প্রদর্শন করা হয় এবং পরে হত্যা করা হয়।

বাবক

আফসীন যখন বাবকের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন বাইজান্টাইন সম্রাট সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণ করেন। ইতিমধ্যে মুতাসিম টায়ানা হইতে সামরিক ঘাঁটি প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। গ্রীকগণ নগর ও জনপদ লুণ্ঠন ও অগ্নিদগ্ধ করিয়া পুরুষদিগকে বন্দী করে এবং স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাগণকে বন্দী করে। মুতাসিমের জন্মস্থান জিবাত্রায় (Zapetron) বর্বরতার সহিত মানুষকে নির্যাতিত ও নিহত করা হয়। মুতাসিম গ্রীকদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া তাহাদের সম্রাট থিওফিলাসকে পরাজিত করেন এবং প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে থিওফিলাসের জন্মস্থান এ্যামরিয়ন (Amorion) ধূলিসাৎ করেন। এই বিজয়-মুহূর্তে খলীফার শিবিরে এক মারাত্মক ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। কয়েকজন আরব সেনাপতি তুর্কীদের প্রতিপত্তিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া এবং খলীফার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল। ইহারা আব্বাসকে তাহাদের দলে টানিয়া খলীফা করিবার প্রতিশ্রুতি দিল। মুতাসিম থিওফিলাসের সহিত সন্ধি করিয়া সামাররায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং বিদ্রোহীদের প্রতি কঠোর শাস্তি বিধান করেন।

বাইজান-টাইনদের সহিত যুদ্ধ ৮৩৮ খ্রীঃ

আরব দলপতিদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় এবং তাহাদের অনেকে ক্ষমতাচ্যুত ও শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ায় তুর্কীদের দৌরাত্ম্য বাড়িয়া গেল। খলীফা এখন তাহাদের হাতের ক্রীড়নক হইয়া পড়িলেন। ইহাদের ক্ষমতার লিপ্সা, বিশ্বাসঘাতকতা ও ন্যাক্কারজনক ব্যবহার দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তুর্কী সেনাপতি আফসীন মাজিয়ার নামক

তুর্কীনেতা আফসীন

তাবারিস্তানের একজন দলপতি বিদ্রোহী হইলে গোপনে তাহাকে উৎসাহ দিতে থাকেন। আফসীনের বিরুদ্ধে তহবিল তসরুপের অভিযোগও আনয়ন করা হইল। আফসীন পলায়নের চেষ্টা করিয়া ধৃত হইলেন। ইহার পর নাস্তিকতার অভিযোগেও তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হয়; কারণ তাঁহার নিকট অগ্নি উপাসকদের ধর্মপুস্তক ও নানা দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল। ইহার পর কারারুদ্ধ অবস্থায় আফসীনের মৃত্যু হয়।

মুতাসিম ৮৪২ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পরলোক গমন করেন। তিনি তাঁহার কয়েকটি নীতি ও কর্মের সাহায্যে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের অধোগতির পথ সুগম করিয়াছিলেন। তুর্কী সৈন্য ও সেনাপতিদের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব তাঁহার নিজের ও বংশের ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি আরব নেতাদের মনস্তুষ্টি বিধান করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে তুর্কী ও অন্যান্য উপজাতীয় লোকদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা খর্ব করিতে পারিতেন। তাঁহার সময়ে মামুনের ধর্ম সম্বন্ধীয় নীতি নিষ্ঠার সহিত পালন করা হয়। তিনি ভ্রাতার মত জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তবে মামুনের মতই মুতাজিলা মতবাদ ব্যতীত অন্য কোন মত বরদাশত করা হইত না। মুতাসিমের সময় পুনরায় ইবন হাম্বলকে বন্দী করা হয় এবং তাঁহার উপর শারীরিক নির্যাতন চালান হয়। পক্ষান্তরে মুতাসিমের দয়া ও মহানুভবতার দৃষ্টান্ত হিসাবে একটি ক্ষুদ্র অথচ প্রাণস্পর্শী ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। এক দরিদ্র বৃদ্ধ কৃষক একদা তাহার মাল বোঝাই গর্দভসহ পথিপার্শ্বস্থ পানি ও পঙ্কে পতিত হইল। খলীফা তাঁহার অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া রাজকীয় পোশাকে কাদামাটি মাখিয়া বৃদ্ধকে সাহায্য করিবার জন্য আগাইয়া আসিলেন।

মুতাসিমের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ওয়াসিক খলীফা হইলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বাইজান্টাইনদের সহিত মুসলমানদের বন্দী বিনিময় হয়।

ওয়াসিক
৮৪২-৮৪৭
খ্রীঃ

এই বন্দী বিনিময়ের ফলে ৫000 মুসলিম নরনারী মুক্তিলাভ করে। ওয়াসিকের সময় তাঁহার পিতা ও পিতৃব্যের মুতাজিলা সমর্থন ও বিপরীতপন্থীদের নির্যাতন নীতি অক্ষুণ্ন থাকে। বাগদাদের জনসাধারণ মুতাজিলাবাদের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন ছিল। আহমদ ইবন নাসর নামক একজন সূফীর নেতৃত্বে বাগদাদে এক বিপুল জনতা সরকারের ধর্মনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য শোভাযাত্রার দিন ধার্য করিল। কিন্তু ইহার পূর্বেই আহমদকে খলীফার নিকট দরবারে

বন্দী করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তাঁহাকে মুতাজিলা মতবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় এবং তিনি মুতাজিলাদের প্রতিটি নীতির বিরোধিতা করিলে কাজীদের বিচারে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

ওয়াসিকের রাজত্বকালে আর উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন ঘটনাই নাই। তাঁহার সময়েও তুর্কীদের প্রাধান্য অপ্রতিহত থাকে। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আব্বাসীয়দের গৌরবময় যুগের অবসান হয়।

মুতাওয়াক্কিল (৮৪৭—৮৬১ খ্রীঃ) :

৮৪৭ সালে ওয়াসিকের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা মুতাওয়াক্কিল খলীফা হইলেন। মুতাওয়াক্কিল পনর বৎসর পর্যন্ত খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সময়ে আব্বাসীয় খিলাফতের অবনতি আরম্ভ হয়। তাঁহার রাজত্বকালে পূর্ববর্তী তিন খলীফার ধর্মনীতি, মুতাজিলা মতবাদের সমর্থন ও বিপরীত মতাবলম্বীদের নিগ্রহ ও নিপীড়ন প্রত্যাহৃত হইল এবং সনাতনপন্থীদের মতামত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। শুধু তাহাই নহে, মুতাওয়াক্কিল মুতাজিলাদের নির্যাতন আরম্ভ করিলেন। তিনি এক ফরমান জারী করিয়া মুতাজিলা মতবাদ পোষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মুতাজিলা মতাবলম্বী আলিম ও সরকারী কর্মচারিগণকে চাকুরী হারাইতে হইল এবং তাঁহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল। বিখ্যাত আলিম ও কাজী ইবন আবি দুয়াদ পূর্ববর্তী তিন খলীফার আমলে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও মুতাজিলী মতবাদের জন্য প্রধান কাজীর পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন। মুতাওয়াক্কিল তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি তাঁহার ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহাকে পরিবারের অন্যান্য লোকজনসহ কারারুদ্ধ করেন। কয়েক বৎসর পর কারাগারেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

খলীফা ওয়াসিকের রাজত্বকালে সনাতনপন্থী আহমদ ইবন নাসর তাঁহার ধর্মমতের জন্য জীবনদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে মুতাওয়াক্কিল নাসরের দেহাবশেষ সামাররা হইতে বাগদাদে আনয়ন করিয়া সসম্মানে কবরস্থ করিলেন। অসংখ্য জনতা এই ধর্মনেতার মর-অবশেষ স্পর্শ করিবার জন্য সমবেত হইল এবং বাগদাদে এক নূতন ধর্ম-উন্মাদনার সৃষ্টি হইল। এইভাবে পুরাতনপন্থীদের জয়জয়কার সূচিত হইল। বস্তুতঃ মামুন ও তাঁহার দুইজন উত্তরাধিকারীর অসহিষ্ণু মনোভাব মুতাওয়াক্কিলের আমলে যে উন্মাদনার সৃষ্টি করিল, তাহা আর একটি নিপীড়ন নীতির জন্ম দিল।

মামুনের সময় হইতে আলীর (রাঃ) বংশধরদের প্রতি উদার নীতি অবলম্বন করা হয়। মুতাওয়াক্কিল এই নীতিরও পরিবর্তন করেন। তিনি প্রকাশ্যে আলীর (রাঃ) স্মৃতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। তিনি কারবালায় আলীর (রাঃ) পুত্র হুসায়নের সমাধিকে ধূলিসাৎ করিয়া দেন এবং ঐখানে তীর্থযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া অমান্যকারীকে কারাবাসের ভয় প্রদর্শন করিলেন। ফাদাকবাগ—যাহা মারওয়ান কর্তৃক রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) বংশধরের নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় উমর কর্তৃক প্রত্যর্পণ করা হইয়াছিল—পুনরায় সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল। তিনি প্রথম তিন খলীফাকে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। আবূ বকর, (রাঃ), উমর (রাঃ) ও আয়েশা সম্পর্কে নিন্দাসূচক মন্তব্য করায় এক ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। তিনি উমাইয়া শাসকদেরও সম্মান করিতেন।

তাঁহার রাজত্বে ইহুদী ও খ্রীস্টানদের প্রতি নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। তাহাদের জন্য অশ্বারোহণ নিষিদ্ধ করা হয়। তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদে ও বাড়ীর দরজায় বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করিতে হইত। অধিকন্তু তাহাদিগকে রাজকার্যে নিযুক্ত করা হইত না।

তাঁহার সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ ও অরাজকতা দেখা দেয়। সিজিস্তানে সাফ্‌ফারীয় বংশ তাহিরীয় বংশের শাসনাবসান ঘটাইল। আজরবাইজানে বিদ্রোহ দেখা দিল। মিসরে আলীবাবা নামক স্থানীয় নেতার অধীনে বিদ্রোহ দেখা যায়। এই বিদ্রোহ পরে প্রশমিত হয়। আর্মিনিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দিলে বোগা নামক সেনাপতি কর্তৃক বিদ্রোহ দমন করা হয়। এশিয়া মাইনরে গ্রীকগণ প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া হাজার হাজার লোককে বন্দী করিল এবং সম্রাজ্ঞী থিওডোরার আদেশে কয়েক সহস্র বন্দীকে হত্যা করা হইল। কেবলমাত্র যাহারা খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হইল, তাহাদিগকে হত্যা করা হয় নাই।

এই খলীফা বার বৎসর সামাররায় অবস্থান করিয়া দামিস্কে রাজধানী সরাইতে মনস্থ করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, সেখানে গিয়া তিনি সিরীয়াবাসীদের বন্ধুত্ব অর্জন করিবেন এবং তুর্কী সেনাবাহিনীর দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। কিন্তু দামিস্কে দুই মাস অবস্থান করিয়া তিনি সেখানকার আবহাওয়া পছন্দ করিতে পারিলেন না এবং পুনরায় সামাররায় ফিরিয়া আসিলেন। মুতাওয়াক্কিল তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে সামাররায় নিকটে বহু অর্থ ব্যয়ে নদীর তীরে জাফরিয়া নামক একটি নগর নির্মাণ

করিয়া সেখানে 'মোতি' প্রাসাদ এবং 'আনন্দ ভবন' নির্মাণ করেন। ইহার চতুর্দিকে সুরম্য বাগান ও জলস্রোত তৈয়ার করা হয় এবং এখানে গান-বাজনা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়।

মুতাওয়াক্কিলের জ্যেষ্ঠপুত্র মুন্তাসির পিতার ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিলেন না। কারণ খলীফা তাঁহার দ্বিতীয়পুত্র মুতাজের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। ইহার ফলে মুন্তাসির তুর্কী সেনপতিদের সহিত চক্রান্ত কবিয়া পিতাকে হত্যা করেন (৮৬১ খ্রী:)।

বিস্তারিত পাঠ্য তালিকা

মুুর, কলিফেট
আমীর আলী, হিস্ট্রি অব দি সারাসেন্স্



৩০

শেষ আব্বাসীয় খলীফাগণঃ মুন্তাসির হইতে মুত্তাকী পর্যন্ত

(৮৬১—৯৪৪)

মুতাওয়াক্কিলের পুত্র মুন্তাসির (৮৬১-৬২ খ্রীঃ) তাঁহার ছয় মাস শাসনের সময় হাসান ও হুসায়নের সমাধিতে তীর্থযাত্রার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া অনেকের প্রশংসা অর্জন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তুর্কী দলপতিগণ মুতাসিমের এক পৌত্র মুস্তায়ীনকে (৮৬২—৮৬৬ খ্রীঃ) খলীফা মনোনীত করেন। মুস্তায়ীন তুর্কী দেহরক্ষীদের নির্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া বাগদাদে পলায়ন করেন। তুর্কীরা মুতাওয়াক্কিলের দ্বিতীয় পুত্র মু'তাজকে খলীফা বলিয়া ঘোষণা করে। মুতাজ (৮৬৬—৮৬৯ খ্রীঃ) তুর্কী সৈন্যদের বেতনের দাবী মিটাইতে না পারায় তাহারা খলীফার সচিব ও উজীরদের বন্দী করে। কিন্তু রাজকোষ শূন্য হওয়ায় নিরাশ হইয়া পুনরায় খলীফার নিকট ৫0,000 দীনার দাবী করিল। খলীফা রাজমাতার নিকট এই অর্থ চাহিয়া নিরাশ হইলেন। এই সময় রাজমাতার নিকট বহু অর্থ ও মূল্যবান অলংকারাদি ছিল। পরিশেষে তুর্কী সেনাদল অর্থের জন্য খলীফাকে অপদস্থ করিয়া সিংহাসনচ্যুত করে। অবশেষে কারাগারে তাঁহার মৃত্যু হয়। মু'তাজের সিংহাসনচ্যুতির পর তুর্কী সর্দারগণ ওয়াসিকের এক পুত্রকে মুহতাদি-বিল্লাহ (৮৬৯—৮৭0) উপাধি দিয়া খিলাফতের আসনে বসাইল। তিনিও এক বৎসরকাল রাজত্ব করার পর সিংহাসনচ্যুত হইলেন এবং কারাগারে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

মুহতাদির সিংহাসনচ্যুতির পর নেতৃস্থানীয় সভাসদগণ মুতাওয়াক্কিলের জীবিত পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠজনকে মু'তামিদ (৮৭0—৮৯২) উপাধি দিয়া খলীফার পদে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি নিজে দুর্বল হইলেও তাঁহার ভ্রাতা মুওয়াফফাক বিশেষ দক্ষতা ও সামরিক প্রতিভার পরিচয় দেন। তিনিই প্রকৃত শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন। মুতামিদের রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা দক্ষিণ ইরাক ও দক্ষিণ-পশ্চিম পারস্যের নিগ্রো বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ জাঞ্জ বিদ্রোহ নামে খ্যাত। মুতাজের রাজত্বকালে আরম্ভ হইয়া এই ভয়াবহ বিদ্রোহ প্রায়

জাঞ্জ বিদ্রোহ (৮৬৯-৮৮৩)

আব্বাসীয় খিলাফত (নবম শতাব্দী)

বিলাদুর-রূম
বাহার-রূম
আল-ফুস্তাত
মিসর
বাহার-খাযার
আরব-বাইযান
বারকা
হামাদান
নিসাবুর
আল-জিবাল
বাগদাদ
ইরাক
খুযিস্তান
কুহিস্তান
সিজিস্তান
গজনী
কান্দাহার
সুগদ
খুরাসান
ফারিস
কিরমান
মাকরান
বাহার-ফারিস
উমান
মদিনা
মক্কা
আরব
বাহার-হিন্দ
বাহার-আদান

প্রধান প্রদেশ ও
রাজপথ সমূহ
সীমানা
রাস্তা

মাইল
0 100 200 300 400 500

আব্বাসীয় খিলাফত (নবম শতাব্দী)

পনর বৎসরকাল স্থায়ী হইয়াছিল। আফ্রিকা হইতে আগত এই সকল নিগ্রো ক্রীতদাস দক্ষিণ ইরাকের জলাভূমি অঞ্চলে লবণ তৈরীর কাজে নিয়োজিত হইয়াছিল। হাজার হাজার নিগ্রো শ্রমিক নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও সামান্য আটা, সুজি ও খেজুরের বিনিময়ে কঠোর পরিশ্রম করিত। আলী ইবন মুহম্মদ নামক একজন পারসিক হযরত আলীর (রাঃ) বংশধর বলিয়া নিজেকে পরিচয় দিলেন এবং বসরার লবণ কারখানায় নিগ্রো ক্রীতদাসদের মধ্যে প্রচারণা আরম্ভ করিলেন। তিনি ক্রীতদাসগণকে তাহাদের শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করাইয়া দিয়া নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিলেন। দূর-দূরান্ত হইতে ক্রীতদাসগণ আসিয়া তাঁহার দলে যোগদান করিল। তাঁহার আন্দোলন কোন নীতি দ্বারা পরিচালিত হয় নাই বরং তাঁহার অনুচরগণ যথেচ্ছ ব্যবহার ও অনাচারের অনুমতি প্রাপ্ত হওয়ায় প্রতিপক্ষগণ তাঁহার নাম দিয়াছিল 'খবীস' বা পিশাচ। ৮৬৯ সালে তাহারা বসরা আক্রমণ করিয়া ব্যর্থ হয়। অতঃপর তাহারা জলা অঞ্চলে 'মুখতারা' নামক একটি নূতন ঘাঁটি নির্মাণ করে। ৮৭০ খ্রীস্টাব্দে তাহারা প্রধান সামুদ্রিক বন্দর উবুল্লা দখল করে। অচিরে তাহারা দক্ষিণ-পশ্চিম পারস্য অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে এবং আহওয়াজ শহর দখল করে। তাহারা খলীফা কর্তৃক প্রেরিত একের পর এক সেনাবাহিনীকে পরাজিত করিয়া বন্দীদিগকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে এবং নানা দ্রব্যসম্ভারে, বিশেষতঃ অস্ত্রশস্ত্রে সমৃদ্ধ হয়। দক্ষিণ ইরাক ও দক্ষিণ-পশ্চিম পারস্যের বহু শহর তাহাদের অধিকারে আসে। তাহারা বসরা ও ওয়াসিত লুণ্ঠন করিয়া বাগদাদের সতর মাইলের মধ্যে পৌঁছিয়া যায়। খলীফার ভ্রাতা মুওয়াফফাক বহু অর্থব্যয়ে এক বিরাট সেনাবাহিনী গঠন করিয়া বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ৮৮১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে মুওয়াফফাক জাঞ্জগণকে বিতাড়িত করিয়া মুখতারায় আশ্রয় লইতে বাধ্য করেন। দীর্ঘদিন অবরোধের পর ৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ই আগস্ট মুখতারা অধিকৃত হয় ও বিদ্রোহী নেতা আলী নিহত হন। অগণিত স্ত্রীলোককে উদ্ধার করিয়া নিজ নিজ গৃহে প্রেরণ করা হয়।

৮৯২ খ্রীস্টাব্দে মুতামিদের মৃত্যুর পর মুওয়াফফাকের পুত্র মুতাদিদ (৮৯২—৯০২) খলীফা হইলেন। তাঁহাকে দ্বিতীয় সাফ্ফাহ বলা হয়; কারণ তিনি দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু আব্বাসী সাম্রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। তাঁহার আমলে আহমদ ইবন তুলুনের পুত্র খুমারা ওয়াইহ্

বার্ষিক একলক্ষ দীনার কর দানের বিনিময়ে মিসরের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন। তাঁহার কন্যা কাতরুন-নাদাকে খলীফা উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। তাঁহার সময় রাজধানী পুনরায় সামাররা হইতে বাগদাদে স্থানান্তরিত হয় (৮৯৪ খ্রীঃ)। তিনি রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য সৌর বৎসরের হিসাব মত আন-নওরোজ-আল মুতাদিদী বা মুতাদিদী নববর্ষের প্রবর্তন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে আফ্রিকায় ফাতিমীয়গণের অভ্যুত্থান ঘটে এবং সাম্যবাদী

কারমাতী

কারমাতীদের আবির্ভাব হয়। কারমাতীগণ সমগ্র আরব, সিরিয়া ও ইরাক লুণ্ঠন করিয়া মুসলিম জগতে ধ্বংস ও বিপর্যয় আনয়ন করিল। ইহাদের নেতা ছিলেন হামদান কারমাত। তিনি ৮৯০ খ্রীস্টাব্দে কুফার নিকটে দারুল হিজরা নামক একটি আড্ডা তৈরী করেন। কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে তিনি প্রচারণা আরম্ভ করেন। সাম্য ও স্ত্রী জাতিসহ সকল সম্পত্তির সমভোগবাদের উপর স্থাপিত এই গুপ্ত সম্প্রদায় বিরুদ্ধবাদীদের রক্তপাত করিতে কুণ্ঠা বোধ করিত না। আবু সাঈদ আল-হাসান আল-জান্নাবী নামক হামদানের এক শিষ্যের নেতৃত্বে তাহারা পারস্যোপসাগরের পশ্চিম তীরে বাহ্‌রাইনে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে (৮৯৯ খ্রীঃ)। আল আহসায় তাহাদের রাজধানী স্থাপিত হয়। এই স্থান হইতে তাহারা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে লুঠতরাজ ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। ৯০০ খ্রীস্টাব্দে বসরার নিকটে তাহারা খলীফার একটি সেনাবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়।

মুতাদিদের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মুকতাফী (৯০২—৯০৮) খলীফা হইলেন। তাঁহার রাজত্বকালে মিসর সরাসরি খলীফার অধীনে আসে। গ্রীকদের সহিত যুদ্ধেও তিনি কৃতকার্য হন এবং কারমাতীদের সহিতও তাঁহার রাজত্বকালে একাধিক যুদ্ধ হয়। জিক্‌রাওয়াইহ নামক তাহাদের নেতা কূফা ও বসরার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ওঁৎ পাতিয়া হজযাত্রীদিগকে হত্যা করিত। খলীফা তুর্কী নেতা ওয়াসিফকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। জিকরাওয়াইহ গুরুতররূপে আহত হইয়া বন্দী হইল এবং বাগদাদে পৌঁছিবার পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। মুকতাফীর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা মুকতাদির খলীফা হইলেন।

মুকতাদিরের পঁচিশ বৎসরের রাজত্বকালে (৯০৮—৯৩২) তেরজন উজীরের উত্থান-পতন ঘটে। ইঁহাদের কয়েকজনকে হত্যাও করা হয়।

ইবন মুকলা নামক একজন উজীর আরবী খুশখতের (Calligraphy) জন্মদাতা। অপর উজীর আলী ইবন ঈসা দুইবারে পাঁচ বৎসরের জন্য উজীর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই দুর্নীতি ও অত্যাচারের যুগে তিনিই উন্নত চরিত্র ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি মিতব্যয়িতার সাহায্যে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করেন। তাঁহার রাজত্বকালে ফাতিমীয় শাসক উবায়দুল্লাহ্ উত্তর আফ্রিকায় ও উমাইয়া শাসক তৃতীয় আবদুর রহমান স্পেনে খলীফা উপাধি গ্রহণ করেন। এইভাবে সর্বপ্রথম একই সঙ্গে মুসলিম জগতে তিনজন খলীফা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে নিজ নিজ অঞ্চলে খলীফা বলিয়া স্বীকৃত হন। দুর্বল ও অযোগ্য খলীফা মুকতাদির তাঁহার দেহরক্ষীদের প্রধান মুনিসের হাতে রাজ্যের সমুদয় ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে 'আমীরুল উমারা' উপাধি দান করেন। মুনিস একজন খোজা ছিলেন। ৯১৭ খ্রীস্টাব্দে বাইজান্টাইন সম্রাজ্ঞী জো (Zoe) মুকতাদিরের দরবারে দুইজন দূত প্রেরণ করেন। এই দূতগণকে সাড়ম্বরে ও জাঁকজমকের সহিত অভ্যর্থনা করা হয়। একটি যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষর ও মুসলমান বন্দীদের মুক্তি এই দূতগণের মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়। মুনিসের তত্ত্বাবধানে সীমান্তে ১২০০০০ দীনার ব্যয়ে মুসলমান বন্দীদিগকে মুক্তিদান করা হয়। ইহার পর বৎসর বাগদাদে মুকতাদিরিয়া হাসপাতালের উদ্বোধন করা হয়। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না; কারণ ঐ বৎসরই খলীফা তাঁহার উজীর ইবন ফুরাতকে সৈন্যদিগের বেতনের সংস্থান করিতে না পারায় কারারুদ্ধ করেন। মুকতাদিরের রাজত্বের শেষ ভাগে তাঁহার মাতাও রাজকার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন। তিনি ফরমান ও আইন-কানুন জারী করিতেন এবং শুক্রবার-দিন কাজী ও সভাসদগণকে লইয়া দরবারে বসিতেন। কিন্তু মুনিসের ক্ষমতা দিন দিন বাড়িয়া যায়। একবার খলীফা মন্ত্রীদের প্ররোচনায় মুনিসের বিরুদ্ধাচরণ করিলে মুনিসের লোকেরা খলীফাকে হত্যা করে (৯৩২ খ্রীঃ)।

মুকতাদিরের মৃত্যুর পর সভাসদগণ তাঁহার এক ভ্রাতা কাহিরকে খলীফা করিলেন। তিনি নিষ্ঠুর ও দুশ্চরিত্র ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে দুই দলের সভাসদগণের মধ্যে কলহের ফলে মুনিস নিহত হন এবং পরে সভাসদগণ খলীফাকেও অন্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন। পরবর্তী জীবনে কাহিরকে বাগদাদের রাস্তায় ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে

দেখা যায়। ইহার পর তুর্কী আমীরগণ মুকতাদিরের পুত্র আর-রাদী বিল্লাহকে (৯৩৪--৪০) খলীফা মনোনীত করেন। তাঁহার রাজত্বকালে প্রদেশগুলি একের পর এক স্বাধীন হইতে থাকে। প্রদেশসমূহ হইতে রাজস্ব আমদানী বন্ধ হইয়া যায়। উজীরগণ অর্থাভাবে শাসনকার্য চালাইতে অক্ষম হন। তাঁহার রাজত্বকালের ৩২৪ হিজরীর (৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের) ঘটনাবলী বর্ণনা করিতে গিয়া ঐতিহাসিক বলেন:

'ফারস আলী ইবন বুওয়াইহের অধীনে চলিয়া যায়, ইস্পাহান ও জিবাল হাসান ইবন বুওয়াইহের হাতে, জজিরা হামদানীদের হাতে, মিসর ও সিরিয়া ইখশীদীগণের হাতে, আন্দালুস উমাইয়া আবদুর রহমানের অধীনে, খুরাসান সামানীদের অধীনে এবং তাবারিস্তান ও দায়লাম দায়লামীদের অধীনে চলিয়া যায়। কেবলমাত্র মদীনাতুস-সালাম খলীফার হাতে রহিল।'*

কিন্তু মদীনাতুস-সালাম বা বাগদাদেও খলীফার কর্তৃত্ব অব্যাহত রহিল না; কারণ ঐ বৎসরই উজীরগণ অর্থাভাবে শাসনকার্য চালাইতে অপারগ হইলে খলীফা মুহম্মদ ইবন রাইক নামক বসরা ও ওয়াসিতের শাসনকর্তাকে বাগদাদে আহ্বান করেন এবং তাঁহাকে 'আমীরুল-উমারা' উপাধি দিয়া সৈন্যবাহিনী ও রাজস্বের উপর সর্বক্ষমতা দান করেন। অধিকন্তু এখন হইতে খুৎবায় খলীফার নামের সহিত তাঁহার নামও যুক্ত হইল। ৯৪০ খ্রীস্টাব্দে আর-রাদীর মৃত্যু হয়। তাঁহাকে শেষ প্রকৃত খলীফা বলা হয়। কারণ তিনি জুমার খুৎবা স্বয়ং পড়িতেন, আলিম-উলামার সঙ্গে সমস্যাবলী আলোচনা করিতেন, গরীব-দুঃখীদের মধ্যে দান-খয়রাত করিতেন এবং অত্যাচারী কর্মচারীদের নিষ্ঠুরতা লাঘব করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনিই শেষ খলীফা, যাঁহার কবিতা রক্ষিত হইয়াছে। এই সকল কবিতায় গভীর ধর্মভাব, পার্থিব সকল বস্তুর নশ্বরতা ও মানবীয় পদ-মর্যাদার স্থিতিহীনতা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে খলীফার পদ-মর্যাদা ও প্রতিপত্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। এখন হইতে আমীরুল-উমারা সকল কাজে সর্বেসর্বা হইলেন এবং ইচ্ছামত খলীফাকে সিংহাসনে বসাইতে ও সিংহাসনচ্যুত করিতে লাগিলেন।

রাদীর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা মুত্তাকী খলীফা হইলেন। তাঁহার সময় আমীরুল উমারা পদ লাভের জন্য বহু লোকের মধ্যে প্রতিযোগিতা

---

* ইবনুল জওযী।

আরম্ভ হয়; কারণ আমীরুল উমারা হওয়ার অর্থ খলীফাকে হাতের মুঠিতে রাখিয়া যাবতীয় ক্ষমতা দখল করা। নিষ্ঠুর তুর্কী আমীরুল উমারা তুজুন মুত্তাকীকে অন্ধ ও সিংহাসনচ্যুত করেন (৯৪৪)। অতঃপর তুজুন মুত্তাকীর ভ্রাতা মুস্তাকফীকে খলীফার পদে অধিষ্ঠিত করিলেন।

৩১

স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব: (১) পশ্চিমাঞ্চলে

আব্বাসীয় যুগে সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে খলীফার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রথম হইতেই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে। সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে যে-সকল রাজবংশের উদ্ভব হয়, সেইগুলি ছিল প্রধানতঃ আরব। অনুরূপ সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলেও বহু ছোট-বড় স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হয়। এইগুলি পারসিক অথবা তুর্কী বংশের লোকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা প্রথমে পশ্চিমাঞ্চলের স্বাধীন রাজবংশগুলির উল্লেখ করিব।

স্পেন

আব্বাসীয়গণের দামিস্ক অধিকারের (২৬শে এপ্রিল, ৭৫০ খ্রীঃ) ঠিক ছয় বৎসর পরে (১৪ই মে, ৭৫৬ খ্রীঃ) পতিত উমাইয়া রাজবংশের একজন যুবরাজ স্পেনে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। আমরা ৪১ অধ্যায়ে এই রাজবংশ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এইভাবে আব্বাসীয় বংশের জন্মকাল হইতেই বিকেন্দ্রণ আরম্ভ হয়।

ইদ্রিসী বংশ

ইদ্রিস ইবন আবদুল্লাহ নামক হাসানের এক প্রপৌত্র ৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে মদীনায় বিদ্রোহী হইয়া মরক্কোতে পলায়ন করেন এবং সেখানে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই ইতিহাসে প্রথম শীয়া রাজবংশ। দুই শতাব্দী ধরিয়া (৭৮৮—৯৭৪) ইদ্রিসীবংশ নামে অভিহিত এই রাজবংশ ফাস (ফেজ) হইতে রাজত্ব করিতে থাকে। স্পেনের খলীফা দ্বিতীয় হাকামের আমলে এই বংশের পতন ঘটে।

আগলবী বংশ

উত্তর আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলে যেমন ইদ্রিসী বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, সেইরূপ ইহার পূর্বাঞ্চলে সুন্নীগণ আগলবী বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিল। প্রথমে হারূনুর রশীদ ইব্রাহীম ইবন আগলবকে ৮০০ খ্রীস্টাব্দে ইফ্রিকিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করেন। ইবন আগলব স্বাধীনভাবেই ইফ্রিকিয়া শাসন করিতে থাকেন। এই বংশের শাসনকর্তাগণ আমীর উপাধি গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের রাজধানী কায়রাওয়ান হইতে এক শতাব্দীর অধিককাল (৮০০—৯০৯) ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া

সুগঠিত নৌবহরের সাহায্যে ইটালী, ফ্রান্স, কর্সিকা ও সার্ডিনিয়ার উপকূলে নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। ৯০২ খ্রীস্টাব্দে ইঁহারা সিসিলি অধিকার করেন। এই যুগে দুঃসাহসিক মুসলমানগণ মাল্টা ও সার্ডিনিয়া অধিকার করে। এথেন্সে প্রাপ্ত তিনটি লিপি হইতে জানা যায় যে, সেখানেও একটি আরব উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। এই বংশের জিয়াদাতুল্লাহ ও তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় ইব্রাহীম কায়রোয়ানের বিখ্যাত মসজিদ নির্মাণ করেন। আগলবী শাসনামলে ইফ্রিকিয়া লাটিন-ভাষাভাষী খ্রীস্ট দেশ হইতে আরবী-ভাষাভাষী মুসলমান দেশে রূপান্তরিত হয়। আগলবী বংশের তৃতীয় জিয়াদাতুল্লাহ ৯০৯ খ্রীস্টাব্দে ফাতিমীয়দের আগমনের ফলে পলায়নপর হইলেন। তিনিই শেষ আগলবী আমীর।

তুলুনী বংশ

এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ ইবন তুলুন তুর্কী ছিলেন। ৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি মিসরের গভর্নরের সহকারী হিসাবে বাগদাদ হইতে মিসরে গমন করেন। শীঘ্রই তিনি সেখানে স্বাধীনভাবে শাসন করিতে আরম্ভ করেন। ৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে সিরিয়ার গভর্নরের মৃত্যু হইলে আহমদ বিনা বাধায় সিরিয়া দখল করেন। তখন হইতে বহু শতাব্দী ধরিয়া সিরিয়া মিসরের অধীন থাকে। আহমদ সেচ ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করেন এবং রাজধানী ফুস্তাতকে সুরম্য অট্টালিকায় সুশোভিত করেন। তাঁহার নির্মিত বিমারিস্তান (হাসপাতাল) ও জামে মসজিদ বিখ্যাত। আহমদের পুত্র খুমারাওয়াইহ একটি 'সুবর্ণ ভবন' নির্মাণ করিয়া প্রাচীরগাত্রে তাঁহার নিজের ও পরিবারের অন্যান্য লোকদের পূর্ণাঙ্গ ছবি দ্বারা সুসজ্জিত করেন। এই প্রাসাদের চতুর্দিকে ছিল সুগন্ধী ফুলের বাগান। তিনি একটি পশুশালা ও পক্ষীশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি খলীফা মুতাদিদের সহিত তাঁহার মেয়ে কাতরুন্নাদার (শিশির কণা) বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বংশের চতুর্থ শাসক শায়বানের সময় মিসর পুনরায় আব্বাসীয়দের শাসনাধীনে চলিয়া যায়।

ইখশীদী বংশ

ইহার পর মিসর ও সিরিয়ায় ইখশীদী নামক অপর একটি তুর্কী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের স্থাপয়িতা মুহম্মদ ইবন তুগজ ৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে খলীফা রাদীর নিকট হইতে ইরানী 'ইখশীদ' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইখশীদ অতঃপর সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের উপর নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পর তিনি মক্কা ও মদীনা শহরদ্বয় তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। মুহম্মদ ইবন তুগজ ইখশীদের উত্তরাধিকারী দুই পুত্রের

শাসনামলে হাবশী খোজা কাফুরই সকল ক্ষমতার মালিক হইলেন। তিনি মিসর ও সিরিয়াকে হামদানীদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। শেষ ইখশীদী শাসক আবুল ফাওয়ারিস আহমদ ৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে ফাতিমীয় সেনাপতি জওহরের হাতে পরাজিত হইলে তাঁহার রাজ্য ফাতিমীয়দের অধীনে চলিয়া যায়।

হামদানী বংশ

হামদানী বংশ প্রথমে উত্তর মেসোপটেমিয়ায় স্থাপিত হয়। তখন ইঁহাদের রাজধানী ছিল মসুলে। ইঁহারা শীয়া ছিলেন। ৯০৪ খ্রীস্টাব্দে আবদুল্লাহ ইবন হামদান মসুলের গভর্নর নিযুক্ত হন। তখন হইতে এই বংশের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই বংশের আরও অনেকে উত্তর মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে ছোটখাট জায়গার শাসনভার প্রাপ্ত হন। আবদুল্লাহ তাঁহার পুত্র হাসানকে মসুলে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হাসান মসুলসহ দিয়ার রাবিয়া ও দিয়ার বকর শাসন করিতে থাকেন। তাঁহার ভ্রাতা আলী ৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে ইখশীদীগণের নিকট হইতে আলেপ্পো ও হিমস্ দখল করিয়া সেখানে প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। বাগদাদে বুওয়াইহী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে বিভিন্ন দুঃসাহসিক ব্যক্তির মধ্যে যে ক্ষমতার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, তখন হাসান ও আলী বাগদাদ দখল করিয়া সেখানে তাঁহাদের প্রভুত্ব স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ৯৪১ খ্রীস্টাব্দে তাঁহারা বাগদাদ দখল করেন এবং খলীফা মুত্তাকী হাসানকে আমীরুল উমারা নিযুক্ত করেন। তিনি হাসানকে নাসিরুদ্দৌলাহ্ ও আলীকে সায়ফুদ্দৌলাহ্ উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু তুর্কী আমীর তুজুন হামদানী ভ্রাতৃদ্বয়কে বাগদাদ হইতে বিতাড়িত করেন। ৯৭৯--৮০ খ্রীস্টাব্দে দিয়ার বকর, দিয়ার রবীয়া ও দিয়ার মুদার বুওয়াইহী আদদুদ্দৌলা কর্তৃক অধিকৃত হয় এবং সায়ফুদ্দৌলার পৌত্র সাঈদুদ্দৌলা ফাতিমীয়গণের অধীনতা স্বীকার করেন (১০০৩ খ্রীঃ)।

এই বংশের সায়ফুদ্দৌলা গ্রীকদের সহিত যুদ্ধে খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু তিনি কবি, দার্শনিক ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে সমধিক প্রসিদ্ধ। দার্শনিক আল-ফারাবী, সাহিত্যিক আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী ও ইবন নুবাতা, কবি মুতানাব্বী ও হামদানী তাঁহার দরবার অলংকৃত করিয়াছিলেন। ইস্পাহানী তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুল-আগানী সায়ফুদ্দৌলার জন্যই রচনা করিয়াছিলেন।

৩২

স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব: (২) পূর্বাঞ্চলে

পূর্বাঞ্চলে প্রথম প্রায়-স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয় মামূনের বিশ্বস্ত সেনাপতি তাহির ইবন হুসায়ন কর্তৃক খুরাসানে। তাহির একচক্ষু বিশিষ্ট ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার উভয় হস্ত যুদ্ধের সময় এত নিপুণতার সহিত ব্যবহার করিতেন যে, খলীফা মামূন তাঁহাকে 'সব্যসাচী' বলিয়া অভিহিত করেন এবং ৮২০ খ্রীস্টাব্দে তাঁহাকে বাগদাদের পূর্ববর্তী সকল অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ পাক-ভারত সীমান্ত পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া নিশাপুর হইতে খলীফার নিয়োগপত্রের বলে কার্যতঃ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। ৮৭২ খ্রীস্টাব্দে সাফফারী বংশের ইয়াকুব তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করিয়া লন।

তাহিরী বংশ

এই বংশের স্থাপয়িতা ইয়াকুব সিজিস্তানের (সিস্তানে) গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন কর্মকার (সাফফার: তাম্রকার)। তিনি সিজিস্তানে একদল দস্যুশ্রেণীর লোকের নেতা হিসাবে তাঁহার দুঃসাহসিকতা ও সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন এবং সিজিস্তানের গভর্নর কর্তৃক সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। পরে তিনি গভর্নরপদে নিযুক্ত হন এবং হিরাত ও ফারস (শিরাজসহ) স্বীয় অধিকারভুক্ত করেন। ৮৭২ খ্রীস্টাব্দে ইয়াকুব খুরাসান দখল করেন। তিনি তাবারিস্তানে একটি যুদ্ধাভিযান প্রেরণ করিয়া আলীর (রাঃ) বংশের হাসান ইবন জায়দকে পরাজিত করিয়া খলীফা মুতামিদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি শিরাজ ও আহওয়াজ অতিক্রম করিয়া বাগদাদের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু খলীফার ভ্রাতা মুওয়াফ্ফাক কর্তৃক পরাজিত হন। ৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে ইয়াকুবের মৃত্যু হয়। তাঁহার ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী আমর খলীফা কর্তৃক খুরাসান, ফারস, কুর্দিস্তান ও সিজিস্তানের শাসনকর্তা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার ক্রমবর্ধমান শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া খলীফা সামানী বংশের ইসমাঈলকে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে প্ররোচিত করেন (৯০০ খ্রীঃ)। ইহার ফলে আমর পরাজিত ও বন্দী হন। ইহার পর সাফফারীগণের শাসন সিজিস্তানেই সীমাবদ্ধ থাকে।

সাফ্ফারী বংশ

বলখের অধিবাসী সামান নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অগ্নি উপাসকের ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার বংশধরগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই বংশ ১২৫ বৎসর পর্যন্ত ট্র্যান্সঅক্সিয়ানা ও পারস্যে প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। সামানের পৌত্র নাসর (৮৭৪-৮৯২) এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহারা সুন্নী মতাবলম্বী ছিলেন। নাসরের ভ্রাতা ইসমাঈল (৮৯২—৯০৭) সাফফারীয়গণের নিকট হইতে খুরাসান দখল করেন এবং 'দাশত কবীর (বৃহৎ পারসিক মরুভূমি) হইতে পারস্যোপসাগর পর্যন্ত এবং পাক-ভারত সীমান্ত হইতে বাগদাদের নিকট পর্যন্ত' অঞ্চলে তাঁহার ক্ষমতা বিস্তার করেন। দ্বিতীয় নাসরের সময় (৯১৩—৪৩) গুরগান, তাবারিস্তান এবং রাই অঞ্চলেও সামানীদের অধিকার স্থাপিত হয়। সামানীগণ খলীফার আনুগত্য স্বীকার করিলেও কার্যতঃ স্বাধীন ছিলেন। সামানীদের সময় তাঁহাদের রাজধানী বুখারা ও প্রবীণ নগরী সমরকন্দ মুসলিম সভ্যতার গৌরবময় কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে বাগদাদকেও ম্লান ও নিষ্প্রভ করিয়া ফেলে। এই অঞ্চলে আরবী ও ফারসীর চর্চা সমভাবে চলিতে থাকে। বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ আর-রাজী এই বংশের একজন যুবরাজ আবু সালিহ মনসূরের নামে তাঁহার গ্রন্থ আল্‌মনসূরী উৎসর্গ করেন। খ্যাতনামা মনীষী ইবন সীনা এই বংশের শাসক দ্বিতীয় নূহ (৯৭৬—৯৭) কর্তৃক বুখারায় আহূত হইয়া তথাকার সুবিশাল গ্রন্থাগারে আপন জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করেন।

সামানী বংশ

সামানীদের রাজ্যের পশ্চিমে ও পশ্চিম-দক্ষিণে বুওয়াইহীদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সামানী বংশের ক্ষমতা খর্ব হয়। অন্যপক্ষে পারসিক সামানীগণ ক্রমাগত তুর্কী সৈনিকদের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়েন। যক্ষু নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চলে ৯৯৪ খ্রীস্টাব্দে গজনবী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ৯৯২ খ্রীস্টাব্দে তুর্কীস্তানের ইলক খান বুখারা দখল করিলেন এবং নয় বৎসর পরে যক্ষু নদীর উত্তরাঞ্চলেও সামানী বংশের শাসনাবসান ঘটাইলেন।

এই শীয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মারদাবীজ ইবন জিয়ার কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে তাবারিস্তান ও গুর্গাওঁয়ে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া রায়, হামাদান ও ইস্পাহান দখল করেন। বুওয়াইহী ভ্রাতৃদ্বয় আলী ও হাসান (যাঁহারা পরে খলীফা কর্তৃক ইমাদুদ্দৌলাহ ও রুকনুদ্দৌলাহ্ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) মারদাবীজের অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত হন।

জিয়ারী বংশ

মারদাবীজকে তাঁহার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য একাধারে সামানীগণের বিরুদ্ধে ও খলীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। মারদাবীজের স্বপ্নসাধ ছিল খলীফার রাজধানী বাগদাদ দখল করিয়া পুরাতন পারস্য সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু তাঁহার অগণিত তুর্কী সেনাবাহিনী তাঁহার ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া তাঁহাকে 'হাম্মামখানায়' হত্যা করে (৯৩৪ খ্রী:)। তাঁহার ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী ওয়াশমাগীর সামানীগণের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে বুওয়াইহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, কিন্তু তাঁহার রাজ্য তাবারিস্তান ও গুর্গাওঁয়ে সীমাবদ্ধ হয়। ওয়াশমাগীরের পুত্র বিস্তুন বুওয়াইহী আদু-দুদ্দৌলাহের নিকট আপন কন্যার বিবাহ দিয়া তাঁহাদের সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন। বিস্তুনের পুত্র কাবুস বুওয়াইহীদের নিকট পরাজিত হইয়া খুরাসানে সামানী রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আঠার বৎসর পর তিনি গুর্গাওঁয়ে পুনঃপ্রবেশ করেন। সামানী আমীর আল-মুন্তাসির ইলক খান কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া কাবুসের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কাবুস পুত্র মিনুচিহরের নিকট শাসনভার দিয়া অবসর গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনিও বিক্ষুব্ধ সেনাদলের হাতে নিহত হন (১০১২)। কাবুস আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। গদ্যে ও পদ্যে তিনি সমভাবে দক্ষ ছিলেন। বিখ্যাত মনীষী আবু রায়হান আল-বিরুনী কাবুসের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ আল-আসার কাবুসের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কাবুসের পুত্র মিনুচিহর এবং পৌত্র আনুশিরওয়ান গজনীর সুলতান মাহমুদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া গুর্গাওঁয়ে ও তাবারিস্তানে রাজত্ব করিতে থাকেন। মিনুচিহর সুলতান মাহমুদের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সলজুকদের শাসন উক্ত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই বংশের শাসকগণ গুর্গাওঁয়ের পার্বত্য অঞ্চলে সামান্য একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসক হিসাবে ১০৯০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ঐ বৎসর হাসান সাবা' কর্তৃক এই বংশের অবসান ঘটে। এই বংশের কায়কাউস নামক একজন শাসক তৎপুত্র গিলান শাহের জন্য একখানি উপদেশ গ্রন্থ 'কাবুসনামা' লিপিবদ্ধ করেন (১০৮২)। এই গ্রন্থে পিতার উপদেশের মাধ্যমে তৎকালীন সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা বিস্তারিত জানা যায়।

যে সব তুর্কী মমলুক (ক্রীতদাস) সামানীদের অধীনে উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে আলপ্তগীন বিখ্যাত ছিলেন। তিনি সামানীদের দেহরক্ষী হিসাবে প্রথমে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি দেহরক্ষী হিসাবে

প্রথম নিযুক্ত হইয়া শীঘ্রই দেহরক্ষীদের প্রধান ও পরে খুরাসানের শাসনকর্তার পদে উন্নীত হন। কিন্তু প্রভুর বিরাগভাজন হইয়া ৯৬২ খ্রীস্টাব্দে আফগানিস্তানের গজনী অধিকার করেন এবং সেখানে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

গজনবী বংশ

গজনবী বংশের প্রকৃত স্থাপয়িতা ছিলেন আলপ্তগীনের মমলূক (দাস) ও জামাতা সবুক্তগীন। এই বংশের পরবর্তী ষোলজন উত্তরাধিকারী সকলেই সবুক্তগীনের অধস্তন পুরুষ। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন সবুক্তগীনের পুত্র মাহমূদ (৯৯৯--১০৩০)।

মাহমূদ সুন্নী মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি দিগ্বিজয়ী বীর, সুশাসক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি যক্ষু নদীর দক্ষিণ তীরে সামানীদের কর্তৃত্বের অবসান ঘটাইলেন এবং বুওয়াইহীদের নিকট হইতে রায় দখল করেন এবং গুর্গাওঁয়ের জিয়ারী শাসককে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। অন্যপক্ষে তিনি বাগদাদের খলীফা আল-কাদির বিল্লাহের নিকট আনুগত্য প্রকাশক পত্রাদি প্রেরণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে 'ইয়ামীনুদ্দৌলাহ ও আমীনুল মিল্লাহ' উপাধি প্রাপ্ত হন। মাহমূদ ১০০১ ও ১০২৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে পাক-ভারত উপমহাদেশে সতরবার যুদ্ধাভিযানে আসেন এবং পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে গজনী শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বিশ্বের খ্যাতনামা সমরনায়কদের সমপর্যায়ভুক্ত। তাঁহার রাজ্য পূর্বে পাঞ্জাব, পশ্চিমে রায়, গুর্গাওঁ, উত্তরে খুরাসান, বলখ ও ট্র্যান্সঅক্সানিয়ার অংশ বিশেষ এবং দক্ষিণে সিজিস্তান লইয়া গঠিত ছিল। তিনি গজনীকে সুরম্য প্রাসাদে সুশোভিত করিয়াছিলেন এবং সেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার দরবারের শান-শওকত ও রাজসিক বদান্যতায় আকৃষ্ট হইয়া এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে কবি ও পাণ্ডিতগণ রাজধানী গজনীতে সমবেত হন। ঐতিহাসিক বায়হাকী ও উৎবী, দার্শনিক আল-ফারাবী, এবং কবি আসজাদী ও ফাররুকী তাঁহার দরবার অলংকৃত করিয়াছিলেন। 'শাহনামা' রচয়িতা কবিশ্রেষ্ঠ ফিরদৌসী এবং বিখ্যাত মনীষী আল-বিরুনী মাহমূদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যে সুখ-শান্তি বিরাজমান ছিল এবং খুরাসান হইতে লাহোর পর্যন্ত পণ্যবাহী কাফেলা নির্বিঘ্নে যাতায়াত করিত। তিনি বিশ্বের নেতৃস্থানীয় রাজা-বাদশাহদের অন্যতম। কালক্রমে সলজুকদের অভ্যুত্থানের ফলে মধ্য-এশিয়ায় গজনবী বংশের ক্ষমতার অবসান

ঘটে। পূর্বাঞ্চলে আফগানিস্তানের গোরবংশীয়গণের অভ্যুত্থানের সাথে সাথে আফগানিস্তান ও তাহাদের হাত হইতে চলিয়া যায়। ১১৮৬ খ্রীস্টাব্দে শেষ গজনবী শাসক খসরু মালিক মুহম্মদ গোরীর নিকট পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হন। দুইশত বৎসরের অধিককাল গজনবীগণ বর্তমান পাকিস্তানে রাজত্ব করেন।

বিস্তারিত পাঠ্য তালিকা

(৩০ ও ৩১ অধ্যায়ের জন্য)

হিট্টি, হিস্ট্রি অব দি এরাব্‌স্‌
মফীজুল্লাহ্‌ কবীর, দি বুওয়াইহিদ ডায়ন্যাস্টি অব বাগদাদ
লেইনপুল, দি মোহাম্মাডান ডায়ন্যাস্টিজ
মফীজুল্লাহ্‌ কবীর, হিস্ট্রি অব দি জিযারিদ্‌স্‌ অব তাবারিস্তান এণ্ড গুর্গান, জার্নেল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ১৯৬০
,, এ শর্ট হিস্ট্রি অব পাকিস্তান, বুক টু।

৩৩

বুওয়াইহী বংশ

(৯৪৬-১০৫৫)

পূর্ববর্তী দুই অধ্যায়ে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে ও পূর্বাঞ্চলে উদ্ভূত স্বাধীন রাজবংশসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এইভাবে উভয়দিক হইতে যখন সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তখন খলীফা মুস্তাকফীর আমলে শীয়া মতাবলম্বী বুওয়াইহীগণ বাগদাদে আসিয়া খলীফার উপর নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। সুন্নী খলীফা শীয়া আমীরদের হাতের ক্রীড়নক হইয়া পড়িলেন। এক শতাব্দীর অধিককাল বাগদাদে বুওয়াইহী অধিকার অক্ষুণ্ন থাকে। বুওয়াইহীগণ ছিলেন কাস্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত দায়লমের অধিবাসী। প্রথম যে তিনজন বুওয়াইহী ভ্রাতা ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহারা ছিলেন আবু শুজা বুওয়াইহ্ নামক একজন সাধারণ মৎস্যজীবীর পুত্র। পরবর্তীকালে বুওয়াইহীগণ প্রাচীন সাসানীয় রাজা বাহরাম গোরের বংশধর বলিয়া দাবী করিতেন।

দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে কয়েকজন দুঃসাহসিক দায়লমী ও গীলানী সমরনেতার আবির্ভাব হয়। ইঁহারা একদিকে বাগদাদের খলীফা ও অপরদিকে খুরাসান ও ট্র্যান্সঅক্সানিয়ার সামানীদের সহিত আপন আপন শক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। প্রথম দুই বুওয়াইহী ভ্রাতা, আলী ও হাসান, জিয়ারী বংশের মারদাবীজের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। কালক্রমে আলী ফারসে এবং হাসান রায় ও ইস্পাহানে প্রাধান্য স্থাপন করেন। তাঁহাদের তৃতীয় ভ্রাতা আহমদ আহওয়াজ (খুজীস্তান) অধিকার করিয়া ওয়াসিতের দিকে অগ্রসর হন। ওয়াসিতের শাসনকর্তা আহমদকে বাগদাদ অধিকার করার জন্য উৎসাহিত করেন। আহমদ ৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী বিনা বাধায় বাগদাদে প্রবেশ করেন। যে-সকল তুর্কী সৈন্য বাগদাদে গোলযোগের সৃষ্টি করিতেছিল, তাহারা বাগদাদ ত্যাগ করিল। খলীফা মুস্তাকফীও ভয়ে আত্মগোপন করিলেন। পরে তিনি আহমদকে 'মুইজুদ্দৌলাহ্' উপাধি দিয়া আমীরুল উমারা নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা আলী ও হাসানকে

যথাক্রমে সম্মানসূচক 'ইমাদুদ্দৌলাহ্' ও 'রুকনুদ্দৌলাহ্' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইতিপূর্বে আমীরুল উমারাদের হাতে পড়িয়া খলীফার কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এক্ষণে শীয়া বুওয়াইহীগণ বংশানুক্রমে বাগদাদে আমীরুল উমারা নিযুক্ত হইয়া খলীফার যাবতীয় রাজনৈতিক ক্ষমতার অবসান ঘটাইলেন। তাঁহারা ধর্মতঃ আব্বাসীয় খলীফাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্য ছিলেন না। এমন কি, মুইজ্জুদ্দৌলাহ্ একবার আব্বাসী খলীফাকে অপসারিত করিয়া একজন আলাবীকে উক্ত পদে নিযুক্ত করার কথাও চিন্তা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ তাঁহাকে উপদেশ দিলেন যে, বর্তমান খলীফার প্রতি তাঁহার ও তাঁহার অনুচর বর্গের বশ্যতা স্বীকার ধর্মতঃ বাধ্যতামূলক নহে; কাজেই তাঁহার অনুচরদের দ্বারা তিনি খলীফার প্রতি যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারিবেন; এমন কি, খলীফাকে হত্যা করিতে বলিলেও তাহারা তাহা শুনিবে। কিন্তু কোন আলাবীকে খলীফা নিযুক্ত করিলে উক্ত খলীফা ঐ সব অনুচরদেরকে প্ররোচিত করিয়া মুইজুদ্দৌলাকেই হত্যা করিতে পারে। অধিকন্তু বাগদাদে ও রাজ্যের অন্যান্য স্থানে সুন্নীদের সংখ্যাই ছিল অনেক বেশী এবং আব্বাসীদের খিলাফতের দাবী সহজে অগ্রাহ্য করা যাইত না।

যে যাহাই হউক, খলীফাকে নামেমাত্র রাখিয়া দিলেও তাঁহার মান-মর্যাদা ক্রমাগত লোপ পাইতে থাকে। বুওয়াইহী আমীরগণ যাঁহাকে ইচ্ছা, খলীফার আসনে বসাইতেন এবং যখন ইচ্ছা, তাঁহাকে পদচ্যুত করিতেন। বাগদাদে প্রবেশের মাত্র এগার দিন পর মুইজুদ্দৌলাহ্ খলীফা মুস্তাকফীকে পদচ্যুত করিয়া মুতা'লিল্লাহ্‌কে খলীফা করিলেন। খলীফা মাত্র একজন বেতনভুক কর্মচারী হইয়া রহিলেন। আমীরুল উমারা ইচ্ছা করিলে এই বেতনও বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন। খলীফার নামের সহিত আমীরের নাম মুদ্রায় অঙ্কিত হইল। খুৎবায়ও খলীফার নামের সহিত আমীরের নাম উল্লেখ করিতে হইত। খলীফার প্রাসাদ-দ্বারে যেমন নহবৎ বাজান হইত, আমীরের প্রাসাদ দ্বারেও সেইরূপ নহবৎ বাজাইবার প্রথা চালু হইল। বুওয়াইহী আমীর আদুদুদ্দৌলাহ্ প্রাচীন সাসানীয় 'শাহান শাহ' উপাধি গ্রহণ করিতেও বিন্দুমাত্র কুন্ঠাবোধ করেন নাই।

বুওয়াইহীদের শাসনামলে ইরাক ও পারস্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ আমীর ছিলেন আদুদুদ্দৌলাহ্ (৯৭৮—৯৮৩)। তাঁহার আমলে বুওয়াইহীদের ক্ষমতা চরমোৎকর্ষ লাভ

করে। রুকনুদ্দৌলাহ্‌র পুত্র আদুদুদ্দৌলাহ্‌ প্রথমে তাঁহার পিতৃব্য ইমাদুদ্দৌলাহ্‌ কর্তৃক ফারসের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। পরে তিনি তাঁহার অপর পিতৃব্য মুইজুদ্দৌলাহ্‌র পুত্র বখতিয়ারকে পরাজিত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ইরাক দখল করেন। তাঁহার ভ্রাতা মু'আইয়িদুদ্দৌলাহ্‌ তাঁহার পক্ষে জিবাল, রায় ও ইস্পাহান শাসন করিতেন। তিনি কুর্দিস্তানের বিদ্রোহী নেতাগণকে পরাজিত করিয়া ঐ অঞ্চলে শান্তি স্থাপন করেন। তিনি হামদানী বংশের নিকট হইতে মসুল, দিয়ার বকর ও দিয়ার রাবিয়া অধিকার করেন। এই-ভাবে উত্তরে কাস্পিয়ান সাগরের তীর হইতে দক্ষিণে পারস্যোপসাগর পর্যন্ত এবং পূর্বে বৃহৎ পারসিক মরুভূমি (দাশ্‌ত কবীর) হইতে পশ্চিমে ফুরাত নদীর অপর পার্শ্ব পর্যন্ত অঞ্চলে তিনি ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। ইয়ামন ও সিজিস্তানের শাসকগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতেন এবং সুদূর সিন্ধু অঞ্চলে তাঁহার নামে খুৎবা পাঠ করা হইত। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আদুদ মুসলমান শাসকদের মধ্যে সর্ব প্রথম প্রাচীন পারসিক 'শাহান শাহ্‌' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার সমসাময়িক মুসলমান-অমুসলমান রাজা-বাদশাহরা তাঁহার সহিত দূত বিনিময় করিয়াছিলেন। মিসরের ফাতিমী-বংশের খলীফা আল-আজীজ এবং বাইজান্টাইন সম্রাট, বাসিল ও কনস্টান্টাইন, তাঁহার দরবারে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সকল দূতকে বহু জাঁকজমক ও আড়ম্বরের সহিত সম্বর্ধনা জানান হয়। ফাতিমী খলীফা আল-আজীজের দূত বাগদাদে আসিলে আদুদুদ্দৌলাহ্‌ এক বিশেষ দরবারের আয়োজন করেন এবং খলীফা আততায়ী আদুদকে রাষ্ট্রের সর্ব ক্ষমতা সমর্পণ করেন। খলীফা বলেন, "আল্লাহ আমার হাতে যে-সকল কর্তব্য ন্যস্ত করিয়াছেন, তাহার সমুদয় আমি আপনাকে সমর্পণ করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছি অর্থাৎ পৃথিবীর পূর্বে ও পশ্চিমে আমার প্রজাগণের সকল ব্যাপার এবং আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি, মালমাত্তা ও গৃহাভ্যন্তরের জিনিসপত্র ব্যতীত সমুদয় রাজ্যের ব্যবস্থাপনা।" এই ঘোষণা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, রাষ্ট্রের প্রকৃত কোন ক্ষমতাই খলীফার হাতে রহিল না। আদুদ তাঁহার এক কন্যাকে খলীফার নিকট বিবাহ দিয়াছিলেন এবং আশা করিয়া-ছিলেন যে, এই মেয়ের ঘরে কোন ছেলে সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে তাহাকে খলীফা করিয়া বুওয়াইহী বংশের সহিত আব্বাসী বংশের সংযোগ ঘটাইবেন।

আদুদ রাজ্যের সমুদয় কাজ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিতেন। বড় বড় রাজা-বাদশাহ্‌দের মত তিনি একটি সুনির্দিষ্ট সময়-তালিকা অনুসারে

গুরুতর রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের সহিত চিত্তবিনোদনকারী লঘু আনন্দ-উৎসবের সমতা বিধান করিতেন। তিনি দানশীল ছিলেন। তাঁহার দরবারে বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়াছিল। যে-সকল পণ্ডিত তাঁহার দরবার অলংকৃত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ব্যাকরণবিদ আবূ আলী আল-ফারসী, জ্যোতির্বিদ আবদুর রহমান সুফী, জ্যোতিষী শরীফ 'ইবনুল-আলাম, অঙ্কশাস্ত্রবিদ আবুল কাসিম এবং বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী আলী ইবন আব্বাস (হালী আব্বাস) সমধিক প্রসিদ্ধ। আলী ইবন আব্বাস আদুদের জন্য তাঁহার বিখ্যাত চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ কিতাবুল-মালিকী (Latin Liber Regius) রচনা করেন। আদুদ বাগদাদে 'বিমারিস্তান-ই-আদুদী' নামক একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে চব্বিশজন খ্যাতনামা চিকিৎসাবিদকে নিযুক্ত করেন। শিরাজে তিনি একটি বিরাট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক বিষয়ে লিখিত যাবতীয় পুস্তক সেখানে সংগ্রহ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত কবি মুতানাব্বী আদুদের প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সভাকবি আস-সালামী ইরাকের সমসাময়িক কবিদের প্রধান বলিয়া বিবেচিত হইতেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবু আলী মিসকাওয়াইহ্ আদুদের সভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার 'তাজাবিরুল উমাম' বুওয়াইহী আমলের বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ। অপর ঐতিহাসিক ইব্রাহীম ইবন হিলাল আস-সাবী 'কিতাবুত-তাজী' নামক বুওয়াইহী বংশের একখানা ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। এই পুস্তকটি এখন আর পাওয়া যায় না; তবে পরবর্তী যুগের অনেক ঐতিহাসিক এই গ্রন্থ হইতে বহু উদ্ধৃতির ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইব্রাহীম আদুদের দবীর ছিলেন এবং তাঁহার লিখিত ঐতিহাসিক চিঠিপত্রের সংগ্রহ হইতে তাঁহার ভাষার পারিপাট্য ও লিখনভঙ্গীর নিদর্শন পাওয়া যায়।

আদুদ নিজেও যথেষ্ট পড়াশুনা করিতেন। তিনি ইউক্লিড ও আবূ আলীর ব্যাকরণ বই মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিতেন। আবুল ফারাজ ইস্পাহানীর 'কিতাবুল আগানী' ঘরে-বাইরে তাঁহার চির সহচর ছিল। তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি-গণের সহিত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতেন। তিনি কবিতা রচনা করিতেন এবং তাঁহার কবিতার নমুনা 'ইয়াতিমা' নামক গ্রন্থে সংরক্ষিত রহিয়াছে।

তিনি স্থাপত্য শিল্পে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। বাগদাদের বাড়ীঘর ও রাস্তাঘাট তাঁহার আদেশে পুনর্নির্মিত হয়। লোকজনকে তাহাদের বাড়ীঘর

সুন্দর করিয়া নির্মাণের জন্য ঋণ দান করা হইত। পূর্ব-বাগদাদে তিনি এক কোটি দিরহাম ব্যয়ে একটি নূতন রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ভৌগোলিক মুকাদ্দাসীর মতে, শিরাজ শহরে নির্মিত আদুদের প্রাসাদ প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে অতুলনীয় ছিল। ইহাতে ৩৬০টি প্রকোষ্ঠ ছিল এবং গঠন-নৈপুণ্যে অথবা সাজ-সজ্জায় যে-কোন দুইটি প্রকোষ্ঠ এক প্রকার ছিল না। তিনি শীয়ী ইমামদের সমাধি সৌধগুলির সংস্কার সাধন করেন। আলী (রাঃ) ও হুসায়নের সমাধি এবং সপ্তম, নবম, দশম ও একাদশ ইমামদের সমাধি তাঁহার চেষ্টায় নূতনভাবে নির্মিত হয়।

তিনি হজ যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার জন্য রাস্তা-ঘাটের সংস্কারে মনোযোগ দেন। তীর্থ যাত্রীদের উপর যে-সকল অন্যায়-কর ধার্য হইত, তাহা তিনি তুলিয়া দেন। পথে পানির ব্যবস্থা করা হয়। আদুদ কাবা-শরীফের জন্য অনেক উপঢৌকণ পাঠাইতেন এবং মক্কা ও মদীনার সংভ্রান্ত পরিবার-সমূহের জন্যও সেখানকার দরিদ্র জনসাধারণের জন্য অনেক টাকা-পয়সা পাঠাইতেন। ইহা ছাড়া মসজিদে আশ্রয় গ্রহণকারী দরিদ্র ও আগন্তুক ব্যক্তিগণের জন্য এবং মসজিদের মুয়াজ্জিন, ইমাম ও কারীদের জন্য তিনি অকাতরে দান করিতেন। আদুদ তাঁহার খ্রীস্টান প্রজাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁহার উজীর নসর ইবন হারুন ও সেনাপতি আবুল আলা উবায়দুল্লাহ্ খ্রীস্টান ছিলেন। তিনি তাঁহার উজীর নসরকে আদেশ দিয়াছিলেন যে, খ্রীস্টানদের যে-সকল গির্জা ও মঠ পুরাতন ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেগুলির যেন সংস্কার করা হয়। খ্রীস্টানদের মধ্যে যাহারা দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত, তাহাদের মধ্যেও অর্থ সাহায্য বিতরণ করার জন্য তিনি আদেশ করিয়াছিলেন।

আদুদ বাগদাদ ও ইরাকের সমুদয়সেচ ব্যবস্থা ও নদীনালা সংস্কার করেন। নগরীর বহু খাল-বিল ভরাট হইয়া গিয়াছিল। বাঁধগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং তাহার ফলে বন্যার সময় লোকদের অপরিসীম কষ্ট ও দুর্দশা হইত। আদুদ এই সকল বাঁধ সংস্কার করেন, নূতন বাঁধ নির্মাণ করেন এবং খাল-বিলগুলির পুনর্নির্মাণে মনোনিবেশ করেন। ইরাকের সাওয়াদ এলাকা ইহার ফলে পরিপূর্ণ সমৃদ্ধি লাভ করিল। আদুদ ইস্তাখর নামক স্থানে একটি লেক নির্মাণ করেন এবং শিরাজের নিকট বন্দ-ই-আমীর নামক একটি বাঁধ নির্মাণ করেন। এই দুইটি কাজ তখনকার দিনের ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলের পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করা হয়। আদুদের এই কীর্তি একটি পারসিক প্রবাদের জন্মদান করিয়াছে। বলা হয় যে, "তিনি সাগরে

একটি পর্বত নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং পর্বতে একটি সাগর খনন করিয়াছিলেন।"

বুওয়াইহী যুগের উজীরগণ বড় বড় বিদ্বান ছিলেন এবং বিদ্বানের সমাদর করিতেন। মুইজুদ্দৌলাহ্‌র উজীর মুহাল্লাবী, রুকনুদ্দৌলাহ্‌র উজীর আবুল ফজল ইবনুল আমীদ, মুয়াইয়িদুদ্দৌলাহ্ ও ফফরুদ্দৌলাহ্‌র উজীর সাহিব ইবন আব্বাস ও বাহাউদ্দৌলাহ্‌র উজীর ফখরুল মুলক ও সাবুর। সকলেই সাহিত্যিক ছিলেন এবং বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তির সমাদর করিতেন। সাবুর বাগদাদে একটি জ্ঞানকেন্দ্র ও গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়া সেখানে ১০,৪০০ বই সংগ্রহ করেন। আদুদের পুত্র শরফুদ্দৌলাহ্ বাগদাদে একটি মানমন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার জ্যোতির্বিদ ইবন রুস্তম আল-কুহী গ্রহ-নক্ষত্রাদি অবলোকন করিতেন। শরফুদ্দৌলাহ্‌র দরবারে খ্যাতনামা অঙ্কশাস্ত্রবিদ আবুল ওয়াফাও ছিলেন। বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী 'ইখওয়ানুস সাফা' এই যুগে বসরায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বুওয়াইহী আমীর জালালুদ্দৌলাহ্‌র সময় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক দুইটি গ্রন্থ মাওয়ারদী ও ইবন আবী ইয়া'লা কর্তৃক লিখিত হয়। উভয় গ্রন্থকারের পুস্তকের নাম 'আহকামুস-সুলতানিয়া'। এই গ্রন্থে খলীফা ও অন্যান্য রাজ-কর্মচারীদের কর্তব্য সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে।

শতাব্দীর অধিক কাল বাগদাদে বুওয়াইহী শাসন সুন্নীগণকে অসন্তুষ্ট ও উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। বুওয়াইহী শাসকগণও দুর্বল ও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বুওয়াইহীগণ বাগদাদে দুইটি শীয়ী ধর্মীয় অনুষ্ঠান চালু করেন: একটি হইল ১০ই মুহর্‌রমের শোকানুষ্ঠান। ইহাকে আশুরা বলা হয়। অপরটি হইল গাদীবের আনন্দোৎসব। জিলহজ মাসে এই উৎসব পালন করা হয়। শীয়াদের মতে ঐ দিবসে হজরত মুহম্মদ (স:) হজরত আলীকে (রা:) তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করিয়াছিলেন। এই দুই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর বাগদাদে শীয়ী-সুন্নী দাঙ্গা বাঁধিয়া যাইত। খলীফা আল-কায়িম অবশেষে সলজুকদের নেতা তুগ্রিলবেগকে বাগদাদে আসিতে আহ্বান করিলেন। ১০৫৫ খ্রীস্টাব্দে তুগ্রিলবেগ বাগদাদে আসিয়া শেষ বুওয়াইহী আমীর মালিকুর-রহীমকে পদচ্যুত ও বন্দী করিয়া বাগদাদে শীয়ী-বুওয়াইহী শাসনের অবসান ঘটাইলেন।

বিস্তারিত পাঠ্য

মফীজুল্লাহ্ কবীর, দি বুওয়াইহীদ ডায়ন্যাস্টি অব বাগদাদ।
,, আউটলাইন অব ইসলামিক হিস্ট্রি।

৩৪

সলজুক বংশ

সলজুক বংশের অভ্যুত্থান ইসলামের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলিম সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। বুওয়াইহী ও গজনবী বংশের ক্ষমতা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাদের স্থানে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইল। স্পেনে উমাইয়াগণ, মিসর ও উত্তর-আফ্রিকায় ফাতিমীয়গণ বহু পূর্ব হইতে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিল। উত্তর সিরিয়ায় ও মেসোপটেমিয়ায় বহু বিদ্রোহী-আরব নেতার আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহারা কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যেরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পারস্যে বুওয়াইহী বংশের বিভিন্ন শাখা ও অন্যান্য বংশের ছোট-খাট রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই শতধা-বিচ্ছিন্ন ও বহুধা-বিভক্ত খলীফার রাজ্যে এক নতুন রাজশক্তির আবির্ভাব হইল। ইহারাই সলজুক নামে অভিহিত।

সলজুকগণ জাতিতে তুর্কোমান ছিল এবং তাহাদের নেতা সলজুকের নামানুসারে তাহাদিগকে সলজুক (বা সলজুকীয়) বলা হয়। সলজুক তাঁহার তুর্কোমান দলবলসহ তুর্কীস্তানের কিরগিজ অঞ্চল হইতে দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি বুখারায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। এখানে সলজুকগণ সুন্নী মতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। কালক্রমে সলজুক ও তাঁহার পুত্রগণ ইলকখান ও সামানীদের রাজ্যের মধ্য দিয়া নিজেদের পথ করিয়া লইতেছিলেন। সলজুকের পৌত্র তুগ্রিলবেগ ও চাগরীবেগ প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করিয়া খুরাসানের উপর আপতিত হইলেন এবং একের পর এক যুদ্ধে গজনবী বংশের আমীরগণকে পরাজিত করিয়া খুরাসানের প্রধান নগরসমূহ অধিকার করিলেন। ১০৩৭ খ্রীস্টাব্দে চাগরীবেগের নামে মার্ভের মসজিদসমূহে খুৎবা পঠিত হয় এবং তাঁহার ভ্রাতা তুগ্রিলবেগের নামে নীশাপুরে খুৎবা পঠিত হয়। অচিরেই সলজুকগণ বলখ, গুর্গাওঁ, তাবারিস্তান এবং খাওয়ারিজম অধিকার করে। জিবাল, হামদোন, দিনাওয়ার, হুলওয়ান, রায় এবং ইস্পাহানও অবিলম্বে তাহাদের অধীনে আসে। শতাধিক বৎসরের পুরাতন বুওয়াইহী বংশ তাহাদের বিজয়াভিযানের সম্মুখে ধূলায় লুণ্ঠিত

আটলান্টিক মহাসাগর
খাবার উপজাতি
কারাখানি রাজ্য
উমাইয়া রাজ্য
কৃষ্ণ সাগর
কনস্টান্টিনোপল
বাইজানটাইন
সাম্রাজ্য
গজনবী রাজ্য
বুওয়াইহি রাজ্য
জিরী রাজ্য
বারবার জাতি
ফাতিমী
সাম্রাজ্য
কায়রো
লিবিয়া
ঘানা
আরব জাতি
নুবিয়া
ইথিওপিয়া
আদন
হামদানী

একাদশ শতাব্দীতে মুসলিম জগৎ

বিভিন্ন রাজ্যের সীমা

মুসলিম

খ্রীষ্টান

অন্যান্য

একাদশ শতাব্দীতে মুসলিম জগৎ

হইয়া পড়িল। পরিশেষে ১০৫৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে খলীফা আল-কায়িম তুগ্রিলবেগকে বাগদাদে আসিতে আহ্বান করিলেন। শেষ বুওয়াইহী আমীর মালিকুর-রহীমের প্রধান সেনাপতি ছিলেন একজন শীয়ী। তাঁহার নাম ছিল বাসাসীরী। তুগ্রিলের আগমনে বাসাসীরী রাহবা নামক স্থানে গিয়া ফাতিমী খলীফা মুস্তানসিরের নামে খুৎবা পড়িলেন।

তুগ্রিলবেগ খলীফার আহ্বানে সাড়া দিয়া তাঁহার আনুগত্য প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলেন এবং খলীফা মসজিদের খতীবদের নিকট আদেশ জারী করিয়া পাঠাইলেন যে, খুৎবায় যেন খলীফার নামের পরে এবং মালিকুর রহীমের নামের পূর্বে তুগ্রিলের নাম পড়া হয়। খলীফার উজীর তুগ্রিলের সম্বর্ধনার জন্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহিত নগরীর বাহিরে গেলেন এবং ৪৪৭ হিজরীর ২৫শে রমজান (ডিসেম্বর, ১০৫৫) সলজুক বাহিনী বাগদাদে প্রবেশ করিল। তুগ্রিলের বাগদাদ প্রবেশের কিছুদিন পরেই জনসাধারণ তুর্কোমান সৈন্যদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইল। ইহাতে মালিকুর-রহীমের হাত আছে, এই অজুহাতে তাঁহাকে বন্দী করা হইল। তখন তাঁহার নামে খুৎবা পাঠ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তিনি বন্দী অবস্থায় ১০৫৮—৫৯ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইহার পর তুগ্রিল কিছুদিন বাহিরে অবস্থান করিয়া বাগদাদে ফিরিয়া আসিলেন। এইবার তাঁহার সম্মানে রাজকীয় সম্বর্ধনার আয়োজন করা হইল। খলীফা হজরত রসুলুল্লাহ্‌র (সঃ) পোশাক পরিয়া ও লাঠি লইয়া যবনিকার অন্তরালে আসন গ্রহণ করিলেন। তুগ্রিলের আগমনে এই পর্দা উত্তোলিত হইল। তুগ্রিল আসন গ্রহণ করিয়া দোভাষীর মধ্যস্থতায় খলীফার সহিত কথোপকথন করিলেন। খলীফা তুগ্রিলকে "প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের রাজা" বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং তাঁহাকে 'সুলতান' উপাধি দান করিলেন।

তুগ্রিল বেগ তাঁহার ভ্রাতা ইব্রাহীম ইনালের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য বাগদাদের বাহিরে গেলে ১০৫৮ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরে শীয়ী সেনাপতি বাসাসীরী বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং বাগদাদের সকল মসজিদে ফাতিমী খলীফা মুস্তানসিরের নামে খুৎবা প্রবর্তিত করিলেন। আব্বাসীয় খলীফা আল-কায়িমকে খিলাফতের সকল দাবী পরিহার করিয়া খিলাফতের নিদর্শন-সমূহ, যথা—পোশাক, পাগড়ি ও মিম্বর, কায়রোতে ফাতিমীয় খলীফার নিকট প্রেরণ করিতে হইল। বাসাসীরী বাগদাদের প্রধান কাজী এবং আলাবী ও

আব্বাসী নেতাগণকে মুস্তানসিরের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন। খলীফা কায়িমকে বন্দী করিয়া রাখা হইল। এক বৎসর পর্যন্ত বাগদাদে ফাতিমীয় খলীফার নামে শাসন চলিল। অবশেষে ১০৫৯ সালের ডিসেম্বরে তুগ্রিল বেগ বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি বাসাসীরীকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন এবং খলীফা আল-কায়িমের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। সলজুকদের শাসনাধীনে পূর্বে আফগানিস্তানের সীমান্ত হইতে পশ্চিমে এশিয়া মাইনরের গ্রীক রাজ্যের সীমান্ত এবং মিসরের ফাতিমীয় রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র পশ্চিম-এশিয়া আব্বাসীয় খলীফার আনুগত্যে পুনর্মিলিত হয়। ইহাদের সামরিক কার্যকলাপের ফলে মুসলিম জগতের পূর্বাঞ্চলে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয় এবং এই রাজনৈতিক ঐক্যের ফলে ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নূতন যুগের সূচনা হয়। তুগ্রিলের সময় (১০৩৭—৬৩) হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আলপ্ আরসালান (১০৬৩-৭২) ও আলপ্ আরসালানের পুত্র মালিক শাহের রাজত্বকাল পর্যন্ত (১০৭২-৯২) সলজুক শাসনের গৌরবময় যুগ।

আলপ্ আরসালান (১০৬৩-৭২)

গ্রীকগণ খিলাফতের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া খলীফার রাজ্যে তাহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতেছিল। ইহার ফলে দশম শতাব্দীর শেষভাগে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য দক্ষিণে এন্টিয়ক ও পূর্বে আর্মিনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। ১০৬০ খ্রীস্টাব্দে সুলতান তুগ্রিলবেগ বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাহাদিগকে কাপাডোসিয়া ও ফ্রিজিয়া হইতে বিতাড়িত করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকারী আলপ্ আরসালান এই সকল অঞ্চল স্থায়ীভাবে জয় করেন। সুলতান তুগ্রিলের মৃত্যুর পর আলপ্ আরসালান সলজুকদের সর্বাধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মহানুভব, ন্যায়পরায়ণ, জ্ঞানী, ধার্মিক, সাহসী ও বিক্রমশীল ছিলেন। তিনি জর্জিয়া ও আর্মিনিয়া চূড়ান্তভাবে জয় করার পর আজারবাইজানের খোই নামক স্থানে অবস্থানকালে সংবাদ পাইলেন যে, গ্রীক সম্রাট রোমানাস ডায়োজিনিস অধুনা বাইজান্টাইন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দুই লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী লইয়া বাগদাদ নগরী ধ্বংস ও সমগ্র পশ্চিম-এশিয়া গ্রীকদের পদানত করিবার উদ্দেশ্যে এশিয়া মাইনর আক্রমণ করিয়াছেন। কনস্টান্টিনোপল হইতে ইতিপূর্বে এত বৃহৎ ও সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী আর কখনও

বাহির হয় নাই। বিশাল বাইজানটাইন বাহিনীর অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানগণ পশ্চাদপসরণ করিয়া মালাজকার্দে সৈন্য সমাবেশ করিল। যুদ্ধে মুসলমানগণ গ্রীকদের সংখ্যাধিক্যে অভিভূত হইয়া পড়িল, কিন্তু বীর বিক্রমে বহুক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ করার পর তাহারা গ্রীক সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়া সম্রাট ডায়োজিনিসকে সভাসদসহ বন্দী করিল। আলাপ-আলোচনার পর স্থির হইল যে, রোমানাস তাঁহার কন্যাগণকে আলপ্ আরসালানের পুত্রদের সহিত বিবাহ দিবেন এবং বন্দীদের উদ্ধারের জন্য দশ লক্ষ এবং বাৎসরিক রাজস্ব স্বরূপ তিন লক্ষ ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়া সন্ধি স্থাপন করিবেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, রোমানাস কনস্টান্টিনোপলের দিকে প্রত্যাবর্তন করিবার পূর্বে পদচ্যুত হইলেন এবং গ্রীকগণ তাঁহাকে বন্দী ও অন্ধ করিয়া পরে নিহত করে। মালাজকার্দের যুদ্ধ এশিয়ায় বাইজানটাইন ক্ষমতার অবসান ঘটাইল। এশিয়া মাইনরের মালভূমি এক্ষণে স্থায়ীভাবে 'দারুল ইসলামের' অন্তর্ভুক্ত হইল এবং ইহার জন্য সমস্ত কৃতিত্ব আলপ আরসালানের। আলপের পিতৃব্যপুত্র সুলায়মান ইবন কুলতুমিশ এশিয়া মাইনরের জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ১০৭৭ খ্রীস্টাব্দে রুমে সলজুকদের সুলতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে তাঁহার রাজধানী ছিল নাইসিয়া শহরে। প্রথম ক্রুসেডের সময় মুসলমানগণ ঐ শহর হইতে বিতাড়িত হইলে রাজধানী আইকোনিয়ামে (কোনিয়ায়) স্থানান্তরিত হয়। সিরিয়ায় আলপের পুত্র তুতুশের শাসনাধীনে আরও একটি রাজ্য স্থাপিত হয়। আলপ্ স্বয়ং আলেপ্পো অধিকার করেন। তিনি ফাতিমীয়দের অগ্রগতি রোধ করেন এবং তাহাদের নিকট হইতে মক্কা ও মদীনা উদ্ধার করেন।

১০৭৩ খ্রীস্টাব্দে আলপ্ আরসালানের মৃত্যু হয়। তাঁহার শাসন ন্যায়-পরায়ণ ও জনকল্যাণকর ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে নিজামুল-মুলক উপাধিধারী বিখ্যাত খাজা হাসান তাঁহার উজীর ছিলেন। বে-সামরিক শাসনের সমুদয় ক্ষমতা উজীরের হাতে ন্যস্ত ছিল। আলপ্ আরসালানের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মালিক শাহ্ জালালুদ্দৌলাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া সুলতান হইলেন।

প্রথম দুইজন সলজুক সুলতান বাগদাদে বসবাস করিতেন না। তাঁহারা একজন সামরিক শাসনকর্তার সাহায্যে বাগদাদ শাসন করিতেন। তুগ্রিল-বেগ মার্ভে থাকিতেন। আলপ্ আদৌ কখনও বাগদাদে আসেন নাই। তিনি ইস্পাহানে থাকিয়া রাজ্যশাসন করিতেন। মালিক শাহ্ তাঁহার

রাজত্বের শেষ ভাগে বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। খলীফা ক্রমান্বয়ে সুলতানের হাতের ক্রীড়নক হইয়া পড়িলেন। পূর্ববর্তী বুওয়াইহী যুগের সহিত সলজুক যুগের পার্থক্য এই যে, এই যুগে সুলতানগণ সুন্নী ছিলেন এবং তাঁহারা খলীফাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তবে রাজনৈতিক ক্ষমতা বলিতে তাঁহার আর কিছুই বাকী রহিল না। সলজুক শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িলে খলীফা তাঁহার লুপ্ত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মালিক শাহ্ (১০৭২-১০৯২) সলজুক শক্তির চরম উৎকর্ষ

মালিক শাহের রাজত্বকালে সলজুক ক্ষমতা চরম উন্নতি লাভ করে। "তাঁহার রাজ্য দৈর্ঘ্যে তুর্কীস্তানের শেষ প্রান্তে অবস্থিত কাশগড় হইতে জেরুজালেম পর্যন্ত এবং প্রস্থে কনস্টান্টিনোপল হইতে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।" মালিক শাহের রাজত্বের প্রথম ভাগে কয়েকটি বিদ্রোহের ফলে রাজ্যে গোলযোগ দেখা দেয়। তাঁহার ভ্রাতার নেতৃত্বেও একটি বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল। ইবন খাল্লিকান বর্ণিত এই সময়ের একটি কাহিনী হইতে মালিক শাহের চরিত্র সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। তুস নগরীতে উজীর নিজামুল-মুলক সমভিব্যাহারে তিনি একটি মসজিদে নামাজ পড়েন ও প্রার্থনা করেন। প্রার্থনার শেষে তিনি উজীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কি প্রার্থনা করিয়াছেন। উজীর উত্তর করিলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, যেন তিনি সুলতানকে বিদ্রোহী ভ্রাতার উপর জয়দান করেন। কিন্তু মালিক শাহ্ বলিলেন, "আমি এই জন্য প্রার্থনা করি নাই। আমি আল্লাহ্‌র নিকট চাহিয়াছি যে, আমাদের দুইজনের মধ্যে যে মুসলমানদিগকে শাসন করিবার জন্য বেশী উপযুক্ত এবং যাহার শাসন প্রজাগণের জন্য বেশী উপকারী, তিনি যেন তাহাকেই জয়ী করেন।"

মালিক শাহ্ শুধু যে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন, তাহাই নহে, তিনি বহু জনহিতকর কাজ করিয়া ইসলামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তিনি মসজিদ, মাদ্রাসা, রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী, হাসপাতাল নির্মাণ করিয়াছিলেন। হজযাত্রীদের সুবিধার জন্য তিনি রাস্তার পার্শ্বে অসংখ্য সরাইখানা নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি দ্বাদশবার বিশাল সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করিতেন এবং উহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতেন। মৃগয়ায় তাঁহার বিশেষ আশক্তি ছিল। মৃগয়া বা প্রমোদ ভ্রমণের সময়েও তিনি

অভাবগ্রস্তদের মধ্যে প্রচুর অর্থ বিতরণ করিতেন। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। ট্রান্সঅক্সিয়ানা হইতে সিরিয়া পর্যন্ত বাণিজ্য কাফেলা, এমন কি দুই একজন পথযাত্রীও নির্বিঘ্নে চলাফেরা করিতে পারিত। এই সকল কারণে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এই সময় বাগদাদে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। শহরের হাম্মামখানাগুলি হইতে ময়লা পানি নিষ্কাশনের জন্য বিশেষ নালার ব্যবস্থা করা হয়। মাছের আঁইশ ছাড়াইবার জন্যও বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।

সলজুকদের সময় সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি হয়। মালিক শাহ্ বিদ্বজ্জনের সমাদর করিতেন। তাঁহার উজীর নিযামুল-মুলক একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ছিলেন। মালিক শাহ্ ১০৭৪-৭৫ খ্রীস্টাব্দে পারসিক পঞ্জিকার সংশোধনের জন্য জ্যোতির্বিদগণের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সংশোধিত পঞ্জিকার নাম দেওয়া হইল "জালালী পঞ্জিকা"। জালালুদ্দীন মালিক শাহের নামানুসারে এই নামকরণ করা হয়। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ উমর খইয়াম এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। উমর খাইয়ামসহ এই সকল জ্যোতির্বিদ মালিক শাহ্ কর্তৃক স্থাপিত একটি মানমন্দিরে গবেষণা-রত ছিলেন। এই পঞ্জিকা গ্রীগরীয় পঞ্জিকা হইতে অধিকতর বিশুদ্ধ। গ্রীগরীয় পঞ্জিকায় ৩৩৩০ বৎসরে ১ দিন ভুল হয়, আর জালালী পঞ্জিকায় ৫০০০ বৎসরে এক দিনের প্রমাদ ঘটে। জ্যোতির্বিদ ও গাণিতিক ছাড়াও উমর খইয়াম কবি এবং দার্শনিকও ছিলেন।

সুপণ্ডিত নিজামুল-মুলক বিদ্বান ও বিদ্বানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। একবার মালিক শাহ্ রাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে পুস্তক রচনার জন্য পণ্ডিত লোকদের মধ্যে এক প্রতিযোগিতা আহ্বান করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে নিজামুল-মুলক রচিত 'সিয়াসতনামা' সর্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়। ৫০ অধ্যায়ে সমাপ্ত এই পুস্তকে রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাদশাহের জন্য ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত সম্বলিত উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। এই পুস্তকের শেষ ভাগে নিজামুল মুলক চরম-পন্থী ও নাস্তিক্যবাদী ধর্মসম্প্রদায়, বিশেষ করিয়া বাতিনী ও কারমাতী সম্প্রদায়-সমূহের রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন এবং কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন।

নিজামুল-মুলক ইসলামের ইতিহাসে তাঁহার আর একটি উল্লেখযোগ্য

কীর্তির জন্য বিখ্যাত। তিনি বলখ, মার্ভ, ইস্পাহান, বসরা এবং বাগদাদে মাদ্রাসা ও উচ্চ শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সকল মাদ্রাসা নিজামুল-মুলকের উপাধি অনুসারে নিজামীয়া নামে খ্যাত। ইহাদের মধ্যে বাগদাদের নিজামীয়া সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইহা বর্তমান যুগের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহিত তুলনীয়। ১০৬৫-৬৭ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হইয়া এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শাফিয়ী মজহাব ও আশআরী মাতবাদ প্রচারের কেন্দ্র হিসাবে মুসলিম জগতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল এবং ১৩৯৩ খ্রীস্টাব্দে মুস্তানসিরীয়া নামক মাদ্রাসার সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। ১০৯১ হইতে ১০৯৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চারি বৎসর ইমাম গাজ্জালী এই নিজামীয়ার অধ্যাপক ছিলেন। ইসলামের প্রতি এই মনীষীর দান অপরিসীম। এই যুগের অন্যান্য লিখকের মধ্যে নাসির-ই-খসরুর নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি বিখ্যাত পরিব্রাজক ও ইসমাঈলী প্রচারক ছিলেন। তাঁহার 'সফরনামায়' তদানীন্তন মুসলিম জগতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্র নিখুঁতভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

মালিক শাহের রাজত্বের শেষভাগে নাস্তিকতাবাদী ঘাতক সম্প্রদায়ের (Assassin) আবির্ভাব ঘটে। নিজামুল-মুলকের সহপাঠী হাসান সাবাহ্ কর্তৃক এই দল গঠিত হইয়াছিল। ব্যক্তিগত জীবনে হাসান সাবাহ্ উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগে বঞ্চিত হইয়া হিংসা ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকেরা বিষ ও ছোরার সাহায্যে যন্ত্রচালিতের মত নেতার আদেশক্রমে বিরুদ্ধবাদীদিগকে ঘায়েল করিত। ইহারা মজান্দারনের পার্বত্য অঞ্চলে দুর্ভেদ্য আলামুত দুর্গে ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছিল। মালিক শাহ্ ইহাদের শক্তি খর্ব করিতে ব্যর্থকাম হন। ১০৯২ খ্রীস্টাব্দে ইহাদের জনৈক গুপ্তঘাতক কর্তৃক নিজামুল-মুলক নিহত হন। ইহার অল্পকাল পরে মালিক শাহেরও মৃত্যু হয়।

নিজামুল-মুলক ও মালিক শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সলজুকদের গৌরবের যুগের অবসান ঘটে। মালিক শাহের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হইয়া পড়ে। গৃহযুদ্ধ ছাড়া অন্যান্য কারণেও সলজুক সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ১০৮৭ খ্রীস্টাব্দে সলজুবগণ সামরিক সামন্ত প্রথা প্রবর্তন করে। এই প্রথানুযায়ী সামন্তগণ নিজ নিজ অঞ্চলে বংশানুক্রমিক শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। ইহার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন বংশ গড়িয়া উঠে। ইহারা কালক্রমে পারস্যের কেন্দ্রীয় সলজুক শাখার সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে। এই বিভিন্ন স্বাধীন

শাখার নাম যথাক্রমে ইরাক ও কুর্দীস্তানের শাখা, কিরমানের শাখা, সিরিয়ার শাখা এবং রুমের শাখা। রুমের শাখা (Iconium) ১৩০০ খ্রীস্টাব্দের দিকে উসমানী তুর্কীদের দ্বারা পরাজিত ও বিতাড়িত হয়। উসমানী তুর্কীগণ ইসলামের বিজয় বৈজয়িন্তী ইউরোপে উড্ডীন করে।

বাগদাদের খলীফাগণের উপর সলজুক কর্তৃত্ব ১০৫৫ খ্রীস্টাব্দে খলীফা আল-কায়িমের আমলে আরম্ভ হইয়া খলীফা আন-নাসিরের আমলে ১১৯৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

বিস্তারিত পাঠ্য তালিকা

হিট্টি, হিস্ট্রি অব দি এরাব্স্
লেনপুল, মুহাম্মাডান ডায়ন্যাস্টিজ
মুর, কলিফেট
আমীর আলী, হিস্ট্রি অব দি সারাসেন্স্
ব্রাউন, লিটারারি হিস্ট্রি অব পার্সিয়া
লেম্বটন, ল্যাণ্ড এণ্ড পিজেন্ট ইন পার্সিয়া।

৩৫

খিলাফতের গৌরবোদ্ধারের শেষ প্রচেষ্টা : খলীফা আন্‌-নাসির লি দীনিল্লাহ্‌

(১১৮০-১২২৫)

খিলাফতের পতনের যুগে ৩৪তম আব্বাসীয় খলীফা আবুল আব্বাস আহমদ 'আন-নাসির লি দীনিল্লাহ' খিলাফতের পূর্ব-গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন। এই হৃতগৌরবের মধ্যে ছিল খলীফার পার্থিব ক্ষমতা। শীয়ী বুওয়াইহী ও সুন্নী সলজুকদের শাসনামলে খলীফা কেবল নামেমাত্রই খলীফা রহিলেন। রাজ্য-রাজত্ব, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ধি, অর্থ-সম্পদ ও শান-শওকত, সবকিছুরই মালিক ছিলেন বুওয়াইহী আমীর ও সলজুক সুলতানগণ। সলজুক শক্তি যখন গৃহ-বিবাদ ও আত্ম-কলহে ধ্বংসোন্মুখ, তখন সুযোগ বুঝিয়া খলীফা ক্ষমতার সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। কিন্তু সলজুক ক্ষমতা খর্ব করিবার জন্য তিনি প্রথমে সলজুক-দের সামন্ত খাওয়ারিজম শাহের সহিত সহযোগিতা করিলেন। আবার খাওয়ারিজম শাহের শক্তি যখন তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেল, তখন তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে মোঙ্গলগণকে উস্কাইয়া দিয়া পরিশেষে নিজের বংশের পতন ত্বরান্বিত করিলেন।

খলীফা নাসিরের প্ররোচণায় খাওয়ারিজম শাহ্‌ তাকাশ ইরাক-ই-আজমের শাসনকর্তা সুলতান দ্বিতীয় তুগ্রিলকে ১১৯৪ খ্রীস্টাব্দে আক্রমণ করেন এবং পরাজিত ও নিহত করেন। নাসির মনে করিয়াছিলেন যে, সলজুকদের সমস্ত রাজ্য তিনিই দখল করিবেন। কিন্তু তাকাশ তাঁহার রাজ্য বৃদ্ধির এই সুযোগ ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তিনি এখন নিজেকে সলজুকদের স্থলবর্তী মনে করিয়া খিলাফতের যাবতীয় পার্থিব ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হইতে চাহিলেন। তিনি বাগদাদ অধিকার করিয়া সলজুকদের মত খলীফার সকল কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিতে চাহিলেন এবং খলীফাকে নামেমাত্র খলীফা করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন। তাকাশ যখন পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সুযোগে খলীফা তাঁহার উজীরের সাহায্যে খুজিস্তান ও অন্যান্য অঞ্চল দখল করিয়া লইলেন (১১৯৬)। কিন্তু

দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলিম জগৎ

বিভিন্ন রাজ্যের সীমা

মুসলিম

খৃষ্টান

অন্যান্য

কিপচক

কারাখানি রাজ্য

বাহর আল খাজার

কৃষ্ণ সাগর

কনস্টান্টিনোপল

সেলজুক সাম্রাজ্য

মুরাবিত বংশ

বাহর আর রুম

লিবিয়া

বাহর ফারিস

বাহর আল আহমার

নুবিয়া

আবিসিনিয়া

বাহর আল হিন্দ

দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলিম জগৎ

তাকাশ ফিরিয়া আসিয়া খলীফার সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া খুজিস্তান ব্যতীত আর অন্যান্য স্থান পুনরাধিকার করিলেন। তাকাশের পুত্র ও উত্তরাধিকারী আলাউদ্দীন মুহম্মদের আমলেও খলীফার সহিত এই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকে। খাওয়ারিজম শাহ আলাউদ্দীন মুহম্মদ পারস্যের সমগ্র অঞ্চল দখল করিয়া বুখারা ও সমরকন্দ অধিকার করিলেন (১২১০)। ১২১৪ সালে তিনি আফগানিস্তানে প্রবেশ করিয়া গজনী দখল করিলেন। ইহার পর তিনি আব্বাসীয় খিলাফতের অবসান ঘটাইয়া একজন আলাবীকে খলীফার পদে নিযুক্ত করিতে সিদ্ধান্ত করিলেন। তিনি তাঁহার আলিমদের দ্বারা একটি ফতোয়া জারী করিয়া নাসিরকে খিলাফতের অনুপযুক্ত ঘোষণা করিলেন এবং তিরমিজের আলাউল মুলক্ নামক একজন আলাবীকে খলীফা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই নূতন খলীফার নামে খুৎবা পাঠ করা হইল এবং মুদ্রায় তাঁহার নাম অঙ্কিত হইল। খলীফা নাসির আপোষের আলাপ-আলোচনা চালাইয়া ব্যর্থ হইলেন। তখন তিনি মোঙ্গল নেতা চেঙ্গীজ খানকে খাওয়ারিজম শাহের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

ইতিমধ্যে আলাউদ্দীন মুহম্মদ হামাদান হইতে বাগদাদের দিকে যাত্রা করিলেন এবং আব্বাসীয় খিলাফতকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে বাধা দানের কোন ক্ষমতাই খলীফার ছিল না, কিন্তু নিয়তি তাঁহার সহায় হইলেন। কঠোর শীতের আবির্ভাবে খাওয়ারিজম শাহ্ বাধ্য হইয়া খুরাসানে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পর বৎসর আবার বাগদাদ অধিকারের সংকল্প করিলেন।

ইতিমধ্যে চেঙ্গীজ খানের নেতৃত্বে মোঙ্গলগণ গোবী মরুভূমির উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত মঙ্গোলিয়া হইতে বহির্গত হইয়া মুসলিম জগতের উপর আপতিত হইল। তাহাদের আক্রমণের সম্মুখে বিখ্যাত শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রসমূহ ধূলিসাৎ হইয়া পড়িল। বলখ, বুখারা, হিরাত ও সমরকন্দ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল। অগণিত নর-নারী, শিশু ও বৃদ্ধ নিহত হইল। মানুষের রক্তস্রোতে ধরিত্রী রঞ্জিত হইয়া উঠিল। ৬০,০০০ মোঙ্গলদের প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে খাওয়ারিজম শাহ্ আলাউদ্দীন মুহম্মদ পরাজিত হইয়া কাস্পিয়ানের একটি দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানেই শোচনীয়-ভাবে তাঁহার মৃত্যু হয় (১২২০)।

মোঙ্গলগণ কিছুকালের জন্য চলিয়া গেলে খাওয়ারিজম শাহ্ আলা-উদ্দীনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী জালালুদ্দীন মংবারনী খলীফা নাসিরকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে খুজিস্তান ছিনাইয়া লইলেন। খলীফা নাসির সর্বক্ষণ পূর্বাঞ্চলে মনোনিবেশ করায় সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের ঘটনাবলির প্রতি তিনি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিশ্ববিশ্রুত মুসলিম বীর সালাহুদ্দীন এই সময় ক্রুসেডারদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। খলীফার নিকট আকুল আবেদন করিয়াও তিনি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর সাহায্যপ্রাপ্ত হইলেন। খলীফা নাসির মতবাদের দিক হইতে ইমামী শীয়া সম্প্রদায়ের প্রতি উদার ভাবাপন্ন ছিলেন এবং আলাবী-গণকে তাঁহার দরবারে ডাকিয়া আব্বাসী ও আলাবী বংশের সমঝোতার চেষ্টা করিয়াছিলেন। চারিশত বৎসর পূর্বে খলীফা মামুন অনুরূপ চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। তিনি আলামুতের ঘাতক সম্প্রদায়ের সহিত রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সমঝোতায় পৌঁছিয়াছিলেন। ১২১১—১২ খ্রীস্টাব্দে ঘাতক সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু তৃতীয় হাসান খলীফার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

নাসির ফতুওয়া নামক একটি ভ্রাতৃসংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। বহু রাজা-বাদশাহ্ ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকেরা ইহার মাধ্যমে খলীফাকে তাঁহাদের নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ও বিশেষ পোশাক পরিধান করাইয়া নূতন সদস্যকে দীক্ষিত করা হইত। এই ভ্রাতৃসংঘে নাসির অবাধে হজরত আলীর (রাঃ) বংশধরগণকে গ্রহণ করিতেন। কাজেই এই ভ্রাতৃসংঘ প্রতিষ্ঠায় খলীফার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধিই যে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

সত্তর বৎসর বয়সে ১২২৫ খ্রীস্টাব্দে নাসিরের মৃত্যু হয়। তিনি আব্বাসীয় খলীফাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ সময় খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার ৪৭ বৎসরের দীর্ঘ খিলাফত দুর্যোগপূর্ণ ও সংকটবহুল ছিল। খিলাফতের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় তিনি না-কাম হইয়াছিলেন। কারণ তাঁহার সামরিক শক্তি ও অর্থবল তৎকালীন অন্যান্য রাজা-বাদশাহদের তুলনায় নগণ্য ছিল। ইহার ফলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি যে কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সফলতার সম্ভাবনা ছিল খুব কম। এই নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি মোঙ্গলগণকে আহ্বান করিয়া আব্বাসীয় খিলাফতের পতনই ত্বরান্বিত করিয়াছিলেন। তবুও তাঁহার

সময়ে বাগদাদে শান্তি বিরাজমান ছিল। জ্ঞানচর্চা অব্যাহত ছিল। তিনি মাদ্রাসা-মক্তব ও কুতুবখানা (লাইব্রেরী) প্রতিষ্ঠায়, দরিদ্রের প্রতি বদান্যতায় ও জনহিতকর কাজে মনোযোগী ছিলেন। তাঁহার সময়ের স্থাপত্য-কার্যের দুইটি নিদর্শন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে একটি বাগদাদের 'তাবিজ ফটক' ও অপরটি সামাররায় প্রতিষ্ঠিত 'মাহদীর অদৃশ্য স্থান'। তাবিজ ফটকের উপরে দুইটি ড্রাগনের মধ্যস্থলে খলীফার প্রতিমূর্তি রহিয়াছে। খলীফা উহাদের চোয়াল বিযুক্ত করিয়া জিহ্বা ধরিয়া আছেন। সম্ভবতঃ ড্রাগন দুইটি আলামূতের প্রধান গুরু তৃতীয় হাসান ও খাওয়ারিজম শাহ্ আলাউদ্দীনকে বুঝাইতেছে। প্রথমোক্তজন খলীফার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শেষোক্তজন খলীফার বিরোধিতা করিয়া অবশেষে মোঙ্গলগণ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া কাস্পিয়ানের একটি দ্বীপে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন।

বিস্তারিত পাঠ্য তালিকা

এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম
হিট্টি, হিস্ট্রি অব দি এরাব্স্
লেনপুল, মোহাম্মাডান ডায়ন্যাস্টিজ

৩৬

বাগদাদের পতন

সাফ্ফাহ কর্তৃক ৭৫০ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত খিলাফত ১২৫৮ খ্রীস্টাব্দে দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা হালাগু খানের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। কিন্তু পাঁচশত বৎসরের অধিককাল স্থায়ী ও সাঁইত্রিশজন খলীফা দ্বারা শাসিত এই রাজ্যে বহুকাল পূর্বে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে আমরা এই রাজ্যের অধোগতির কথা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। হালাগু খানের আক্রমণ ও বাগদাদের পতন বহু শতাব্দীর আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বহুধাবিভক্ত রাজ্যের শেষ পরিণতি মাত্র। এক শতাব্দীকাল পূর্ণ শক্তিতে ও পূর্ণ গৌরবে রাজত্ব করার পর মনসূরের বংশধরগণ দুর্বল হইয়া পড়িলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইব্ন্ খলদুনের মতে, একক ব্যক্তি-ভিত্তিক বংশানুক্রমিক শাসন শতাব্দীর অধিককাল পূর্ণতেজে চলিতে পারে না। একই বংশ হইতে উদ্ভূত শাসকগণের মধ্যে বিলাস ও আরাম-আয়েশের ফলে দুর্বলতার সঞ্চার হয়। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি আমরা খলীফা-গণকে সামাররায় তুর্কী সৈন্যদের হাতের ক্রীড়নক হিসাবে দেখিতে পাই। দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি শীয়া দায়লামী সম্প্রদায় বাগদাদে আসিয়া খলীফার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিল। তাহারা যাহাকে ইচ্ছা খলীফা করিত, যাহাকে ইচ্ছা সিংহাসন হইতে টানিয়া নামাইত। ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যের পূর্বে ও পশ্চিমে বহু স্বাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইল। ইহারাও পরস্পর অন্তর্দ্বন্দ্বে ও আত্মকলহে লিপ্ত ছিল এবং পরস্পরের সহিত যুদ্ধে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করিতেছিল। খিলাফতের এই সকল আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ইহার পতনকে আসন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। ১২৫৮ সালের হালাগুর আক্রমণ ছিল একটি উপলক্ষ মাত্র।

বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব এবং তাহাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার একটি দিক মাত্র। খলীফার সাম্রাজ্যে মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে এবং মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে কোন ঐক্যের বন্ধন ছিল না। যে ধর্ম বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রচার করিয়া জাতি ও

বর্ণ নির্বিশেষে মানবীয় মর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিল, সেই ধর্মের অনুসারিগণ পরস্পর ঘৃণা ও বিদ্বেষে লিপ্ত হইল। আরবগণ উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া পরস্পর আত্মকলহে লিপ্ত হইত। পারসিকগণ, তুর্কীগণ এবং উত্তর আফ্রিকার বার্বারগণ আরবগণের সহিত মিলিত হইয়া মুসলিম ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় করিতে চেষ্টা করে নাই। ইরানের প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতি যুগে যুগে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জন্ম দিয়াছিল। সিরিয়াবাসিগণ উমাইয়াদের প্রতি তাহাদের প্রাণের টান কখনও ভুলিতে পারে নাই। এইসব জাতিগত ও বর্ণগত বিরোধের সহিত ধর্মীয় বিরোধ যুক্ত হইয়া ধর্মের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিল। ইহাদের মধ্যে শীয়া, কারমাতী, ইসমাঈলী ও এসাসিন (ঘাতক) প্রভৃতি সম্প্রদায় প্রধান। এই সকল ধর্মসম্প্রদায়ের উন্মেষ, বিস্তার ও কার্যকলাপ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে, ইহাদের অনেকেই পুরাতন জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থান সূচিত করে কিংবা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ বুঝায়।

সামাজিক ও নৈতিক অধোগতি আব্বাসীয় রাজবংশের পতনের অপর কারণ। খলীফাগণ অপূর্ব বিলাস-ব্যসনে ও আরাম-আয়েশে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহারা তাঁহাদের অন্তঃপুরে অসংখ্য দাস-দাসী রাখিতেন। অসংখ্য খোজা-প্রহরী অন্তঃপুর পাহারা দিত। আরব–অনারব রক্তের সংমিশ্রণে রাজশক্তি ক্রমাগত দুর্বল হইয়া পড়িল। খলীফাগণের মদ্যপান, সঙ্গীতানুরাগ ও রাজকার্যে অনাসক্তি সুযোগ সন্ধানী সামরিক নেতাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিল। খলীফার দরবার এই সকল দ্বন্দ্বের ফলে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বীর কলহের ক্ষেত্রে পরিণত হইল। ইহার সহিত যুক্ত হইল উত্তরাধিকারের জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়মের অভাব। আব্বাসীয় শাসনের শেষের দিকে খলীফা প্রথমে তুর্কী সৈন্যদের পরে শীয়া দায়লামীদের এবং সর্বশেষে সুন্নী সলজুকগণের হাতের ক্রীড়নক হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থাও ক্রমাগত শোচনীয় হইতে থাকে। প্রদেশসমূহ স্বাধীন হইয়া যাওয়ার পর খলীফার কোষাগারে ঘাটতি দেখা দেয়। প্রাদেশিক বংশগুলির মধ্যে অনেকেরই উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের নিকট যত খুশী রাজস্ব আদায় করা। নূতন নূতন রাজবংশের অভ্যুত্থানের ফলে প্রজাসাধারণের অবস্থা ক্রমাগত শোচনীয় হইতে থাকে। বিভিন্ন রাজবংশের মধ্যে যুদ্ধের ফলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া

পড়ে। তদুপরি দাজলা-ফুরাত উপত্যকা অঞ্চলে প্রায়ই বন্যা লাগিয়াই ছিল। দুর্ভিক্ষে বহুলোক মারা যাইত। বিভিন্ন প্রকারের অসুখ, ব্যাধি ও মহামারীর সম্মুখে সেই যুগের মানুষ নিতান্ত অসহায় ছিল। মুসলিম বিজয়ের প্রথম চারি শতাব্দির মধ্যে ন্যূনপক্ষে চল্লিশটি মহামারীর কথা ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন। রাজধানী বাগদাদে বছরের পর বছর ধরিয়া বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে খাদ্যদ্রব্যের অগ্নিমূল্য ও জনসাধারণের শোচনীয় দুর্গতি এবং খাদ্যাভাবে মৃত্যু প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের ঘটনাপঞ্জীতে বছরের পর বছর উল্লেখিত হইতে থাকে।

এই সকল রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বিপর্যয়ের ফলে মুসলমানদের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা খর্ব ও নিস্তেজ হইতে থাকে। এই জরাজীর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা ও এই প্রাণহীন রাষ্ট্রীয়-সংস্থা বাহির হইতে সামান্য আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মোঙ্গল আক্রমণ এই অধোগতির চূড়ান্ত পরিণতি মাত্র। হিট্টি বলেন, "রুগ্ন ব্যক্তি পূর্বেই মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিল; তখন সিঁধেল চোরেরা দরজা ভাঙ্গিয়া ঢুকিল এবং রাজকীয় উত্তরাধিকার হইতে তাহাদের অংশটুকু ছিনাইয়া লইয়া গেল।"

চেঙ্গীজ খানের পৌত্র হালাগুখান ১২৫৩ খ্রীস্টাব্দে এক বিশাল মোঙ্গল-বাহিনী লইয়া মঙ্গোলিয়া হইতে পুনরায় ধ্বংসযজ্ঞের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। হালাগু শেষ আব্বাসী খলীফা মুস্তাসিমকে (১২৪২—১২৫৮) ইসমাঈলী এসাসিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহযোগিতা করার আহ্বান জানাইয়া পত্র লিখিলেন। ১২৫৬ খ্রীস্টাব্দে মোঙ্গলগণ এসাসিনদের আলামুতের প্রধান ঘাঁটি-সমেত সকল পার্বত্যকেন্দ্রগুলি দখল করিয়া ইহাদের সন্ত্রাসজনক কার্য-কলাপের অবসান ঘটাইলেন। পর-বৎসর হালাগুখান খলীফাকে একটি চরমপত্র প্রেরণ করিয়া বাগদাদ নগরীর বহিঃপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিবার দাবী জানাইলেন। ১২৫৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বাগদাদ আক্রমণ করা হইল। উজীর ইবনুল কামী একদল প্রতিনিধিসহ হালাগুর দর্শন প্রার্থনা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইলেন। মুসলমানদের মধ্যে খিলাফত সম্পর্কে যে-অন্ধ বিশ্বাস বহুকাল ধরিয়া প্রচলিত ছিল, হালাগু খানকে তাহা বলা হইল,—"যদি খলীফাকে হত্যা করা হয়, তাহা হইলে সমগ্র বিশ্ব বিশৃঙ্খলায় ভরিয়া উঠিবে, সূর্য তাহার মুখ লুকাইবে, বৃষ্টিপাত বন্ধ হইবে এবং গাছপালা আর গজাইবে না।" কিন্তু ধ্বংসযজ্ঞের নায়ক ইহাতে ভীত

হইবার পাত্র ছিলেন না। ফেব্রুয়ারীর ১০ তারিখে মোঙ্গলবাহিনী নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিল। খলীফা তাঁহার তিনশত কর্মচারিসহ হালাগুর নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইল। নগরীতে লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগ চলিতে লাগিল। খলীফার পরিবারবর্গসহ নগরীর অধিকাংশ জনসাধারণ ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। মুসলিম জগতের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম এমন অবস্থার সৃষ্টি হইল যে, জুমার খুৎবায় উচ্চারণের নিমিত্ত কোন খলীফাই রহিল না। আব্বাসীয় খিলাফতের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে খিলাফতের প্রাথমিক অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

বিস্তারিত পাঠ্য

হিট্টি, হিস্ট্রি অব দি এরাব্স্
ম্যুর, কলিফেট

৩৭

আব্বাসীয় শাসনপদ্ধতি

আব্বাসীয় খলীফাগণ যে-শাসনপদ্ধতি প্রবর্তন করেন, তাহা পরবর্তী-যুগে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এই শাসন-পদ্ধতির বিবর্তনে ইসলামের অনুশাসন, বিভিন্ন খলীফার ব্যক্তিগত চরিত্র এবং বিশেষ করিয়া শাসনকার্যে নিযুক্ত প্রতিভাবান ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টা কার্যকরী হইয়াছিল। ইহা ছাড়া আব্বাসীয় যুগে অনারব মুসলমানদের মধ্য হইতে বহু রাজনৈতিক প্রতিভার আবির্ভাব ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে ইঁহাদের নিযুক্তির ফলে বহু পারসিক ও অনারব প্রথাও আব্বাসীয় শাসন-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হয়। সব কিছুর সমন্বয়ে যে-শাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে, তাহার সুদূরপ্রসারী প্রভাব আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের পরেও বিভিন্ন দেশে মুসলিম শাসনকে প্রভাবিত করিয়াছিল।

রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন খলীফা। তিনি বে-সামরিক, সামরিক ও বিচার বিভাগীয় কার্য তিনজন উচচপদস্থ কর্মচারীর উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ইঁহারা হইলেন উজীর, প্রধান সেনাপতি ও কাজীউল কুজাত। খলীফার দুইজন ব্যক্তিগত কর্মচারী ছিলেন। একজনের নাম হাজিব। তিনি দূত বা অন্য দর্শনার্থীদিগকে খলীফার সান্নিধ্যে হাজির করিতেন। অপরজনের নাম জল্লাদ। ইনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত লোকদিগকে মৃত্যুদণ্ড দিতেন। খলীফার দেহরক্ষীদের প্রধানও রাষ্ট্রে বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন।

খলীফার পরেই রাষ্ট্রে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন উজীর। এই পদটি পারসিক শাসনব্যবস্থা হইতে গৃহীত হইয়াছিল। খলীফা হারুনুর রশীদের সময় পারসিক বারমাকী বংশের ইয়াহিয়া সর্ব-প্রথম উজীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আল-মাওয়ারদী উজীরকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যাঁহারা সর্বক্ষমতার অধিকারী, তাঁহা-দিগকে উজীর-তাফবীজ এবং যাঁহারা সীমিত ক্ষমতার অধিকারী, তাঁহাদিগকে উজীর-তানফিদ বলা হইত। কিন্তু এই শ্রেণী-বিভাগ বাস্তব-ধর্মী নয়। কারণ খলীফা ও উজীরের মধ্যে কি সম্পর্ক হইবে, তাহা কোন নিযুক্তিপত্রে নির্ধারিত করিয়া দেওয়া সম্ভব ছিল না। খলীফা

উজীর

শক্তিশালী হইলে উজীরের ক্ষমতা সীমিত হইতে বাধ্য ছিল, কিন্তু খলীফা অমনোযোগী বা দুর্বল হইলে উজীরগণ অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারিতেন। উজীরের প্রধান কাজ ছিল, সকল বিভাগীয় প্রধানদের কার্যের তদারক করা। এই বিভাগীয় প্রধানগণ প্রায়শঃ উজীর কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। কোন কোন সময় এই বিভাগীয় প্রধানগণকেও উজীর আখ্যায়িত করা হইত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা উজীর ছিলেন না।

সরকারী কার্য বিভাগ বা দীওয়ান

আব্বাসীয় শাসন বিভাগকে দীওয়ান বলা হইত। এই সকল দীওয়ানের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান: (১) দীওয়ানুল-খারাজ—রাজস্ব বিভাগ, (২) দীওয়ানুল নাফাকাহ—ব্যয় নির্বাহ বিভাগ, (৩) দীওয়ানুল-জুনদ—সৈন্য বিভাগ, (৪) দীওয়ানুল মাওয়ারী ওয়াল গিলমান—ক্রীতদাস ও মুক্তিপ্রাপ্ত দাস সংক্রান্ত বিভাগ, (৫) দীওয়ানুল-বির ওয়াস-সাদাকাত—বদান্যতা বিভাগ, (৬) দীওয়ানুত-তওকী—নালিশ বিভাগ, (৭) দীওয়ানুন-নাজর ফিল-মাজালিস—নালিশের বিচার-বিভাগ, (৮) দীওয়ানুল-বারীদ ওয়াল-আখ্‌বার—ডাক ও গুপ্তচর বিভাগ, (৯) দীওয়ানুশ-শুরতা—পুলিশ বিভাগ, (১০) দীওয়ানুল-ফদ ওয়াল খাতাম—পত্রাদির সিলমোহর-করা ও খোলার বিভাগ, (১১) দীওয়ানুজ জিমাম বা আজিম্মা—হিসাব-পরীক্ষা বিভাগ।

দীয়ানুল খারাজ বা রাজস্ব-বিভাগ

আব্বাসীয় যুগে রাজস্ব-বিভাগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই বিভাগের প্রধানকে সাহিব দীওয়ানুল খারাজ বা সাহিবুল খারাজ বলা হইত। উজীরের পরে তিনিই রাষ্ট্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। বস্তুতঃ রাজস্ব ব্যতীত খলীফার শাসন চলিতে পারিত না, কাজেই উজীরের প্রধান কাজ ছিল রাজস্ব-সচিবের সহযোগিতায় রাষ্ট্রীয় তহবিল পূর্ণ করা। রাজস্ব পূর্ববর্তী উমাইয়া যুগের মতই জাকাত, জিজিয়া, খারাজ হইতে সংগৃহীত হইত। জাকাত মুসলমানদের জন্য অবশ্য দেয়। ইহা আবাদী জমি, গৃহপালিত পশু, স্বর্ণ, রৌপ্য এবং পণ্য দ্রব্যেরউপর ধার্য হইত। এই উপায়ে সংগৃহীত অর্থ মুসলমানদের মধ্যে দরিদ্র, ইয়াতীম, নিরাশ্রয় ও ধর্মযুদ্ধে যোগদানকারী স্বেচ্ছা-সেবকদের জন্য ব্যয়িত হইত। মুসলমান দাস-দাসী ও যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির জন্যও এই অর্থ ব্যয় করা হইত। অমুসলমানদের নিকট হইতে জিজিয়া ও ভূমি-রাজস্ব আদায় করা হইত। ইহা ছাড়া যুদ্ধবিরতির শর্ত হিসাবে এককালীন অর্থও আদায় করা হইত। তবে ভূমি-রাজস্বই (খারাজ) ছিল আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস।

ভূমি রাজস্ব প্রধানতঃ তিন পদ্ধতিতে সংগৃহীত হইত। ইহাদের নাম মুকাতামা, মিসাহা ও মুকাসামা। মুকাতামা বড় বড় জমার ক্ষেত্রে জমিদার বা তৎসমতুল্য জোতদারগণের নিকট হইতে গৃহীত রাজস্বের নাম। মিসাহা প্রকৃত চাষকৃত জমির উপর মাপের পদ্ধতিতে গৃহীত রাজস্বের নাম। মুকাসামা প্রকৃত চাষকৃত জমির উপর ফসলের অংশবিশেষ (যেমন ১/৪, ১/৩ বা ১/২) হিসাবে ধার্য-কর। ইহা ফসল মাড়াইয়ের সময় ফসলের সাহায্যে কিংবা ফসলের মূল্য দ্বারা পরিশোধ্য ছিল।

আব্বাসীয় যুগের প্রথম দিকে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের ফলে রাজস্ব আদায়ের নূতন নূতন কর চালু হয়। এই সকল কর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নূতন বলিয়া ইহাদিগকে ধর্মানুমোদিত মনে করা হইত না। তাই এই সকল করকে ধর্মীয় ভাষায় মুকুস বা বে-আইনী কর বলিয়া ধরা হইত। খলীফাদের একাধিক অনুশাসনে এই সকল করকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইলেও রাষ্ট্রীয় করের তালিকায় এই সকল করের পুনরাবৃত্তি এ-কথাই প্রমাণিত করে যে, ব্যবহারিক জীবনে এই সকল কর সব সময় আদায় করা হইত এবং ভূমি-রাজস্বের পর এই জাতীয় কর হইতে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণই খুব বেশী ছিল। এই সকল করের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের উপর ধার্য শুল্ক। এই শুল্কের নাম ছিল 'মাআসির'। এই নামের উৎপত্তি শিকল বা রজ্জু হইতে। নদীতে নৌকা ইত্যাদি যাহাতে কর ফাঁকি দিয়া পার হইয়া যাইতে না পারে, তজ্জন্য স্থানবিশেষে এইগুলিকে আগলাইয়া রাখার জন্য যে-শিকল বা রজ্জু ব্যবহার করা হইত, তাহার নাম মা'সার। পরে এই করকেই এই নাম দেওয়া হইয়াছে। এই ধরনের আর একটি করের নাম ছিল জলকর। নদীর যে-কোন রকমের ব্যবহারের জন্য এই কর ধার্য করা হইত। দোকান বা ঘর-বাড়ির উপর যে-কব ধার্য হইত, তাহার নাম ছিল মুস্তাগাল্লাত। বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের উপর আবগারী শুল্ক ধার্য হইত। বিক্রিত দ্রব্যের উপর বিশেষতঃ কাপড়ের উপর বিক্রয় কর বসান হইত। বিভিন্ন খনির উপর এবং বনের উপরও কর বসান হইত। মালুল-জাহবাজা নামক এক প্রকার অতিরিক্ত কর রাজস্ব আদায়ের খরচ কিংবা অপূর্ণ অথবা ভাঙ্গাচোরা মুদ্রার সাহায্যে রাজস্ব দেওয়ার সময় ক্ষতি পূরণ বাবদ গৃহীত হইত। এই সকল নিয়মিত কর ছাড়া রাষ্ট্রের অনিয়মিত আয়ের মধ্যে প্রধান ছিল মৃত লোকের পরিত্যক্ত লাওয়ারিশ সম্পত্তি এবং উজীর ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারী

কর্মচারির মৃত্যুর পর তাঁহাদের বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি। এই সকল কর্মচারির পদচ্যুতির পর তাঁহাদের সম্পত্তি প্রায়শঃ বাজেয়াপ্ত করা হইত। প্রয়োজনবোধে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের নিকট হইতে জোরপূর্বক অর্থ আদায় করা হইত। শান্তিভঙ্গের জন্য কোন বিশেষ এলাকার উপর পাইকারী জরিমানা ধার্যের দৃষ্টান্তও এই যুগে দেখা যায়। আব্বাসীয় যুগের বিভিন্ন সময়ে সমগ্র সাম্রাজ্যের মোট রাজস্বের একটি তালিকা পাদটীকায় দেওয়া হইল।*

রাষ্ট্রের আয়ের সম্বন্ধে যেমন মোটামুটি ধারণা করা যায়, ব্যয় সম্বন্ধে তেমন ধারণা করা সম্ভব নয়। বিশেষ বিশেষ উৎসব অথবা অনুষ্ঠান উপলক্ষে খলীফা, তাঁহার উচ্চপদস্থ কর্মচারী কিংবা অন্যান্য শাসকগণের বদান্যতার বহু দৃষ্টান্ত ঐতিহাসিকগণের বর্ণনায় পাওয়া যায়। বিবাহ-শাদী উপলক্ষেও বিপুল অর্থ ব্যয়িত হইত। দরবারের শান-শওকতে, দালান-কোঠা নির্মাণে ও আসবাবপত্র এবং সাজ-সজ্জায় বহু অর্থ খরচ হইত। বাইজান্টাইনদের সহিত যুদ্ধে ও বিদ্রোহ দমনে প্রচুর টাকা-পয়সা ব্যয় করা হইত। আব্বাসীয়গণের শাসন-বিভাগ ও উহাদের কর্মচারির সংখ্যা ছিল বিপুল। এই সকল কাজেও অনেক অর্থের প্রয়োজন হইত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এতদসত্বেও প্রাথমিক যুগের খলীফাগণ মৃত্যুর সময় রাজকোষে প্রচুর অর্থ জমা রাখিয়া যাইতে পারিতেন। মনসূরের মৃত্যুর সময় রাজকোষে ৬০,০০.০০,০০০ দিরহাম এবং ১,৪০,০০,০০০ দীনার ছিল; হারূনুর রশীদের তহবিলে ৯০,০০,০০,০০০ দিরহাম পাওয়া যায় এবং মুকতাফীর মৃত্যুর সময় (৯০৮ খ্রীঃ) এই সংখ্যা ছিল ১০,০০,০০,০০০ দীনার।

অন্যান্য শাসন বিভাগের মধ্যে নালিশের বিচার-বিভাগ (নজর ফিল

---

* শাসকের নাম অথবা সময়	মোট রাজস্ব
হারূনুর রশীদ	৫৩০,৩১২,০০০ দিরহাম (ক্রেমার)।
মামুন	৩৩১,৯২৯,০০৮ ” (ইবনখলদুন)।
মুতাসিম	৩৮৮,২৯১,৩৫০ ” (কুদামা)।
মুকতাদির	১৪,৫০১,৯০৪ দীনার (ক্রেমার)।
৯১০খ্রীঃ—৯৬০ খ্রীঃ	২৯০,০৩৮,০৮০ দিরহাম
	২৯৯,২৬৫,৩৪০ ” (ইবনখুরদাজবিহ)।
বুওয়াইহী আদুদুদ্দৌলা	৩৬০,০০০,০০০ ” (ইবনুল-জওজী)।

মাজালিম), পুলিশ-বিভাগ (দীওয়ানুশ-শুরতা), ডাক ও গুপ্তচর-বিভাগ (দীওয়ানুল বারীদ ওয়াল আখবার) এবং বিচার-বিভাগ প্রধান। 'নজর-ফিল-মাজালিম' সরকারী কর্মচারিদের বিরুদ্ধে খলীফার নিকট সরাসরি নালিশের ভিত্তিতে এই সকল বিষয়ে খলীফার রায় প্রদানের নাম।

অভিযোগ-বিভাগ

উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক প্রজাসাধারণের নালিশ শুনিবার জন্য নির্দিষ্ট দিনে দরবারে বসিতেন। খলীফা দ্বিতীয় উমরও এই রীতি চালু রাখিয়াছিলেন। আব্বাসীয় খলীফাদের মধ্যে মাহদী প্রথম এই প্রথা চালু করেন। হাদী, হারুন ও মামুন এই রীতি অনুসারে জনসাধারণের নিকট হইতে অভিযোগ শ্রবণ করিতেন। খলীফা মুহতাদীর সময় (৮৬৯--৭০) পর্যন্ত এই প্রথা চালু ছিল। নরম্যান রাজা দ্বিতীয় রগার (Roger) সিসিলিতে এই প্রথা প্রবর্তনের পর ইহা ইউরোপে প্রসার লাভ করে।

পুলিশের কর্তাকে সাহিবুশ-শুরতা বলা হইত। প্রত্যেক শহরেই পুলিশবাহিনী থাকিত। পুলিশের প্রধানগণ রাজ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতেন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় তাঁহার দায়িত্ব ছিল অপরিসীম। ধর্মীয় বিধি-নিষেধ, যথা—জুয়াখেলা, সুদ গ্রহণ, মদ্যপান ইত্যাদি নিষিদ্ধ কাজ হইতে লোকজনকে বিরত রাখা, বাজারে সঠিক ওজন বলবৎ করা প্রভৃতির কাজের ভারপ্রাপ্ত অন্য বিশেষ পুলিশের নাম ছিল মুহতাসিব। জনসাধারণের নৈতিক মান উঁচু রাখা ও গর্হিত কাজ বারণ করা তাঁহার প্রধান কাজ। আব্বাসীয় যুগে ডাক বিভাগের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এই বিভাগের প্রধানকে সাহিবুল-বারীদ বলা হইত। উমাইয়া যুগে মু'আবিয়া এবং আবদুল মালিক ডাক বিভাগের বুনিয়াদ কায়েম করেন। আব্বাসীয় খলীফাদের মধ্যে হারুনুর-রশীদ ডাক-বিভাগের সম্প্রসারণ করেন। রাজধানীকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শহরের সহিত রাস্তা-ঘাটের সাহায্যে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইত। এই সকল পথে ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর অদল-বদল করিয়া ডাক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হইত। পারস্যে গাধা ও ঘোড়ার প্রচলন ছিল বেশী, আর সিরিয়ায় ও আরবদেশে উটের সাহায্যে ডাক আনা-নেওয়া হইত। সরকারী কাজেই ডাক-বিভাগের ব্যবহার বেশী হইত; তবে সাধারণ লোকেরাও চিঠিপত্র এবং অন্যান্য জিনিসপত্র পাঠাইবার জন্য মাশুল দিয়া সীমিতভাবে এই বিভাগের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিত।

পুলিশ-বিভাগ

ডাক-বিভাগ

চিঠিপত্র আদান-প্রদানের জন্য পোষমানা কবুতরের ব্যবহার এই যুগে জানা ছিল। নাস্তিক বাবকের পরাজয় ও বন্দী হওয়ার সংবাদ বাগদাদে খলীফা মুতাসিমের নিকট কবূতরের সাহায্যে প্রেরণ করা হয়।

আব্বাসীয় যুগে বাগদাদে ডাক-বিভাগের সদর দফতরে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের রাস্তা-ঘাট, যাত্রীদের সুবিধার জন্য স্থাপিত স্টেশন ও দুই স্টেশনের মধ্যকার দূরত্ব ইত্যাদি বিষয়ে প্রামাণ্য বিবরণ রাখিয়া দেওয়া হইত। এই সব বিবরণীর দ্বারা পথচারী, সওদাগর ও তীর্থযাত্রীদের বিশেষ উপকার হইত। এই সকল বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়া ভৌগোলিক-গণ অনেক পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। 'আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক' নামক গ্রন্থ রচয়িতা ইবন খূরদাজবিহ্ একজন পোস্ট-মাস্টার (সাহিবুল-বারীদ) ছিলেন এবং সরকারী রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই সকল পুস্তক হইতে তদানীন্তন আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান পথ-ঘাটের সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পথ ছিল খুরাসান পথ। এই পথ বাগদাদ হইতে হামাদান, রায়, নিশাপুর, তুস, মার্ভ, বুখারা, সমরকন্দ হইয়া চীনের সীমান্ত পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল। এই রাজপথের উপর অবস্থিত প্রধান প্রধান শহর ও নগর হইতে উত্তরে ও দক্ষিণে বহু শাখাপথ চলিয়া গিয়াছিল। আর একটি প্রধান পথ বাগদাদ হইতে দাজলার তীর ধরিয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া ওয়াসিত, বসরা ও খুজিস্তানের মধ্য দিয়া শিরাজে চলিয়া গিয়াছে। এই রাজপথ হইতে বহু শাখা পশ্চিমে ও পূর্বে চলিয়া গিয়াছে। এই সকল পথে তীর্থযাত্রী ও বাণিজ্য কাফেলা যাতায়াত করিত। তীর্থ-যাত্রীদের জন্য ও পথচারী মুসাফিরদের জন্য রাস্তার পার্শ্বে বহু সরাইখানা, পানির ফোয়ারা ও কূপের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইত। তৃতীয় প্রধান রাজপথ বাগদাদকে উত্তর-পশ্চিমের শহর মসুল, আমিদ এবং অন্যান্য সীমান্তবর্তী এলাকার সহিত সংযুক্ত করিয়াছিল। বাগদাদ হইতে আর একটি রাজপথ পশ্চিমে আনবার ও রাক্কা হইয়া দামিস্ক পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে।

ডাক ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান ব্যতীত প্রধান পোস্ট-মাস্টারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য ছিল। তিনি গুপ্তচর বিভাগেরও প্রধান ছিলেন। প্রাদেশিক পোস্ট-মাস্টারগণ হয় তাঁহার নিকট কিংবা খলীফার নিকট সরাসরি স্থানীয় সরকারী কর্মচারিদের কাজ-কর্ম ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করিতেন। ইঁহারা গভর্নরের আচার-ব্যবহার সম্পর্কেও রিপোর্ট

পাঠাইতেন। গুপ্তচর-বৃত্তির জন্য সওদাগর, ফেরিওয়ালা কিংবা ভ্রমণকারীর বেশে লোক নিযুক্ত করা হইত। মামুনের গোয়েন্দা-বিভাগে বহু বর্ষিয়সী রমণী কাজ করিতেন।

মুসলিম রাজ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা একটি ধর্মীয় কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এইজন্য খলীফা ফকীহ্ (আইনজ্ঞ) শ্রেণীর লোকদের মধ্য হইতে কাজী নিযুক্ত করিতেন। এই বিভাগের প্রধানকে কাজীউল-কুজাত বলা হইত। বিখ্যাত আইনজ্ঞ ইমাম আবু ইউসুফ সর্বপ্রথম কাজীউল কুজাত উপাধিপ্রাপ্ত হন। তিনি মাহ্দী ও তাঁহার দুই পুত্র হাদী ও হারূনের সময় উক্ত পদ অলংকৃত করেন। কাজীর যোগ্যতা ও গুণাবলির মধ্যে কুরআন ও সুন্নার জ্ঞান, ইজমা অর্থাৎ সাধারণ সম্মতির অবগতি এবং ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার যোগ্যতার (ইজতিহাদ) উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কাজীকে পুরুষ, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ-মস্তিষ্ক, স্বাধীন (গোলাম নহে), মুসলমান, চরিত্রবান, দৃষ্টি ও শ্রবণ-শক্তিসম্পন্ন হইতে হইবে। অমুসলমানগণ সাধারণতঃ তাহাদের ধর্মীয় গুরু বা ধর্মীয় সংস্থার আওতাধীন ছিল। আল-মাওয়ারদী দুই প্রকার বিচারকের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন—সাধারণ ও ব্যাপক ক্ষমতাপ্রাপ্ত (কাজী মতলক) এবং বিশেষ ও নির্ধারিত কার্যে নিযুক্ত কাজী (কাজী খাস)। প্রথম শ্রেণীর কাজীগণের কর্তব্যের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি, ধর্মীয় বিধি-নিষেধ লংঘনের জন্য শাস্তি বিধান (হুদুদ), দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের তত্ত্বাবধান, মৃতের উইল ইত্যাদি যথাযথ প্রতিপালনের ব্যবস্থা, ইয়াতীম, নাবালক ও অন্যান্য অসহায়দের তত্ত্বাবধান ইত্যাদি প্রধান। কাজীগণ তাঁহাদের কার্য নির্বাহের জন্য নায়েব (সহকারী) নিযুক্ত করিতে পারিতেন। ইহা ছাড়া তাঁহার একজন কাতিব (দবীর), হাজিব এবং একজন খাজিন (কোষাধ্যক্ষ) থাকিত। ইঁহারা সকলেই সরকারী বেতনভুক ছিলেন। এই যুগের ফকীহ্‌দের মধ্যে সরকারের অধীনে কাজী পদে নিযুক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে একটি সাধারণ অনিচ্ছা দেখা যায়। অধিকাংশ ফকীহ কাজী হইতে চাহিতেন না। যদিও-বা কেহ অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর রাজী হইতেন, তবে তিনি এই শর্তে রাজী হইতেন যে, তিনি সরকারী তহবিল হইতে কোন বেতন গ্রহণ করিবেন না এবং তাঁহাকে কোন শরীয়তবিরোধী কাজ করিতে বাধ্য করা হইবে না। ইঁহাদের কেহ কেহ খেলাতাদি (উপঢৌকণ, পোশাক ইত্যাদি) গ্রহণ করিতেও পরাঙমুখ ছিলেন।

বিচার-বিভাগ

আব্বাসীয় যুগে খলীফাদের দেহরক্ষী-বাহিনী খুব শক্তিশালী ছিল। ইহারা প্রথমে খুরাসানী, পরে তুর্কী ও দায়লমী ছিল। দেহরক্ষীর প্রধান খুব ক্ষমতাশালী ছিলেন। সৈন্যবাহিনী দুই প্রকারের ছিল।

সৈন্য-বিভাগ

যাহারা নিয়মিত চাকুরীতে ছিল এবং সরকারী তহবিল হইতে বেতনপ্রাপ্ত হইত, তাহাদিগকে বলা হইত 'মুরতাজিকা'। আর যাহারা যুদ্ধের সময় সৈন্য–বিভাগে যোগদান করিত এবং রেশন ও ভাতাপ্রাপ্ত হইত, তাহাদিগকে বলা হইত 'মুতাতাওইয়া' অর্থাৎ স্বেচ্ছাবাহিনী। দেহ-রক্ষীবাহিনী ভাল বেতন পাইত এবং উত্তম সাজে সজ্জিত থাকিত। আব্বাসীয় যুগের প্রথমদিকে একজন পদাতিকের বেতন ছিল বাৎসরিক ৯৬০ দিরহাম। ইহা ছাড়া সে রেশন ও অন্যান্য ভাতা পাইত। অশ্বারোহী-সৈন্য পদাতিকের দ্বিগুণ বেতন পাইত। খলীফা মামুনের সময় ইরাকের সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ছিল ১,২৫,০০০। সৈনিকদের বেতন অন্য লোকের বেতনের তুলনায় খুব বেশীই ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, মনসূরের সময় একজন ভাল রাজমিস্ত্রীর বেতন ছিল দৈনিক এক দিরহাম এবং একজন শ্রমিকের বেতন ছিল মাত্র $\frac{1}{6}$ দিরহাম।

নিয়মিত সেনাবাহিনীর মধ্যে পদাতিক (হারবিয়া), ধানুকী (রামিয়া) এবং অশ্বারোহী (ফুরসান) এই তিন প্রকার সৈন্য ছিল। পদাতিকগণ বর্শা, ঢাল ও তরবারি দ্বারা সজ্জিত ছিল। ধানুকিগণ ঢাল-তরবারির সহিত তীর-ধনুক রাখিত। অশ্বারোহিগণ শিরস্ত্রাণ ও উরস্ত্রাণ পরিহিত থাকিত এবং দীর্ঘ বর্শা ও সমর-কুঠার রাখিত। ধানুকীদের সহিত অদাহ্য পোশাক পরিহিত একদল নেপথা-নিক্ষেপক (নাফফাতুন) থাকিত। ইহারা শত্রুদের প্রতি নেপথা বা অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করিত। অবরোধ যন্ত্রপাতি-সহ (যেমন মানজানিক) একদল ইঞ্জিনিয়ারও সেনাবাহিনীর সহিত যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গমন করিত। এইরূপ একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারের নাম ইয়াকুব ইবন সাবির আল-মানজানিকী। তিনি খলীফা আন-নাসিরের সময়কার ছিলেন। নিয়মিত সেনাদলে কর্মজীবন আরম্ভ করিয়া তিনি পরে ইঞ্জি-নিয়ারদের প্রধান হইয়াছিলেন। যুদ্ধ-কৌশল সম্পর্কিত 'উমদাতুল মাসালিক' নামক একখানি পুস্তকের লিখক হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি রহিয়াছে। এই পুস্তকে যুদ্ধের শ্রেণী-বিন্যাস, দুর্গ দখল, দুর্গ নির্মাণ, অশ্বারোহণ কৌশল, কারিগরি বিদ্যা, দুর্গ অবরোধ, অশ্বের কুচকাওয়াজ, অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা, সামরিক কলকব্জা প্রস্তুত, সম্মুখ যুদ্ধ, বিভিন্ন

প্রকারের অশ্ব ও অশ্বারোহির গুণাবলী প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সহিত একদল ডাক্তার এবং প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রসহ একটি হাসপাতাল থাকিত। এই হাসপাতালের সহিত উষ্ট্র-পৃষ্ঠে স্থাপিত শিবিকার আকৃতি এ্যাম্বুল্যান্সও থাকিত। হারুনুর রশীদের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে এই সকল ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। তাঁহার ও তাঁহার পুত্র মামুনের সময় হাসপাতালের সাজ-সরঞ্জাম, যথা তাঁবু ইত্যাদি এবং ঔষধ-পত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বহনের জন্য বহু উট ও খচ্চরের প্রয়োজন হইত। এই প্রথা খিলাফতের পত্তনের যুগেও চালু থাকে এবং সেলজুক সুলতান মাহমুদের সময়ও হাসপাতালের জন্য ৪০টি উটের বোঝাই মালপত্রের প্রয়োজন হইত। রাজকীয় সেনাবাহিনী ও দেহরক্ষী-দল ব্যতীত আরও এক প্রকার সেনাদলের কথা জানা যায়। ইহারা ছিল ভৃত্যের পর্যায়ভুক্ত এবং ক্রীতদাসগণের মধ্য হইতে অল্পবয়স্ক বালকদিগকে সুশিক্ষা দান করিয়া ইহাদিগকে প্রাসাদে রাখিয়া দেওয়া হইত। ইহারা 'সিবয়ানুদ্দার' বা 'গিলমানুদ্দার' নামে অভিহিত হইত।

সেনাবাহিনীর বিভিন্ন স্তরবিন্যাস সম্পর্কে সব সময় একরকম নিয়ম প্রচলিত ছিল না। মাসউদীর মতে, দশজন লোকের উপর একজন আরিফ, একশতজন লোকের উপর একজন নকীব এবং দশজন নকীবের উপর অর্থাৎ এক হাজার লোকের এক দলের উপর একজন কায়িদ থাকিত। দশ হাজার লোকের একদল সেনাবাহিনী একজন আমীর দ্বারা পরিচালিত হইত। সেনাবাহিনীর প্রধানকে রঈসুল-জায়শ, সাহিবুল-জায়শ কিংবা পরবর্তী যুগে ইসপাহসালার (সিপাহসালার) বলা হইত।

সৈন্যদল গতানুগতিক পাঁচটি দলে বিভক্ত হইয়া যুদ্ধ করিত—অগ্র, পশ্চাৎ, কেন্দ্র, ডান ও বাম। আরব সৈন্যদের যুদ্ধযাত্রার দৃশ্য দর্শককে বিস্ময়ে অভিভূত ও ভয়ে বিমূঢ় করিয়া তুলিত। সম্মুখভাগে অশ্বারোহী-দল দ্রুত গমন করিত, উভয় পার্শ্বে তীরন্দাজ বাহিনী তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া চলিত। ইহারা ঘোড়ার সঙ্গে তাল রাখিয়া দৌড়াইতে পারিত। পশ্চাতে অগণিত সংখ্যায় অপূর্ব নিয়ম-শৃঙ্খলার সহিত পদাতিকবাহিনী গমন করিত। ইহাদেরই মধ্যস্থলে খাদ্য, তাঁবু ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া উটের সারি চলিয়া যাইত। পশ্চাদ্ভাগে চলিত অগণিত উট, খচ্চর ও অশ্ব, এ্যাম্বুল্যান্স, ক্ষেপণাস্ত্র, প্রস্তর-নিক্ষেপক-অস্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ও মাল-মাত্তা

লইয়া। খলীফা অথবা শাহজাদাগণ যুদ্ধাভিযানে গমন করিলে জাঁকজমক আরও বাড়িয়া যাইত। দেহরক্ষীদের জমকাল ইউনিফরম, স্বর্ণখচিত রাজকীয় পতাকা, সেনাপতি ও সৈন্যাধ্যক্ষগণের জাঁকজমকপূর্ণ পরিচ্ছদ নয়নাভিরাম ও চিত্তাকর্ষক হইত। অগ্রগামী সেনাদল নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিবামাত্র পরিখা খনন করিয়া অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিত। ইহার পর মূল সৈন্যদল পৌঁছিলে তাঁবুগুলিকে এমন সুবিন্যস্তভাবে সংস্থাপন করা হইত, যেন সচরাচর শহরের মত রাস্তাঘাট, হাট-বাজার ও প্রাঙ্গণ থাকে। সমস্ত কাজ নিয়ম-শৃঙ্খলার সহিত সমাধা হইত। তারপর রসদ বিতরণ করা হইত, শিবিরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইত, উনুনে পাত্র চড়াইয়া দেওয়া হইত এবং সান্ধ্যভোজনের পর এশার নামাজ পাঠান্তে সৈন্যগণ চক্রাকারে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধ বা দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প শুনিত কিংবা বীণা ও বাঁশীর সহিত গীত বা কবিতা পাঠ শ্রবণ করিত।

শত্রুর মুকাবিলা করিবার সময় পদাতিক সেনাবাহিনী বর্গক্ষেত্র গঠন করিত এবং তাহাদের বর্শাফলক সম্মুখে বাঁকাইয়া মাটিতে প্রোথিত করিত। তারপর হাঁটু গাড়িয়া মাটিতে ঢাল নামাইয়া শত্রুর মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকিত। পদাতিকগণের অব্যবহিত পিছনেই ধনুর্ধর ও তীরন্দাজগণ থাকিত। ইহাদের উভয় পার্শ্বে অশ্বারোহীরা থাকিত। শত্রুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তীরন্দাজগণ ঝাঁকে ঝাঁকে অজস্রধারায় তীর নিক্ষেপ করিত। পদাতিক দল তাহাদের স্বস্থানে থাকিয়া বর্শার ব্যবহার করিত। যুগপৎ অশ্বারোহীরা সম্মুখে অগ্রসর হইয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিত। যেই মুহূর্তে শত্রুগণ পশ্চাদপসরণের কোন নমুনা দেখাইত, তৎক্ষণাৎ মূল বাহিনী কিংবা কোন বাহিনী সংরক্ষিত থাকিলে উহার সাহায্যে প্রচণ্ড আক্রমণ করা হইত। শত্রু সৈন্যকে অনুসরণ করিয়া বহুদূর যাইতে হইলে অশ্বারোহী বাহিনী এবং তীরন্দাজদের মধ্যে যাহারা অশ্বারোহী ছিল, তাহারাই এই কার্য সমাধা করিত।

আরবগণের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু যে কেবল তাহাদের উন্নত কলা-কৌশলের মধ্যেই নিহিত ছিল, তাহা নহে; আরবগণ অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে স্থানান্তর গমন করিতে পারিত। গ্রীক বাহিনী খচ্চর, গাধা অথবা ঘোড়ার সাহায্যে মালপত্র টানিত, কিন্তু আরবগণ এই উদ্দেশ্যে উষ্ট্রের ব্যবহার করিত। সৈন্য, খাদ্যদ্রব্য, লটবহর ও যুদ্ধাস্ত্র উটের পিঠে দিয়া আরবগণ অতি অল্প সময়ে একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিত। পার্বত্য যুদ্ধেও আরবগণ পটু ছিল। বাবকের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে আব্বাসীয় বাহিনী দক্ষতা

ও নিপুণতার পরিচয় দেয়। অবরোধের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল শর-নিক্ষেপক যন্ত্র, প্রস্তর নিক্ষেপক মানজানিক ও প্রাচীর ভাঙ্গিবার দাব্বাবা।

প্রাথমিক যুগে আরব নৌ-বহর রাজ্য জয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিলেও আব্বাসীয়দের সময় নৌবহর অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নৌবাহিনী ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী স্বাধীন মুসলিম রাজ্যগুলির একচেটিয়া হইয়া পড়ে। স্পেনের উমাইয়াগণ ও মিসরের ফাতিমী শাসকগণ উন্নতমানের নৌবাহিনীর অধিকারী ছিলেন। পাঁচ রকমের যুদ্ধ জাহাজের নাম এই যুগে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে, যথা—(১) আশশুউনা—বড় যুদ্ধ জাহাজ—ইহাতে করিয়া অস্ত্রশস্ত্র বহন করা যাইত, (২) হাররাকা—ইহাতে ন্যাপথা ও অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য বহন করা হইত, (৩) তাবরাদা—ক্ষিপ্রগতি ছোট নৌকা, (৪) ইশারিয়াৎ ও (৫) সালান্দাৎ। নৌবাহিনীর প্রধানকে আমীরুল বাহর বলা হইত। এই নাম হইতেই এ্যাডমিরাল (Admiral) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

খলীফা মুকতাদিরের সময় আব্বাসীয়গণের সামরিক শক্তি হ্রাস পাইতে থাকে। এই সময় হইতে সৈন্যগণ রাজকীয় কোষাগার হইতে সরাসরি বেতন পাইত না। তাহারা প্রাদেশিক শাসনকর্তা অথবা আঞ্চলিক সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট হইতে বেতন প্রাপ্ত হইত। এই উদ্দেশ্যে উচচপদস্থ কর্মচারিগণকে জায়গীর হিসাবে বিভিন্ন অঞ্চল প্রদান করা হইত। এই সময় কতকগুলি প্রদেশ হইতে কোন রাজস্ব আদায় হইত না। কোন কোন প্রদেশ হইতে পূর্ববর্তী রাজস্বের অংশ বিশেষ মাত্র আদায় হইত। মুকতাদির তাঁহার সভাসদগণকে এই শর্তে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনভার প্রদান করিলেন যে, তাঁহারা যেন নিজ দায়িত্বে রাজস্ব আদায় করিয়া যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করেন ও সৈন্যদের বেতন দান করেন এবং পরিশেষে একটি নির্দিষ্ট অঙ্ক বাগদাদে প্রেরণ করেন। এই প্রথা ইকতা (জায়গীর) নামে অভিহিত হয়। বুওয়াইহী আমীরগণ সৈন্যদিগকে বেতনের পরিবর্তে জায়গীর দানের প্রথা ব্যাপকভাবে চালু করেন। এই জায়গীর প্রথা সলজুকদের আমলে নিয়মিত প্রথা হিসাবে প্রবর্তিত হয়। এই সময় হইতে গভর্নর ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ শহর, অঞ্চল ও প্রদেশ পর্যন্ত জায়গীর হিসাবে শাসন করিতে থাকেন। ইঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনভাবে আপন আপন এলাকা শাসন করিতে থাকেন। এই সামন্ত রাজগণ নির্দিষ্টহারে বাৎসরিক সুলতানকে কর দান করিতেন এবং যুদ্ধের সময় নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য লইয়া সুলতানের পতাকার নীচে যুদ্ধযাত্রা করিতেন। এই সকল সৈন্যের সাজ-সরঞ্জাম ও ভরণপোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁহাদের ছিল।

প্রাদেশিক শাসন: গভর্নর

উমাইয়া খলীফাদের সময় প্রাদেশিক বিভাগগুলি যেমন ছিল, আব্বাসীয়-দের সময় তাহার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। আব্বাসীয়গণের সময় প্রদেশের সীমানা মাঝে মাঝে কিছু কিছু রদবদল হইত এবং ভৌগোলিকগণ কর্তৃক বর্ণিত নামের তালিকার সহিত রাজনৈতিক এলাকাগুলির হুবহু মিল সব সময় ছিল না বলিয়া মনে হয়। তবে প্রাথমিক যুগের প্রদেশ বিভাগগুলির নাম মোটামুটি নিম্নরূপ ছিল:

(১) আফ্রিকা ও সিসিলি, (২) মিসর, (৩) সিরিয়া-প্যালেস্টাইন, (৪) হিজাজ ও ইয়ামামা, (৫) ইয়ামন, (৬) বাহরাইন ও উমান, রাজধানী বসরা, (৭) সাওয়াদ বা ইরাক, (৮) জজীরা. (৯) আজরবাইজান, (১০) জিবাল (Media), (১১) খুজিস্তান, (১২) ফারস (শিরাজ), (১৩) কিরমান, (১৪) মাকরান, (১৫) সিজিস্তান বা সিস্তান, (১৬-২০) কুহিস্তান, কুমিস, তাবারিস্তান, গুর্গান ও আর্মিনিয়া, (২১) খুরাসান, উত্তর-পশ্চিম আফগানিস্তানসহ, (২২) খাওয়ারিজম, (২৩) সুগ্‌দ (বুখারা ও সমরকন্দ শহরসহ), (২৪) ফরগনা।

প্রাদেশিক শাসনকর্তা উজীরের সুপারিশক্রমে নিযুক্ত হইতেন এবং উজীরের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে অপসারিত হইতেন। তাঁহাকে আমীর বলা হইত এবং প্রদেশের সামরিক ব্যাপার, রাজস্ব আদায়, শান্তিরক্ষা, ধর্মীয় অনুশাসন কার্যকরীকরণ, পুলিস বাহিনী গঠন ও জুমার নামাজের ইমামতি করা ইত্যাদি তাঁহার কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হইত। প্রদেশের শাসনকর্তাগণ খলীফার দুর্বলতার সুযোগে স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেন এবং দূরবর্তী অঞ্চলের আমীরগণ এই শাসন কর্তৃত্ব নিজেদের পরিবারে বংশানুক্রমিক করিবার চেষ্টা করিতেন। বিচার বিভাগের মোটামুটি দায়িত্ব আমীরের হাতে থাকিলেও কাজীগণ খলীফা কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন বলিয়া মনে হয়। গভর্নরগণ প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ খলীফার নিকট রাজধানীতে প্রেরণ করিতেন।

বিস্তারিত পাঠ্য তালিকা

হিট্টি, হিস্ট্রি অব দি এরাব্‌স্
কবীর, দি বওয়াইহিদ ডায়ন্যাস্টি অব বাগদাদ
আমীর আলী, হিস্ট্রি অব দি সারাসেন্‌স্

৩৮

আব্বাসীয় যুগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন

আব্বাসীয় যুগে পুরাতন রক্ষণশীল সামাজিক ব্যবস্থা বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়াছিল। আব্বাসীয়গণ পারসিকদের ও অনারবদের সহায়তায় ক্ষমতা দখল করিয়াছিলেন। খলীফাগণ অনারব রমণীদের পাণিগ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহারা অনেকেই জাতিতে পারসিক, গ্রীক, তুর্কী ও আর্মিনীয় ছিলেন। খলীফাগণ দরবারে পারসিক ও তুর্কী দেহরক্ষী, পারসিক উজীর ও কর্মচারী পরিবেষ্টিত হইয়া কালাতিবাহিত করিতেন। উমাইয়া যুগের পুরাতন অভিজাত শ্রেণী ক্ষমতাচ্যুত হইল এবং তাহাদের স্থলে নতুন অনারব অভিজাত শ্রেণী ও শাসকমণ্ডলী গড়িয়া উঠিল। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধনিক ও বণিক শ্রেণী সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিল। এখনকার অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে আমরা ধনাঢ্য ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণকে দেখিতে পাই। জীবনযাত্রার মান অনেক বাড়িয়া যায় এবং ধনী ব্যক্তিগণের বেশ-ভূষায়, সাজ-সরঞ্জামে, আসবাবপত্রে, খানাপিনায় ও বিলাস-ব্যসনে পূর্ববর্তী যুগ হইতে বহু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

সমাজ

আব্বাসীয় খলীফাগণ মহা আড়ম্বরে ও জাঁকজমকে জীবন যাপন করিতেন। চকমকে ইউনিফরম পরিহিত দেহরক্ষীরা তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া থাকিত। খলীফা জানুর নিম্ন পর্যন্ত কাবা পরিধান করিয়া মণিমুক্তা-খচিত কোমরবন্দ কোমরে বাঁধিয়া, কাঁধের উপর মূল্যবান চাদর জড়াইয়া কালান্‌সুয়া নামক চোখা-মাথাবিশিষ্ট টুপি পরিধান করিতেন। এই কালান্‌সুয়া মনসূর কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। বিশেষ দরবার উপলক্ষে খলীফা সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিতেন। দেহরক্ষিগণ খোলা তরবারি হাতে তাঁহার চতুর্দিকে দণ্ডায়মান থাকিত। উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও যুবরাজগণ সিংহাসনের ডাইনে ও বামে সারিবদ্ধ থাকিতেন। খলীফা প্রথমে পরদার অন্তরালে থাকিতেন। পরদা উত্তোলিত হইলে উপস্থিত ব্যক্তিগণের নাম উচ্চারিত হইত। তাঁহারা অভিবাদন করিয়া আসন গ্রহণ করিতেন। এতদুপলক্ষে ভাবী উত্তরাধিকারী খলীফার পার্শ্বে একটি আসনে উপবিষ্ট থাকিতেন।

খলীফাদের জীবনযাত্রা

সভাসদগণ সিংহাসনের উভয় পার্শ্বে বংশ ও পদমর্যাদানুযায়ী দুই সারিতে উপবেশন করিতেন। ঈদুল ফিতর উপলক্ষে খলীফা গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে ভোজে আপ্যায়িত করিতেন।

অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বেশ-ভূষায় খলীফার অনুকরণ করিতেন। ধর্মনেতা ও আইনজ্ঞগণ মাথায় কাল পাগড়ি এবং 'তায়লাসান' নামক রুমাল পরিধান করিতেন। এই যুগে ঢিলা পায়জামা (সারাউইল), কামিজ, নীচের জামা, জ্যাকেট (কুফতান), কাবা, সর্বোপরি পরিহিত আবা বা জুব্বা এবং কালানসুয়া টুপি ভদ্রলোকের সাধারণ পোশাক ছিল। অবস্থাপন্ন লোকেরা মোজা ব্যবহার করিত। পুরুষেরা জুতা ও বুট-জুতা উভয়ই ব্যবহার করিত।

এই যুগে রমণীদের বেশ-ভূষায় অনেক পরিবর্তন লক্ষিত হয়। ধনাঢ্য মহিলারা মণিমুক্তা-খচিত গুম্বজাকৃতি টুপি পরিধান করিতেন। এই টুপির নিম্নভাগে মণি-বসানো বৃত্তাকার মালা থাকিত। হারুনুর রশীদের বৈমাত্রেয় ভগ্নী উলাইয়া এই টুপির প্রচলন করেন। হাতে বালা (আসাবীয়) ও পায়ে মল (খলখল) সচরাচর ব্যবহৃত হইত। গণ্ডদেশ ও ওষ্ঠ রঞ্জিত করার পদ্ধতি পারসিকদের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছিল। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম ফোঁটার ব্যবহার আরবদের মধ্যে বরাবর প্রচলিত ছিল। নুওয়াইরীর মতে আদর্শ সুন্দরীকে ঋজুদীর্ঘ দেহ, পূর্ণচন্দ্রের মত বদনমণ্ডল, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কেশ, তিল বিশিষ্ট গোলাপী গণ্ড, মৃগের মত ডাগর কাল চোখ, নিদ্রালু চক্ষুপুট, ক্ষুদ্র মুখগহ্বরে মুক্তা সদৃশ সুসজ্জিত দন্তপাটি, উন্নত বক্ষ, প্রশস্ত নিতম্ব এবং ক্রমাগত ক্ষীয়মান ও হেনারঞ্জিত-প্রান্ত অঙ্গুলীর অধিকারিণী হইতে হইবে।

সমাজে নারীর স্থান

আব্বাসীয় যুগের প্রথম দিকে স্ত্রীলোকগণ তাহাদের উমাইয়া ভগ্নীদের মতই অবাধে চলাফেরা করিতে পারিত। কিন্তু দশম শতাব্দীর শেষের দিকে ক্রমান্বয়ে অবরোধ প্রথা চালু হইতে থাকে। প্রাথমিক যুগে অভিজাত শ্রেণীর মহিলারা বিশেষতঃ রাজপরিবারের মহিষী ও শাহজাদীগণ সমাজে বিশেষ সম্মানিতা ও সমাদৃতা ছিলেন। মনসুরের সময় দুইজন শাহজাদী বর্ম পরিহিতা হইয়া বাইজান্টাইনদের সহিত যুদ্ধে গমন করেন। সাম্রাজ্ঞী জুবায়দা প্রতিভাশালিনী রমণী ও গুণসম্পন্না কবি ছিলেন। তাঁহার জনহিতকর কার্যের কথা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তিনি হারুনুর রশীদের সময় ও পুত্র মামুনের

সময় রাজকার্যে অংশ গ্রহণ করিতেন। মামুনের পত্নী বুরানও গুণবতী ও দানশীলা ছিলেন। হারুনুর রশীদের মাতা খায়জুরান, তাঁহার ভগ্নী উলাইয়া রাষ্ট্র ও সমাজে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। মুকতাদিরের মাতা দরবারে বসিয়া সভাসদ ও বৈদেশিক রাজদূতগণকে সাক্ষাৎকার প্রদান করিতেন, দরখাস্তকারীদের আবেদন শ্রবণ করিতেন এবং পুরুষের মত রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। সাধারণ আরব রমণিগণও যুদ্ধে যোগদান করিতেন, সৈন্য পরিচালনা করিতেন, কবিতা-কাব্যে পুরুষদের সঙ্গে প্রতি-যোগিতা করিতেন এবং বিশেষ করিয়া গান-বাজনায় সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। খলীফা মুতাসিমের আমলে তবলাবিশারদ উবায়দা নিপুণ তবলাবাদিকা হিসাবে 'উবায়দা আত-তাম্বুরীয়া' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার খ্যাতি সর্বজনবিদিত ছিল এবং তিনি সঙ্গীতও রচনা করিতে পারিতেন। মুতাওয়াক্কিলের আমলে ফযল নাম্নী এক কবি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। শায়খা শুহ্‌দা নাম্নী এক মহিলা দ্বাদশ শতাব্দীতে বাগদাদে ইতিহাস ও সাহিত্যে বক্তৃতা দান করিতেন। তিনি খুশখতের জন্যও খ্যাতি অর্জন করেন। জয়নব উম্মুল মু'আইয়িদ আইন শিক্ষা লাভ করিয়া যোগ্যতার সনদ লাভ করিয়াছিলেন। তাকিয়াহ হাদিস-বিশারদ ও কবি ছিলেন।

মুসলিম সমাজে সর্ব যুগে বিবাহ একটি ধর্মীয় কর্তব্য এবং পারিবারিক জীবন-আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইত। সন্তানের জন্ম, বিশেষতঃ পুত্র সন্তানের জন্ম আল্লাহর নিয়ামত বলিয়া গ্রহণ করা হইত। গৃহকর্ম, স্বামী ও সন্তানের পরিচর্যা স্ত্রী-জাতির প্রথম ও প্রধান কর্তব্য ছিল। সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব মাতার উপর ন্যস্ত ছিল। মেয়েরা সূতা কাটিয়া ও তাঁত বুনিয়া অবসর বিনোদন করিত।

ভদ্রলোক

আরব লেখকদের মতে, ভদ্রলোকের (জরীফ) সংজ্ঞা নিম্নরূপ: তাঁহার ব্যবহার নম্র, তিনি নির্ভীক ও সাহসী, তাঁহার আচরণ মার্জিত, তিনি ঠাট্টা-পরিহাস থেকে বিরত থাকেন, সু-জনের সঙ্গ ভালবাসেন; তিনি সত্যকথনে অভ্যস্ত, প্রতিজ্ঞা পালনে দৃঢ়, গোপন কথা রক্ষায় যত্নবান; তিনি পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করেন, জীর্ণ পোশাক পরিহার করেন, খাওয়ার টেবিলে অল্প অল্প আহার মুখে তোলেন, অল্প কথা বলেন, অল্প হাসেন, খাবার ধীরে ধীরে চিবান, অঙ্গুলী লেহন করেন না, রসুন-পেঁয়াজ বর্জন করেন এবং সর্বসাধারণ্যে দন্তকীলক ব্যবহার পরিহার করেন।

এই যুগে দীওয়ান বা সোফার প্রচলন হয়। এই সোফা কামরার তিন দিকে স্থাপিত হইত। উমাইয়াদের সময় বসিবার জন্য চেয়ারের প্রচলন হইয়াছিল, কিন্তু চতুষ্কোণ গদী (কুশন) মেঝের উপর রাখিয়া উহার উপর আরামে বসাই বেশী জনপ্রিয় ছিল। ঘরের মেঝে কার্পেটে ঢাকা থাকিত। দীওয়ান অথবা কুশনের সম্মুখে ছোট টেবিল রাখিয়া উহার উপর পিতলের তৈরী বড় বড় গোল ট্রেতে খাবার দেওয়া হইত। অবস্থাপন্ন গৃহে ট্রে রৌপ্যের তৈয়ারী হইত এবং কাঠের টেবিল আবলুস, ঝিনুক অথবা কচ্ছপের খোল খচিত করিয়া সুসজ্জিত করা হইত।

ঘরের আসবাবপত্র

চিনির পানিতে তৈয়ারী মিষ্টি শরবৎ, ফলের সিরাপ কিংবা গোলাপ পানির সাহায্যে সুগন্ধযুক্ত করিয়া পরিবেশন করা হইত। কিসমিস বা খেজুর দ্বারা প্রস্তুত নবীজ নামক পানীয়ও প্রচলিত ছিল। মদ্যপান উচ্চস্তরের সমাজে প্রচলিত ছিল। খলীফা, উজীর, নাজীর, উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সকলেই মদ্যপান করিতেন। সঙ্গীতের জলসায়, নাচগানের আসরে মদ্যপান বহুল-প্রচলিত ছিল। এইসব জলসায় খলীফাগণের বিশেষ সহচর থাকিত; তাহাদিগকে 'নাদীম' বলা হইত। কবিরা এই যুগে মদ্যপান সম্পর্কিত 'খামরীয়াৎ' রচনা করিতেন।

পানীয়

এই যুগে মুসলিম সমাজে হাম্মামের প্রচলন খুব বেশী ছিল। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক খতীবের মতে মুকতাদিরের রাজত্বকালে (৯০৮—৩২খ্রীঃ) বাগদাদে ২৭০০ সাধারণের ব্যবহারোপযোগী হাম্মামখানা ছিল। ঐ একই ঐতিহাসিকের মতে অন্য সময় ইহার সংখ্যা ৬০,০০০ পর্যন্ত ছিল। এই সংখ্যা অতিরঞ্জিত মনে হইলেও ইহা দ্বারা হাম্মামের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে বেশ ধারণা করা যায়। হাম্মামখানা অনেকগুলি কামরা লইয়া গঠিত ছিল। ইহার মেঝে মোজাইক করা এবং আভ্যন্তরীণ দেওয়াল মার্বেল পাথরে মোড়া ছিল। আভ্যন্তরীণ প্রকোষ্ঠটি গুম্বজে ঢাকা থাকিত এবং ঐ গুম্বজের রঙীন কাঁচ বা পাথরের মধ্য দিয়া ঘরে আলোক প্রবেশ করিতে পারিত। এই কামরাটিকে উত্তপ্ত পানির বাষ্পের সাহায্যে গরম করা যাইত। কোন কোন হাম্মামখানায় গরম ও ঠাণ্ডা উভয় রকম পানির ব্যবস্থা থাকিত।

হাম্মাম

আব্বাসীয় আমলে পূর্ববর্তী উমাইয়া যুগের ন্যায় খলীফা ও শাহজাদাগণের নিকট মৃগয়া অত্যন্ত প্রিয় ছিল। আমীন সিংহ শিকার করিতে

ভালবাসিতেন। চিতার সাহায্যে শিকার মুতাসিমের খুব প্রিয় ছিল। বাজপাখীর সাহায্যে বা পোষা পাখীর সাহায্যে অন্য পাখী শিকার পুরাতন পারসিক প্রথা। আরবদের মধ্যে ইহার বহুল প্রচলন ঘটে। শিক্ষাপ্রাপ্ত বাজপাখীর সাহায্যে হরিণ, খরগোশ, বুনোহাঁস প্রভৃতি শিকার করা হইত। বড় শিকারের জন্য বাজপাখীর সাথে সাথে পোষা কুকুরের ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। শিকার যাত্রীরা সময় সময় কোন বিশেষ স্থানে বৃত্তাকার ব্যূহ রচনা করিয়া শিকার করিত। ইহাকে 'হালকা' বলা হইত। মুতাসিম দজলা নদীর সহিত ঘোড়ার নালের আকৃতি দেওয়াল তৈয়ার করাইয়া তাহার ভিতরে শিকারগুলিকে ঢুকাইয়া লইতেন। অন্যান্য বহির্দ্বার ক্রীড়ার মধ্যে ছিল তীর-ধনু, পোলো, বর্শা নিক্ষেপ ও ঘোড়দৌড় ইত্যাদি। এই সময়ে কিছু গৃহাভ্যন্তরীণ খেলা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ইহাদের মধ্যে দাবা ও পাশা খেলা প্রধান। হারুনুর রশীদই সর্বপ্রথম দাবা খেলা প্রবর্তন করেন। দাবা (শতরঞ্জ) একটি ভারতীয় খেলা। অভিজাত মহলে পাশার পরিবর্তে দাবা খেলা বিশেষ চালু হয়। হারুনুর রশীদ শার্লিমানের নিকট যে উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি দাবার বোর্ড ছিল।

খেলাধুলা

সাম্রাজ্যের প্রসার, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বিভিন্ন বিলাস সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা, আব্বাসীয় যুগে অপেক্ষাকৃত শান্তি পরিবেশ এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত বিপুল শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত বিপুল উৎপন্ন দ্রব্য ও শিল্পজাত দ্রব্য দূর-দূরান্তের রাজ্যের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথ সুপ্রশস্ত করিয়াছিল। বাগদাদ, বসরা, সীরাফ, কায়রো এবং আলেকজান্দ্রিয়া জল ও স্থলপথের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। পাক-ভারত উপমহাদেশ ও চীন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কের বিষয়ে তৃতীয় মুসলিম শতাব্দীর মুসলমান বণিকদের সমুদ্রযাত্রা, যেমন সুলায়মান আত্তাজিরের সমুদ্রযাত্রার বিবরণ হইতে জানা যায়। পারস্যোপসাগরের সামুদ্রিক বন্দর সীরাফ, বসরা ও উবুল্লা হইতে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে আদন ও লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত বন্দরসমূহ হইতে মুসলমান সওদাগরগণ সমুদ্রপথে পাক-ভারত উপমহাদেশ, সিংহল, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও চীনদেশে চলিয়া যাইত। স্থলপথে সমরকন্দ ও চীনা তুর্কিস্তান হইয়া যে বাণিজ্যপথ চলিয়া গিয়াছিল, ইহাকে 'বৃহৎ রেশম পথ'

অর্থনৈতিক অবস্থা: বাণিজ্য

বলা হইত। চীনদেশের পণ্যদ্রব্যের মধ্যে রেশম প্রধান ছিল। এইজন্য এই বাণিজ্যপথের নাম 'রেশম পথ' হইয়াছিল। এই পথে বাণিজ্য কাফেলার অদল-বদল হইত; কোন এক কাফেলা সারাপথ পরিভ্রমণ করিত না। চীনদেশ হইতে আনীত পণ্যদ্রব্যের মধ্যে ছিল রেশম, রেশমের তৈরী কাপড়, তৈজসপত্র, কাগজ, কালি, স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ও দারুচিনি। পাক-ভারত উপমহাদেশ হইতে আসিত চন্দন কাঠ, আবলুস কাঠ, নারিকেল, চিতাবাঘের চামড়া এমন কি বাঘ, হাতী ও চিতাবাঘ। খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে চীনদেশের সঙ্গে মুসলমানদের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। মুসলমান সওদাগরগণ তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া যাইতেন খেজুর, চিনি, সূতী ও পশমী বস্ত্র, ইস্পাতের যন্ত্রপাতি ও কাঁচের জিনিস।

স্ক্যাণ্ডিন্যাভিয়া অঞ্চলে বিশেষতঃ সুইডেনে সপ্তম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দীর তারিখ অঙ্কিত হাজার হাজার মুসলিম মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি মুসলিম বাণিজ্য বিস্তারের পরিধি সূচিত করে। ভলগা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বহু মুদ্রার প্রাপ্তি এই যুগের সাহিত্যে উল্লিখিত মুসলিম সাম্রাজ্যের সহিত বাল্টিক অঞ্চলের বাণিজ্য সম্পর্কের বিবরণী সত্য বলিয়া প্রমাণিত করে। এই বাণিজ্যপথ কাস্পিয়ান সাগর, কৃষ্ণ সাগর ও রুশিয়ার মধ্য দিয়া বাল্টিক সাগর অঞ্চলে চলিয়া যাইত। এই সকল অঞ্চল হইতে আরবগণ চামড়া, পশম এবং আম্বর (সুগন্ধি) আনিত। বার্ণার্ড লুইস বলেন, সম্ভবতঃ আরবগণ নিজেরা স্ক্যাণ্ডিন্যাভিয়া অঞ্চল পর্যন্ত যাইত না। এই সকল উত্তরাঞ্চলের লোকেরা রুশিয়ায় তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিত। কিংবা ভলগা অঞ্চলের খাজার ও বুলগারগণ উত্তরাঞ্চলের লোকদের সহিত আরবদের মধ্যস্থ হিসাবে কাজ করিত। এই অঞ্চলে আরব বাণিজ্যের প্রভাব হিসাবে দুইটি জিনিসের উল্লেখ করা হয়। সুইডেনের সর্বপ্রাচীন মুদ্রা আরবী দিরহামের ওজনে তৈরী হইত এবং প্রাচীন আইসল্যাণ্ডের সাহিত্যে বহু আরবী শব্দ বিদ্যমান রহিয়াছে। আফ্রিকার সহিতও আরবগণ স্থলপথে ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইত এবং এই অঞ্চল হইতে তাহারা স্বর্ণ ও ক্রীতদাস আমদানী করিত। পশ্চিম ইউরোপের সহিতও আরবদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। এই ব্যবসায়ে ইহুদীগণ মধ্যস্থ হিসাবে কাজ করিত। এই ইহুদীরা আরবী, ফারসী, গ্রীক, ফ্রাঙ্ক, স্পেনীয় ও স্লাভ ভাষা জানিত। ইহারা জল ও স্থল পথে পূর্ব হইতে পশ্চিমে এবং পশ্চিম হইতে পূর্বে যাতায়াত করিত। পাশ্চাত্য হইতে তাহারা খোজা, ক্রীতদাসী,

ক্রীতদাস, ব্রকেড, পশম, তরবারি প্রভৃতি আমদানী করিত। তাহারা পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে জাহাজে মিসরের ফারামা নামক স্থানে অবতরণ করিয়া উষ্ট্রযোগে লোহিত সাগর পর্যন্ত যাইত; সেখান হইতে আবার জাহাজযোগে সিন্ধু, দক্ষিণ ভারত, ও চীনদেশে চলিয়া যাইত। আর এক দল পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এন্টিয়কে অবতরণ করিয়া স্থলপথে জাবিয়া নামক স্থানে গমন করিয়া সেখান হইতে বাগদাদ ও উবুল্লা হইয়া উমান, সিন্ধু, দক্ষিণ-ভারত ও চীনদেশে চলিয়া যাইত।

সুদূরপ্রসারী ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে নবম শতাব্দীতে আরবদের মধ্যে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। রৌপ্য-মুদ্রা দিরহাম এবং স্বর্ণ-মুদ্রা দীনারের মধ্যে আনুপাতিক মূল্যের তারতম্য ঘটায় এক শ্রেণীর মুদ্রা বিনিময়কারীর (সাররাফ) উদ্ভব হয়। নবম শতাব্দীতে ইহারাই ব্যাপকভাবে ব্যাঙ্কের ভূমিকা পালন করিতে আরম্ভ করে। বড় বড় ব্যবসায়িগণ তাহাদের মূলধন ইহাদের নিকট জমা রাখিত। এই সময়ে বাগদাদে প্রধান কেন্দ্র ও অন্যান্য শহরে শাখা অফিসসহ ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠে। এই সকল ব্যাঙ্ক হইতে চেক ও ক্রেডিটপত্র (Letter of Credit) দেওয়া হইত। এই ব্যবস্থা এত সুচারুরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল যে, বাগদাদ হইতে একটি চেক লইয়া মরক্কোতে উহা ভাঙ্গানো যাইত। বসরাতে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা এত প্রসার লাভ করে যে, প্রত্যেক সওদাগর ব্যাঙ্কে হিসাব খুলিতেন এবং বাজারে চেকের সাহায্যে লেন-দেন করিতেন, কখনও নগদ টাকার সাহায্যে লেনদেন করিতেন না। দশম শতাব্দীতে আমরা বাগদাদে সরকারী ব্যাঙ্ক দেখিতে পাই। এই ব্যাঙ্ক হইতে সরকারকে অনাদায়ী রাজস্বের বিনিময়ে বহু নগদ অর্থ ধার দেওয়া হইত। মুসলমানদের মধ্যে সুদ গ্রহণ বে-আইনী হওয়ায় এই সকল ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ প্রায় সকলেই ইহুদী ও খ্রীস্টান ছিলেন।

সেই যুগের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি তৎকালীন সাহিত্যে ও চিন্তাধারায় প্রতিফলিত হইয়াছিল। এই যুগের সাহিত্যে আদর্শ সওদাগরের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সমাজে সওদাগরদের স্থান বহু উচ্চে ছিল। পুরাতন আরব অভিজাত শ্রেণীর পরিবর্তে আমরা শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই। এক শ্রেণী ধনিক ও বণিক, অপর শ্রেণী শিক্ষিত সম্প্রদায়। ধনিক সম্প্রদায়ের প্রাচুর্য সম্পর্কে ধারণা করিতে হইলে দুই একটি উদাহরণ দিতে হয়। বাগদাদে খলীফা মুকতাদিরের আমলে ইবনুল-জাস্সাস নামক

এক জহুরীর ১৬,০০০,০০০ দীনার মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পরও তিনি বেশ ধনী ছিলেন। বসরার বিখ্যাত ব্যবসায়িগণের কয়েকজনের প্রত্যেকের বাৎসরিক আয় ১,০০০,০০০ দিরহামের অধিক ছিল। একজন মিল-মালিকের পক্ষে একশত দীনার দৈনিক দান-সদকায় ব্যয় করা সম্ভব ছিল। সীরাফে একজন সওদাগরের বাড়ী তৈয়ার করিতে গড়ে ১০,০০০ দীনার লাগিত। কাহারও বাড়ী ৩০,০০০, আবার কাহারও বাড়ী ৪,০০০,০০০ দীনারেরও ছিল। সীরাফের এই সকল সওদাগর সারাজীবন সমুদ্রপথে কাটাইত।

ব্যবসা-বাণিজ্যের এত ব্যাপক সমপ্রসারণ কখনও সম্ভব হইত না, যদি সাম্রাজ্যের মধ্যে কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য না থাকিত।

শিল্প

শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে কাপড়-চোপড় প্রধান ছিল। বয়নশিল্পে সর্বাপেক্ষা বেশী লোকজন খাটিত এবং অন্যান্য শিল্পের তুলনায় এই শিল্পের উৎপাদনও বেশী ছিল। কাপড়-চোপড়ের মধ্যে কাটা-কাপড়, জামা-কাপড়, বুটিদার কাপড়, গৃহসজ্জার সামগ্রী, কুশন ও কার্পেট ইত্যাদি প্রধান ছিল। সূতী, সিল্কের তৈয়ারী ও পশমী সব রকমের কাপড়ই তৈরী হইত। মিসরে লিনেন কাপড় তৈরী হইত। সূতা প্রথম পাক-ভারত উপমহাদেশ হইতে আমদানী হইত। পরে পূর্ব পারস্য হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে স্পেন পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম রাজ্যে তুলার চাষ হইত। বাইজানটাইন ও সাসানীয় আমল হইতে পারস্যে সিল্কের কাপড় তৈরী হইত। পারস্যের সিল্কের কাপড় 'টাফেটা' নামে ইউরোপে প্রসিদ্ধিলাভ করে। গুর্গাওঁ ও সিস্তানে সিল্কের কাপড় বেশী তৈরী হইত। কার্পেট সর্বত্র তৈরী হইত, তবে তাবারিস্তান ও আর্মিনিয়ার কার্পেট সর্বোৎকৃষ্ট ছিল। বিভিন্ন স্থানে তৈরী বিশেষ বিশেষ কাপড় ঐসব স্থানের নামানুসারে পরিচিত হইত। বাগদাদে তৈরী এক প্রকার ডুরিদার কাপড় বাগদাদের এক এলাকার নামানুসারে 'আত্তাবী' নামে অভিহিত হইত। অনুরূপ কাপড় স্পেনে তৈরী হইয়া 'তাবী' নামে ইউরোপে বিশেষ প্রসার লাভ করে। কুফায় প্রস্তুত সিল্কের রুমাল এখনও কুফীয়া নামে পরিচিত। এই রুমাল মাথায় বাঁধা হয়। ফারসের বিভিন্ন শহরে কয়েকটি উচ্চমানের কারখানায় কার্পেট, এমব্রয়ডায়রী, ব্রকেড (দীবাজ) ও রাজ-রাজড়াদের জন্য সম্মানের পোশাকে (খিলাত) ব্যবহৃত কাপড় (তীরাজ) প্রস্তুত হইত। তীরাজ কাপড়ে সুলতানের বা খলীফার নাম বা সংকেত লিখিত থাকিত। এই তীরাজ

কাপড় তৈরীর জন্য অনেক সময় সরকারী কারখানাও থাকিত। এই সকল কাপড় শাসকরা নিজে ব্যবহার করিতেন এবং বিশেষ উৎসব উপলক্ষে পদস্থ অফিসার ও সেনাপতিগণকে যৌতুক দেওয়া হইত। খুজীস্তানে এক-প্রকার বুটিদার কাপড় প্রস্তুত হইত, যাহা 'দামাস্ক' নামে পরিচিত ছিল। এই বুটিদার কাপড় প্রথমে দামিস্কে প্রস্তুত হইত বলিয়া ইহার এই নামকরণ করা হয়। বুখারা জায়নামাজের জন্য বিখ্যাত ছিল। সিডন, টায়ার ও অন্যান্য সিরীয় শহরে প্রাচীন ফিনিশীয় কাঁচ-শিল্প মুসলমানদের আমলে সূক্ষ্মতায় ও স্বচ্ছতায় বিশেষ উন্নতি লাভ করে। ক্রুসেডের সময় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যোগাযোগের ফলে সিরিয়ার রঙ্গীন কাঁচ ইউরোপে নীত হয়। পরে এই ধরনের রঙ্গীন কাঁচ গির্জাসমূহে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে থাকে। সিরিয়ার কাঁচ ও ধাতু-নির্মিত ফুলদান নিত্যব্যবহার্য ও শৌখীন উভয় প্রকারের উপাদান হিসাবে প্রসিদ্ধ লাভ করে। রঙীন অনুলিপি সমন্বিত কাঁচের ঝাড় মসজিদে ও প্রাসাদে শোভা পাইত। পারস্যের কাশান অঞ্চলে রঙীন টালি নির্মিত হইত বলিয়া এই শিল্পকে 'কাশানী' বলা হইত। দামিস্কে বহুকাল যাবৎ এই শিল্প সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

মুসলমানদের মধ্যে কাগজের ব্যবহার এবং ব্যাপক উৎপাদন বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি চীনদেশ হইতে সমরকন্দে কাগজ আমদানী হয়। উক্ত শতাব্দীর অবসানের পূর্বেই বাগদাদে প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয়। ইহার পর হইতে মুসলিম সাম্রাজ্যের সর্বত্র বহু কল স্থাপিত হয়। মিসরে ৯০০ খ্রীস্টাব্দে কিংবা তারও পূর্বে, মরক্কোতে ১১০০ খ্রীস্টাব্দে, স্পেনে ১১৫০ খ্রীস্টাব্দে কাগজের কল চালু হয় এবং সাদা ও রঙীন উভয় প্রকার কাগজ প্রস্তুত হইতে থাকে। হল্যাণ্ডের বিখ্যাত লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত ৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের হস্তলিখিত পুস্তক 'গরীবুল-হাদীস' সর্বপ্রাচীন কাগজের নিদর্শন। বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আর একটি প্রাচীন পুস্তক একজন খ্রীস্টান লেখকের দ্বারা ৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। মুসলিম অধ্যুষিত স্পেন ও ইটালী হইতে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাগজ শিল্প ইউরোপে প্রসার লাভ করে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে কাগজ সর্ব-সাধারণের জ্ঞানার্জনের পথ প্রশস্ত করে। মুসলিম জগতে বিখ্যাত কাগজ উৎপাদনের কেন্দ্র ছিল সমরকন্দ, বাগদাদ, দামিস্ক, ত্রিপলী, কায়রো, ফেজ ও ভেলেন্সিয়া।

এই যুগে ধাতব শিল্পও বিশেষ উন্নতি লাভ করে। মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ধাতুর খনি ছিল। পূর্বাঞ্চলের প্রদেশসমূহে, বিশেষতঃ হিন্দুকুশ অঞ্চলে রৌপ্য পাওয়া যাইত। নুবিয়া ও সুদান অঞ্চল হইতে স্বর্ণ আসিত। ইস্পাহানের নিকটে তাম্রখনি ছিল। এই তাম্রখনি হইতে ৫000 দিরহাম সরকারী রাজস্ব পাওয়া যাইত। পারস্য, মধ্য-এশিয়া ও সিসিলিতে লৌহ পাওয়া যাইত। পারস্যোপসাগর হইতে মুক্তা এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে মূল্যবান প্রস্তর সংগৃহীত হইত। এই যুগে জহুরীর শিল্প বিশেষ নৈপুণ্য অর্জন করে। হীরা, মুক্তা, চুনি, পান্না ও নালকান্তমণি রাজা-বাদশাহদের বড় প্রিয় ছিল। হারুনুর রশীদ একটি চুনি ৪0,000 দীনার ব্যয়ে অর্জন করিয়াছিলেন। খলীফা মুকতাফীর ২0,000,000 দীনার মূল্যের অলংকার ও সুগন্ধিদ্রব্য ছিল।

কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্য

প্রথম যুগের আব্বাসীয়দের আমলে কৃষির বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। ইরাকের 'সাওয়াদ' নামে অভিহিত উর্বর পলিমাটি অঞ্চল কৃষির পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল। আব্বাসীয় রাজধানী বাগদাদ এই অঞ্চলে অবস্থিত ছিল এবং এই অঞ্চলের সমৃদ্ধি রাষ্ট্রের নিয়মিত আয়ের পথ সুগম করিয়াছিল। আব্বাসীয় খলীফাগণ দজলা-ফুরাত উপত্যকার নিম্ন অঞ্চলের কৃষির উন্নতির প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁহারা এই এলাকায় পুরাতন খালের সংস্কার সাধন করেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নূতন খাল খনন করেন। মনসুরের সময় সংশোধিত 'নহর-ঈসা' নামে অভিহিত একটি খাল ফুরাত ও দজলাকে আনবার ও বাগদাদের নিকটে যুক্ত করিয়াছে। অন্যান্য প্রধান খালের মধ্যে নহরে সরসর, নহর মালিক, নহর কুসা, নহর সারা, নহর দুজাইন ও নহর সিলাহের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল খাল দজলা-ফুরাত উপত্যকার নিম্নাঞ্চলকে স্বর্ণ-প্রসবিনী শস্য-শ্যামলা খাদ্য ভাণ্ডারে পরিণত করে। ইরাকের প্রধান উৎপন্ন শস্য ছিল বার্লি, গম, ধান, খেজুর, তুলা ইত্যাদি। সাওয়াদের উর্বর এলাকায় নানা রকমের ফল ও শাক-সব্জী উৎপন্ন হইত। খুরাসানও কৃষির জন্য বিখ্যাত ছিল। বুখারার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল উদ্যানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সমরকন্দ ও বুখারার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত সুগ্দ্ উপত্যকার উদ্যানে খেজুর, আপেল, পীচ, খুবানী, লেবু, কমলালেবু, ডুমুর, আঙ্গুর, জলপাই, বাদাম, আনার প্রভৃতি ফল এবং মুলা, শশা, বেগুন প্রভৃতি তরকারী এবং গোলাপ, রায়হান প্রভৃতি সুগন্ধি ফুল জন্মাইত। খাওয়ারিজমে

বড় বড় তরমুজ উৎপন্ন হইত। ফারস এবং আওয়াজে ইক্ষু চাষ হইত। পরে সিরিয়ায় ইক্ষু চাষ প্রবর্তিত হয় এবং ক্রুসেড যুদ্ধে যোগদান-কারীদের মাধ্যমে ইহার চাষ ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে।

ফুল ও ফুলের বাগান শুধু শৌখিন লোকদের অঙ্গনই সুশোভিত করেনি, বরং ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বড় বড় উদ্যানে বহু ফুলের চাষও করা হইত। এই সকল ফুল হইতে সুগন্ধি অথবা নির্যাস তৈরী করা হইত। গোলাপ, পদ্ম ও অন্যান্য ফুল হইতে প্রস্তুত নির্যাস বা সুগন্ধি দামিস্ক, শিরাজ, জুর এবং অন্যান্য শহরে পাওয়া যাইত। ফারিসের জুর এলাকা লাল গোলাপী আতরের জন্য বিখ্যাত ছিল। এই এলাকার গোলাপ-পানি পূর্বে চীনদেশ এবং পশ্চিমে মাগরিব পর্যন্ত রফতানী হইত। বাগদাদের খলীফা ফারসের রাজস্বের সহিত ৩০,০০০ বোতল গোলাপের নির্যাস প্রাপ্ত হইতেন। সাবুরে বিশ্ববিখ্যাত দশ প্রকার সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হইত।

এই যুগের কৃষির উন্নতির নিদর্শন স্বরূপ বিভিন্ন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে বহু পুস্তক লিখিত হয়। ইবন্ নাদিম তাঁহার 'ফিহরিস্ত' নামক পুস্তকে আতর সম্বন্ধে লিখিত কয়েকটি পুস্তকের নাম করিয়াছেন।

বিস্তারিত পাঠ্য তালিকা

হিট্টি, হিস্ট্রি অব দি এরাব্স্
বার্ণার্ড লিউইস, দি এরাব্স্ ইন হিস্ট্রি
আমীর আলী, হিস্ট্রি অব দি সারাসেন্স্

৩৯

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা

উমাইয়া যুগে আরবদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্মেষের কথা বিংশ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। আব্বাসীয় যুগে এই জ্ঞান সাধনা নূতন পরিবেশে নূতন ভাবধারায় সিঞ্চিত হইয়া অসংখ্য শাখা-পল্লবে প্রসারিত হইয়া বিশ্ব-সভ্যতার এক স্মরণীয় অধ্যায় রচনা করিয়াছে। আরবগণের জ্ঞান-পিপাসা, তাহাদের অনুসন্ধিৎসা এবং অন্তরের প্রসার জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিল। প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থল পাক-ভারত উপমহাদেশ, ইরান, গ্রীস এবং হেলেনীয় সভ্যতা অধ্যুষিত সিরিয়া ও মিসর এই যুগে মুসলমানদের ভাবধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়া জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে নূতন দিগন্ত উন্মোচন করিল। প্রাথমিক পর্যায়ে এক শতাব্দীকাল (৭৫০—৮৫০ খ্রীঃ) আরবগণ প্রাচীন সভ্যতার অমূল্য সম্পদ বিদেশী ভাষা হইতে আরবীভাষায় অনুবাদ করিয়া আরবী ভাষাভাষী শিক্ষিত সমাজের নিকট তুলিয়া ধরে। পারসিক, সংস্কৃত, সিরীয় ও গ্রীক ভাষায় লিখিত গ্রন্থ এই সময় আরবীতে অনূদিত হয়। আরবীতে রূপান্তর লাভ করার পর এই বিজাতীয় জ্ঞানের আত্মীকরণ ঘটে। এ্যারিস্টটলের দর্শন, নিও-প্লেটোনীয় ভাষ্যকারগণের রচনা, গ্যালেনের চিকিৎসা বিজ্ঞান, ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত', ভারতীয় গণনা পদ্ধতি, পারস্যের সুকুমার সাহিত্যের আরবীরূপ, যথা—'কালীলা ওয়া দিমনাহ্' ইত্যাদি প্রাথমিক যুগে আরব জ্ঞান-চর্চার বহুমুখী ভারধারার গোড়া পত্তন করিয়াছিল। ইহার ফলে পরবর্তী তিন শতাব্দী কাল (৮৫০—১১৫০ খ্রীঃ) জ্ঞান-বিজ্ঞানের জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে মুসলমানগণ স্বকীয় মৌলিক অবদান রাখিয়া যান। কিন্তু তর্জমার যুগ ও মৌলিক অবদানের যুগের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখান সম্ভবপর নয়; কারণ তর্জমাকারীদের অনেকেই প্রতিভাশালী ছিলেন এবং তর্জমার সহিত নিজের ভাবধারা যুক্ত করিয়া সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

তর্জমাকারিগণ: প্রাথমিক যুগের তর্জমাকারীদের মধ্যে আবু ইয়াহিয়া ইবনুল বত্রিক মনসূরের জন্য গ্যালেন ও হিপক্রেটিসের চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ অনুবাদ করেন। সিরীয় খ্রীস্টান ইউহান্না হারুনুর-রশীদের জন্য বহু ডাক্তারী বই তর্জমা করেন। মামুনের সময়কার তর্জমাকারী হুনায়ন ইবন

ইসহাকের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি নেস্টরীয় খ্রীস্টান ছিলেন। খলীফা মুতাদিদের সময় তারকাপূজারী ('সাবীয়ান') সাবিত ইবন কুররা গ্রীক গণিত ও জ্যোতিষ গ্রন্থ অনুবাদ করেন। সাবিতের পুত্র সিনান, পৌত্র সাবিত এবং ইব্রাহীম এবং প্রপৌত্র আবুল ফারাজ একাধারে তর্জমাকারী ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ইবন মাতার নামক পণ্ডিত ব্যক্তি ইউক্লিডের এলিমেন্টস্ এবং টলেমীর আলমাজেস্ট অনুবাদ করেন। তরজমার যুগ শেষ হইবার পূর্বেই এ্যারিস্টটলের সমগ্র গ্রন্থাবলী তর্জমার মাধ্যমে আরবদের নাগালের মধ্যে আসিয়া পড়ে। আরব লেখকগণ ন্যূনপক্ষে এ্যারিস্টটলের এ্যাকশতটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া থাকেন। এইগুলির মধ্যে অবশ্য কিছু কিছু গ্রন্থ মেকী বলিয়া প্রমাণিত হইলেও গ্রীকদের এই দার্শনিকের ভাবধারার সংরক্ষণ ও সমপ্রসারণের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব মুসলমানদের। ইউরোপ যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তখন আরবগণ গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের লুপ্তপ্রায় সম্পদরাজিকে তাহাদের আপন ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া প্রাচীন জগতের জ্ঞানভাণ্ডারকে সযত্নে রক্ষা করেন। হিট্টি বলেন, 'যখন রশীদ ও মামুন গ্রীক ও পারাসক দর্শনের গভীরে প্রবেশ লাভ করিতেছিলেন, তখন পাশ্চাত্যে তাঁহাদের সমসাময়িক শার্লিমান ও তাঁহার সভাসদগণ দস্তখত লিখিবার কায়দা আয়ত্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়।' গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে ইউরোপ তখন নিতান্ত অজ্ঞ ছিল। এই দীর্ঘ সুফলপ্রসূ তর্জমার যুগের পরবর্তী যুগ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানে মৌলিক অবদানের যুগ। দশম শতাব্দীর মধ্যেই কুরআনের ভাষা বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও দার্শনিক ভাবধারা প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম বলিয়া পরিগণিত হইল। এই যুগে আরবী শুধুমাত্র আরবদের ভাষাই রহিল না। মুসলিম জগতের সকল জাতি ও সমপ্রদায়ের লোকদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভাষা হইল আরবী। তাই এই যুগে মুসলমান, খ্রীস্টান, ইহুদী প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী লোক, আরব, পারসিক, তুর্কী, আফ্রিকান, বার্বার প্রভৃতি জাতির লোক সমভাবে সমান উৎসাহে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। সকলেরই ভাবধারার বাহন ছিল আরবী।

দর্শন

আরবগণ গ্রীক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া দর্শনের (ফালসাফা) চর্চা আরম্ভ করিয়াছিল। যাঁহারা শুধুমাত্র দর্শনের আলোচনা করিতেন, তাঁহাদিগকে ফাইলসুফ বা দার্শনিক বলা হইত; কিন্তু যাঁহারা দর্শনকে ধর্মের সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করিতেন, তাঁহাদিগকে মুতাকাল্লিমীন

(বা তার্কিক) বলা হইত। এই যুগের দার্শনিকদের মধ্যে আল-কিন্দী, আল-ফারাবী এবং ইবন সীনা প্রধান।

আবূ ইউসূফ ইয়াকুব ইবন ইসহাক আল-কিন্দী নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি কুফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে জ্ঞানচর্চা করেন। তিনি জাতিতে আরব ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'আরবদের দার্শনিক' বলা হয়। তিনি দর্শনে সমন্বয়বাদী ছিলেন এবং প্লেটো ও এ্যারিস্টটলের ভাবধারার সমন্বয় বিধানে প্রয়াসী ছিলেন। তিনি যে কেবল দার্শনিকই ছিলেন তাহা নহে, তখনকার যুগের অপরাপর মনীষীদের মত তিনি জ্যোতির্বিদ, রসায়নবিদ, চক্ষু-বিশেষজ্ঞ ও সঙ্গীতবিশারদ ছিলেন। তিনি ২৬৫টি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু ইহার অধিকাংশই বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। সঙ্গীতের মূল সূত্র সম্বন্ধে লিখিত তাঁহার চারিটি পুস্তক এখনও বিদ্যমান। দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার রচনা ল্যাটিন তর্জমায় পাওয়া যায়। 'থিওলোজিয়া' নামক এ্যারিস্টটলের পুস্তকের প্রথম অধ্যায় বলিয়া কথিত একটি নিও-প্লেটোনীয় ভাষ্যের তর্জমার জন্য তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং এই পুস্তক পরবর্তী যুগের ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই পুস্তকে তিনি আত্মা (নফ্‌স্), আল্লাহ এবং বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, আত্মা অতীন্দ্রিয় এবং অবিনশ্বর। নশ্বরদেহ নষ্ট হইয়া গেলে আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। আল্লাহ সর্ববস্তুর আদি-কারণ।

কিন্দী

হিট্টি বলেন, "গ্রীক দর্শনের সহিত ইসলামের সমন্বয় সাধন আরম্ভ হয় আল-কিন্দী কর্তৃক, তিনি ছিলেন একজন আরব। তুর্কী জাতীয় আল-ফারাবী এই সমন্বয় সাধনের কাজ আগাইয়া দেন এবং পূর্বাঞ্চলে পারসিক ইবন সীনা কর্তৃক এই কার্য সম্পূর্ণ হয়।"

আল-ফারাবী ট্রান্সঅক্সিয়ানায় জন্মগ্রহণ করেন, বাগদাদে শিক্ষালাভ করেন এবং আলেপ্পোর সাইফুদ্দৌলাহ্‌র দরবার অলংকৃত করেন। ৯৫০ খ্রীস্টাব্দে দামিস্কে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি এ্যারিস্টটল ও প্লেটোর বহু গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেন। তিনি এ্যারিস্টটল ও প্লেটোর ভাবধারার সহিত সুফীবাদের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেন। তিনি আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য 'আদি কারণে'র মতবাদকে যুক্তিতর্ক সহকারে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি আত্মা, আত্মার গুণাবলী এবং বুদ্ধি (আকল)

ফারাবী

সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন। গ্রীক দার্শনিকদের ভাষ্য রচনা করা ছাড়াও তিনি মনস্তত্ত্ব, রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা ও অধিবিদ্যা সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি দ্বিতীয় শিক্ষক (আল-মুআল্লিমুস-সানী) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "প্রথম শিক্ষক" বলিতে আরবগণ এ্যারিস্টটলকে বুঝাইত। রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারায়ও ফারাবীর অবদান রহিয়াছে। 'আল-মদীনাতুল ফাদিলা' ও 'আস্‌-সিয়াসাতুল মাদানীয়া' নামক গ্রন্থদ্বয়ে প্লেটোর রিপাবলিক ও এ্যারিস্টটলের পলিটিক্‌সের অনুকরণে তিনি একটি আদর্শ নগরীর শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে একটি ফর্মুলা প্রণয়ন করেন। বুদ্ধিদীপ্ত ও আদর্শচরিত্র রাষ্ট্রপ্রধান এই রাষ্ট্রের অন্তর, অপরাপর কর্মকর্তাগণ ইহার হস্তপদ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত জনসাধারণের কল্যাণে রাষ্ট্র শাসন করিবেন। ফারাবী চিকিৎসা বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র এবং সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক সাইফুদ্দৌলার সান্নিধ্যে তিনি এত নিপুণভাবে বাঁশী বাজাইতেন যে, শ্রোতারা ইহার প্রভাবে অট্টহাস্যে ফাটিয়া পড়িত, কিংবা অজস্রধারায় অশ্রুপাত করিত অথবা নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িত।

তৃতীয় প্রধান দার্শনিক ইবন সীনা (৯৮০—১০৩৭) তাঁহার দার্শনিক মতবাদের জন্য ফারাবীর নিকট ঋণী। পাশ্চাত্যে তিনি Avicenna নামে পরিচিত। তিনি বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সমগ্র জীবন মুসলিম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলেই অতিবাহিত করেন। আরবগণ তাঁহাকে 'আশ-শায়খুর-রঈস' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। তিনি সামানী সুলতান নূহ ইবন মনসুরকে আরোগ্য করিয়া তাঁহার প্রীতিভাজন হন এবং বিশাল রাজকীয় গ্রন্থাগারে নিজের জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করিবার সুযোগপ্রাপ্ত হন। তিনি দর্শন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জ্যামিতি ও জ্যোতিষ-শাস্ত্র, ধর্ম ইত্যাদ বিষয়ে ৯৯টি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি একটি বিখ্যাত কবিতায় উচ্চমার্গ হইতে দেহে আত্মার অবতরণ সম্বন্ধে বর্ণনা দান করিয়াছেন। আল-ফারাবীর ভাবধারা অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল ও বোধগম্য ভাষায় তিনি পরিবেশন করেন। তাঁহার এই চিন্তার স্বচ্ছতা তাঁহাকে পাশ্চাত্যজগতে বিশেষ পরিচিত ও জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল এবং তাঁহার বহু গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুশ-শিফা একটি দার্শনিক বিশ্বকোষ। ইহাতে গ্রীক ভাবধারা ও মুসলিম ধর্মতত্ত্বের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। তিনি মহাজগতের ঐক্য (Cosmic Unity),

মানবীয় আত্মার সহিত আদিকারণের সম্পর্ক এবং সক্রিয় বুদ্ধি (আকলুল-ফাআল) সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি আত্মার অবিনশ্বরতা সম্পর্কেও আলোচনা করেন এবং নবুয়তের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞান : মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই ছিলেন পারসিক। ইহা ছাড়া ইহুদী ও খ্রীস্টানগণ চিকিৎসক হিসাবে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। এই যুগের চিকিৎসকগণ অধিকাংশই একাধারে ডাক্তার, অধি-বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং জ্ঞান-সাধক ছিলেন, এবং হাকিম নামে অভিহিত হইতেন। চিকিৎসকগণ প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন। হারুনুর রশীদ, মামুন ও বার্মাকীদের চিকিৎসক নেস্টোরীয় খ্রীস্টান জিব্রীল ইবন বখতীযু ৮৮,৮০০,০০০ দিরহাম সঞ্চয় করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। এই বখতীযু পরিবার ছয়-সাত পুরুষ ধরিয়া প্রখ্যাত চিকিৎসকের জন্ম দান করে। খলীফা মুতাওয়াক্কীলের আমলে আলী আত্তাবারী নামক চিকিৎসাবিজ্ঞানী কর্তৃক লিখিত ফিরদৌসুল-হিকমা আরবী ভাষায় লিখিত প্রাচীনতম চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক।

আল আত্তা-বারী

আবু বকর আর-রাজী (৮৬৫-৯২৫) ব্রাউনের মতে, মুসলমান চিকিৎসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা মৌলিক এবং গ্রন্থকার হিসাবে প্রচুর প্রণেতাদের অন্যতম। তাঁহার সময়ে বাগদাদে যে নূতন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি তাহার প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। ফিহরিস্তের গ্রন্থকার তাঁহার রচিত ১১৩টি প্রধান ও ২৮টি ছোটখাট পুস্তকের তালিকা দিয়াছেন। তিনি 'কিতাবুল-আসরার' নামক রসায়ন বিজ্ঞানের একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়া চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত রসায়নের প্রধান পুস্তক ছিল। ঐ সময় জাবিরের রসায়ন পুস্তক আর-রাজীর এই পুস্তককে নিষ্প্রয়োজনীয় করিয়া দেয়। তিনি সিস্তানের সামানী শাসক মনসুর ইবন ইসহাকের জন্য দশ বালামে লিখিত 'কিতাবুল-মনসূরী রচনা করেন। ইহা একটি চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। 'কেন দক্ষ চিকিৎসকগণও সব রোগ নিরাময় করিতে পারে না', 'কেন ভীত রোগীরা সহজে দক্ষ চিকিৎসকের সাহচর্য পরিহার করে', 'কেন লোকেরা দক্ষ চিকিৎসকের চেয়ে হাতুড়ে ও ভণ্ড চিকিৎসককে বেশী পছন্দ করে', কেন অজ্ঞ চিকিৎসক, আনাড়ী চিকিৎসক ও মেয়ে-মানুষেরা বিদ্বান চিকিৎসকের চেয়ে বেশি কৃতকার্য হয়; এই সকল নামে তাঁহার হাল্কা বিষয়বস্তুর উপর ছোটখাট বই রহিয়াছে। বিভিন্ন রোগ

আর-রাজী

বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে বসন্ত রোগ ও হাম সম্পর্কে লিখিত বই বিখ্যাত। তাঁহার এই গ্রন্থও ল্যাটিনে অনূদিত হইয়াছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রধান বই আল-হাবী (الحاوی)। ১২৭৯ খ্রীস্টাব্দে সিসিলিতে এই গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। এই পুস্তকে গ্রীক, সিরীয়, আরব, পারসিক ও হিন্দু চিকিৎসা পদ্ধতি হইতে তিনি অবলীলাক্রমে দৃষ্টান্ত আনয়ন করিয়া পরিশেষে নিজের মতামত ও অভিজ্ঞতা সংযোজন করিয়াছেন। বিংশতি খণ্ডে সমাপ্ত এই পুস্তকের দশ খণ্ডমাত্র এখন বিদ্যমান। আর-রাজীর এই সকল গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর মুদ্রিত হইয়া বহু শতাব্দী ধরিয়া পাশ্চাত্য জগতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। বুওয়াইহী

আল-মাজুসী

আমীর আদুদ্দৌলাহর দরবারের একজন চিকিৎসক আলী ইবন আব্বাস আল-মাজুসী (পাশ্চাত্যে হালি আব্বাস নামে পরিচিত) 'কিতাবুল মালিকী' নামক একটি চিকিৎসাগ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহিত ব্যবহারিক চিকিৎসা পদ্ধতির সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। ইহাতে পথ্যাদি এবং ঔষধপত্র সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে আর-রাজীর পরে বিখ্যাত নাম ইবন সীনা। দার্শনিক হিসাবে তাঁহার সম্বন্ধে পূর্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি। তিনি প্রধানতঃ দার্শনিক হইলেও ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁহার প্রভাব সর্বাধিক। তাঁহার 'আল-কানুন ফিত-তিব্ব' গ্রন্থে গ্রীক ও আরব চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে।

ইবন সীনা

চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই বিরাটকায় বিশ্বকোষে সাধারণ ঔষধ এবং মস্তক হইতে পদ পর্যন্ত মানবদেহের যাবতীয় ব্যাধির বিষয় আলোচনা রহিয়াছে। ইহাতে প্রত্যেক রোগের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও উহার প্রতিকারের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। সর্বমোট ৭৬০টি ঔষধের বিষয় ইহাতে আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহার এই গ্রন্থ ক্রেমোনার জিরার্ড (Gerard of Cremona) কর্তৃক দ্বাদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। এই গ্রন্থের অপূর্ব জ্ঞানভাণ্ডার, ইহার সুশৃঙ্খল রচনা বিন্যাস এবং দার্শনিক পরিকল্পনা শীঘ্রই চিকিৎসা সাহিত্যে প্রসিদ্ধি অর্জন করে এবং অচিরে গ্যালেন, আর-রাজী ও আল-মাজুসীর গ্রন্থসমূহের পরিবর্তে ইহাই ইউরোপের স্কুলসমূহে চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ্য পুস্তক হিসাবে গৃহীত হয়। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই গ্রন্থ পাশ্চাত্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রধান অবলম্বন ছিল। ডক্টর অসলার বলেন, এই পুস্তক

অন্য কোন পুস্তকের চেয়ে অধিকতর কাল ধরিয়া 'চিকিৎসার বাইবেল' ছিল। একজন খ্রীস্টান চক্ষু চিকিৎসক আলী ইবন ঈসা একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাগদাদে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি এই বিষয়ে 'তাজকিরাতুল কাহ্‌হালীন' নামক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে একশত ত্রিশ প্রকারের চক্ষুরোগের বর্ণনা রহিয়াছে। এই গ্রন্থও হিব্রু এবং ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। মুতাদিদের আস্তাবল রক্ষক ইয়াকুব ইবন আখী হিজাম পশু-চিকিৎসা বিষয়ক একখানি পুস্তক রচনা করেন। ইঁহার একটি হস্তলিখিত প্রতিলিপি বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

আলী ইবন ঈসা

এই যুগে আরবগণ রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধ আবিষ্কারেও বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। তাঁহারা ঔষধের দোকান, ঔষধ তৈরীর কারখানা স্থাপন করেন ও ঔষধ বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মামুন ও মুতাসিমের সময় ঔষধ প্রস্তুতকারকগণকে এক প্রকার বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইত। অনুরূপভাবে ডাক্তারগণকে পরীক্ষায় পাশ করিতে হইত। খলীফা মুকতাদিরের সময় ডাক্তারদের মধ্যে দুর্নীতির ফলে সিনান ইবন সাবিতকে সকল চিকিৎসকদের পরীক্ষা লইয়া তাঁহাদিগকে সার্টিফিকেট (ইজাজত) দেওয়ার জন্য আদেশ করা হয়। বাগদাদে ৮৬০ ব্যক্তি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ইহার ফলে বাগদাদ হইতে হাতুড়ে ডাক্তারগণকে বিতাড়িত করা হয়। মুকতাদিরের উজীর আলী ইবন ঈসা একদল সরকারী ডাক্তারের সাহায্যে রোগগ্রস্ত লোকদিগকে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ঔষধাদি প্রদান করিতেন। কয়েকজন ডাক্তার দৈনিক জেলখানা পরিদর্শন করিতেন। জনস্বাস্থ্যে এইরূপ রাষ্ট্রীয় চেতনা তৎকালীন পৃথিবীর অন্যত্র নিতান্ত অজ্ঞাত ছিল। খলীফার চিকিৎসক সিনান (সাবীয়ান) কেবল চিকিৎসার মান উন্নয়ন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি বাগদাদের হাসপাতাল (বিমারিস্তান) দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়া বিশেষ সুখ্যাতির অধিকারী হন। বাগদাদের এই হাসপাতালের অনুকরণে সমগ্র মুসলিম জগতে ন্যূনাধিক চৌত্রিশটি হাসপাতাল গড়িয়া উঠে। একাদশ শতাব্দীতে ভ্রাম্যমান হাসপাতালও দেখিতে পাওয়া যায়। মেয়েদের জন্য হাসপাতালে পৃথক ওয়ার্ডের ব্যবস্থা ছিল। হাসপাতালে ডিস্পেন্সারী থাকিত; কোন কোন হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রন্থের গ্রন্থাগার থাকিত এবং ব্যবহারিক চিকিৎসা বিদ্যায় শিক্ষাদান করা হইত।

ঔষধ

আরবগণ প্রাচীন হিন্দু, পারসিক ও গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতি সাধন করে। সিদ্ধান্ত নামক একটি জ্যোতির্বিদ্যার বই মুহম্মদ ইবন ইব্রাহীম আল-ফাজারী কর্তৃক অনূদিত হইয়া পরবর্তী পণ্ডিতগণের পথপ্রদর্শক ও সহায়ক হয়। টলেমীর আল মাজেস্টের তর্জমার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। পারসিকদের নিকট হইতে জ্যোতির্বিদ্যার নির্ঘন্ট (যিজ) উত্তরাধিকার সূত্রে আরবদের হাতে আসে। পারস্যের জুন্দিসাবুর নামক স্থানে নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে নিয়মিত নিরীক্ষণ (রসদ) চলিতে থাকে। মামূনের মানমান্দরের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বাগদাদের শাম্মাসিয়া ফটকের নিকটে স্থাপিত এই মানমন্দির হইতে সিন্দ ইবন আলী ও ইয়াহিয়া ইবন মনসুর গ্রহ-নক্ষত্রের গতি-বিধিই নিরীক্ষণ করিতেন না, বরং তাঁহারা আল মাজেস্টের সূত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন এবং পৃথিবীর আকৃতি ও উহার পরিধি নির্ভুলভাবে যাচাই করিয়া দেখিতেন। এই যুগের জ্যোতির্বিদদের যন্ত্রপাতির মধ্যে বৃত্তের চতুর্থাংশ (Quadrant) এস্ট্রলেব, সূর্যঘড়ি এবং ভূগোল প্রধান ছিল। আলম ইবন ঈসা নামক একজন বৈজ্ঞানিক এস্ট্রলেব তৈরী করিয়া 'আস্তরলাবী' উপাধি প্রাপ্ত হন। মূসা ইবন শাকিরের পুত্রগণ এই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের নিজেদেরও মানমন্দির ছিল। খলীফা মুতাওয়াক্কিলের সময় বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী আল-ফারগানী 'মুদখিল' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা ১১৩৫ খ্রীস্টাব্দে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। বুওয়াইহী আমীর শরফুদ্দৌলাহর সময় বাগদাদে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আল-কুহী উল্লেখযোগ্য গবেষণা চালান। আল-বাত্তালী নামক সাবীয়ান জ্যোতির্বিদ গ্রহণ সম্পর্কে এবং গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি সম্পর্কে বহু তথ্য আবিষ্কার করেন। মুসলিম জগতের সর্বাপেক্ষা মৌলিক ও প্রজ্ঞাশীল মনীষী আবু রায়হান আল-বিরুনীও একজন জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তিনি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক মাসুদের (সুলতান মাহমূদের পুত্র) জন্য 'আল-কানুনুল-মাসউদী' নামক জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার 'আত-তাফ্‌হীম', জ্যামিতি, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষের একটি প্রশ্নোত্তর পুস্তক। তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-আসার'। ইহাতে তিনি প্রাচীন পঞ্জিকা ও অব্দসমূহের বিশেষ আলোচনা করেন। এই সকল গ্রন্থে আল-বিরুনী পৃথিবীর গতি ও দ্রাঘিমা এবং অক্ষরেখার পরিমাপ নির্ভুলভাবে নিরূপণ করেন। সলজুক সুলতানদের

জ্যোতির্বিদ্যা

মধ্যে জালালুদ্দীন মালিক শাহ্ জ্যোতির্বিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তিনি একটি মানমন্দির নির্মাণ করাইয়া পণ্ডিতদের গবেষণার সুযোগ করিয়া দেন। তাঁহার সময় পারসিক পঞ্জিকার সংস্কার করা হয়। কবি উমর খইয়াম একজন জ্যোতির্বিদও ছিলেন এবং অন্যান্যদের সহযোগিতায় 'জালালী পঞ্জিকা'র উদ্ভাবন করেন। হালাগু খান ১২৫৯ খ্রীস্টাব্দে মারাগায় একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ নাসিরুদ্দীন তূসী ইহার পরিচালক ছিলেন। তিনি নূতন নির্ঘণ্ট তৈরী করেন। এইগুলি সমগ্র এশিয়ায়, এমন কি চীন দেশে প্রচলিত হয়।

গণিত

আরবগণ হিন্দুদের নিকট হইতে গণনা পদ্ধতি ও শূন্যের (0) ব্যবহার শিখিয়াছিল। অচিরেই এই গণনা পদ্ধতি আরব জগতে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আরবগণের নিকট হইতে এই গণনা পদ্ধতি পাশ্চাত্যে প্রচলিত হয়। আরব লিখকগণের মধ্যে মুহম্মদ ইবন মূসা আল-খাওয়ারিজমী সর্বপ্রথম এই গণনাপদ্ধতি আরবজগতে প্রচলিত করেন। কিন্তু আরবগণের মধ্যে এই গণনা পদ্ধতির সাথে সাথে পুরাতন কথায় লেখার পদ্ধতি ও গ্রীকদের অক্ষরের সাহায্যে গণনার পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল। আল-খাওয়ারিজমী (৭৮০—৮৫০) বিরাট গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি জ্যোতির্বিদ্যার নির্ঘন্ট তৈরী করিয়াছিলেন। তিনি অঙ্কের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ রচনা করেন। এ্যালজেব্রা সম্পর্কিত তাঁহার গ্রন্থ 'হিসাবুল-জবর ওয়াল-মুকাবালা' ল্যাটিন তর্জমায় বিদ্যমান। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এই গ্রন্থ ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে গণিতের প্রধান পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হইত। এই গ্রন্থের মাধ্যমে ইউরোপে এ্যালজেব্রার চর্চা শুরু হয় এবং তাঁহার গ্রন্থ হইতেই এই বিষয়ের নামকরণ হয়। সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ উমর খাইয়াম এ্যালজেব্রা সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার এ্যালজেব্রা খাওয়ারিজমীর এ্যালজেব্রা হইতে উন্নত ধরনের ছিল। তিনি সমীকরণের প্রকার-ভেদ ও দ্বিতীয় পর্যায়ের সমীকরণে (equations of the second degree) জ্যামিতির প্রয়োগ তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। আব্বাসীয় আমলের শেষ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গাণিতিক ছিলেন আবুল ওয়াফা। ত্রিকোণ-মিতিতে তাঁহার উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে। তিনি খাওয়ারিজমী ও ডায়োফান্তাসের এ্যালজেব্রার ভাষ্য রচনা করেন। তিনি কেরানী ও রাজস্ব কর্মচারীদের জন্য একটি অঙ্কের বই রচনা করেন। জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁহার পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয় পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আরবগণের 'আল-কীমিয়া' বর্তমান কেমিস্ট্রি বা রসায়ন বিজ্ঞানের জনক। এই শব্দটি প্রাচীন মিসরীয় অথবা গ্রীক হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করা হয়। মিসরীয় ও গ্রীকগণ কাল্পনিক বিষয় হিসাবে ইহার চর্চা করেন। আরবগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ইহাকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করেন। আরবদের কীমিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও জন্মদাতা জাবির ইবন হাইয়ান (লাটিন Geber)। তিনি ৭৭৬ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি কুফায় কার্যরত ছিলেন। **Max Mayerhof** বলেন যে, জাবির হারুনুর রশীদের বার্মাকী উজীরদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। ৮০৩ খ্রীস্টাব্দে এই উজীর পরিবারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও কুফায় নির্বাসিত হন এবং সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর দুই শতাব্দী পরে কুফার একটি রাস্তা পুনর্নির্মাণের সময় জাবিরের গবেষণাগার আবিষ্কৃত হয়। আরবী ও ল্যাটিন ভাষায় লিখিত কীমিয়ার একশত পুস্তকে গ্রন্থকার হিসাবে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। ইহার অনেকগুলি হিজিবিজি কুসংস্কারের গোঁজা মিল। অনেক আজেবাজে লোকের লেখা তাঁহার নামে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

আল-কীমিয়া

কিন্তু তাঁহার কয়েকটি গ্রন্থ হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, তিনি রসায়নবিদদের মধ্যে সর্বপ্রথম হাতে-কলমে পরীক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কাজেই তিনি রসায়নের মতবাদ ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেন। ইউরোপীয় আল-কেমী ও কেমিস্ট্রির সমগ্র ঐতিহাসিক ধারায় তাঁহার প্রভাব পরিস্ফুট। তিনি কয়েকটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বর্ণনা দিয়াছেন এবং কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকের ল্যাটিন তর্জমা হইতে বহু বৈজ্ঞানিক নাম ইউরোপীয় ভাষায় গৃহীত হয়।

পরবর্তী মুসলিম রাসায়নিকগণ জাবিরকে তাঁহাদের শিক্ষক বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালের আল-কীমিয়া বৈজ্ঞানিক পথে অগ্রসর না হইয়া কল্পনা ও বিলাসের রাজ্যে বিহার করিতে থাকে। বিখ্যাত দার্শনিক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী আর-রাজী কীময়া সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থটি জাবিরের ভাবধারা অপেক্ষা অনেক উন্নত ধরনের। ইহাতে বিভিন্ন বস্তুর শ্রেণী বিভাগ এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে উন্নতমানের আলোচনা রহিয়াছে।

উমাইয়া যুগে ইতিহাস রচনা আরম্ভ হইলেও সেই যুগের কোন ইতিহাস

পুস্তক পাওয়া যায় না। আব্বাসীয় যুগের প্রথম হইতে প্রকৃত ইতিহাস রচনার কাজ আরম্ভ হয়। প্রথমে হাদীসের মত 'ইসনাদ পদ্ধতিতে ইতিহাস লিখিত হইত। ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণীর উৎস বর্ণনা করিতে যাইয়া নিজের সমসাময়িক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ঘটনার সময় পর্যন্ত বর্ণনাকারীদের নাম উল্লেখ করিয়া যাইতেন। এই পদ্ধতির সাহায্যে মূল বর্ণনাকারীর হুবহু জবানীতে ঘটনা বিবৃত হইত। এই পদ্ধতি সকল সময় ত্রুটিমুক্ত না হইলেও ঘটনার সত্যতা উদ্ধারের জন্য ঐতিহাসিকের ঐকান্তিক আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা ইহার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। হিশামুল-কালবীর (মৃত্যু ৮১৯) লেখায় প্রাক্-ইসলামী যুগের কিংবদন্তী ও কাহিনী সংরক্ষিত হইয়াছে। রসূলুল্লাহর (সঃ) প্রথম জীবনী গ্রন্থ লিখিত হয় ইবন ইসহাক (মৃঃ ৭৬৭) কর্তৃক। তিনি মদীনার লোক ছিলেন; তাঁহার মূলগ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। ইবন হিশাম নামক জীবনী-লেখক উক্ত গ্রন্থ অবলম্বনে পরবর্তীকালে রসূলের (সঃ) একটি জীবনী প্রণয়ন করেন। ইবন হিশাম ৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে কায়রোতে মৃত্যু-মুখে পতিত হন। হাদীসবেত্তা ইবন শিহাব আজ-জুহরী রসূলের (সঃ) জীবনী সম্পর্কিত বহু হাদীস সংগ্রহ করেন। এই সকল হাদীসের ভিত্তিতে 'মাগাজী' গ্রন্থ (ধর্মযুদ্ধ) লিখিত হয়। মাগাজী-লিখক মূসা ইবন উক্‌বা (মৃঃ ৭৫৮) এবং ওয়াকিদী (মৃঃ ৮২২) মদীনার অধিবাসী ছিলেন। ইবন সা'দ (মৃঃ ৮৪৫) তাবাকাত (বিভিন্ন শ্রেণীর জীবনী কোষ) রচনা করেন। ইহাতে রসূলুল্লাহ, তাঁহার সাহাবী ও তাবীয়ীনগণের জীবন সন্নিবেশিত হইয়াছে। সীরাত (রসূলের জীবনী), মাগাজী ও তাবাকাত গ্রন্থে সর্বপ্রথম প্রকৃত ইতিহাস লিখন পদ্ধতি আরম্ভ হয়। নবম শতাব্দীতে ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবরণী লিখার জন্য উপকরণসমূহ সংগ্রহ হয়। সীরাত, মাগাজী ও তাবাকাত সাহিত্য ও অন্যান্য উপকরণের সাহায্যে নবম শতাব্দীতে ধারাবাহিক ইতিহাস লেখার কাজ আরম্ভ হয়। আহমদ ইবন ইয়াহিয়া আল বালাদুরী (মৃঃ ৮৯২) তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফুতুহুল বুলদান' রচনা করেন। ইবন আবদুল হাকাম (মৃঃ ৮৭০) ফুতুহুল মিসর ওয়া সাখবারুহা' রচনা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্ব-ইতিহাস রচনা আরম্ভ হয়। কিংবদন্তী, উপাখ্যান, জীবনী, বংশ-তালিকা, ইহুদী ও খ্রীস্টান উপাখ্যান ব্যাপক ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনার পথ সুপ্রশস্ত করে। 'খুদাইনামা' নামক প্রাচীন পারসিক গ্রন্থ ইবনুল মুকাফফা (মৃঃ ৭৫৭) কর্তৃক 'সিয়ারুল মুলূকুল আজম' নামে অনূদিত হয়। এখনকার ইতিহাস

ইতিহাস ইলমুত-তাওয়ারিখ

গ্রন্থে ইসলামী ও অনৈসলামী কাহিনী, কাল্পনিক উপাখ্যান ও ঐতিহাসিক কাহিনী পরস্পর সংযোজিত হইতে থাকে এবং যে-কোন উৎস হইতে যে-কোন কাহিনী ইতিহাস পুস্তকে লিপিবদ্ধ করার আগ্রহ দেখা দেয়। এই যুগের ঐতিহাসিকদের কয়েকটি প্রধান নাম তাঁহাদের গ্রন্থসহ নিম্নে দেওয়া হইল:

ইবন কুতায়বা (মৃ: ৮৮৯): কিতাবুল মাআরিফ

আবূ হানীফা আদ দীনাওয়ারী (মৃ: ৮৯৫): আখবারুত তিওয়াল

আল ইয়াকুবী: তারিখ

হামজা আল ইসপাহানী: (মৃ: ৯৬১): তারিখ-ই-সিনি-ই-মুলুকিল-আরদ

তাবারী

কিন্তু এই যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ছিলেন আবূ জাফর মুহম্মদ ইবন জরীর আত-তাবারী (৮৩৮—৯২৩)। তিনি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'তারিখুর তরুসুল ওয়াল মুলুক' এবং কুরআনের তফসীরের জন্য চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তিনি ইসলামের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য অখণ্ড ও পূর্ণভাবে সূক্ষ্মদর্শীর বিচার-বিশ্লেষণ সহ তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগের উপকরণ সমূহ এত পরিপূর্ণভাবে আর কোন ঐতিহাসিক কর্তৃক সংগ্রহ ও সংকলনের চেষ্টা হয় নাই। পরবর্তীকালে মিসকাওয়াইহ, ইবনুল আসীর ও আবুল ফিদা তাবারীর গ্রন্থ হইতে বহু উপকরণ নিজেদের গ্রন্থে সংযোজন করেন। তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে ৯১৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাস রচনা করেন। তিনি ইসনাদ পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তিনি পারস্য, ইরাক, সিরিয়া ও মিসর সফর করেন। কথিত আছে, একবার তিনি মুসাফির অবস্থায় রুটির জন্য জামার আস্তিন বিক্রী করিতে বাধ্য হন। তিনি চল্লিশ বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন চল্লিশ পৃষ্ঠা রচনা করিয়াছিলেন। ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি যে ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন, তাহা একটি যুগের অবসান সূচিত করে। আত-তাবারীর ইতিহাস গ্রন্থ বৎসর ভিত্তিক।

মাসূদী

এই যুগে বৎসর ভিত্তিক ইতিহাস গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে আর এক প্রকার পদ্ধতির ইতিহাসও আমরা দেখিতে পাই। ইহা বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইত। মাসূদী এই পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। ঘটনাগুলিকে বৎসরের ভিত্তিতে বর্ণনা না করিয়া বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ, রাজবংশ অথবা জাতির ভিত্তিতে সাজাইয়া এই ইতিহাস রচিত হইত। মাসূদীর মত পরবর্তীকালে ফখ্‌রী ও ইবন খলদুন এই

পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনা করেন। মাসূদী মুতাজিলা মতাবলম্বী ছিলেন এবং জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে বাগদাদ হইতে এশিয়ার প্রায় প্রত্যেক দেশে এবং জাঞ্জিবারে সফর করেন। তাঁহার মুরুজুজ-জাহাব ইতিহাস ও ভূগোলের একটি বিশ্বকোষ। ইহাতে মুসলিম ইতিহাস ছাড়া, পাক-ভারতীয়, পারসিক, রোমান ও ইহুদীদের ইতিহাসও আলোচিত হইয়াছে। তিনি বিভিন্ন দেশ ও রাজ্যের ভৌগোলিক পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, যেখানে এখন সমুদ্র রহিয়াছে, সেখানে এককালে স্থলভাগ বিরাজ করিত এবং যাহা এখন স্থলভাগ, তাহা এককালে সমুদ্র ছিল। 'আত-তান্‌বিহ ওয়াল আশরাফ' নামক গ্রন্থে তিনি খনিজদ্রব্য, উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতের সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিকের মতবাদ বিবৃত করেন এবং ইতিহাসের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

দশম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া আব্বাসীয় যুগের ইতিহাস নূতন উপকরণ ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত হইতে থাকে। পূর্বেকার ধর্মভিত্তিক ইতিহাস নৈর্ব্যক্তিক ও আদর্শবাদী ছিল। সত্যের তুলাদণ্ডে প্রত্যেকটি কথার মূল্য বিচার হইত। এক্ষণে রাজকর্মচারী ও সভাসদগণ ইতিহাস লেখার কাজে নিযুক্ত হইতে থাকেন। ইহার ফলে ইতিহাসের আকার, বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে। খলীফা বা আমীরের সচিব দৈনিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঘটনাপঞ্জী লিপিবদ্ধ করিতে থাকেন। তাঁহাদের উপকরণ হইল সরকারী দলীল, কর্মচারীদের সহিত ব্যক্তিগত যোগাযোগ, দরবারের লোকদের মধ্যেকার গল্পগুজব। পূর্বেকার ধর্মজ্ঞ আলিম বা পণ্ডিতগণের হাত হইতে ইতিহাস রচনার কাজ রাজকর্মচারীদের হাতে চলিয়া যায়। পূর্বেকার ইতিহাস ব্যাপক ও মানবতাবোধ ভিত্তিক ছিল। এক্ষণে ইতিহাস রাজা-বাদশাহ ও রাজ-দরবারকে কেন্দ্র করিয়াই লিখিত হইতে থাকে। কিন্তু পক্ষান্তরে সরকারী দলীল দস্তাবেজের উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাস রচিত হওয়ায় লিখকভেদে এখনকার ইতিহাস মোটামুটি নির্ভরযোগ্য হইত। আবার খলীফা বা বাদশাহের সান্নিধ্যে বসিয়া ইতিহাস রচনা করার ফলে ব্যক্তিগত মত প্রকাশের বা সত্য প্রকাশের স্বাধীনতাও সীমিত ছিল।

এই যুগের দরবারী ঐতিহাসিকদের মধ্যে মিসকাওয়াই (মৃ: ১০৩০), ইব্রাহীম আস-সাবী (মৃ: ১০০৩—৪), হিলাল-আস-সাবী (মৃ: ১০৫৬), উৎবী ও আবু শুজা রুদরাওয়ারী প্রধান। ইঁহাদের সততা ও পক্ষপাত-মুক্ততা মোটামুটি সর্বজন-স্বীকৃত।

আব্বাসীয় যুগের শেষের দিকে তিনজন ঐতিহাসিকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা হইলেন ইবনুল জওজী (১১১৬—১২০১), ইবনুল আসীর (১১৬০—১২৪৩) ও সিবত ইবনুল জওজী (১১৮৬—১২৫৭)। ইবনুল আসীর তাঁহার বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'আল-কামিল ফিত-তারিখের' জন্য অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। পূর্ববর্তী যুগের ইতিহাসের জন্য তিনি তাবারীর গ্রন্থের উপর নির্ভর করেন এবং ১২১১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ঘটনা বিবৃত করেন। ক্রুসেডের বিবরণী তাঁহার ইতিহাসের বিশিষ্ট অধ্যায়। ইবনুল জওজী ও তাঁহার পৌত্র সিবত যথাক্রমে কিতাবুল মুন্তাজাম ও মির-আতুজ জামান রচনা করেন।

ভূগোলের চর্চা মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় কারণে অপরিহার্য হইয়া পড়ে। নামাজের সময় কিবলা নির্ণয় অর্থাৎ কাবা শরীফের দিক ঠিক করা, মসজিদ সমূহকে কাবামুখী করিয়া নির্মাণ করার প্রয়োজনীয়তা এবং পবিত্র হজ-যাত্রা ইত্যাদি ধর্মীয় প্রয়োজনে ভূগোলের চর্চা মুসলমানদের পঠন-পাঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভূগোলের সহিত জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অঙ্কেরও সম্পর্ক ছিল। এই কারণে ইহারা পরস্পরের পরিপূরক ও সহায়ক ছিল। আবার মুসলমান সওদাগর ও অভিযাত্রিগণ দীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রার পর দূর-দূরান্তের দেশ ও অধিবাসী সম্পর্কে মনোজ্ঞ কাহিনী প্রচার করিয়া বিদেশ-যাত্রায় বহু লোককে উৎসাহিত করেন। সুলায়মান আত-তাজির নামক সিরাফের একজন সওদাগরের ভ্রমণ কাহিনী হইতে দূরপ্রাচ্য ও পাক-ভারত সম্পর্কে অনেক মনোরম কাহিনী জানা যায়। এই সকল গল্প হইতে সিন্দবাদ নামক নাবিকের নামকে কেন্দ্র করিয়া বহু রোমাঞ্চকর কাহিনী প্রচলিত হয়। ৯২১ খ্রীস্টাব্দে খলীফা মুকতাদির আহমদ ইবন ফাদলান নামক একজন অভিযাত্রীকে রাশিয়ার ভলগা নদীর নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রেরণ করেন। তাঁহার লেখনী হইতে রাশিয়া সম্বন্ধে প্রথম প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায়। আরবগণ টলেমীর ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ আরবীতে তর্জমা করেন। খাওয়ারিজমী 'সুরাতুল আরদ' নামক পুস্তক রচনা করেন এবং ইহাতে মামুনের সময়কার ৬৯ জন জ্ঞানীলোকের সহায়তায় একটি মানচিত্র সংযোজিত করেন। দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধে মাসূদী এই মানচিত্রটি অধ্যয়ন করেন। খাওয়ারিজমীর ভূগোল গ্রন্থ চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমান লিখকগণকে প্রভাবিত করে।

ভূগোল

আব্বাসীয় যুগে পথঘাটের বর্ণনা সমন্বিত বহু ভূগোল গ্রন্থ লিখিত

হয়। এই গ্রন্থরাজির প্রথম গ্রন্থ 'আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক' (পথ ও রাজ্য) আব্বাসীয় ডাক বিভাগের জিবাল অঞ্চলের প্রধান ইবন খুরদাজবিহ কর্তৃক রচিত হয়। পরবর্তী যুগের ভৌগোলিক ইবনুল ফকীহ, ইবন হাওকল, মাকদিসী ও অন্যান্য অনেকে এই গ্রন্থের ব্যবহারে উপকৃত হইয়াছিলেন। ৮৯১—৯২ খ্রীস্টাব্দে আল-ইয়াকুবী তাঁহার কিতাবুল বুলদানে ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক বিবরণ সংযুক্ত করেন। ৯২৮ খ্রীস্টাব্দে কুদামা 'আল-খারাজ' নামক গ্রন্থে খিলাফতের প্রদেশ বিভাগ, ডাক বিভাগের ব্যবস্থাদি ও রাজস্ব সম্পর্কিত বিবরণ ইত্যাদির উল্লেখ করেন। ৯০৩ খ্রীস্টাব্দে ইবন রুস্তা 'আল-আলাকুন-নাফীসা' রচনা করেন এবং আল-হামাদানী তাঁহার 'কিতাবুল বুলদান' রচনা করেন। ইস্তাখরী তাঁহার ভৌগোলিক গ্রন্থ 'মাসালিজুল মাসালিকে বহু মানচিত্র সংযোজিত করেন। তাঁহারই অনুরোধে ইবন হাওকল বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করিয়া তাঁহার পুস্তক সংশোধন করেন, মানচিত্রগুলি পুনরায় অঙ্কিত করেন এবং নিজের নামে 'আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক' রচনা করেন। এই জাতীয় গ্রন্থ লেখকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মৌলিক ও বিখ্যাত ছিলেন 'আল-মাকদিসী। তিনি স্পেন, সিস্তান ও পাক-ভারত ব্যতীত যাবতীয় মুসলিম অধ্যুষিত দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং বিশ বৎসরের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সমন্বিত মনোজ্ঞ ও বিবিধ উপকরণ-সমৃদ্ধ 'আহসানত-তাকাসিম' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। আব্বাসীয় যুগের শেষভাগে পূর্বাঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম ভৌগোলিক ইয়াকুত আল হামারী (১১৭৯—১২২৯) তাঁহার ভৌগোলিক বিশ্বকোষ 'মুজামুল বুলদান' রচনা করেন। তাঁহার সাহিত্যিক বিশ্বকোষ 'মুজামলু-উদাবা বিদ্বজ্জন সমাজে সমভাবে সমাদৃত। তাঁহার ভৌগোলিক বিশ্বকোষে তিনি স্থানের নাম সমূহ বর্ণমালার হিসাবে সুসজ্জিত করেন এবং প্রত্যেকটি স্থান সম্বন্ধে যথাযথ বর্ণনা প্রদান করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলিম অবদানের কথা স্বীকার করিতে গিয়া জর্জ মার্টিন বলেন, "মানবজাতির প্রধান কাজ মুসলমানগণ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক আল-ফারাবী একজন মুসলমান ছিলেন; সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্কশাস্ত্রবিদ আবূ কামিল এবং ইব্রাহীম ইবন সিনান মুসলমান ছিলেন; সবশ্রেষ্ঠ ভৌগোলিক ও বিশ্বকোষ প্রণেতা আল-মাসূদী মুসলমান ছিলেন; সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আত-তাবারীও একজন মুসলমান ছিলেন।"

ভূগোল গ্রন্থ

আব্বাসীয় খিলাফতের প্রথম যুগে সাহিত্যে একটি অভিনব আন্দোলন

সাহিত্য

গড়িয়া উঠে। পারসিক ও অন্যান্য অনারবদের মধ্যে এই আন্দোলনের জন্ম হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল সমাজে আরবদের প্রাধান্য ও আভিজাত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। এই আন্দোলনের নাম ছিল 'শুউবিয়া'। ইহাতে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-সাম্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইলেও ক্রমশঃ আরবদের প্রাধান্য বিনষ্ট করা ও অনারবদের শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করাই এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। আরব-অনারব উভয় পক্ষের দাবী সমর্থনের জন্য সুযোগ্য ও বিখ্যাত সাহিত্যিকগণ আগাইয়া আসেন। সে যাহাই হউক, এই যুগের আরবী সাহিত্যে অনারবদের দান বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। আরবী সুকুমার সাহিত্য জাহিজের (মৃত্যু ৮৬৮-৬৯) লেখায় আরম্ভ হইয়া দ্বাদশ ও একাদশ শতাব্দীতে বদীউজ্জমান হামদানী (৯৬৯—১০০৮), সাআলিবী (৯৬১—১০৩৮) ও হারিরী (১০৫৪--১১২২) প্রমুখ লেখকগণের লেখনীতে পরিপূর্ণতা লাভ করে। পারসিক প্রভাবের ফলে এই যুগের গদ্য সাহিত্য কৃত্রিম ও অলংকারমণ্ডিত হইয়া পড়ে। বদীউজ্জমান হামাদানী সর্বপ্রথম নাটকীয় ভঙ্গীতে গল্প বলার জন্য 'মাকামা' নামক একপ্রকার ছন্দময় গদ্যের প্রবর্তন করেন। এই রচনা পদ্ধতিতে লেখক বিষয়বস্তু অপেক্ষা রচনা-কৌশল, কবিত্ব, পাণ্ডিত্ব ও বাগ্মিতার উপর বিশেষ জোর দিতেন। বদীউজ্জমানের 'মাকামা' হারিরীর মাকামার আদর্শ স্বরূপ ছিল। সাত শতাব্দী ধরিয়া হারিরীর মাকামা বিশুদ্ধ আরবীর আদর্শ রচনা হিসাবে মুসলিম জগতে সমাদৃত ছিল। আরবী সাহিত্যে এই গদ্য রচনা নাটকের কাছাকাছি, কিন্তু আরবগণ প্রকৃত নাট্য সাহিত্য রচনায় কখনও ব্রতী হয় নাই। আরবী সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় আবুল ফারাজ ইসপাহানী সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার 'কিতাবুল আগানী' কবিতা ও সাহিত্যের অমূল্য রত্ন-ভাণ্ডার। হামদানী বংশের সাইফুদ্দৌলাহ তাঁহার এই কাজের জন্য এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ইনাম দেন। কথিত আছে, প্রখ্যাত বুওয়াইহী উজীর সাহেব ইবন খাব্বাদ (মৃঃ ৯৯৫) ভ্রমণের সময় ত্রিশ উটের বোঝাই বই পুস্তক সঙ্গে লইয়া যাইতেন, কিন্তু কিতাবুল আগানীর একটি প্রতিলিপি পাওয়ার পর হইতে তিনি কেবল এই বইটি সঙ্গে লইয়া যাইতেন। দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি ইরাকের জহশিয়ারী (মৃঃ ৯৪২) পুরাতন পারাসক গল্পগ্রন্থ 'হাজার আফসানার' উপর ভিত্তি করিয়া একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা 'আলফ লায়লা ওয়া লায়লা' (সহস্র ও এক রজনী) নামক গ্রন্থের অগ্রদূত ছিল। পাক-ভারতীয়, গ্রীক, হিব্রু, ও মিসরীয়

গল্পের সমাবেশে মিসরে মমলুক শাসনের সময় 'আলফ লায়লা' পরিপূর্ণতা লাভ করে। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থ ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়।

গদ্যের মত পদ্য সাহিত্যেও এই যুগে নূতন পদ্ধতি ও রচনা কৌশল প্রবর্তিত হয়। হারুনুর রশীদের সভাকবি আবূ নুওয়াসের কবিতায় তৎকালীন উচ্চ শ্রেণীর সমাজের বিলাসব্যসন ও ভোগসর্বস্ব জীবনের নিখুঁত ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহার বিশিষ্ট কবিতাগুচ্ছ 'খমরীয়াত' মদ্যের প্রশংসায় রচিত হইয়াছিল। আবুল আতাহিয়া (৭৪৮—৮২৮) নামক অপর কবি গভীর ধর্মীয় ও নৈতিক ভাব প্রকাশক কবিতা রচনা করিয়া উচ্চ শ্রেণীর ভোগ-লালসার জীবনকে ঘৃণিত ও নিন্দনীয় বলিয়া প্রকাশ করেন। এই যুগে সিরিয়ায় দুইজন বিখ্যাত কবির আবির্ভাব হয়। একজনের নাম আবূ তাম্মাম। তিনি 'হামাসা' নামক বীর-রসাত্মক কবিতার সংকলনের জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। অন্ধকবি আবুল আলা আল-মাআররী ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতার বাণী অনবদ্য ভাষায় রচনা করিয়া আরবী সাহিত্যের কলেবর সমৃদ্ধ করেন।

রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা

মুসলমানগণ একদিকে গ্রীক দার্শনিকগণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া এবং অপরদিকে খিলাফতের প্রকৃত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে নিজেদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিশিষ্ট রূপ বিধিবদ্ধ করেন। দার্শনিক আল-ফারাবী প্ল্যাটোর রিপাবলিক এবং এ্যারিস্টটলের পলিটিক্স্ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া একটি আদর্শ নগরীর পরিকল্পনা পেশ করেন, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। চরিত্রবান ও বুদ্ধিদীপ্ত রাষ্ট্রপ্রধান এই রাষ্ট্রের অন্তর এবং অপরাপর কর্মকর্তাগণ এই রাষ্ট্রের হস্তপদ ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত কাজ করিয়া যাইবে। জনসাধারণের কল্যাণ সাধন এই রাষ্ট্র পরিচালনার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। আল-মাওয়ারদী সর্বপ্রথম তাঁহার 'আহকামুস-সুলতানিয়া' গ্রন্থে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁহার সমসাময়িক বুওয়াইহী আমীরগণের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি খলীফার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ এই গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি খলীফা ও আমীরের মধ্যে ধর্মীয় ও জাগতিক কার্যকলাপের ভিত্তিতে ক্ষমতা বিভাগের চেষ্টা করেন এবং ধর্মীয় ব্যাপারে খলীফার কর্তৃত্ব চূড়ান্ত বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি খলীফাকে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি বলিয়া মনে

জ্ঞানের সাহায্যে

করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে খলীফাগণ তাঁহাদের পূর্ববর্তী খলীফার মনোনয়নক্রমে নিযুক্ত হইতেন। সেজন্য তিনি মত প্রকাশ করেন যে, এইরূপ মনোনয়ন আইনতঃ সিদ্ধ, যদি এই মনোনয়ন জনসমর্থন লাভ করে। মাওয়ারদী খলীফার জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতা ও গুণাবলীর উল্লেখ করেন: খলীফাকে কুরাইশ বংশোদ্ভূত, পুরুষ, পূর্ণবয়স্ক, আদর্শ-চরিত্র, শারীরিক ও মানসিক ত্রুটি বর্জিত, জ্ঞানী ও বিচার ক্ষমতা সম্পন্ন ও সাহসী হইতে হইবে। খলীফার বিভিন্ন কর্তব্যের মধ্যে ধর্মরক্ষা, দারুল ইসলামকে শত্রুর হামলা হইতে রক্ষা, বিবাদ নিষ্পত্তি, সৎকর্মে উৎসাহ ও অসৎকর্মে বাধা দান, জিহাদ করা, খারাজ ও সাদকা আদায়, উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগ ও তাহাদের বেতনাদি দান ইত্যাদি প্রধান। ইমাম আল-গাজ্জালী খিলাফত সম্পর্কে অনুরূপ মতবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া নিয়াছেন। তাঁহার সময় সলজুক সুলতানগণ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন। সেজন্য আল-গাজ্জালী মন্তব্য করেন যে, ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে খলীফা সলজুক সুলতানদের উপর নির্ভর করেন, যেমন শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে তিনি উজীরের উপর নির্ভর করেন এবং ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁহাকে উলামার সহিত আলোচনা করা উচিত। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, আব্বাসীয় খলীফা চুক্তি (আহ্‌দ) মোতাবেক আইনতঃ মুসলিম জগতের ইমাম, কিন্তু সরকারী কাজকর্ম সুলতানগণ কর্তৃক সুসম্পন্ন হইয়া থাকে এবং এই সুলতানগণ খলীফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। গাজ্জালীর এই আপোষ-নীতি খিলাফত-পরবর্তী যুগে ইবন তাইমিয়ার (১২৬৩—১৩২৮) সমর্থন লাভ করে নাই। তিনি শরীয়তকে (ধর্মীয় আইনকে) সর্বোপরি স্থান দেন এবং শরীয়তের ঊর্ধ্বে কোন কর্তৃপক্ষকে স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে জনসাধারণের সম্মিলিত অভিমত (ইজমা) ইমাম বা খলীফা মনোনয়ন করিবেন এবং তিনি শরীয়তের বিধি-নিষেধ দ্বারা পরিচালিত হইবেন। তিনি শরীয়তের আইনের মাধ্যমে সুসংহত উম্মাহ্‌র (জাতি বা সম্প্রদায়) প্রধান হিসাবে খিলাফতের পুনরুজ্জীবনের পক্ষপাতী ছিলেন।

ধর্মীয় বিদ্যার অনুশীলনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিষয়ের সৃষ্টি হয়; তন্মধ্যে ইলমুল কালাম (ধর্মতত্ত্ব), হাদীস ও ফিক্‌হ প্রধান।

ধর্মীয় বিদ্যা

পরবর্তী অধ্যায়ে ইলমুল-কালামের সহিত বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের বিশেষ উল্লেখ করা হইবে।

ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে হাদীসবিদ্যা একটি বিশেষ বিজ্ঞান

হিসাবে অধীত ও চর্চিত হইতে থাকে। এই হাদীসের জ্ঞান অর্জনের জন্য মুসলমান বিদ্যান্বেষী দূর হইতে দূরান্তরে দীর্ঘ ও বিপদ-সংকুল ভ্রমণে যাত্রা করিতেন এবং এই জ্ঞানার্জন যাত্রায় প্রাণোৎসর্গকারীকে শহীদের (ধর্মযুদ্ধে নিহত) মর্যাদা দান করা হইত। হাদীস সংগ্রহের ব্যাপারে বিশুদ্ধতার পরিমাপ হিসাবে দুইটি জিনিসের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হইত। প্রথমতঃ ইসনাদ। যাঁহাদের মধ্যস্থতায় সংগ্রাহকের সময় হইতে রসূলুল্লাহ্‌র সময় পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাঁহাদের এই ধারাবাহিকতাকে ইসনাদ বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ হাদীসের আভ্যন্তরীণ পাঠ্য (মতন)। এই ভিত্তিতে হাদীসকে সহীহ্ (বিশুদ্ধ), হাসান (মধ্যম) ও জয়ীফ (দুর্বল), এই তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে। নবম শতাব্দীতে ছয়টি বিখ্যাত হাদীস সংকলন প্রস্তুত হয়। এইগুলিকে 'আস-সিহাহুস-সিত্তা' বা ছয়টি বিশুদ্ধ গ্রন্থ নামে অভিহিত করা হয়। এই-গুলির মধ্যে মুহম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারীর (৮১০-৭০) সংকলন গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। বুখারী ষোল বৎসর পর্যন্ত পারস্য, ইরাক, সিরিয়া, হিজাজ ও মিসরে পরিভ্রমণ করিয়া ১০০০ বিশেষজ্ঞের নিকট হইতে সংগৃহীত ছয় লক্ষ হাদীসের মধ্যে ৭২৭৫টি হাদীস প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন এবং এইগুলি তাঁহার গ্রন্থে নামায, হজ, জিহাদ ইত্যাদি বিষয় অনুসারে বিন্যস্ত করেন। হাদীস লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে তিনি অজু করিয়া নামায পড়িয়া লইতেন। তাঁহার গ্রন্থ মুসলিম জগতের সর্বত্র বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ হিসাবে শ্রদ্ধার সহিত পঠিত হইয়া থাকে।

হাদীস

বুখারীর গ্রন্থের প্রায় সমমর্যাদা সম্পন্ন হাদীস গ্রন্থ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (মৃত্যু ৮৭৫) কর্তৃক সংকলিত হয়। বুখারীর গ্রন্থের সহিত মুসলিমের গ্রন্থও সমভাবে সমাদৃত হইয়া থাকে এবং 'সহীহাইন' বা দুইটি বিশুদ্ধ পুস্তক বলিতে এই দুইটি হাদীস গ্রন্থকে বুঝান হয়। অপর চারটি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থের নাম আবু দাউদের (মৃঃ ৮৮৮) 'সুনান', তিরমিজীর (মৃত্যু আনুমানিক ৮৯২) 'জামী', ইবন মাজার (মৃঃ ৮৮৬) 'সুনান' এবং নাসায়ীর (মৃত্যু ৯১৫) 'সুনান'।

কুরআন ও হাদীসের চর্চার ফলে ধর্মের যাবতীয় বিধি-নিষেধ (শরীয়ত) ফিক্‌হ্‌র মাধ্যমে বিধিবদ্ধ হইতে থাকে। এই সময় সমাজের পরিবর্তিত অবস্থা ও নূতন পরিস্থিতির মোকাবেলার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নে দুইটি নীতি উদ্ভব হয়—একটি কিয়াস (বা সাদৃশ্য ভিত্তিক সিদ্ধান্ত) এবং অপরটি ইজমা (সাধারণ সম্মতি)। এইভাবে

ফিক্‌হ্

মুসলিম আইনের চারিটি উৎস স্থিরীকৃত হয়। তাছাড়া বিশিষ্ট আইনজ্ঞগণ কোন ব্যাপারে শরীয়তের বিধি নির্ণয় করিবার জন্য প্রায়শঃ ব্যক্তিগত মত প্রয়োগ করিতেন। এই ব্যাপারে হযরত রসূলুল্লাহর (সঃ) সহিত তাঁহার ইয়ামনে নিযুক্ত কাজী মু'আজ ইবন জাবালের একটি কথোপ-কথন ব্যক্তিগত অভিমতের নীতি সুস্পষ্টভাবে সমর্থন করিতেছে:

হযরত: যখন কোন ব্যাপার উপস্থিত হয়, তখন তুমি কিভাবে মীমাংসা করিবে?

মু'আজ: আল্লাহর কুরআনের সাহায্যে।

হযরত: যদি তুমি তাহাতে কিছু না পাও?

মু'আজ: রসূলের সুন্নাহ মোতাবেক।

হযরত: যদি তাহাতে কিছু না পাও?

মু'আজ: তাহা হইলে আমি আমার যুক্তি প্রয়োগ করিব।

এই সকল নীতির ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের ফলে সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে চারিটি প্রধান মজহাব বা মতাবাদ গড়িয়া উঠে। ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) (মৃত্যু ৭৬৭) প্রধান হানাফী মজহাবের জন্মদাতা। তাঁহারই শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ তাঁহার বিখ্যাত 'কিতাবুল-খারাজ' গ্রন্থে তাঁহার উস্তাদের প্রধান মতবাদসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইমাম আবু হানীফা (রা) কিয়াসের নীতির সহিত আর একটি নীতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এইটি হইল ইসতিহ্‌সান (সুবিচার)। ইমাম আবু হানীফার (রাঃ) মজহাব সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা সহনশীল। সুন্নী মুসলিম জগতের প্রায় অর্ধাংশ তাঁহার মত-বাদে বিশ্বাসী। ফন ক্রেমারের মতে এই মজহাব ইসলামের এক 'মহত্তম ও মহিমান্বিত কীর্তি'। মদীনার ইমাম মালিক ইবন আনাস মালিকী মজহাবের প্রতিষ্ঠাতা। উত্তর আফ্রিকা ও পূর্ব আরবে এই মতবাদ প্রচলিত। মুহম্মদ ইবন ইদ্রীস আশ-শাফিয়ী (মৃত্যু ৮২০) সহনশীল ইরাকের ও রক্ষণশীল মদীনার দুই মতবাদের মাঝামাঝি মধ্যপন্থী মত পোষণ করিতেন। তাঁহার মতবাদ শাফিয়ী মজহাব নামে সুপরিচিত হইয়া মিসরের নিম্নাঞ্চল, পূর্ব আফ্রিকা, প্যালেস্টাইন, পশ্চিম ও দক্ষিণ আরবে এবং ভারতের উপ-কূলীয় অঞ্চলে প্রাধান্য লাভ করে। চতুর্থ সুন্নী মজহাবের প্রতিষ্ঠাতা শাফিয়ীর শিষ্য ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল কর্তৃক প্রতিষ্টিত হয়। তিনি খলীফা মামুনের সময় মুতাজিলা মতবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া কারারুদ্ধ হন এবং বহু নিপীড়ন ও নিগ্রহ ভোগ করেন। বাগদাদে তিনি

জনপ্রিয় শিক্ষাগুরু ছিলেন এবং তাঁহার জানাজায় আট লক্ষ পুরুষ ও ষাট হাজার স্ত্রীলোক শরীক হইয়াছিল। তাঁহার বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ 'মসনদ' বিশিষ্ট সম্মানের অধিকারী।* শরীয়তের বিধি-নিষেধ অনুযায়ী মানুষের যাবতীয় কাজ-কর্মকে পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে (১) ফরয (অবশ্য কর্তব্য), (২) মুস্তাহাব (প্রশংসনীয়), (৩) জায়েজ (আইনসিদ্ধ), (৪) মহরূহ (অপছন্দনীয়), (৫) হারাম (নিষিদ্ধ)।

শিল্পকলা

উমাইয়া যুগের শিল্পকলার কথা বিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। আব্বাসীয় যুগে খলীফা মনসূর ও হারুনুর-রশীদের সময় বহু সুরম্য অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছিল, কিন্তু সবই কালের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

স্থাপত্য

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা হইতে এই সকল প্রাসাদ ও অট্টালিকার জাঁকজমক ও ব্যয়বাহুল্য সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। মনসূর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'কুব্বাতুল-খাদরা,' কাসরুল খুলদ এবং রুসাফা, বার্মাকীগণ কর্তৃক নির্মিত প্রাসাদসমূহ, খলীফা মুতাদিদের ৪ লক্ষ দীনার ব্যয়ে নির্মিত 'সুরাইয়া' প্রাসাদ এবং 'তাজ' প্রাসাদ, মুতাদিদের 'বৃক্ষ' প্রাসাদ (দারুশ-শাজারা) এবং বুওয়াইহীদের ১০ লক্ষ দীনার ব্যয়ে নির্মিত 'মুইজ্জীয়া' প্রাসাদ সকলই বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলাইয়া গিয়াছে। কয়েকটি ধ্বংসযজ্ঞ এই সামগ্রিক বিলুপ্তির জন্য দায়ী। প্রথমতঃ আমীন ও মামুনের গৃহ যুদ্ধ এবং দ্বিতীয়তঃ ১২৫৮ খ্রীস্টাব্দে হালাগু খানের বাগদাদ লুণ্ঠন এবং সর্বশেষে নৈসর্গিক কারণে এই সকল স্থাপত্য শিল্প নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। মুতাসিম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজধানী সামাররার ধ্বংসাবশেষ নির্ভুলভাবে সনাক্ত হইয়াছে। মুতাসিমের পুত্র মুতাওয়াক্কিল এখানে ৭ লক্ষ দীনার ব্যয়ে একটি বৃহৎ জুমা মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। রাক্কার সামরিক ঘাঁটির ধ্বংসাবশেষও টিকিয়া আছে। সামাররা ও রাক্কার নির্মাণ কৌশলে, স্থাপত্য পদ্ধতিতে পারসিক প্রভাব সুস্পষ্ট। অন্যপক্ষে উমাইয়া-যুগের স্থাপত্য পদ্ধতিতে বাইজানটাইন ও সিরীয় প্রভাব প্রবল।

প্রাণীজগতের প্রতিকৃতি সন্ধান সম্বন্ধে বাধা-নিষেধ থাকা সত্ত্বেও আমরা

---

* হানাফীদের সংখ্যা ১১৮,০০০,০০০ শাফিয়ীদের সংখ্যা ৭৩,০০০,০০০ মালিকীদের সংখ্যা ৩০,০০০,০০০ এবং হাম্বলীদের সংখ্যা ৩,০০০,০০০।

অট্টালিকার সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য চিত্রকলার ব্যবহার কোথাও কোথাও দেখিতে পাই। মনসূর তাঁহার প্রাসাদের গুম্বজের উপর একজন অশ্বারোহীর প্রতিকৃতি স্থাপন করিয়াছিলেন। আমীন দজলায় তাঁহার প্রমোদতরীগুলি সিংহ, ঈগল ও তিমি মৎস্যের আকৃতি করিয়া তৈয়ার করাইয়াছিলেন। মুকতাদির একটি প্রকাণ্ড সরোবরের মধ্যস্থলে অষ্টাদশ প্রশাখা বিশিষ্ট স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত একটি বৃক্ষ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সরোবরের প্রতি পার্শ্বে ব্রকেডের পোশাকে সুসজ্জিত বর্শাধারী পঞ্চদশ অশ্বারোহীর মূর্তি ছিল। ইহারা যন্ত্রচালিত হইয়া অহরহ যুদ্ধরত সৈনিকদের মত অঙ্গভঙ্গী করিয়া ঘুরিতে থাকিত। মুতাসিম তাঁহার সামাররা প্রাসাদকে কুসায়র আমরার মত প্রাচীন চিত্রে শোভিত করিয়াছিলেন। মুতাওয়াক্কিলের সময়েও প্রাসাদে বহু মানব মূর্তি অঙ্কিত করা হয়। এই সকল কাজ খ্রীস্টান কারিগর দ্বারা করা হইত বলিয়া মনে হয়।

চিত্রকলা

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন পুস্তকে ক্ষুদ্রচিত্র (Miniature) সন্নিবেশিত করা হইত। এই সকল পুস্তকের মধ্যে কালিলা ওয়া দিমনাহ্ হারিরীর মুকামাত ও কিতাবুল আগানীর নাম উল্লেখ করা যায়।

মুসলমানদের মধ্যে প্রাণীজগতের প্রতিকৃতি অঙ্কন বাধা-নিষেধের ফলে কখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু কুরআন শরীফ ও অন্যান্য গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে মুসলমানগণ খুশখৎ বা সুন্দর হস্তাক্ষর ব্যবহার করেন। খুশখৎ লিখক সমাজে চিত্রকর অপেক্ষা অনেক সম্মানী ছিলেন। রাজা-বাদশাহ, কাজী ও অন্যান্য লোকগণ খুশখৎ অভ্যাস করাকে পুণ্যের কাজ বলিয়া মনে করিতেন। আরবী ভাষায় লিখিত বইয়ের বহুল প্রচার ও প্রসারের জন্য আমরা এই সকল লিখকদের নিকট ঋণী। প্রখ্যাত হস্তলিপিকার ইবন মুকলাহ খলীফা আর-রাদীর সময় উজীর ছিলেন। সুন্দর হস্তলিপির সাহায্যে পুস্তকের প্রতিলিপি প্রস্তুত করা ছাড়াও বইয়ের সাজসজ্জা ও বিভিন্ন রংয়ের সাহায্যে ইহাকে মনোগ্রাহী করিয়া তৈয়ারের কলাকৌশলও মুসলমানগণ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

খুশখৎ

উমাইয়া যুগের মত আব্বাসী যুগেও সঙ্গীত চরমোৎকর্ষ লাভ করে। এই যুগের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে মক্কার সিয়াত, মসুলের ইব্রাহীম, ইবন জামী, মুখারিক ও ইসহাক ইবন মসুলী প্রধান। ইঁহাদের মধ্যে ইব্রাহীম মসুলী সর্বশ্রেষ্ঠ ও মৌলিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। খলীফা হারুনুর-রশীদ

তাঁহাকে ১ লক্ষ ৫০ হাজার দিরহাম এককালীন দান করেন এবং দশ হাজার দিরহাম তাঁহার মাসিক বৃত্তি নির্ধারিত করেন। ইহা ছাড়া তিনি মাঝে মাঝে পারিতোষিক লাভ করিতেন। একবার একটি মাত্র সঙ্গীতের জন্য তিনি খলীফার নিকট এক লক্ষ দিরহাম লাভ করিয়াছিলেন। এই খলীফার সময় বহু সঙ্গীতজ্ঞ ও গায়ক-গায়িকা তাঁহার দরবার অলংকৃত করিয়াছিল। একটি সঙ্গীত উৎসবে দুই হাজার গায়ক-গায়িকা অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ইব্রাহীম মসুলীর মত তাঁহার পুত্র ইসহাকও বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। খলীফা হারুনুর-রশীদের ভ্রাতা ইব্রাহীম ইবনুল মাহদী বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও গায়ক ছিলেন। খলীফাদের মধ্যে আল-ওয়াসিক, আল-মুনতাসির, আল-মুতাজ ও আল-মুতামিদ সঙ্গীতবিশারদ ছিলেন। ওয়াসিক তাঁহার বাঁশীতে এক শত সুর-লহরী বাজাইতে পারিতেন। এই যুগে সঙ্গীত সম্পর্কিত অনেক বই গ্রীক ভাষা হইতে আরবীতে অনূদিত হয়। সঙ্গীতের আরবী প্রতিশব্দ মুসিকী গ্রীক ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। আরবগণ সঙ্গীতের মতবাদের জন্য গ্রীকদের নিকট ঋণী হইলেও ব্যবহারিক কলা হিসাবে সঙ্গীতের চর্চায় তাহাদের অবদান মৌলিক। আরবগণ সঙ্গীতের থিওরী বুঝাইতে 'মুসিকী' শব্দের প্রয়োগ করিতেন এবং আরবী শব্দ 'গীনা' ব্যবহারিক গানের জন্য প্রয়োগ করিতেন। সঙ্গীত বিষয়ে পুস্তক রচনাকারীদের মধ্যে দার্শনিক আল-কিন্দী, চিকিৎসা বিজ্ঞানী আর-রাজী ও দার্শনিক আল-ফারাবীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে আল-ফারাবী সঙ্গীতের মতবাদের উপর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবাপেক্ষা মৌলিক গ্রন্থ প্রণেতা। তাঁহার রচিত কিতাবুল-মুসিকী উল-কবীর প্রাচ্যে সঙ্গীতের সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য পুস্তক। প্রখ্যাত মনীষী ইবন সীনাও সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। ইমাম আল-গাজ্জালী 'সামা' নামক ভক্তিমূলক গানের সমর্থনে মত প্রকাশ করায় সূফীদের মধ্যে সঙ্গীতের বহুল প্রচলন ঘটে।

সঙ্গীত

বিস্তারিত পাঠ্য তালিকা

আর্নল্ড, দি লিগেসি অব ইসলাম
হিট্টি, হিস্ট্রি অব দি এরাব্স্
রোজেন থাল, পলিটিক্যাল থট ইন মেডিয়্যাভাল ইসলাম

৪০

মুসলিম ধর্ম সম্প্রদায়সমূহ

মুসলমানদের মধ্যে অদৃষ্টবাদ ও মানবীয় কর্ম-স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করিয়া যে দুইটি মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল, সে সম্বন্ধে বিংশ অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। কিভাবে মু'তাজিলা মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে, সে সম্বন্ধেও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহারা ছিল ধর্মের ব্যাপারে যুক্তি প্রয়োগের পক্ষপাতী। আব্বাসীয় যুগের প্রথম দিকে এই মতবাদ শক্তিশালী হইয়া উঠে। মামূন মু'তাজিলা মতবাদের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি এই মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন না, বরং এই মতবাদকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। তিনি ৮২৭ খ্রীস্টাব্দে একটি ঘোষণা প্রকাশ করিলেন যে, "কুরআন সৃষ্ট"। ছয় বৎসর পর ৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি আর এক ফরমান জারী করিয়া বিরুদ্ধবাদীদের বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করেন। কাজীগণ এই বিচারে উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে তাঁহাদিগকে বরখাস্ত করা হইত। মামূনের সময় রক্ষণশীল মতবাদের সমর্থক ধার্মিকপ্রবর ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল স্বীয় মতবাদে অটুট থাকিয়া অটল বিশ্বাস ও দুর্জয় সাহসের পরিচয় দান করেন। পুরাতন মতবাদের সমর্থকগণকে মামুনের উত্তরাধিকারী মুতাসিম ও ওয়াসিকের সময়ও নির্যাতন সহ্য করিতে হয়। কিন্তু খলীফা মুতাওয়াক্কিল ৮৪৮ সালে মু'তাজিলাবাদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়া পুরাতন মত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। মু'তাজিলা চিন্তাবিদ-গণের মধ্যে আন-নজ্জাম, আল-জাহিজ, মুআম্মার আস-সুলামী এবং আল-জুব্বায়ী প্রধান। বিখ্যাত তফসীর লিখক আজ-জমখশরী মু'তাজিলা-পন্থী ছিলেন।

মু'তাজিলাবাদ

মু'তাজিলা মতবাদের উৎপত্তি সম্পর্কে বহু বিতর্ক প্রচলিত আছে। গ্রীক দর্শনের প্রভাবে মুসলমানদের মধ্যে এই মতবাদের উদ্ভব হয় বলিয়া মনে করা হয়। বুদ্ধিজীবী মহলে গ্রীক দর্শনের বহুল প্রসার মামূনের রাজত্বকালেই (৮১৩—৮৩৩ খ্রীঃ) ঘটে। ইহার এক শতাব্দী পূর্বে উমাইয়া

খলীফা হিশামের রাজত্বকালে (৭২৪—৪৩) আলজাদ ইবন ফিরহাম নামক একজন লোক 'কুরআন সৃষ্ট' এই মতবাদ প্রচারের অপরাধে এবং গায়লান আদ-দিমাস্কী নামক অপর একজন লোক মানুষের স্বাধীন কর্মক্ষমতায় বিশ্বাস করার জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। ঐ সময় কোন গ্রীক গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। মু'তাজিলাগণ কুরআনের আলোকে মানবমনের বহু জিজ্ঞাসার সদুত্তর খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। সাধারণ প্রচলিত চরম অদৃষ্টবাদের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া চিন্তাশীল মনে আলোড়নের সৃষ্টি করে, তাহারই ফলশ্রুতি হইল মু'তাজিলা-বাদ। কুরআনের ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া তাহাদের মতবাদ গড়িয়া উঠে। পরবর্তীকালে গ্রীক ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শন এই মতবাদকে পরিপূর্ণতা দান করে।

মু'তাজিলাপন্থীদের মত ও নীতিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। এই প্রসঙ্গে তাহাদের পূর্ণ নাম বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বস্তুতঃ মু'তাজিলা নাম অন্যদের দেওয়া। ইহারা নিজদিগকে বলিত 'আহলুত তওহীদ ওয়াল আদ্ল' অর্থাৎ তওহীদ ও ন্যায়ের অনুসারী। এই নাম হইতেই তাহাদের মূল মতবাদের কাঠামো অনুমান করা যায়। আল্লাহ্‌র একত্বে অবিচল নিষ্ঠা এবং সামান্যতম আভাষে বা ইঙ্গিতে আল্লাহর সত্তার সহিত কোন অংশীবাদ বরদাশ্‌ত না করা, এবং আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচার সম্পর্কিত ধারণাকে সকল গোঁজামিল হইতে মুক্ত রাখা। আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে তাঁহার সত্তা হইতে পৃথক করিয়া দেখানকে ইহারা তওহীদের পরিপন্থী মনে করে। চরম অদৃষ্টবাদ অনুযায়ী মানুষের দোষ বা দুষ্কর্মের জন্য শাস্তিদানকে ইহারা আল্লাহ্‌র আদল বা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী মনে করে। মু'তাজিলাপন্থীদের অপরাপর সকল নীতি এই দুইটি মূলনীতি হইতে উদ্ভূত এবং তাহাদের এই দুইটি মূলনীতি কুরআন-কেন্দ্রীক ও কুরআন-ভিত্তিক। তওহীদের ভাবধারার সহিত তিনটি মত যুক্ত রহিয়াছে।

(১) আল্লাহ্‌র জাত ও সিফাত (গুণাবলী): আল্লাহ এক। তাঁহার গুণাবলী তাঁহার সত্তা হইতে পৃথকভাবে কল্পনা করা যায় না। কারণ আল্লাহ চিরন্তন। তাঁহার গুণাবলীও যদি চিরন্তন হয়, তবে আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বহুত্বের ধারণা আরোপিত হয়। আল্লাহ্‌র সিফাত (গুণাবলী) তাঁহার জাত (সত্তা) হইতে পৃথক নহে।

(২) কুরআন আল্লাহ্‌র অহী। মু'তাজিলাগণ মনে করে যে, আল্লাহ্‌র

অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মত কুরআনও সৃষ্ট। যে কারণে আল্লাহর চিরন্তন গুণাবলীর কল্পনা তওহীদের পরিপন্থী, ঠিক সেই কারণে কুরআনকে চিরন্তন বলিয়া ধরিয়া লইলে ইহা তওহীদের পরিপন্থী হয়। ইহা মু'তাজিলাগণের দ্বিতীয় প্রধান অভিমত।

(৩) বেহেশতের অধিবাসিগণ পরকালে আল্লাহতাআলাকে দেখিবেন, এই ধারণার প্রকৃত ব্যাখ্যা মু'তাজিলা মতানুযায়ী অন্যরূপ। আল্লাহ্ স্থানকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহেন। তাঁহার শরীরী কোন অস্তিত্ব নাই। কোন চর্মচক্ষে তাঁহাকে দেখা যায় না। কাজেই বেহেশতে তাঁহাকে সাধারণ অর্থে দেখা যাইবে না। এই সাক্ষাৎকার আধ্যাত্মিক অর্থে বুঝিতে হইবে।

আল্লাহ্তাআলার ন্যায়বিচারের সহিত সম্পর্কযুক্ত মু'তাজিলা মতগুলি নিম্নরূপ: যদি স্ব স্ব কর্ম সম্পাদনার স্বাধীনতা মানুষের না থাকে, যদি মানুষ পূর্বনির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থানুযায়ী কলের পুতুলের মত সকল কাজ করিয়া যায়, তবে কৃতকর্মের জন্য তাহাকে দায়ী করা যায় না। কাজেই মানুষের ভালমন্দ কাজ করিবার স্বাধীনতা রহিয়াছে। অন্যপক্ষে যদি আল্লাহ মানুষকে কৃতকর্মের জন্য পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত করেন অথচ মানুষের কোন ভালমন্দ কর্মপন্থা নির্ণয়ের স্বাধীনতা না থাকে, তবে আল্লাহ্র ন্যায়বিচারে সন্দেহের অবকাশ থাকে। অথচ আল্লাহ যে ন্যায়বিচারক, এ বিষয়ে কাহারও দ্বিমতের অবকাশ নাই। কাজেই মু'তাজিলা মতানুসারে মানুষ আপন আপন কর্মপন্থা অবলম্বনে স্বাধীন। সে সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করিলে আল্লাহ্ তাহাকে পুরস্কৃত করেন, অন্যায় করিলে তিনি তাহাকে শাস্তিদান করেন।

আশ'আরী

যুক্তিবাদী মুতাজিলা মত খণ্ডন করিয়া পুরাতন মতবাদকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুসলমানদের মধ্যে নূতন ধর্মতত্ত্বের উদ্ভব হইল। ইহাকে 'ইলমুল কালাম' ও ইহার ধারক ও বাহকগণকে 'মুতাকাল্লিমীন' বলা হয়। এই পন্থার প্রধান উদ্যোক্তা আশ'আরী এবং তাঁহার মতবাদকে আশ'আরী মতবাদ বলা হইয়া থাকে। ধর্মকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ ও যুক্তি প্রদর্শন ব্যতীতই গ্রহণ করিতে হইলে এবং ধর্মীয় চিন্তাকে আলোচনা-সমালোচনা ও দার্শনিক চিন্তার আওতা বহির্ভূত রাখিতে হইলে মু'তাজিলাদের আক্রমণ হইতে সনাতন ধর্মকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই পুরাতন মতবাদের স্বপক্ষে যুক্তিবাদের অবতারণা নূতন কালাম বা ধর্মতত্ত্বের প্রধান

উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। আবুল হাসান আলী আল'আশআরী (৮৭৩—৯৩৫ খ্রীঃ) বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রথমে মু'তাজিলী ধর্মনেতা আবদুল ওয়াহ্হাব আল-জুব্বায়ীর নিকট ধর্মজ্ঞানে শিক্ষা লাভ করেন। চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি মু'তাজিলা ছিলেন। ৯১২ খ্রীস্টাব্দে বসরার মসজিদে এক শুক্রবারে তিনি মুতাজিলা পথ পরিহার করেন। তখন হইতে তিনি পুরাতন মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং মু'তাজিলাপন্থীদের যুক্তি তাহাদেরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। আল্লাহ্‌র সিফাত (গুণাবলী) সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলেন যে, আল্লাহ্‌র গুণ ও মানুষের গুণ এক নহে। আল্লাহ্‌র গুণকে মানুষের গুণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে বুঝিতে হইবে। সাক্ষরিক অর্থে কিংবা মানবীয় অর্থে ইহা বুঝা যাইবে না। আল্লাহ্‌র গুণাবলী আমাদের বিশ্বাসের অঙ্গ। ইহা বুঝিবার চেষ্টা করা সমীচীন নহে।

কুরআন সম্বন্ধে তিনি বলেন: কুরআনের বহিঃপ্রকাশ নির্দিষ্ট সময়ে ঘটিলেও কুরআন আদি হইতে বিদ্যমান। ইহাঁর শব্দরূপ আল্লাহ্‌তাআলারই দেওয়া। কাজেই কুরআনের ভাষা আল্লাহ্‌রই ভাষা। এই আদি ও অবিনশ্বর কুরআন জিব্রাইলের মাধ্যমে আল্লাহতাআলার রসূলের উপর অবতীর্ণ করিয়াছেন। কাজেই ইহা জাগতিক পদার্থের মত সৃষ্ট নহে। আল্লাহ্‌র দর্শন সম্বন্ধীয় মতবাদকে নানা যুক্তি সহকারে উপস্থাপিত করিতে গিয়া তিনি বলেন যে, কিয়ামতের দিনে মানুষ আল্লাহকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে, যেমন পূর্ণিমার দিনে চাঁদকে দেখা যায়। মানবীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে আশ'আরী নূতন ব্যাখ্যা দান করেন। এই ব্যাপারে তিনি প্রাচীনপন্থী ও মু'তাজিলাপন্থীদের মতের সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। তিনি মানুষের কর্মের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া বলেন, আল্লাহ সকল কাজের স্রষ্টা, কিন্তু মানুষ স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনতা প্রয়োগে কাজ অর্জন করে (কাস্‌ব্) ও তাহার জন্য দায়ী হয়।

আশ'আরীর ব্যবস্থা ও মতবাদকে পূর্ণতা দান করেন ইমাম আবু হামিদ আল-গাজ্জালী। এই প্রতিভাবান মনীষী মুসলমানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মৌলিক চিন্তাবিদদের অন্যতম। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ধর্মীয় চিন্তায় তাঁহার অবদান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। খুরাসানের তুস নগরে ১০৫৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। গভীর ধর্মীয় মনোভাব এবং অনুসন্ধিৎসু মন লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইমাম গাজ্জালী

ধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, দার্শনিকদের সূক্ষ্ম তর্ক, সূফীবাদের আভ্যন্তরীণ পন্থা প্রভৃতি তাঁহার মনকে নানাভাবে আলোড়িত করে। তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া কালাতিপাত করেন। তিনি 'আল-মুনকিজ মিনাদ-দালাল' গ্রন্থে এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন, "আমার বিশ বৎসর বয়স হইতে প্রতিটি মতবাদ অথবা বিশ্বাস গভীরভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে আমি ক্লান্তি বোধ করি নাই। আমি এমন কোন 'বাতেনী' লোকের সংস্পর্শে আসি নাই, যাঁহার আভ্যন্তরীণ পন্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে আমার ইচ্ছা হয় নাই; এমন কোন 'জাহেরী' লোকের সংস্পর্শে আসি নাই, যাঁহার বাহ্যিক পন্থার সার সংগ্রহ করিতে চেষ্টিত হই নাই, এমন কোন দার্শনিকের সংস্পর্শে আসি নাই, যাঁহার দর্শনের মূলবস্তু শিখিতে চাহি নাই; এমন কোন মুতাকাল্লিমের সংস্পর্শে আসি নাই যাঁহার 'কালামের' উদ্দেশ্য অনুধাবন করিতে চেষ্টা করি নাই; এমন কোন সূফীর সাহচর্য পাই নাই, যাঁহার সূফীবাদের মর্ম উদ্ধার করিতে আগ্রহী হই নাই; এমন কোন দরবেশের সাক্ষাৎ পাই নাই, যাঁহার বৈরাগ্যের উৎপত্তি অনুধাবন করিতে চেষ্টা করি নাই; এমন কোন জিনদীকের দেখা পাই নাই, যাহার নাস্তিকতার কারণ উদ্ঘাটন করি নাই। এই অনুসন্ধিৎসা আমার যুবা বয়স হইতে আমার হৃদয়ের অতৃপ্ত পিপাসার মত ছিল। এই সহজাত প্রবৃত্তি ও স্বভাব আল্লাহতাআলা আমার মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহাতে আমার কোন হাত ছিল না।"

আল-গাজ্জালী প্রথমতঃ ধর্ম ও আইন অধ্যয়ন করেন। বিশ বৎসর বয়সে তিনি তকলীদের (পূর্ববর্তী ধর্মমতকে অন্ধভাবে অনুকরণ) বিরোধিতা করেন। এই সময় তিনি দর্শন, তর্কশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও তাসাউফ অধ্যয়ন করেন। ১০৯১ খ্রীস্টাব্দে তিনি বাগদাদের নিজামীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইহার কিছুদিন পর তাঁহার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল এবং তিনি অধ্যাপনা ছাড়িয়া দিয়া সূফীবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বার বৎসর দরবেশের মত নানা জায়গায় ঘুরিয়া, হজ্ব সমাপন করিয়া পুনরায় বাগদাদে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার জন্মস্থান তুসনগরে ১১১১ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। গাজ্জালী অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; তন্মধ্যে পূর্বোক্ত 'মুনকিজ' তাহাফুতুল-ফালাসিফাহ্, আল-ইকতিসাদ ফি'ল ই'তিকাদ প্রধান। তাঁহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ইহ্ইয়াউলুমুদ্দীন' (ধর্মীয় জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন)।

আল-গাজ্জালী মুতাকাল্লিমীন, বাতিনী ও ইসমাঈলী, দার্শনিক ও সূফী-দের মতবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, কেবলমাত্র যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা কিংবা কেবলমাত্র সংজ্ঞার সাহায্যে সত্যে পৌঁছান সম্ভব নয়। তিনিই সর্বপ্রথম আচার-অনুষ্ঠান ভিত্তিক ধর্মের সহিত সূফীবাদের সমন্বয় সাধন করেন। তিনি ধর্মের প্রয়োজনে দর্শনের সহায়তাও গ্রহণ করেন। তাই মুতাকাল্লিমীনের ধর্ম, সূফীর ধর্ম ও দার্শনিকের ধর্মের সকল বিরোধ দূরীভূত করিয়া তিনি এই বিভিন্ন মত-বাদের সংশ্লেষ সাধিত করেন। তাঁহার সৃষ্টিধর্মী ও সহনশীল লিখনীর প্রভাবে বহুদিনের বিতর্কের অবসান ঘটে এবং ইসলামী চিন্তাধারার এক বিশিষ্ট রূপ সুনির্দিষ্ট হয়। দার্শনিকদের নিকট হইতে তিনি যুক্তি প্রয়োগের নীতি গ্রহণ করেন। মুতাকাল্লিমের মতানুযায়ী তিনি 'ওহী' বা খোদা প্রদত্ত জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন এবং সূফীদের নিকট হইতে তিনি সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। গাজ্জালীর ভাবধারা লাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়া ইহুদী ও খ্রীস্টান চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

সূফীবাদ

ইসলামে সূফীবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ ধর্মের ইতিহাসে এক মনোজ্ঞ অধ্যায়। অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের মত সূফীবাদও মুসলমানদের মধ্যে উৎপত্তি লাভ করিয়া পরে নানা দেশীয় ভাবধারায় পুষ্টি লাভ করে। বাহ্যিক আচার-সর্বস্ব ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এই ভাবধারার উদ্ভব হয়। তাহা ছাড়া স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের জন্য ও তাঁহার সহিত সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রতি মানব মনের আকুল আকুতি এই মতবাদের জন্মদান করে। নীতি ও মতবাদের চেয়ে চিন্তা ও অনুভূতিই সূফীবাদের মূলকথা। বিখ্যাত বিজ্ঞানী জাবির ইবন হাইয়ানকে প্রথম সূফী নাম দেওয়া হয়। প্রথম যুগের সূফী সাধকগণের মধ্যে বলখের ইব্রাহীম ইবন আদহমের নাম ও রাবিয়া বসরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে বাগদাদে বিখ্যাত সূফী মারূফ আল-কারখী মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহার সময় হইতে নিছক বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রসাধনা হইতে সূফীবাদের পৃথক ভাবধারার উৎপত্তি হইতে থাকে। সূফীবাদকে যিনি সর্বপ্রথম বিশেষ মত ও পথ হিসাবে স্বাতন্ত্র্য দান করেন, তিনি হইলেন জুননুন আল-মিসরী। মরমীয় পুলকানুভূতির (ওয়াজ্দ) মাধ্যমে আল্লাহর দিব্যজ্ঞান লাভের কথা তিনিই প্রথম ব্যক্ত করেন।

পারসিক বায়েজীদ আল-বিস্তামী সর্বপ্রথম 'ফানা' (বা ব্যক্তিসত্তার বিলোপ) নীতি প্রবর্তন করেন। ৯২২ খ্রীস্টাব্দে ইবন মনসুর আল-হাল্লাজ বিশেষ অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় 'আনাল-হাক্ক' বা 'আমি সত্য' এই কথা উচ্চারণের জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। সূফী বায়েজীদের 'ফানা'র অভিজ্ঞতার এটি অন্যতম অভিব্যক্তি। পরমাত্মার মধ্যে মানবাত্মার অবলুপ্তির যে অনুভূতি, হাল্লাজ 'আনাল হাক্ক'-এর মাধ্যমে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্ন-লিখিত কবিতায় তাঁহার সূফী ভাবধারা অনবদ্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে :

আমি সেই, যাহাকে আমি ভালবাসি এবং যাহাকে আমি ভালবাসি সেই আমি ;

আমরা দুই আত্মা একই দেহে আমাদের বাস,
তুমি যখন আমাকে দেখ, তখন তাহাকেও দেখ,
এবং যখন তুমি তাহাকে দেখ তখন আমাদের উভয়কেই দেখ।

সূফীদের মধ্যে অদ্বৈতবাদের প্রধান উদ্বোক্তা ছিলেন স্পেনের মরমী সাধক মুহীউদ্দীন ইবনুল আরাবী। যাবতীয় পদার্থে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বানু-ভূতির ধারণা তাঁহারই অবদান।

মরমী কবিদের মধ্যে পারসিক সাদী, হাফিয ও রুমী বিখ্যাত নাম। দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের মধ্যে সূফীবাদে যাঁহাদের উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে আল-ফারাবী ও ইমাম আল-গাজ্জালীর নাম বিশেষ স্মরণীয়।

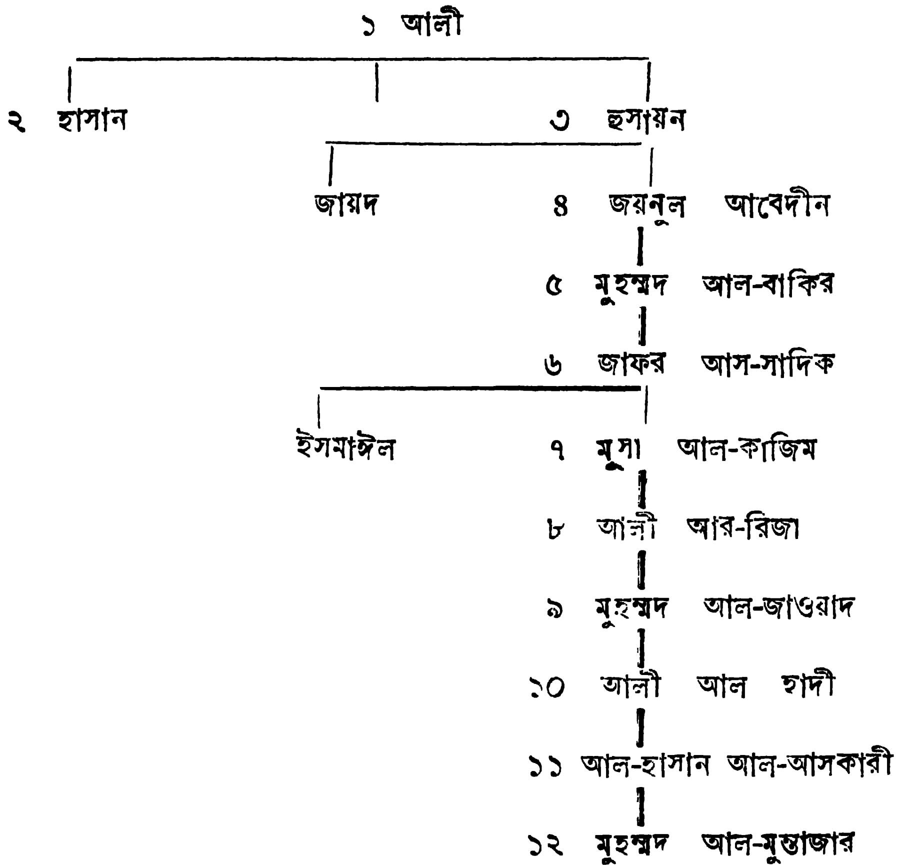
প্রথম পাঁচ শতাব্দী যাবৎ সূফীবাদ ব্যক্তিভিত্তিক ছিল। দ্বাদশ খ্রীস্টীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে বিভিন্ন সূফী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। ইহাদের মধ্যে হযরত আবদুল কাদির প্রতিষ্ঠিত কাদিরিয়া তরীকা (পথ) মুসলিম জগতে বিশেষ প্রসার লাভ করে। মরমী কবি জালালুদ্দীন রুমীর অনুসারী সূফী তরীকার নাম 'মাওলাবী তরীকা'। ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই তরীকার লোকেরা ভক্তিমূলক গানের ব্যবহার করিত। শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী তাঁহার সূফী মতবাদের জন্য ১১৯১ খ্রীস্টাব্দে আলেপ্পোতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি বিখ্যাত সুহরাওয়ার্দীয়া তরীকার জন্মদাতা।

ইহার পর মুসলিম জগতের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় বহু সূফী ভ্রাতৃত্বের উদ্ভব হয়। এই সকল তরীকার অনুসারীরা বিশেষ আস্তানায় বাস করে। তাহাদের বাসস্থানকে 'তাকিয়া', 'জাবিয়া' কিংবা 'রিবাত' বলা হইত। জাবিয়ার প্রধান দীক্ষা-গুরুর নাম ছিল শায়খ বা মুর্শীদ এবং দীক্ষিতকে মুরীদ বলা হইত। ইহারা বিশেষ অনুষ্ঠানে আল্লাহ্‌র 'জিকর' করিত। ইহারা সচরাচর পশমী পোশাক পরিধান করিত। সম্ভবতঃ পশম (সূফ) হইতে ইহাদের নাম সূফী হইয়াছে। সূফীদের মধ্যে তসবীহ ব্যবহারের প্রচলন আছে। সূফী পন্থায় বৈরাগ্য, দারিদ্র্য, কৃচ্ছ্র সাধনা, জিকর ও ধ্যানের মাধ্যমে মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন সাধিত হয়। ভালবাসার সাহায্যে এই মিলন সংঘটিত হয়; ভয় ও ভীতির মাধ্যমে নয়। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সূফী মতে পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। সূফীদের আদর্শ হিসাবে রাবিয়া বসরী বিশেষ সম্মানের অধিকারিণী। তিনি অনুশোচনা (তওবা), ধৈর্য, দারিদ্র্য ও আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরশীলতার (তাওয়াক্কুল) জন্য সমগ্র মুসলিম জগতে সুপরিচিতা। তাঁহার অপরাপর বাণীর মধ্যে নিম্নলিখিতটি প্রধান:

"আমি আল্লাহ্‌র ভয়ে····কিংবা বেহেশ্‌তের আশায় আল্লাহ্‌র ইবাদত করি নাই; শুধু মাত্র তাঁহারই প্রেমে এবং তাঁহাকে পাওয়ার আশায় (ইবাদত করিয়াছি)।"

আরবীতে 'শীয়া' শব্দের অর্থ দল। যাহারা হযরত আলীকে (রাঃ) মুআবিয়ার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সমর্থন দান করিয়াছিল, তাহারা 'শীয়াত-ই-আলী' বা আলীর দল নামে অভিহিত হইত। ইহারাই পরবর্তীকালে শীয়া সম্প্রদায়ে রূপান্তর লাভ করে। শীয়াদের মতে হযরত মুহম্মদের (সঃ) পরে মুসলমানদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব হযরত আলী (রাঃ) ও তাঁহার বংশের লোকদের মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ইমাম (শীয়া মতে নেতার নাম) শুধু মাত্র নেতৃত্বই করিবেন না, বরং তিনি আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষমতাও প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সেজন্য ইমাম বেগুনাহ হইবেন। শীয়াদের মধ্যে বহু দল-উপদল রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা বার ইমামকে মান্য করে, তাহাদিগকে 'ইসনা আশারীয়া' বলা হয়। এই বার ইমামের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল:

শীয়া



আলী, হাসান ও হুসায়ন ব্যতীত অপর নয়জন ইমাম সকলেই হুসায়নের বংশধর। ইঁহাদের মধ্যে চারিজনই বিষ প্রয়োগে নিহত হইয়াছেন বলিয়া মনে করা হয়, জাফর, মূসা, আলী আর-রিজা ও মুহম্মদ আল-জাওয়াদ। অপর চারিজন যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। দ্বাদশ ইমাম মুহম্মদ সামাররায় অদৃশ্য হইয়া যান। শীয়াদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, তিনি জীবিত আছেন এবং পৃথিবী ধ্বংস হইবার পূর্বে একবার 'মাহদী' হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিবেন ও সমগ্র পৃথিবী জয় করিবেন। দ্বাদশ ইমাম সর্বযুগে সর্বকালে অদৃশ্য ইমাম হিসাবে সম্মানিত হইয়া থাকেন। পারস্যের সাফাবী শাসকগণ অদৃশ্য ইমামের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্য শাসন করিতেন এবং আলিম-মুজতাহিদগণ ইমামের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিতেন।

যাহারা ষষ্ঠ ইমাম জাফরের পর মূসা আল-কাজিমকে ইমাম বলিয়া মানে না বরং ইমাম জাফরের জ্যেষ্ঠপুত্র ইসমাঈলকে যিনি পিতার মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পূর্বে ইন্তিকাল করেন—সপ্তম ইমাম বলিয়া স্বীকার করেন

তাহারা 'ইসমাঈলী' নামে পরিচিত। তাহাদের মতে সপ্তম ইমাম ইসমাঈল অদৃশ্য ইমাম (ইমাম মুন্তাজার)। ইসমাঈলীগণ কুরআনের ব্যাপক অর্থে ও ইহার আভ্যন্তরীণ গোপন অর্থে বিশ্বাস করিয়া থাকে, যাহারা কুরআনের এই গূঢ় রহস্য জানে না, প্রকৃত সত্য তাহাদের নিকট গোপন থাকে। এই মতবাদের জন্য ইসমাঈলীগণকে বাতিনীও বলা হয়।

বিস্তারিত পাঠ্য তালিকা

হিট্টি, হিস্ট্রি অব দি এরাব্স্
ট্রিটন, ইসলাম
সৈয়দ আবদুল হাই, মুসলিম ফিলসফী

৪১

আব্বাসীয় যুগে শিক্ষাপদ্ধতি

মুসলমানগণ ধর্মীয় প্রয়োজনে মুসলিম জগতের সর্বত্র এক অতি উন্নত ও ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে এই শিক্ষা ব্যবস্থা উচ্চ পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। হযরত মুহম্মদের (সঃ) জন্মের সময় মক্কায় খুব অল্পসংখ্যক লোকই লেখাপড়া জানিত। সীমিত সংখ্যক লোকের মধ্যে জ্যোতিষ ও যাদুবিদ্যার প্রচলন ছিল। ইসলাম প্রচারের পর জ্ঞানার্জনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। প্রথম অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতে আল্লাহতাআলা কর্তৃক মানুষকে জ্ঞান শিক্ষাদানের বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে:

"পড়, তোমার মহিমান্বিত প্রভু কলমের সাহায্যে শিক্ষাদান করিয়াছেন, মানুষকে শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা তাহারা জানিত না।"

হযরত রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) হাদীস, "জ্ঞানার্জন প্রতি মুসলমান নর-নারীর জন্য অবশ্যকর্তব্য" এবং "জ্ঞানার্জন কর, যদি চীন দেশেও হয়।" জ্ঞানার্জনে মুসলমানগণকে যুগে যুগে উৎসাহিত করিয়াছে।

মুসলমানদের শিক্ষা দুই জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চালু হয়; প্রাথমিক ও উচ্চ। এই যুগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি বিশেষের বদান্যতায় গড়িয়া উঠে। ফন ক্রেমারের মতে মুসলিম শিক্ষা-পদ্ধতি পুরামাত্রায় শিক্ষাদানের স্বাধীনতা ও বিষয়বস্তুর স্বাধীনতায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক সুমহান দৃষ্টান্ত। ইহাতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের দৃষ্টান্ত বিরল।

প্রাথমিক শিক্ষা মসজিদ সংলগ্ন গৃহে সম্পন্ন হইত। সমগ্র মুসলিম জগতে এইরূপ হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় আপনা-আপনি গড়িয়া উঠে। প্রায় প্রতি মসজিদে অথবা প্রতি গ্রামে এইরূপ একটি বিদ্যালয় থাকিত। ছয় বৎসর বয়সে বালক-বালিকাগণ এই বিদ্যালয়ে লেখাপড়া আরম্ভ করিত। কুরআন শরীফ পাঠ ও লিখার অভ্যাস এই বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ ছিল। লেখার অভ্যাস করা হইত বলিয়া এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হয় 'মাকতাব' বা লেখার স্থান। এই সকল মকতবে

নামায পড়ার জন্য কুরআনের কিয়দংশ মুখস্থ করান হইত। লেখা ও পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরবী ব্যাকরণ, রসূল ও সাহাবীদের সম্বন্ধীয় গল্প, কিছু অঙ্ক এবং কবিতাও শিখান হইত। মুখস্থ করার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইত। ছেলে-মেয়েদিগকে শাসন করার জন্য দৈহিক শাস্তির প্রচলন ছিল। রাজ-পরিবারের ও অভিজাত বংশের ছেলে-মেয়েদের জন্য বিশেষ শিক্ষকের ব্যবস্থা থাকিত। শিক্ষকের সম্মান সম্পর্কে মুসলিম সমাজে বহু প্রবাদ ও প্রবচন প্রচলিত আছে। এ সম্বন্ধে হযরত আলীর (রাঃ) একটি কথা প্রায়ই উল্লেখ করা হইয়া থাকে, "যিনি আমাকে এক হরফও শিক্ষা দিয়াছেন, আমি তাঁহার গোলাম।" ইহা সত্ত্বেও মক্তবের শিক্ষক (মুআল্লিম) সমাজে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না। উচ্চস্তরের শিক্ষকগণ সর্বত্র মোটামুটি বিশেষ সমাদৃত হইলেও মক্তবের শিক্ষককে বোকা ও নিম্ন মর্যাদা সম্পন্ন বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু তাঁহারা সুদূরপ্রসারী প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে জ্ঞানালোক বিতরণের পবিত্র দায়িত্ব সম্পাদন করিতেন এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতেন।

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথমদিকে ফিক্‌হ অধ্যয়ন করা হইত। এই সঙ্গে মুসলিম আইনের উৎস কুরআন ও হাদীসও শিক্ষাদান করা হইত। ক্রমান্বয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব ও অঙ্ক পাঠ্য-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে ধর্মীয় শিক্ষার সহায়ক হিসাবে এই সকল বিষয়ে শিক্ষাদান করা হইত। প্রথমতঃ ব্যক্তি বিশেষকে কেন্দ্র করিয়া বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষাদান হইত। দূর-দূরান্ত হইতে জ্ঞানপিপাসু ছাত্রগণ বিশেষজ্ঞের নিকট সমবেত হইত এবং তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিত। বিষয় নির্বাচনে, শিক্ষাদান পদ্ধতিতে ও ব্যক্তিগত মত প্রকাশে শিক্ষক সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। এই শিক্ষকগণও অধিকাংশ সময় মসজিদের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতেন। একই ছাদের নীচে ভক্তেরা নামায আদায় করিত, আলিম ও আইনজ্ঞ কুরআন ও হাদীসের উপর বক্তৃতা করিতেন এবং ভাষাবিজ্ঞানী কবিতার ব্যাখ্যাদান করিতেন। বিদ্বান ব্যক্তিগণ ছাত্রগণকে শিক্ষাদান ছাড়াও মাঝে মাঝে সর্বসাধারণের জন্য বক্তৃতা দান করিতেন। এই সকল বক্তৃতার মাধ্যমেও উচ্চশিক্ষার প্রসার হইত। ইহাতে বক্তার খ্যাতি ও সুনাম চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িত। অবারিতদ্বার এই সকল বক্তৃতায় যে-কেহ আলোচনা-সমালোচনায় যোগদান করিতে পারিত। এই-ভাবে উচ্চ শিক্ষার সহিত বৃহত্তর জনসাধারণের যোগাযোগ ঘটিত এবং

২৪—

বক্তা বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেন। একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এইভাবে মসজিদই উচ্চশিক্ষার জন্য উপযুক্ত স্থান ছিল।

উচ্চশিক্ষার জন্য অচিরে মুসলিম জগতের বিভিন্ন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় (মাদ্রাসা) গড়িয়া উঠে। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাগদাদের নিজামীয়া সর্বপ্রথম এবং পরবর্তীকালের মাদ্রাসার জন্য ইহা আদর্শস্বরূপ ছিল। ১০৬৫—৬৭ খ্রীস্টাব্দে সলজুক উজীর নিজামুল-মুলক এই মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এই মাদ্রাসায় শাফিয়ী মজহাব ও আশ্‌আরী মতবাদে শিক্ষাদান করা হইত। এই মাদ্রাসার ছাত্রগণ মাদ্রাসা-গৃহেই অবস্থান করিত এবং অনেকেই বৃত্তি পাইত। কোন কোন পাশ্চাত্য লেখকের মতে নিজামীয়ার গঠন পদ্ধতি ও নিয়মকানুন পরবর্তীকালে ইউরোপের বিশ্ব-বিদ্যালয় সমূহকে প্রভাবিত করিয়াছিল। নিজামীয়া সরকারী সমর্থন ও সাহায্যপুষ্ট ছিল। সেজন্য ইহাতে অধ্যাপকের (মুদাররিস) নিযুক্তির জন্য খলীফার অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয়। এক সময় একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার অধীনে দুই বা ততোধিক সহকারী থাকিতেন। ইঁহাদিগকে মুয়ীদ (পুনর্নালোচনাকারী) বলা হইত। ইঁহারা বক্তৃতার পরে কম মেধাসম্পন্ন ছাত্রদিগকে বক্তৃতার অংশবিশেষ বুঝাইয়া দিতেন। পরিব্রাজক ইবন বতুতা আসরের নামাযের পর একজন বিখ্যাত অধ্যাপকের একটি বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক উচ্চ-মঞ্চে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিলেন এবং ছাত্ররা টুলের উপর বসিয়া বক্তৃতা শ্রবণ করিল। তাহারা মগরিবের নামায পর্যন্ত বক্তাকে নানা লিখিত ও মৌখিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া চলিল। এই নিজামীয়া মাদ্রাসায় আল-গাজ্জালী চারি বৎসর পর্যন্ত বক্তৃতাদান করেন। গাজ্জালীর মতে কেবল জ্ঞানদানই শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে, ছাত্রদের মধ্যে একটি নৈতিক চেতনা জাগ্রত করাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। বক্তৃতাগৃহে কাগজ ও কালির ব্যবস্থা ছিল, যাহাতে ছাত্ররা অধ্যাপকের বক্তৃতা প্রয়োজন মত টুকিয়া লইতে পারে। নিশাপুরের এক বক্তৃতাগৃহে ৫00 কালির দোয়াত ছিল। অধ্যাপক-গণ বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। অন্যপক্ষে অপেক্ষাকৃত অপরিপক্ক অধ্যাপকগণকে অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া পুনরায় অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিতেও দেখা যায়। ছাত্ররা অধ্যাপকগণকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করিত এবং শিষ্যের মত তাঁহাদের সেবা করিত। একবার নিজামীয়ার একজন অধ্যাপকের মৃত্যু হইলে বাগদাদের জনসাধারণ দোকানপাট বন্ধ করিয়া

তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং ছাত্রগণ তাহাদের কলম ভাঙ্গিয়া ও দোয়াত ছুঁড়িয়া তাহাদের দুঃখ প্রকাশ করে। নিজামীয়া হালাগু খানের বাগদাদ আক্রমণের পরেও টিকিয়াছিল। পরবর্তীকালে ইহা 'আল মুস্তানসিরীয়ার' সহিত একীভূত হইয়া যায়। 'আল-মুস্তানসিরীয়া' ১২৩৪ খ্রীস্টাব্দে বাগদাদে স্থাপিত হয়। খলীফা আল-মুস্তানসিরের নামানুসারে ইহার নামকরণ হয়। এই মাদ্রাসায় চারি মজহাবের ফিক্‌হ্ পড়ান হইত। মাদ্রাসার ফটকদ্বারে একটি ঘড়ি ছিল। মাদ্রাসার মধ্যে হাম্মাম ও রান্নাঘর ছিল এবং ইহাতে একটি হাসপাতাল ও গ্রন্থাগার ছিল। সলজুক উজীর নিজামুল-মুলক বাগদাদের নিজামীয়া ব্যতীত নিশাপুর ও অন্যান্য স্থানে অনুরূপ মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল মাদ্রাসাও নিজামীয়া নামে অভিহিত হইত। খুরাসান, ইরাক ও সিরিয়ায় এই জাতীয় মাদ্রাসা স্থাপিত হইতে থাকে। পরিব্রাজক ইবন জুবায়র বাগদাদে ত্রিশটি, দামিস্কে বিশটি ও মসুলে ছয়টি মাদ্রাসার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

মসজিদ-মাদ্রাসা ব্যতীত সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদীদের একপ্রকার মজলিস বসিত। খলীফাগণ, তাঁহাদের উজীর ও অন্যান্য অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা নিজ নিজ সাধ্যমত কবি-সাহিত্যিকগণের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন এবং সন্ধ্যার পর এই সকল প্রতিভাবান লোকদের সমাবেশে 'মজলিসুল-আদাব' বা সাহিত্যানুষ্ঠান বসিত। এই যুগে স্মৃতিশক্তি ও মুখস্থবিদ্যার উপর জোর দেওয়া হইত। তখন ছাপাখানা ছিল না। কুতুবখানায় বা গ্রন্থাগারে বই-পুস্তক প্রচুর থাকিলেও একই বইয়ের সংখ্যা সীমিত ছিল এবং সাধারণ লোকের পক্ষে বই যোগাড় করা দুঃসাধ্য ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে এবং প্রাচীন আরব প্রথামত স্মৃতিশক্তির উপর গুরুত্ব-আরোপ মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছে। কথিত আছে, আল-গাজ্জালী তিন লক্ষ হাদীস মুখস্থ করিয়াছিলেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল এক লক্ষ হাদীস মুখস্থ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থাগার

শিক্ষার সহায়ক হিসাবে মুসলমানদের মধ্যে বড় বড় কুতুবখানা স্থাপিত হইয়াছিল। মসজিদগুলিতে বহু পুস্তক রাখা হইত। অনেকে মৃত্যুর সময় পুস্তকাদি মসজিদের জন্য উইল করিয়া যাইতেন। সাধারণতঃ মসজিদে ধর্মীয় পুস্তকই বেশি রাখা হইত। ইহা ছাড়া ধনী ও অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা আপন আপন গ্রন্থাগারে বহু বই-পুস্তক যোগাড় করিয়া রাখিতেন। বিদ্যান্বেষী ও শিক্ষার্থীকে এই সকল

পুস্তক পড়িতে দেওয়া হইত। বুওয়াইহী আমীর আদুদুদ্দৌলাহ শিরাজে যে গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে বইগুলিকে বিভিন্ন আলমারীতে সাজাইয়া রাখা হইত এবং তালিকায় বইয়ের নাম লিপিবদ্ধ করা হইত। সকল বিষয়ে লিখিত সকল গ্রন্থ এই গ্রন্থাগারে স্থান পাইত। রামহরমুজ ও বসরায় ঐ সময় আরও দুইটি পুস্তকালয় ছিল। এখানে বইয়ের পাঠকদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। রামহরমুজের পুস্তকালয়ে একজন মুতাজিলী শায়খ মুতাজিলা মতবাদ সম্পর্কে বক্তৃতা করিতেন। বিখ্যাত বুওয়াইহী উজীর সাহিব ইবন আব্বাদের বিরাট কুতুবখানা ছিল। ইহার পুস্তকগুলি বহন করিবার জন্য চারিশত ভারবাহী উষ্ট্রের প্রয়োজন হইত। এই সকল পুস্তকের তালিকাই মোটা দশ বালামে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ফিরূজাবাদে অপর একজন বুওয়াইহী উজীরের কুতুবখানায় ৭০৩০ পুস্তক ছিল। সাবুর নামক অপর উজীরের বাগদাদস্থ কুতুবখানায় ১০,৪০০ পুস্তক ছিল এবং এখানে সন্ধ্যার পর সাহিত্যিক ও কবিদের আবৃত্তি, সঙ্গীতানুষ্ঠান ও আলোচনা সভা বসিত।

এই যুগে বইয়ের ব্যবসাও বিশেষ চালু হয়। ছাপাখানার অভাবে হস্তলিখিত বই বিক্রয় হইত। সুন্দর হস্তাক্ষরের খুব সমাদর ছিল। বই বিক্রেতাগণ নিজেরাই সুন্দর হস্তাক্ষর লিখিতেন এবং বইয়ের প্রতিলিপি প্রণয়ন করিতেন। কাগজের প্রচলন বইয়ের প্রসার ও প্রচারে সহায়তা করিয়াছিল। সমরকন্দ হইতে আরবগণ চীন দেশীয় বন্দীদের নিকট কাগজ প্রস্তুত কৌশল আয়ত্ত করেন। দশম শতাব্দীর মধ্যে কাগজের ব্যবহার সমগ্র মুসলিম জগতে চালু হয়।

জ্ঞানার্জনের জন্য সফর মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। হজ সমাপন উপলক্ষে মক্কায় মুসলিম জগতের বিভিন্ন অঞ্চল

শিক্ষাসফর

হইতে বহু জ্ঞানী ও জ্ঞানপিপাসু লোকের সমাবেশ হইত। ইহা ছাড়াও হাদীস সংগ্রাহকগণ বহু বাধা-বিঘ্ন ও কষ্ট স্বীকার করিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ভাষাবিদগণও ভাষাতত্ত্বের গবেষণার জন্য বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতেন। কুরআন শরীফের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য বেদুঈনদের মধ্যে বসবাস করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করা হইত। এইভাবে নানা কারণে মুসলমানগণ দেশে-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইত। শিক্ষার উদ্দেশ্যে, নিতান্ত কৌতূহল পরবশ হইয়া, সত্যের অনুসন্ধানে অথবা নিছক খেয়ালের বশে বহু মুসলমান পরিব্রাজক তখনকার বিপদসংকুল ও কষ্টসাধ্য ভ্রমণযাত্রায় জীবনের

বহু বৎসর কাটাইয়া দিত। এই সফর মুসলিম শিক্ষা পদ্ধতিকে বহুমুখী বৈচিত্র্য দান করে। নূতন ভাবধারা, নূতন মতাদর্শ অথবা নূতন আবিষ্কারের সংবাদ প্রচারের জন্য কোন পত্র-পত্রিকা তখন ছিল না বটে, কিন্তু এই পরিব্রাজক মণ্ডলী দূর হইতে দূরান্তে, দেশ হইতে দেশান্তরে প্রখ্যাত অধ্যাপক, আলিম অথবা বৈজ্ঞানিকের মত ও পথের ভালমন্দ বিবরণ অল্পসময়ের মধ্যে ছড়াইয়া দিত।

আব্বাসীয় যুগে সমাজে অতি উচচ শিক্ষিত ও পরিমার্জিত রুচিসম্পন্ন একদল লোকের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধারণ লোকের শিক্ষার মান কতখানি উঁচু ছিল, তাহা বলা কঠিন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাধারণ মান

তবে শিক্ষিত লোকের জ্ঞানের পরিধি খুবই ব্যাপক ছিল বলিয়া মনে হয়। আরব্যোপন্যাসে বর্ণিত ক্রীতদাসী তাওয়াদ্দুদের জবানীতে যে সকল জ্ঞানগর্ভ আলোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা হইতে শিক্ষিত লোকের সাধারণ জ্ঞানের মান সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। তাওয়াদ্দুদের মতে জ্ঞান দুই প্রকার—একটি সহজাত, অপরটি আয়াসলব্ধ। মানুষ চারিটি উপাদানে তৈয়ারী—পানি, মাটি, আগুন ও বায়ু। যকৃৎ দয়ার উৎস, প্লীহা হাসির উৎস এবং মূত্রাশয় ধূর্ততার উৎস। মস্তিষ্কের পাঁচটি গুণ রহিয়াছে—অনুভূতি, কল্পনা, ইচ্ছা, খেয়াল ও স্মৃতি। পাকস্থলী সকল রোগের আকর, খাদ্য সকল আরোগ্যের মূল। গ্রহ সাতটি—চন্দ্র, সূর্য, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি।

বিস্তারিত পাঠ্য তালিকা

হিট্টি, হিস্ট্রি অব দি এরাব্‌স্
খুদাবক্‌স, কন্ট্রিবিউশন টু মুসলিম সিভিলাইজেশন, প্রথম খণ্ড।

৪২

স্পেনে মুসলিম শাসন

মুসলমানদের স্পেন বিজয়

উমাইয়া খলীফা ওয়ালীদের সময় স্পেন বিজয়ের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।* মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনে শাসক ও অভিজাত সম্প্রদায় এবং শাসিতদের মধ্যে বিভেদ চরম আকার ধারণ করিয়াছিল। প্রথমোক্ত শ্রেণীতে ছিলেন রাজা, যাজক ও সভাসদগণ, আর শেষোক্ত শ্রেণীতে ছিল মধ্যবিত্ত, ভূমিদাস, দাস ও ইহুদীগণ। দেশের রাজস্ব ব্যবস্থা এইরূপ ছিল যে, অভিজাত শ্রেণী কর হইতে প্রায় মুক্ত ছিল এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে করের সম্পূর্ণ বোঝা বহন করিতে হইত। দাস ও ভূমিদাসগণ জমিদার ও মালিকগণ কর্তৃক নানাভাবে নির্যাতিত হইত। রাস্তাঘাটের অবস্থা ভাল ছিল না। দস্যু-তস্করের ভয়ে মানুষ নিরাপদে চলাফেরা করিতে পারিত না। ব্যবসা-বাণিজ্যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ও সংখ্যাগুরু খ্রীস্টানগণ ইহুদীদের উপর অত্যাচার করিত। তাহাদিগকে খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করা হয়; ধর্মান্তরিত না হইলে তাহাদের উপর নানাভাবে নির্যাতন চালান হইত। ইহুদীগণ গথ রাজার শাসনে অতিষ্ঠ হইয়া মুক্তির পথ খুঁজিতেছিল। এই সময় স্পেনের ভিসিগথ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রডারিক নামক একজন সভাসদ সিংহাসন দখল করেন। পূর্ববর্তী রাজার জামাতা কাউন্ট জুলিয়ান সিউটা ও আলজিসিরাসের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় লোকেরা জবর-দখলকারী রাজার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করার উপায় খুঁজিতেছিলেন। জুলিয়ান উত্তর আফ্রিকার মুসলমান শাসনকর্তা মূসাকে স্পেন আক্রমণের জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। মূসা প্রথমে তারিক নামক একজন সেনাপতিকে ১০০ অশ্বারোহী ও ৪০০ পদাতিক সৈন্যসহ ৭১০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে

* ১৫শ অধ্যায়

তথ্যসংগ্রহ অভিযানে প্রেরণ করিলেন। অতঃপর ৭১১ খ্রীস্টাব্দে সেনাপতি তারিক ইবন জিয়াদকে ৭000 সৈন্যসহ স্পেন বিজয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হইল। তারিক প্রথমে যেখানে অবতরণ করেন, তাহার নাম তাঁহারই নামানুসারে জিব্রাল্টার হইয়াছে। জুলিয়ান কর্তৃক প্রদত্ত চারিটি জাহাজের সাহায্যে জিব্রাল্টার প্রণালী পার হইয়া তাঁহারা স্পেনের দিকে যাত্রা করিলেন। সর্বমোট ১২000 সৈন্যসহ ৭১১ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে জুলাই তারিক রডরিকের ১ লক্ষ সৈন্যের মোকাবিলা করিলেন। ওয়াদি লাক্কো (বারবেইট নদী) নদীর তীরে সাতদিন ধরিয়া প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। রডারিকের সৈন্যদলে ভাঙ্গন ধরিল; মুসলমানদের আক্রমণে গথ বাহিনী পর্যুদস্ত হইল। রডারিক যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত কিংবা নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইলেন। ওয়াদি লাক্কোর যুদ্ধে স্পেনীয়গণের পরাজয় মুসলমান বিজয় ত্বরান্বিত করিল। একে একে প্রধান শহরগুলি মুসলমানদের করতলগত হইল। এলভিরা, কর্ডোভা, মালাগা, এসিজা ও সর্বশেষে গথ রাজধানী টলেডো একে একে অধিকৃত হইল। স্পেনের অর্ধাংশ তারিকের অধিকারে আসিল।

ওয়াদি লাক্কোর বিজয় সংবাদ মূসার নিকট পৌঁছিলে তিনি তারিককে অগ্রাভিযান বন্ধ রাখিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে নির্দেশ পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সুচতুর তারিক তাহা অগ্রাহ্য করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। অন্যপক্ষে শত্রুকে সময় দিলে তাহারা সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করিয়া তাঁহার নিশ্চিত বিজয়ের সম্ভাবনা বিনষ্ট করিয়া ফেলিতে পারিত। কিন্তু মূসা তাঁহার সহকারীর এই অভাবিতপূর্ব সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া দশ সহস্র সৈন্য সহ ৭১২ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে স্পেনে উপস্থিত হইলেন। তিনি ভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া মেডিনা, সিডোনিয়া, কারমোনা ও প্রাচীন রোমক রাজধানী সেভিল দখল করিলেন। টলেডোর নিকট তিনি তারিকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আদেশ অমান্য করার অপরাধে তাঁহাকে কষাঘাত করিলেন। তারপর আবার দুই সেনাপতির মিলিত চেষ্টায় সারাগোসা, এ্যারাগন, লিওঁ ও গ্যালিসিয়া অধিকার করিলেন। ইহার অল্প পরে দামিস্ক হইতে খলীফা মূসাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মূসার দামিস্ক যাত্রার দৃশ্য আরব ঐতিহাসিকগণের বর্ণনায় বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তাঁহার সহিত ছিল তাঁহার কর্মচারীবৃন্দ, মুকুট পরিহিত ও সুবর্ণের কটিবন্ধে সজ্জিত চারিশত ভিসিগথ যুবরাজ, অগণিত দাসদাসী ও যুদ্ধবন্দী এবং

বেশুমার ধনদৌলত। খলীফা ওয়ালীদ মূসাকে মহাসমারোহে সম্বর্ধনা করিলেও পরে সুলায়মান তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং তাঁহাকে অপমানজনক শাস্তি প্রদান করেন।

স্পেন তখন হইতে খিলাফতের একটি প্রদেশ হিসাবে শাসিত হইতে থাকে। মুসলমানগণ ইহার নাম দিল আল-আন্দালুস। মূসা তাঁহার পুত্র আবদুল আজীজকে আমীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেভিলে রাজধানী স্থাপিত হয়। আবদুল আজীজ অচিরে আততায়ীর হাতে প্রাণ হারাইলে সেনাবাহিনী আইয়ুব নামক এক সেনাপতিকে নেতা মনোনীত করে। তিনি হুর নামক অপর প্রতিদ্বন্দ্বী কর্তৃক বিতাড়িত হন। হুর পিরেনীজ পর্বত অতিক্রম করেন। সামহ্ নামক সেনাপতি হুরকে অপসারিত করেন (৭১৯ খ্রীঃ)। তিনি রাজধানী কর্ডোভায় স্থানান্তরিত করেন। তিনি সারাগোসায় একটি জুমা মসজিদ নির্মাণ করেন এবং গুয়াদাল কুইভির নদীর উপর কর্ডোভার সেতুটি পুনর্নির্মাণ করেন। তিনি জমি নূতনভাবে জরীপ করাইয়া কর ধার্য করেন, সেপ্টিমেনিয়া ও নারবোন দখল করিয়া মুসলিম অধিকার বিস্তৃত করেন। কিন্তু টুলো দখল করিতে গিয়া ৭২১ সালে তিনি যুদ্ধে নিহত হন।

সামহের উত্তরাধিকারী আবদুর রহমান আল-গাফিকী ৭৩২ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিম পিরেনীজ আতিক্রম করেন এবং ডিউক ইউডেমকে পরাজিত করিয়া বোর্ডক্স আক্রমণ করেন। উত্তরদিকে অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইয়া তিনি টুরস নামক শহরে উপস্থিত হইলেন। ডিউক ইউডেস আরবদের বিরুদ্ধে ফ্রাঙ্ক নেতা চার্লস মার্টেলের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। টুরস ও পয়িটিয়ার্সের মধ্যবর্তী অঞ্চলে আবদুর রহমান চার্লস মার্টেলের সৈন্যবাহিনীর মোকাবেলা করেন। সাত দিন ধরিয়া উভয় সৈন্যদল পরস্পরের মুখামুখী দাঁড়াইয়া রহিল। ছোটখাট যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিয়েছিল। অবশেষে আরব সেনাপতি ফ্রাঙ্ক বাহিনীকে আক্রমণ করিলেন। আরব অশ্বারোহীদের প্রচণ্ড আক্রমণে ফ্রাঙ্কগণ টলটলায়মান হইয়া উঠিল, কিন্তু আরবগণ গনীমতের লোভে একবার বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলে শত্রুদের পাল্টা আক্রমণে আবদুর রহমান যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্বাচনের প্রশ্নে আরবদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিলে তাহারা রাত্রির অন্ধকারে আহত সৈনিকগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলিয়া পলাইয়া আসিল। চার্লস আহত সৈনিকদিগকে নির্মমভাবে হত্যা করেন।

টুরসের যুদ্ধ ৭৩২

আরবদের বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য তিনি মার্টেল বা হাতুড়ি উপাধি লাভ করেন। মুসলমানগণ এই যুদ্ধকে 'বালাতুশ শুহাদা' বা শহীদা চত্বর নামে অভিহিত করিয়া থাকে। এই যুদ্ধের ফলে ইউরোপে আরবদের গতি রুদ্ধ হইল এবং গলে নারবোন ব্যতীত আর কোন উল্লেখযোগ্য স্থান মুসলমানদের অধিকারে রহিল না। চার্লস এই যুদ্ধের পর অশ্বারোহী সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া আরবদের অনুকরণে অশ্বারোহী বাহিনী গঠন করিবার উদ্দেশ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি অশ্বারোহী সৈন্যগণকে জায়গীর দান করিয়া ভবিষ্যৎ সামন্তবাহিনীর গোড়া পত্তন করিলেন।

এই যুদ্ধের গুরুত্ব ও ফলাফল সম্পর্কে পূর্বে ঐতিহাসিকগণ যে মত পোষণ করিতেন, তাহা এখন অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে। গিবন ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ মনে করিতেন যে, এই যুদ্ধে আরবগণের পরাজয় খ্রীস্টানগণকে চরম বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। আরবগণ জয়ী হইলে প্যারিস ও লণ্ডনে যেখানে গির্জাসমূহ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেখানে আজ মসজিদ দেখা যাইত এবং অক্সফোর্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় বিদ্যায়তনে বাইবেলের পরিবর্তে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হইত। বহু ঐতিহাসিক মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই যুদ্ধ একটি মীমাংসক যুদ্ধ। কিন্তু হিট্টির মতে এই যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে কিছুই মীমাংসা করে নাই। আরব অগ্রগতি গল পর্যন্ত পৌঁছিয়া ইহার স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বচ্ছন্দ বেগ হারাইয়া ফেলিয়াছে। আরবদের মধ্যে গোত্রীয় বিবাদ ও দলগত বিভেদ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলেই তাহাদের অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়াছে। এই যুদ্ধের পরাজয় তাহাদের দলগত বিভেদের পরিণতি স্বরূপ। অন্য পক্ষে আরবদের অগ্রাভিযান ইউরোপে একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে এমনও বলা যায় না। কারণ ইহার পরেও তাহারা এ্যাভিগনন ও লিওঁ আক্রমণ করিয়াছিল এবং তাহারা নারবোনে ৭৫৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তাহাদের অধিকার বজায় রাখে।

স্পেনে আরবদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমান্বয়ে চরম আকার ধারণ করে। ৭৩২ খ্রীস্টাব্দ হইতে ৭৫৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ২৩ জন গভর্নর স্পেন শাসন করেন। মুদার ও হিময়ারদের মধ্যে গভর্নর পদ লইয়া রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হইত। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য তাহারা ঠিক করিল যে, পর্যায়ক্রমে একজন মুদার ও একজন হিময়ার এক বৎসর করিয়া গভর্নর

হইবেন। এই ব্যবস্থাও কার্যকরী হইল না। কারণ এই ব্যবস্থানুযায়ী নিযুক্ত প্রথম মুদার গভর্নর ইউসুফ কোন ইয়ামনীকে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে রাজী হইলেন না। তিনি দশ বৎসর (৭৪৬—৭৫৬) যাবৎ ক্ষমতাসীন ছিলেন। ইহার পর খলীফা হিশামের পৌত্র আবদুর রহমান স্পেনের আমীর হইলেন।

উমাইয়া আমীরগণের শাসন (৭৫৬--১০৩১ খ্রীঃ) ঃ

৭৫০ খ্রীস্টাব্দে আব্বাসীয়গণ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তাহারা উমাইয়া বংশের যাহাকে যেখানে পাইত, নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিত। পতিত রাজবংশের কেহ তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে না পারে, এই জন্য তাহাদের বংশ নির্মূল করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। যে অল্পসংখ্যক উমাইয়া বংশের লোক আব্বাসীয়গণের কোপানল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, তন্মধ্যে খলীফা হিশামের পৌত্র আবদুর রহমান অন্যতম। পাঁচ বৎসর পর্যন্ত এই একুশ বৎসর বয়স্ক যুবক ছদ্মবেশে ও সন্তর্পণে আব্বাসীয় গুপ্তচরগণের শ্যেন দৃষ্টি এড়াইয়া প্যালেস্টাইন, মিসর ও উত্তর আফ্রিকার মধ্য দিয়া পলায়ন করিয়া অবশেষে স্পেনে নিরাপদ আশ্রয় স্থলে পৌঁছেন। ফুরাত নদীর তীরবর্তী একটি বেদুঈন শিবির হইতে তাঁহার যাত্রা আরম্ভ হয়। আব্বাসীয়গণ তাঁহাদের শিবিরের অতি সন্নিকটে পৌঁছিয়াছে জানিতে পারিয়া আবদুর রহমান তাঁহার ত্রয়োদশ বর্ষীয় এক ভ্রাতার সহিত আত্মরক্ষার শেষ প্রচেষ্টা হিসাবে নদীর স্রোতে লাফাইয়া পড়িলেন। ছোট ভাই শত্রুর মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে ভুলিয়া নদীবক্ষ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন বটে, কিন্তু আব্বাসীয়গণের হস্তে তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হইল। আবদুর রহমান আপন সংকল্পে অটুট রহিলেন এবং নিরাপদে নদীর অপর পাড়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অনুগত ভৃত্য বদর প্যালেস্টাইনে তাঁহার সহিত মিলিত হইল। তখন উত্তর আফ্রিকায় স্পেনের গভর্নর ইউসুফের এক আত্মীয় শাসন করিতেছিলেন। এই শাসনকর্তা আবদুর রহমানকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিলেন। শহর হইতে শহরান্তরে এবং গোত্র হইতে গোত্রান্তরে আশ্রয়ের আশায় বন্ধুহীন ও কপর্দকহীন অবস্থায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবদুর রহমান অবশেষে ৭৫৫ খ্রীস্টাব্দে মিউটায় পৌঁছিলেন। বার্বারগণ তাঁহার মাতুল বংশীয় ছিলেন এবং নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে তাঁহারা তাঁহাকে আশ্রয় দান করিলেন। সেখান হইতে তিনি বদরকে স্পেনে প্রেরণ করিলেন।

প্রথম আবদুর রহমান (৭৫৬-৭৮৭)

দক্ষিণ স্পেনের ইলভিরা, জেইন ও অন্যান্য স্থানে দামিস্ক ও কিন্নিসরীনের বহু সিরীয় বাহিনী বসবাস করিতেছিল। ইহাদের অনেকে উমাইয়া খলীফাদের অনুগ্রহপুষ্ট ছিল। তাহারা আবদুর রহমানের নাম শুনিয়া উমাইয়াদের রাজগৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে মাতিয়া উঠিল। এই সিরীয় সৈনিকগণ অচিরে স্পেনের ইয়ামনী সম্প্রদায়ের লোকজনকে নিজেদের দলভুক্ত করিয়া লইল। স্পেনে তখন মুদার বংশীয় ইউসুফ আমীর ছিলেন। ইয়ামনীগণ তাঁহার প্রাধান্য পছন্দ করিত না। ইহারা সকলে মিলিয়া তাহাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে আবদুর রহমানকে স্পেনে আসিবার জন্য আহ্বান করিয়া পাঠাইল। তাহাদের প্রেরিত একটি জাহাজে করিয়া আবদুর রহমান ৭৫৫ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্পেনে অবতরণ করিলেন। এই সময় স্পেনের আমীর ইউসুফ এ্যারাগণ অঞ্চলে বিদ্রোহ দমনে ব্যাপৃত ছিলেন। আবদুর রহমানের স্পেনে আগমনের সংবাদ পাইয়া তিনি দ্রুত রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং তাঁহার কর্মাধ্যক্ষ খালিদ ইবন জায়দের হাতে আবদুর রহমানের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে প্রচুর উপঢৌকন দিতে অঙ্গীকার করিয়া ও তাঁহার সহিত আপন কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইল। দক্ষিণ স্পেনের নগর-গুলি একের পর এক আবদুর রহমানের বশ্যতা স্বীকার করিল। জর্ডানের আরবগণ কর্তৃক অধ্যুষিত আর্কিডোনা, প্যালেস্টাইন আরবদের শহর সিডোনা এবং হিমসের আরবদের বাসভূমি সেভিল আবদুর রহমানকে আমীর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল এবং ৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে মার্চ মাসের মধ্যে বিনা রক্তপাতে দক্ষিণ স্পেনে আবদুর রহমানের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। ৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই মে গুয়াদাল কুইভির নদীর তীরে ইউসুফের সৈন্যবাহিনী আবদুর রহমানের বাহিনীর মোকাবেলা করিল। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। ইউসুফ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। আবদুর রহমান কর্ডোভা অধিকার করিয়া সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করিলেন। ইহার ফলে লোকেরা বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিল। এইভাবে দামিস্কে উমাইয়া বংশের পতনের ছয় বৎসর পরে স্পেনে উমাইয়া বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু কর্ডোভার উপর স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিলেও আবদুর রহমানের অবস্থা তখনও নিরাপদ ছিল না। পরাজিত আমীর ইউসুফ উত্তরাঞ্চলে গোলযোগ

সৃষ্টি করিতেছিলেন। অবশেষে তিনি টলেডোর নিকট পরাজিত ও নিহত হন। যে ইয়ামনী আরবগণ বার্বারদের সহিত মিলিত হইয়া আবদুর রহমানের স্পেনে আগমনকে অভিনন্দিত করিয়াছিল, তাহারা বিদ্রোহী হইল। . সেভিলের ইয়ামনী শাসনকর্তা আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলে তিনি পদচ্যুত হন ও ৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে নিহত হন। ইহাতে বহু ইয়ামনী আরব বিদ্রোহী হইল। ৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে মায়সার নদীর তীরে তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও নিহত হয়। টলেডোর শাসনকর্তা বিদ্রোহী হইলে ৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে নগরী অধিকৃত হয় এবং সকল বিদ্রোহী নেতার ফাঁসী হয়।

আব্বাসী খলীফা আল-মনসূর তাঁহার উত্তর আফ্রিকার গভর্নর আলা ইবন মুগীসকে স্পেন দখল করার জন্য আদেশ দেন। খলীফা তাঁহাকে স্পেনের গভর্নর হিসাবে একটি নিযুক্তিপত্রও দিয়াছিলেন। তদনুসারে আলা ৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে ইয়ামনীদের সহায়তায় বেজা প্রদেশে আব্বাসীয় কৃষ্ণ পতাকা উড্ডীন করেন। তিনি ইহার পর সেভিলে গমন করেন এবং তথাকার ইয়ামনীদের সমর্থন লাভ করেন। আবদুর রহমান এই আব্বাসীয় প্রতিনিধিকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য সেভিলের দিকে যাত্রা করিলে আলা কারমোনা নামক শহরের দিকে গমন করেন এবং শহরটি অবরোধ করেন। আবদুর রহমান এক অতর্কিত আক্রমণে আলাকে পরাজিত ও নিহত করেন। আলার ছিন্ন মস্তক, আব্বাসীয় পতাকা ও নিযুক্তিপত্র খলীফা মনসূরের নিকট প্রেরণ করা হইল। খলীফা মনসূর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন, "আল্লাহর শুকর যে, তিনি আমাদের মধ্যে এবং এইরূপ শত্রুর মধ্যে সাগরের ব্যবধান রাখিয়াছিলেন।"

দশ বৎসর ধরিয়া বার্বারগণ আবদুর রহমানকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাদের নেতা শাকনা শান্তাগ্রিয়াতে ৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং দীর্ঘ নয় বৎসর আবদুর রহমানের বিরোধিতা করেন। সরকারী সেন্যবাহিনীর আগমন সংবাদে তিনি অরণ্যে ও পর্বতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। পরিশেষে তাঁহারই দলের দুইজন লোক ৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁহাকে হত্যা করে।

আব্দুর রহমানের রাজত্বের শেষভাগে উত্তর-পূর্ব স্পেনের মুসলমান সর্দারগণ তাঁহার বিরুদ্ধে একটি ঐক্যজোট গঠন করিয়া ফ্রান্সের সম্রাট শার্লিমানকে স্পেন আক্রমণ করিতে উৎসাহিত করেন। ইঁহাদের

মধ্যে ছিলেন বার্সিলোনার গভর্নর সুলায়মান এবং প্রাক্তন স্পেনের আমীর ইউসুফের জামাতা আবদুর রহমান ইবন হাবিব। ৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে শার্লিমান পিরেনীজ পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া স্পেন আক্রমণ করিলেন। পরবৎসর (৭৭৮ খ্রীঃ) তিনি সারগোসা আক্রমণ করিয়া প্রতিহত হন এবং ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ কলহের জন্য স্পেন হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। পিরেনীজ আক্রমণের সময় বাস্ক ও অন্যান্য পার্বত্য জাতি ফ্রাঙ্ক বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া বহু লোককে হতাহত করে। আবদুর রহমান ৭৮০ খ্রীস্টাব্দে সারাগোসা অধিকার করেন এবং বিদ্রোহী আরব নেতাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া ঐক্যজোট ভাঙ্গিয়া দেন। ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে ৫৯ বৎসর বয়সে আবদুর রহমানের মৃত্যু হয়। তাঁহাকে কর্ডোভার রাজপ্রাসাদে সমাহিত করা হয়।

শার্লিমানের সহিত যুদ্ধ

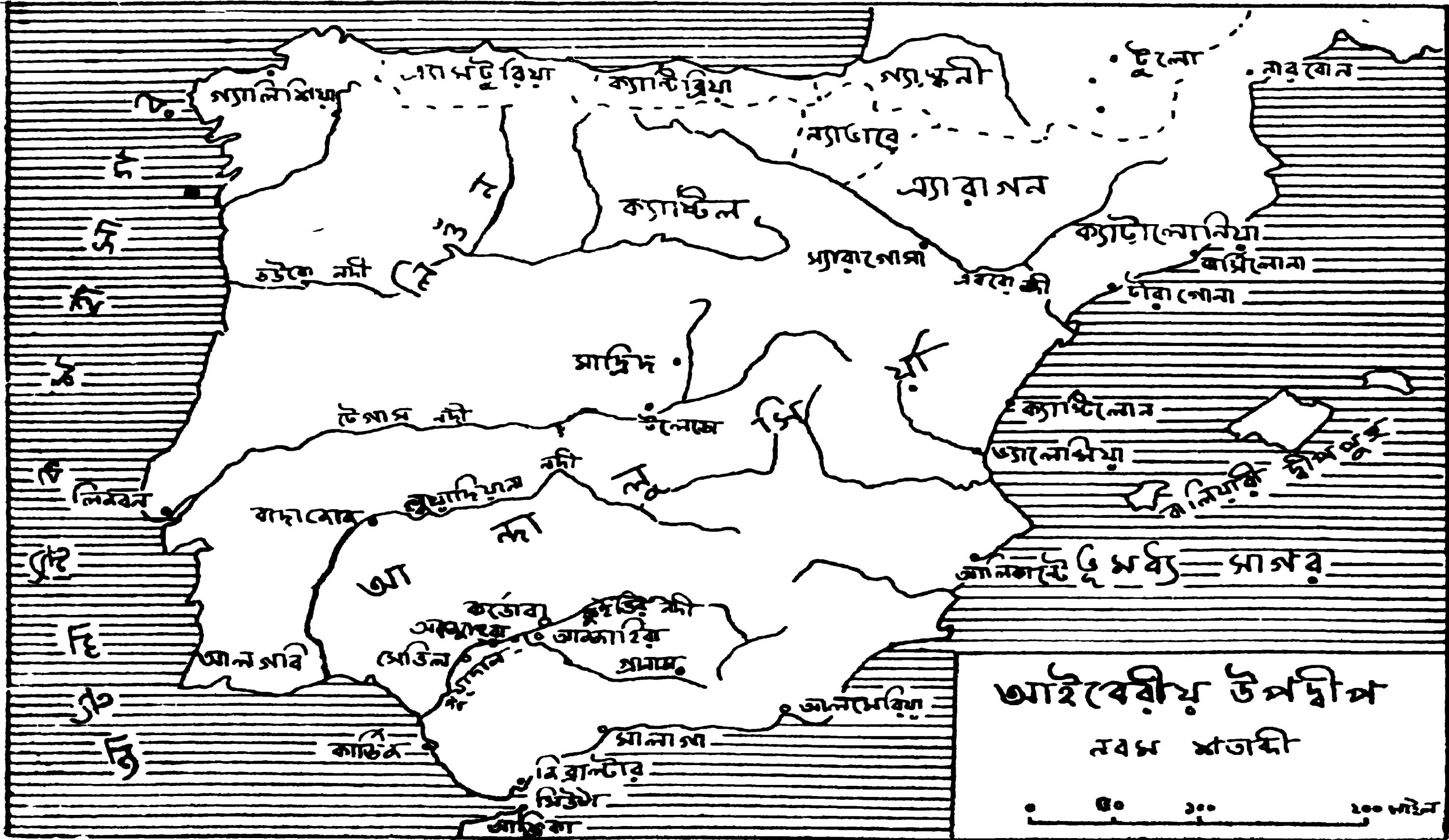
আবদুর রহমান উত্তর আফ্রিকার বার্বারদের সাহায্যে একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। ৪০,০০০ (মতান্তরে ২ লক্ষ)-এরও উপর সুশৃঙ্খল ও সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সাহায্যে তিনি স্পেনে তাঁহার ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাচ্যের আব্বাসী খলীফা ও পাশ্চাত্যের সম্রাট শার্লিমানের মতই তিনি ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। ৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি স্পেনে আব্বাসীয় খলীফার নাম খুৎবা হইতে অপসারিত করেন এবং স্বয়ং 'আমীরুল মুসলিমীন' উপাধি ধারণ করেন। তবে তিনি খলীফা উপাধি গ্রহণ হইতে বিরত থাকেন।

আবদুর রহমান সমগ্র স্পেনে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া আরব সর্দারদের ক্ষমতা খর্ব করেন। তাঁহার সমসাময়িক আব্বাসী খলীফা মনসুর তাঁহাকে 'কুরায়শদের শ্যন' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি যে দ্রুততার সহিত স্পেনে উপস্থিত হইয়া স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন, সেজন্য তাঁহাকে এই উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। তিনি স্পেনে একটি সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন। তাঁহার শাসন ব্যবস্থা পরবর্তীকালে সম্প্রসারিত ও বর্ধিত হইয়া বহুদিন যাবৎ স্পেনে বিদ্যমান থাকে। তিনি হাজিব, কাতিব, কাজী, সাহিবুশ-শুরতা ও কায়েদ (সৈন্যাধ্যক্ষ) প্রভৃতি অফিসারের সাহায্যে শাসনকার্য চালাইতেন। তিনি রাস্তাঘাটের উন্নতি বিধান করেন এবং বিশেষ দূত ও ঘোড়ার সাহায্যে দ্রুত ডাক বিলির ব্যবস্থা করেন। তিনি প্রাচীন কর্ডোভা নগরীর সংশোধন ও সম্প্রসারণ করেন। রাজধানীর পশ্চিম দিকে তিনি 'মুনইয়াতুর রুসাফা' নামক একটি প্রমোদ উদ্যান রচনা

করিয়া সেখানে ইরাক, সিরিয়া ও মিসর হইতে নানা রকমের গাছ-গাছড়া ও ফলের গাছ আমদানী করেন। ফলবৃক্ষের মধ্যে পীচ ও দাড়িম্ব প্রধান ছিল। সিরিয়া হইতে আমদানীকৃত একটি তালগাছ সম্পর্কে তিনি কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন। তিনি আশি হাজার দীনার ব্যয়ে কর্ডোভায় একটি বিশাল জুমা মসজিদ নির্মাণ করেন। কালক্রমে ইহা মক্কা ও জেরুজালেমের মতই খ্যাতি ও গুরুত্ব অর্জন করে। ১২৩৬ খ্রীস্টাব্দে ফার্ডিনাণ্ড (৩য়) এই মসজিদটিকে গির্জায় পরিণত করেন। ইহা আজও 'লা মেসকুইটা' (মসজিদ) নামেই পরিচিত। তিনি কর্ডোভায় পানীয় জলের সরবরাহের জন্য একটি পয়:প্রণালীর বন্দোবস্ত করেন। তিনি রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও মসজিদ, হাম্মাম ও দুর্গ নির্মাণ করেন। তিনি বিদ্বান ও পণ্ডিত লোকের সমাদর করিতেন এবং ইঁহাদের সহিত সাহিত্যালোচনায় যোগদান করিতে আগ্রহী ছিলেন। নবম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত স্পেন যে বিশ্বসভ্যতার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল, আবদুর রহমান 'আদ-দাখিল' (আগন্তুক) একাধিক উপায়ে তাহার সূচনা করিয়াছিলেন। স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা বাগদাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমকক্ষ হিসাবে জগতে প্রসিদ্ধি অর্জন করে।

আবদুর রহমানের পুত্র প্রথম হিশাম (৭৮৮–৯৬ খ্রী:) পিতার উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনি পণ্ডিত এবং ধার্মিক ছিলেন। ধর্মপরায়ণতার জন্য তাঁহাকে উমর ইবন আবদুল আজীজের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু হিশামের পুত্র হাকাম (১ম) আমোদ-প্রমোদ ও জাঁকজমক ভালবাসিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে (৭৯৬–৮২২ খ্রী:) কর্ডোভার নও-মুসলিমগণ একজন বার্বার ফকীহের নেতৃত্বে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। বিক্ষুব্ধ জনতা হাকামকে তাঁহার প্রাসাদে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে। কিন্তু আমীরের অশ্বারোহিগণ বিদ্রোহিগণকে বিতাড়িত করে। তিন শত নেতাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। কর্ডোভার দক্ষিণ উপকণ্ঠে নও-মুসলিমগণ বাস করিত। তাহাদিগকে তিন দিনের ভিতর স্পেন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে নির্দেশ দেওয়া হয়। তাহাদের ঘরবাড়ী সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করা হয়। এই সময় আট হাজার পরিবার মরক্কোতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পনর হাজার লোক আলেকজান্দ্রিয়ায় বসতি স্থাপন করে।

হাকামের পুত্র দ্বিতীয় আবদুর রহমানের রাজত্বকালে (৮২২–৫২ খ্রী:) অপেক্ষাকৃত শান্ত ছিল। হিট্টির মতে তিনি ছিলেন "উমাইয়া-স্পেনীয়



আইবেরীয় উপদ্বীপ (নবম শতাব্দী)

দ্বিতীয় আবদুর রহমান (৮২২-৫২ খ্রীঃ)

ঐক্যের স্রষ্টা এবং সঙ্গীত ও জ্যোতির্বিদ্যার উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক।” কথিত আছে, দ্বিতীয় আবদুর রহমান চারি ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন: একজন স্ত্রীলোক, একজন খোজা, একজন ফকীহ ও একজন গায়ক। স্ত্রীলোকটি ছিলেন তাঁহার স্ত্রী রানী তরুব। ষড়যন্ত্রে পটিয়সী এই মহিলা স্পেনের শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন। খোজা লোকটি ছিলেন হাজিব (প্রাসাদাধ্যক্ষ) নাসর। তিনি রানীর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। আমীর আবদুর রহমান গান-বাজনায় ও কাব্যচর্চায় ভুলিয়া থাকিতেন। ইহার ফলে খোজা নাসর রানী তরুবের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্যের সকল শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করিতে সমর্থ হইলেন। তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন ফকীহ মুহম্মদ ইয়াহিয়া ইবন ইয়াহিয়া। ইনিই প্রথম হাকামের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং আমীরকে প্রাসাদে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইয়াহিয়া এক্ষণে বিদ্রোহের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া সরকারের সহিত সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন এবং এই সময় তাঁহারই চেষ্টায় আন্দালুসে মালিকী মজহাব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আমীর কাজী নিযুক্ত করার সময় তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

আমীর যে চতুর্থ ব্যক্তির প্রভাবাধীন ছিলেন, তিনি গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞ জিরইয়াব। তিনি প্রথমে বাগদাদে হারুনুর রশীদ ও তাঁহার পুত্র আমীন ও মামূনের দরবারে ছিলেন। তিনি বিখ্যাত গায়ক ইসহাক মসুলীর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তিনি কালক্রমে সঙ্গীতে এত পারদর্শিতা লাভ করেন যে, তাঁহার শিক্ষক ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাকে বাগদাদ ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। প্রথমে তিনি উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় গমন করেন। সেখান হইতে তিনি কর্ডোভায় যান। দ্বিতীয় আবদুর রহমান কর্ডোভা নগরীকে বাগদাদের মত গৌরব ও জাঁকজমকপূর্ণ করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে যে-কোন মূল্যে সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও গায়কগণকে নিজের দরবারে আকৃষ্ট করিতে প্রয়াসী হন। তিনি স্বয়ং রাজধানী হইতে বাহির হইয়া জিরইয়াবকে অভ্যর্থনা জানান। আমীর তাঁহাকে একটি প্রাসাদোপম বাসগৃহ দান করেন এবং বাৎসরিক ২৪000 দীনার বেতন ও অন্যান্য ভাতা প্রদান করেন। তিনি স্পেনের সকল গায়ক অপেক্ষা খ্যাতি অর্জন করেন এবং দশ হাজার গানের কথা ও সুর জানিতেন। ইহা ছাড়া তিনি একজন কবি, জ্যোতিষী এবং ভৌগোলিকও ছিলেন। তিনি একজন হাস্যরসিক এবং ফ্যাশনের প্রবর্তক ছিলেন।

আবদুর রহমানের রাজত্বের শেষভাগে কর্ডোভায় খ্রীস্টানদের মধ্যে একটি অদ্ভুত আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল খ্রীস্টান-দের মধ্যে আরব সংস্কৃতির বিস্তার রোধ করা। ইহার কারণ এই যে, স্পেনের খ্রীস্টানগণ আরবী ভাষা, সাহিত্য, রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া আরবদের অনুকরণ আরম্ভ করে এবং অনেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত না হইয়াও আরবীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করে। ইহারা মোজারাব (আরবী মুস্তারাব) নামে অভিহিত হয়। সেভিলের বিশপ জন ৭২৪ খ্রীস্টাব্দে বাইবেলের একটি আরবী সংস্করণ প্রণয়ন করেন। কর্ডোভার ধর্মান্ধ খ্রীস্টানগণ এই আরব প্রীতি রোধ করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে হযরত মুহম্মদ (স:) ও ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করিতে থাকে। ইহাদের নেতা ছিল ইউলোজিয়াস নামক একজন খ্রীস্টান সাধু। আবদুর রহমান বিশপ-দের এক সভা ডাকিয়া তাঁহাদের সাহায্যে এই ধরনের নিন্দাবাদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী করাইলেন। কিন্তু খ্রীস্টানগণ তাহাদের বিশপদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিল। ধর্মান্ধ খ্রীস্টানগণ হযরত মুহম্মদের (স:) প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করিয়া প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হইল না। আমীর বাধ্য হইয়া ইহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিলেন। অনেকে বন্দী হইল। এগারজন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইল। ফ্লোরাও মেরী নামক খ্রীস্টান রমণীও মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইল। খ্রীস্টানদের মধ্যে মুহম্মদের (স:) প্রতি গালিগালাজ করিয়া স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণের এই হিড়িক ক্রমাগত বাড়িয়া চলিল। এই আন্দোলন আবদুর রহমানের মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করার পর ৮৫২ খ্রীস্টাব্দে আবদুর রহমানের মৃত্যু হয়।

তাঁহার আমলে যোগ্য শাসক ও কর্মচারীদের সাহায্যে শাসন কার্যে শৃঙ্খলা বিধান করা হয়। তিনি বহু অট্টালিকা, মসজিদ, রাস্তাঘাট ও পুল নির্মাণ করেন। কর্ডোভার জুমা মসজিদে তিনি দুইটি অলিন্দ বৃদ্ধি করেন। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদি সংগ্রহের জন্য একজন পণ্ডিতকে মেসোপটে-মিয়ায় প্রেরণ করেন। বিদ্বান ও শিল্পীদের দ্বারা তিনি তাঁহার দরবার অলংকৃত করেন। তিনি স্পেনে আরব ও পারসিক চাল-চলন ও আদব-কায়দা প্রবর্তন করেন। তিনি নিজেও কবি ছিলেন এবং বিশেষ দরবারে কবিদের আবৃত্তি শুনিতেন।

দ্বিতীয় আবদুর রহমানের তিনজন উত্তরাধিকারী মুহম্মদ, মুনজির ও আবদুল্লাহর রাজত্বকালে বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। নও-মুসলিম-

গণ ও বার্বারগণ এই সকল বিদ্রোহের নেতা ছিল। তাহারা প্রদেশগুলিতে প্রায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিল। দক্ষিণাঞ্চলে আর্কিডোনায় স্পেনীয় মুসলমানগণ বাৎসরিক কর দানের প্রতিশ্রুতিতে মুহম্মদের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিল। উত্তরাঞ্চলে এ্যারাগনে বনু কাসি নামক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত প্রাচীন ভিসিগথ পরিবার একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। টলেডোর আশেপাশে বনু জুন্নুন নামক বার্বার পরিবার গোলযোগ করিয়া বেড়াইত। সেভিলে বনু হাজ্জাজ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিল। এইভাবে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মেরিডা ও বাদাজোজে, আলগার্বে ও মুর্সিয়ায় স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। কিন্তু এই সকল বিদ্রোহের চেয়ে ভয়াবহ ও বিপজ্জনক ছিল উমর ইবন হাফসুনের বিদ্রোহ। এই লোক দস্যুদলের সর্দার ছিল। বোবাস্ট্রো পাহাড়ে তাহার ঘাঁটি ছিল। সে স্পেনীয় মুসলমান ছিল এবং স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলে মুসলমান শাসনের বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। দক্ষিণাঞ্চলের খ্রীস্টানগণ তাহাকে স্পেনের জাতীয় স্বাধীনতার অগ্রনায়ক বলিয়া মনে করিত। সে স্পেনে ক্রমাগত গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া আব্বাসীয় কিংবা উত্তর আফ্রিকার আগলবী বংশের শাসকদের নিকট হইতে স্পেনের গভর্নরের পদ প্রাপ্তির আশা করিয়াছিল। ইহাতে ব্যর্থ হইয়া সে ৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়া পিতৃ-পিতামহের ধর্মে ফিরিয়া গেল এবং সামুয়েল নাম গ্রহণ করিল। তাহার বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপের ফলে স্পেনে আরব শাসনের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। স্পেনের উমাইয়া পরিবারে একজন ত্রাণকর্তার অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইতে থাকে।

কর্ডোভার উমাইয়া খিলাফত

তৃতীয় আবদুর রহমান (৯১২-৯৬১ খ্রী:)

স্পেনের এইরূপ সংকট সময়ে ৯১২ খ্রীস্টাব্দে মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে আবদুর রহমান আমীর হইলেন। তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন আমীরের ক্ষমতা কর্ডোভা ও উহার আশেপাশে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। আবদুর রহমান বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। অরাজকতা ও গৃহযুদ্ধের ফলে শান্তিকামী জনসাধারণ বিদ্রোহী সর্দারদের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবদুর রহমানকে সমর্থন করিতে লাগিল।

আবদুর রহমান যুগোপযোগী প্রতিভা ছিলেন। অটুট সংকল্প, অদম্য সাহস ও দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয় তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের রাজত্বকালে তিনি বিদ্রোহী প্রদেশগুলিকেই পুনরধিকার করেন নাই, চতুর্দিকে বহুদূর পর্যন্ত বিজয়াভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। প্রথমে এসিজা দুর্গ অধিকৃত হয় (৯১২) এবং এই প্রদেশ তাঁহার অধিকারে আসে। ইহার পর জেইন ও এলভিরা অধিকৃত হয়। সেভিলের বনু হাজ্জাজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলে নও-মুসলিম ও খ্রীস্টানগণ ইবন হাফসুনের পতাকাতলে সমবেত হইয়া স্পেনের আমীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল। কিন্তু ইবন হাফসুন খ্রীস্টধর্ম অবলম্বন করিয়া সামুয়েল নাম গ্রহণ করার পর হইতে তাহার জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়িল। নও-মুসলিমগণ খ্রীস্টান শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আশঙ্কিত হইয়া সামুয়েলের পক্ষ ত্যাগ করিল। তাহারা আবদুর রহমানের সহিত শান্তি স্থাপনে উদগ্রীব হইয়া উঠিল। সামুয়েল এক্ষণে শুধু খ্রীস্টান সমর্থকদের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল। আবদুর রহমান সামুয়েলকে পরাজিত করিয়া তাহার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ৯১৭ খ্রীস্টাব্দে সামুয়েলের মৃত্যু হয়। ত্রিশ বৎসর ধরিয়া সে চারিজন আমীরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। সামুয়েলের মৃত্যুর পর ৯২৭ খ্রীস্টাব্দে তাহার পার্বত্য দুর্গ বোবাস্ট্রো আবদুর রহমানের দখলে আসে। মেরিডা, বেজা ও বাদাজোজ একে একে বশ্যতা স্বীকার করিল। সর্বশেষে বাকী রহিল প্রাচীন স্পেনীয় রাজধানী টলেডো। এই নগরের অধিবাসীরা দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হইল। আবদুর রহমান নগর অবরোধ করিয়া নিকটবর্তী অঞ্চলে আল-ফাতাহ নামক একটি শহর নির্মাণ করিলেন। ৯৩২ খ্রীস্টাব্দে টলেডো অধিকৃত হয়।

বহিঃশত্রুর সহিতও আবদুর রহমানকে যুদ্ধ করিতে হয়। দক্ষিণে উত্তর আফ্রিকার মুসলিম ফাতিমীয় শাসকগণ এবং স্পেনের উত্তরাঞ্চলে লিওঁর খ্রীস্টান শাসকগণ আবদুর রহমানের ক্ষমতা খর্ব করিতে চেষ্টিত ছিল। ফাতিমীয় উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী ইবন হাফসুনের সহিত দূত বিনিময় করিয়া মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। আবদুর রহমান ফাতিমীয় শক্তির বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বিধানের জন্য ৯৩১ খ্রীস্টাব্দে সিউটা দখল করেন। তিনি আল-মাবিয়া পোতাশ্রয়ে একটি শক্তিশালী নৌবহর গঠন করেন। এই নৌবহর পৃথিবীর কোন নৌবহর অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল না। ইহা

পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে ফাতিমীয় নৌবহরের মোকাবেলা করিতে লাগিল। ফাতিমীয় খলীফার আদেশে সিসিলীর একটি নৌবহর স্পেনের উপকূল আক্রমণ করিলে আবদুর রহমানের সত্তরটি যুদ্ধ জাহাজের এক বহর ৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে আফ্রিকার উপকূল আক্রমণ করে। স্পেনের উত্তরাঞ্চল কখনও মুসলমানদের অধিকারে আসে নাই। তন্মধ্যে বাস্কান' (বাস্ক) পার্বত্য জাতি মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। ইহার পূর্বদিকে ন্যাভারে ও এ্যারাগণ অবস্থিত ছিল; পশ্চিম দিকে ছিল ক্যাস্টিল ও লিওঁ। লিওঁর রাজা ওরডনো (২য়) ৯১৪ খ্রীস্টাব্দে মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করেন। তিন বৎসর পর তিনি আবদুর রহমানের এক সেনাপতিকে বন্দী করিয়া তাঁহার ছিন্ন মস্তক একটি শূকরের মস্তকের পার্শ্বে দুর্গ প্রাকারে কীলকবিদ্ধ করেন। ৯২০ খ্রীস্টাব্দে আবদুর রহমান স্বয়ং যুদ্ধাভিযানে বাহির হইয়া 'সান এসটেবান' নামক দুর্গ ধূলিসাৎ করেন এবং আরও কতকগুলি দুর্গ ধ্বংস করেন। ইহার পর তিনি ওরডনো এবং ন্যাভারের রাজা সাঞ্চোর সম্মিলিত বাহিনীর মোকাবেলা করেন এবং তাঁহাদিগকে পরাজিত করেন; ন্যাভারের কিয়-দংশ ও অন্যান্য খ্রীস্টান জায়গা পদদলিত করিয়া বিজয়োল্লাসে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু খ্রীস্টানগণ ইহাতে নিরাশ হয় নাই; ওরডনো এবং সাঞ্চো পুনরায় মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করিয়া বহু স্ত্রীলোক ও ছেলে-মেয়েকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। আবদুর রহমান তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ন্যাভারের রাজধানী পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন এবং শত্রুর বহু দুর্গ ধ্বংস করিলেন। তিনি সাঞ্চোকে পরাজিত করিয়া তাঁহার দর্প চূর্ণ করি-লেন। লিওঁর রাজা ওরডনো ৯২৪ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হইল। ইহার ফলে উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বিরতি ঘটে। আবদুর রহমান এই মর্মে এক ফরমান জারী করিলেন যে, ৯২৯ সালের ১৬ই জানুয়ারী শুক্রবার হইতে খুৎবায় এবং সরকারী কাগজপত্রে তাঁহাকে 'খলীফা' বলিয়া সম্বোধন করিতে হইবে। তিনি এই উপলক্ষে 'আল-খলীফা আন-নাসীর লি দীনীল্লাহ্' উপাধি গ্রহণ করিলেন। স্পেনে তাঁহার আধিপত্য ও প্রতিপত্তি এবং আব্বাসীয় খিলাফতের অধোগতি তাঁহাকে 'খলীফা' উপাধি গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিল।

খলীফা হইয়াও আবদুর রহমান যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতে নিস্তার পান নাই। খ্রীস্টানগণ উত্তরাঞ্চল হইতে তাঁহার পৈতৃক রাজ্যের উপর লোলুপ দৃষ্টি

নিক্ষেপ করিত। ৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে সারাগোসার মুসলমান শাসনকর্তা বিদ্রোহী হইয়া উত্তরাঞ্চলের খ্রীস্টান রাজাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। আবদুর রহমান ৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে ইঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া প্রায় ত্রিশটি দুর্গ অধিকার করিলেন। ইহার ফলে লিওঁ এবং বাটালোনিয়ার একাংশ ব্যতীত সম্পূর্ণ স্পেন তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু ৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে লিওঁর রাজা রামিরো এবং ন্যাভাবের রানী টোটা প্রথমবারের মত আবদুর রহমানকে পরাজিত করিলেন এবং তাঁহার বিশাল বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিলেন। খলীফা আবদুর রহমান মাত্র ৪৩ জন লোকসহ প্রাণে বাঁচিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আবার খ্রীস্টান-দের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে রানী টোটার পৌত্র সঞ্চো লিওঁব সিংহাসন হারাইয়া ন্যাভারেতে তাঁহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলে রানী টোটা আপন পুত্র ও পৌত্র সাঞ্চোকে লইয়া আবদুর রহমানের দরবারে তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থী হইয়া আসিলেন। রানী আবদুর রহমানের নিকট দুইটি প্রার্থনা লইয়া আসিয়াছিলেন—তাঁহার পৌত্র সাঞ্চোর চিকিৎসা ও তাঁহাকে লিওঁর সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। আবদুর রহমান শাহী মেহমানদের আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি করেন নাই। খলীফার দরবারে তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থী খ্রীস্টান রানী ও রাজার দৃশ্য আবদুর রহমানের সম্মান ও প্রতিপত্তি শতগুণে বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার সুনাম ও সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিল। পরিশেষে খলীফার ইহুদী চিকিৎসকের পরিচর্যায় সাঞ্চো নিরাময় হইলেন এবং খলীফার সামরিক সাহায্যে ৯৬০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সাঞ্চো লিওঁ, গ্যালিসিয়া এবং ন্যাভারের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া খলীফার আনুগত্য স্বীকার করিলেন। ৯৬১ সালের ১৫ই অক্টোবর তৃতীয় আবদুর রহমানের মৃত্যু হয়।

আবদুর রহমানের রাজত্বকাল স্পেনের ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায়। যে সময় তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তখন স্পেনের আমীরের ক্ষমতা কর্ডোভা ও উহার আশেপাশে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি অবিরাম যুদ্ধ চালাইয়া পূর্বে এ্যাব্রো নদীর মোহনা হইতে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত এবং উত্তরে পিরেনীজের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে জিব্রাল্টার পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগে অপ্রতিহত ক্ষমতা স্থাপন করেন। কিন্তু আবদুর রহমানের গৌরব ও সুখ্যাতি তাঁহার যুদ্ধ-জয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁহার সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও স্থাপত্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তাঁহার সুনাম ও

সুখ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট এবং জার্মানী, ইটালী ও ফ্রান্সের রাজারা তাঁহার দরবারে দূত পাঠাইয়া স্পেনের সহিত কূট-নৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। খলীফাও জার্মানীর ও অন্যান্য স্থানের খ্রীস্টান রাজাদের দরবারে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

আবদুর রহমানের সময় কর্ডোভা উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করে। পাঁচ লক্ষ লোক অধ্যুষিত এই নগরীতে সাতশত মসজিদ ও তিনশত হাম্মাম ছিল। কর্ডোভার তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে গুয়াদাল-কুইভির নদীর তীরে তিনি 'অজে-জাহরা' নামক নূতন শহর ও প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ইহার নির্মাণ কার্য ৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে আরম্ভ হইয়া তাঁহার মৃত্যুর পনর বৎসর পরে সম্পন্ন হয়। তিনি এই প্রাসাদের জন্য পঞ্চাশ লক্ষ দীনার ব্যয় করেন; নিউমিডিয়া ও কার্থেজ হইতে মার্বেল আমদানী করা হয়; কনস্টান্টিনোপল হইতেও নানা উপকরণ আসে। খলীফার একটি মুক্তিপ্রাপ্তা ক্রীতদাসীর নামানুসারে ইহার নাম 'আজ-জাহরা' রাখা হয়। ইহাতে চারিশত প্রকোষ্ঠ ছিল এবং হাজার হাজার ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী এবং প্রহরী ইহার অভ্যন্তরে বাস করিত। খলীফার দেহ-রক্ষীদের সংখ্যা ছিল ৩৭৫০। ইহারা সকলে বিদেশী ক্রীতদাস ছিল। তাঁহার সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল এক লক্ষ।

আবদুর রহমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি বিধানে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। রাজ্যের মোট আয়ের এক-তৃতীয়াংশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইত। দার্শনিক ইবন মাসাররা, ঐতিহাসিক ইবনুল আহমার, জ্যোতি-র্বিজ্ঞানী আহমদ ইবন নাসর এবং মাসলামা ইবন কাশিম, চিকিৎসাবিদ আরিব ইবন সাঈদ এবং ইয়াহিয়া ইবন ইসহাক আবদুর রহমানের দরবার অলংকৃত করিয়াছিলেন। গ্রীক ও ইহুদী পণ্ডিতগণও তাঁহার দরবারে সমাদৃত হইতেন। বহু গ্রীক গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ে আরবীতে অনেক মৌলিক গ্রন্থও লিখিত হয়। খলীফার গ্রন্থাগারে বহু গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। রাজ্যের সর্বত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইয়াতিমখানা স্থাপিত হয়। কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সময় কৃষিকার্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। নূতন কৃষি পদ্ধতির প্রবর্তন হয়। স্পেনের বিভিন্ন স্থানে মনোরম উদ্যান রচিত হয়। বহু পতিত জমি আবাদ করা হয়। সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হয়। পাহাড়ে থাক কাটিয়া কৃষির ব্যবস্থা করা হয়। জিনিসপত্রের দাম সস্তা হয়। ভিক্ষুক ও

কর্ডোভায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

ভিক্ষাবৃত্তি লোপ পায়। কৃষির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পেরও উন্নতি হয়। রেশম, সুতা, পশম, চামড়া ও ধাতব শিল্প প্রসার লাভ করে। কর্ডোভার ১৩০০০ তাঁতী ছিল। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ ও পারদের খনি হইতে এই সকল ধাতু উদ্ধার করা হয়। স্পেনের লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যেও বিশেষ প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে। আর্থিক উন্নতির ফলে রাজ্যের আয় বাড়িয়া যায়। বাৎসরিক ৬,২৪৫,০০০ দীনার রাজস্ব আমদানী হইত। ইহার এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা সৈন্যের ব্যয় নির্বাহ হইত। অধিকাংশ লোক খচ্চর ও ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইত। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, "পূর্বে কখনও কর্ডোভা এত উন্নতিশীল, আন্দালুস এত ধনশালী ও রাজ্য এত বিজয়মণ্ডিত হয় নাই।"

দ্বিতীয় হাকাম (৯৬১—৭৬): আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হাকাম আল-মুসতানসির বিল্লাহ উপাধি ধারণ করিয়া খলীফা হইলেন। তাঁহার রাজত্বকালে উত্তরাঞ্চলের খ্রীস্টানগণ পুনরায় আন্দালুসিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। আল-হাকাম সুপণ্ডিত ছিলেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। তথাপি তিনি খ্রীস্টান আক্রমণের সমুচিত জবাব দিবার জন্য ৯৭২ খ্রীস্টাব্দে স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করিয়া তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। লিওঁ ও ন্যাভারের রাজা সাঞ্চো ও গ্র্যাসিয়া তৃতীয় আবদুর রহমানের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার মৃত্যুর পর এই সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেন। লিওঁর রাজা সাঞ্চো আবদুর রহমানের সহায়তায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে সাঞ্চোর বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ লইয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ৪র্থ ওরডনো আল-হাকামের সাহায্য প্রার্থী হইলেন। ওরডনোকে সসম্মানে জাহরা প্রাসাদে অভ্যর্থনা জানান হয়। আল-হাকাম তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু সাঞ্চো আসন্ন বিপদের মুখে সন্ধির শর্ত পূর্ণ করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় হাকাম সাঞ্চোকে সিংহাসনচ্যুত না করাই সিদ্ধান্ত করিলেন। ওরডনোর মৃত্যু হইলে সাঞ্চো পুনরায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলেন। আল-হাকামের সেনাপতিগণ অমিত তেজে যুদ্ধ করিয়া সাঞ্চোকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিলেন। সাঞ্চোর দেখাদেখি খ্রীস্টান দলপতিগণ হাকামের অধীনতা স্বীকার করিল। ফাতিমীয়গণের সহিতও আল-হাকামের কয়েকবার যুদ্ধ হয়। ইহার ফলে মরিটানিয়া আল-হাকামের বশ্যতা স্বীকার করে।

হাকাম জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি বিদ্বান ছিলেন এবং বিদ্বজ্জনের সমাদর করিতেন। তিনি জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের

দের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। তিনি রাজধানীতে সাতাইশটি অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করেন। আবদুর রহমান (৩য়) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার সময় পৃথিবীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে বিশিষ্ট গৌরব অর্জন করে। কায়রোর আল-আজহার এবং বাগদাদের নিজামীয়ার পূর্বেই এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ইহাতে স্পেন, ইউরোপের অন্যান্য অংশ এবং আফ্রিকা ও এশিয়া হইতে ইহুদী, খ্রীস্টান ও মুসলমান ছাত্রগণ পড়াশুনা করিতে আসে। হাকাম কর্ডোভার মসজিদটি সম্প্রসারণ করেন; এই মসজিদেই বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত ছিল। তিনি ইহার মধ্যে সীসার পাইপের মধ্য দিয়া পানি আনয়ন করেন এবং ইহাকে মোজাইকে সুসজ্জিত করেন। আন্দালুসিয়ার এমন কোন ছোট-বড় শহর ছিল না, যেখানে স্কুল ছিল না। ইহা ছাড়া প্রধান শহরে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান ছিল। সেভিল, মালাগা, সারাগোসা ও জেইনের উচ্চ বিদ্যালয় সমূহ কর্ডোভার অনুকরণেই স্থাপিত হইয়াছিল। এইগুলিকেও বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায়।

হাকাম কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মুসলিম প্রাচ্য হইতে সুযোগ্য অধ্যাপক মণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহাদের বেতনের জন্য তিনি ওয়াকফ নির্ধারণ করেন। কর্ডোভার বিখ্যাত অধ্যাপকদের মধ্যে ঐতিহাসিক ও ব্যাকরণবিদ ইবনুল-কুতিয়া এবং বাগদাদের বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ আবু আলী আল-কালীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবু আলীর রচিত কিতাবুল আলী এখনও আরবী ভাষাভাষী অঞ্চলে পঠিত হয়। আবু আলীর প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য সর্বজন-স্বীকৃত হইলেও তাঁহার মঞ্চ-ভীতি সম্পর্কে চমৎকার গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে, তাঁহাকে খলীফা আবদুর রহমানের দরবারে আগত বাইজান্টাইন দূতের সম্মানে আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা দিতে বলায় তিনি ভূমিকায় 'হামদ ও নাত' (আল্লাহর প্রশংসা ও রসূলের গুণগান) ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। এই দুইজন অধ্যাপক ছাড়া ফকীহ আবূ ইব্রাহীম ও আবূ বকর ইবন মুয়াবিয়াও কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয় অলংকৃত করিয়াছিলেন। শেষোক্ত অধ্যাপক হাদীস ও আইন বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। হাকামের দরবারের পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে 'কিতাবুল-আইন' নামক অভিধান রচয়িতা আবূ বকর আজ-জুবায়দীর নাম করা যাইতে পারে। হাকাম ইঁহাকে শাহজাদা হিশামের জন্য গৃহশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হাকামের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন আবূ আবদুল্লাহ আল-উজরী।

আল-হাকাম ও তাঁহার ভ্রাতা আবদুল্লাহ তাঁহাদের পিতার জীবদ্দশায় আপন আপন গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে হাকাম পিতার গ্রন্থাগার ও তাঁহাদের গ্রন্থাগার দুইটিকে একত্র করিয়া একটি বৃহৎ কুতুবখানা গঠন করেন। তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাদি সংগ্রহ করেন। পুস্তক সংগ্রহে তাঁহার নিষ্ঠা অতুলনীয় ছিল। পুস্তকের অন্বেষণে তাঁহার প্রতিনিধিগণ আলেকজান্দ্রিয়া, দামিস্ক ও বাগদাদের পুস্তকের দোকান সমূহ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইত। তাহারা পুস্তক ক্রয় করিত কিংবা পুস্তকের প্রতিলিপি প্রস্তুত করাইয়া লইত। কেহ খলীফাকে কোন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ উপহার দিলে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। রাজকীয় লাইব্রেরীর পুস্তকের সংখ্যা অন্যূন ৪০০,০০০ (মতান্তরে ৬০০,০০০) ছিল। এই সকল পুস্তকের তালিকা ৪৪টি খণ্ডেও সমাপ্ত হয় নাই। প্রতিখণ্ডে কেবল কাব্য ও কবিতার গ্রন্থের নাম লিখিতেই ২০ পাতা লাগিয়াছিল। পালিশ-করা চন্দন কাঠের নির্মিত আলমারীতে বইগুলি রাখা হইত। পুস্তকের প্রতিলিপি প্রস্তুত, বাঁধাই ও সোনালী হরফে নাম খোদাইয়ের জন্য পার্শ্ববর্তী প্রকোষ্ঠ সমূহে বহুলোক নিযুক্ত হইত। বড় বড় শহরে সাধারণ পাঠাগারও ছিল। এইগুলি সরকারী খরচে চলিত। মাত্র কর্ডোভাতেই এইরূপ সত্তরটি সাধারণ পাঠাগার ছিল। খলীফার উৎসাহে কর্ডোভা নগরীতে বিরাট পুস্তক ব্যবসায়ও গড়িয়া উঠে। জহুরীর দোকান, কাপড়-চোপড়ের দোকান ও অন্যান্য দোকানেপাটের মত পুস্তকের দোকানেও বহু গ্রাহকের সমাবেশ হইত। কোন খ্যাতনামা গ্রন্থকারের পুস্তকের প্রথম কপি সংগ্রহ করার জন্য ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দিত। খলীফা নিজে প্রচুর দাম দিয়া এইরূপ বিখ্যাত লেখকের গ্রন্থ যোগাড় করিতেন। কিতাবুল আসানীর রচয়িতা আবুল ফারাজ ইস্পাহানীর এই গ্রন্থের জন্য খলীফা হাকাম এক হাজার দীনার দিয়াছিলেন। ইস্পাহানী উমাইয়া বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং সানন্দে তাঁহার পুস্তকের একটি কপি ইরাক হইতে স্পেন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

হাকাম কেবল পুস্তকের সংগ্রাহকই ছিলেন না, তিনি নিজেও একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। মুসলমান খলীফাদের মধ্যে এবং তাঁহার সমসাময়িক রাজা-বাদশাহ্দের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বইয়ের নিয়মিত পাঠক ছিলেন এবং পুস্তকের পৃষ্ঠার প্রান্তে নিজ হস্তে মন্তব্য লিখিতেন। এই মন্তব্য সম্বলিত পুঁথি-পুস্তকগুলি পরবর্তীকালে

পণ্ডিত ব্যক্তিদের বিশেষ উপকারে আসিত। তিনি ইতিহাস, জীবনী ও বংশতত্ত্বে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

তাঁহার বদান্যতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় স্পেনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়। তাঁহার তত্ত্বাবধানে বহু গ্রীক গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয়। স্কুল-মাদ্রাসার বৃদ্ধি, পাঠাগারের প্রাচুর্য ও বই-পুস্তকের প্রতুলতা আন্দালুসে সাধারণ শিক্ষার মান বাড়াইয়া দেয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের সম্মিলিত জ্ঞানের ভাণ্ডার কর্ডোভায় বুদ্ধিজীবী মহলের গোচরীভূত হয়। আন্দালুসিয়ার সাধারণ শিক্ষার মান সম্বন্ধে সুপণ্ডিত ডোজী মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই সময় আন্দালুসিয়ায় প্রায় প্রত্যেক লোক লিখিতে ও পড়িতে জানিত"। অথচ খ্রীস্টীয় ইউরোপে এই সময় মাত্র পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যেই লেখাপড়া সীমাবদ্ধ ছিল। তাহা ছাড়া খুব অল্পলোকই সামান্য লেখা-পড়া জানিত।

খলীফা জনহিতকর কাজেও বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তিনি রাস্তা-ঘাটের সংস্কার করেন এবং পথিকের জন্য কূপ ও সরাইখানার ব্যবস্থা করেন। রাজ্যের সর্বত্র কূপ, সরাইখানা, হাম্মাম ও বাজার নির্মাণ করান হয়। তিনি উদ্যান রচনায় উৎসাহী ছিলেন এবং জনসাধারণকে উদ্যান তৈয়ার করিতে উৎসাহিত করিতেন। তিনি বহু অর্থব্যয়ে কর্ডোভার মসজিদের সম্প্রসারণ করেন। পণ্ডিত, জ্ঞানী, ধর্মপরায়ণ, দানশীল, বিদ্যোৎসাহী ও সহনশীল খলীফা আন্দালুসের সার্বিক কল্যাণ সাধন করিয়া কর্ডোভাকে মুসলিম জগতের তৃতীয় জ্ঞানকেন্দ্রে উন্নীত করিয়া গিয়াছেন।

উমাইয়া খিলাফতের পতন: হাকামের (দ্বিতীয়) মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় হিশাম বার বৎসর বয়সে খলীফা হইলেন। হিশামের মাতা সুবহ্ এবং তাঁহার উজীর মুহম্মদ ইবন আবি আমীর রাজ্যে সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপিত করিয়াছিলেন। অচিরেই ইবন আবি আমীর বালক খলীফাকে বন্দী করিয়া নিজেই শাসনকার্য চালাইতে লাগিলেন। তিনি হাজিব আল-মনসুর নামেই সমধিক সরিচিত। তিনি উত্তরাঞ্চলের খ্রীস্টান শাসকদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের ক্ষমতা খর্ব করেন। ১০০২ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু আন্দালুসের খিলাফতের পূর্বগৌরব আর ফিরিয়া আসিল না। বার্বার, আরব, স্লাভ ও স্পেনীয়দের কলহে কর্ডোভার গৌরব-রবি ক্রমাগত অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। প্রথমে হাজিব আল-মনসুরের পুত্রদের মধ্যে কলহ,

হাজিব আল-মনসুর

পরে দ্বিতীয় হিশামের পুনরায় সিংহাসনারোহণ ও সিংহাসন ত্যাগ এবং উমাইয়া বংশের দুর্বল ও অযোগ্য খলীফাদের সিংহাসন লাভ ও শোচনীয় পরিণতি উমাইয়া খিলাফতের চরম অবনতি সূচিত করে। শেষ খলীফা তৃতীয় হিশাম ১০৩১ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইবন জওহর নামক একজন নেতার অধীনে গঠিত রাষ্ট্রীয় পরিষদ খলীফার কার্যভার গ্রহণ করে।

কর্ডোভার গৌরব: স্পেনে উমাইয়া বংশের শাসন পৌণে তিনশত বৎসর (৭৫৬—১০৩১খ্রী:) স্থায়ী হইয়াছিল। এই সময় রাজধানী কর্ডোভা ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং বাগদাদ ও কনস্টান্টিনোপলের সহিত সমগ্র পৃথিবীর তিনটি সংস্কৃতি কেন্দ্রের অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার এক লক্ষ তের হাজার গৃহ, একুশটি উপশহর, সত্তরটি লাইব্রেরী ও অগণিত বইয়ের দোকান, মসজিদ ও প্রাসাদ ইহার আন্তর্জাতিক খ্যাতি বৃদ্ধি করিয়াছিল। পর্যটক মাত্রেই কর্ডোভার সমৃদ্ধি ও জাঁকজমক দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইত। নগরীতে মাইলের পর মাইল পাকা রাস্তা ছিল। পার্শ্ববর্তী গৃহসমূহ হইতে রক্ষিত আলোক-বর্তিকা দ্বারা এই রাস্তাগুলি রাত্রিতে আলোকিত হইত। অথচ "ইহারও সাতশত বৎসর পরে লণ্ডনে সরকারী বাতি বলিতে কিছুই ছিল না" কিংবা "প্যারিসে বহু শতাব্দী পরে যে, কেহ বৃষ্টির দিনে নিজের দোর-গোড়ার বাহিরে পা বাড়াইত, তাহার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত কাদায় ডুবিয়া যাইত।" যখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গোসল করাকে অখ্রীস্ট আচরণ বলিয়া হেয় মনে করা হইত, তখন কর্ডোভার বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের জমকালো বাসগৃহে হামামখানায় গোসলের আনন্দ উপভোগ করিতেন। লিওঁ, নেভারে কিংবা বার্সিলোনের শাসকগণ যখনই কোন শল্য চিকিৎসক, স্থপতি, সঙ্গীত-বিশারদ বা পোশাক প্রস্তুতকারক চাহিতেন, তখন তাঁহাদিগকে কর্ডোভার শরণাপন্ন হইতে হইত। শুধু তাহাই নহে, নানাপ্রকার শিল্পে স্পেন পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। কেবলমাত্র কর্ডোভাতেই তের হাজার তন্তুবায় বয়ন শিল্পে নিয়োজিত ছিল। চর্মশিল্প কর্ডোভা হইতে মরক্কোতে এবং সেখান হইতে ইউরোপে প্রসার লাভ করে। পশম ও রেশম শিল্প কর্ডোভা, মালাসা ও আলমারিয়ায় সমৃদ্ধি লাভ করে। দামিনু হইতে বিভিন্ন ধাতুর কাজ স্পেনে প্রবর্তিত হয়। ধাতুর উপর স্বর্ণ ও রৌপ্যের কাজ ও ফুলের কাজ বিশেষ নিপুণতার সহিত সম্পাদিত হয়। কৃষিকার্যেও উমাইয়াদের



আইবেরীয় উপদ্বীপ (মধ্য দ্বাদশ শতাব্দী)

সময় প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ধান, গম, ইক্ষু, তুলার চাষ ছাড়া নানা রকম ফল যেমন—আঙ্গুর, পীচ, এ্যাপরিকট, কমলালেবু এবং আনারও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। উমাইয়াগণ উত্তম সেচ ব্যবস্থার সাহায্যে ফলন বাড়াইয়া স্পেনকে সমৃদ্ধিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। কৃষির উন্নতি আন্দালুসিয়ায় আরবগণের বিশেষ অবদান। উদ্বৃত্ত ফসল ও শিল্পজাত দ্রব্য স্পেন হইতে দামিস্ক, মক্কা ও বাগদাদ রফতানী হইত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশ (মুলুকুত-তাওযায়িফ):

বনু আব্বাদ (১০২৩-৯১): উমাইয়া বংশের পতনের পর আন্দালুসিয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের উদ্ভব হয়। ইহাদের মধ্যে সেভিলের বনু আব্বাদ বিখ্যাত। এই বংশের শাসকগণ হিরার লখমী বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবী করিতেম। এই বংশের স্থাপয়িতা মুতাদিদ একজন কবি ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তাঁহার পুত্র মুতামিদ (১০৬৮—১০৯১খ্রীঃ) সর্বকালের আরব কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি "ক্ষুদ্র রাজাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দানশীল, সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন।" তাঁহার উজীর ইবন আম্মারও একজন কবি চিলেন। তাঁহার স্ত্রী ইতিমাদ গুণবতী ও সুন্দরী রমণী ছিলেন। তিনি প্রথমে একজন ক্রীতদাসী ছিলেন। এক-বার বাদশাহ উজীরের সহিত গুয়াদালকুইভির নদীর তীরে বেড়াইতে-ছিলেন। মৃদুমন্দ সমীরণে নদীর প্লানি নড়িয়া উঠিতে দেখিয়া বাদশাহ এক পঙক্তি কবিতা রচনা করিয়া পরবর্তী পঙ্‌ক্তি পূর্ণ করিবার জন্য উজীরের দিকে চাহিয়া ছিলেন। তখন নদীতে কাপড় ধৌত করিতে করিতে একজন ক্রীতদাসী পঙ্‌ক্তিটি পূর্ণ করিলেন। খলীফা ইঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া ইঁহার পাণি-গ্রহণ করিলেন। ইঁহারই নাম ইতিমাদ এবং বাদশাহও এই নাম হইতে মুতামিদ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। বাদশাহ রানীর বহু আবদার মিটাইয়াছিলেন। একবার কর্ডোভায় বরফ পড়িতেছিল। রানী বাদশাহকে অনুরোধ জানাইলেন যে, এই তুষারপাতের দৃশ্যকে কি করিয়া অনুকরণ করা যায়। বাদশাহ নগরীর উপকণ্ঠে বাদামগাছ লাগাইয়া দিলেন। এই বাদামের সাদা ফুল শীতের শেষে তুষার পাতের দৃশ্যের অনুরূপ প্রতীয়মান হইল। আর একবার বেদুঈন রমণীরা কর্দমাক্ত রাস্তায় তাহাদের কাপড়ের প্রান্ত তুলিয়া ধরিয়া দুধের পাত্র লইয়া হাঁটিয়া যাইতেছিল। রানীর ইচ্ছা হইল, এই রকম কিছু করা। যেই কথা,

সেই কাজ। রাজপ্রাসাদের অঙ্গন তৎক্ষণাৎ গোলাপ পানি ও নানা সুগন্ধি দ্রব্য ছড়াইয়া খোশবুদার পঙ্কে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলা হইল। তখন রানী সখী-সাথীদিগকে লইয়া বেদুঈন রমণীদের কার্যের পুনরাবৃত্তি করিলেন।

মুতামিদের শেষজীবন বড় দুঃখজনক হইয়াছিল। উত্তরাঞ্চলের খ্রীস্টান রাজাগণ এই সময় পুনরায় সক্রিয় হইয়া উঠিলেন। লিওঁ ও ক্যাস্টিলের দুইটি রাজ্য প্রথম ফার্ডিনাণ্ডের অধীনে একীভূত হইল। ফার্ডিনাণ্ডের পুত্র ষষ্ঠ আলফনজো তাঁহার রাজ্যের সহিত গ্যালিসিয়া ও ন্যাভেরে যুক্ত করিলেন এবং সম্রাট উপাধি গ্রহণ করিলেন। উত্তরাঞ্চল হইতে ঘন ঘন মুসলিম রাজ্য আক্রান্ত হইতে লাগিল। ষষ্ঠ আলফনজোর বিরুদ্ধে সহায়তার জন্য মুতামিদ মরক্কোর মুরবিত নেতা ইউসুফ ইবন তাশফীনকে আহ্বান করিলেন। ইহাই পরবর্তীকালে তাঁহার কাল হইল। ইউসুফ সানন্দে এই আহ্বানে সাড়া দিয়া মরক্কো হইতে স্পেনে আসিলেন এবং ১০৮৬ খ্রীস্টাব্দে ২৩শে অক্টোর ষষ্ঠ আলফানজোকে জাল্লাকার যুদ্ধে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করিলেন। খ্রীস্টানরাজ কোন রকমে প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন। ইউসুফ বিজয়গর্বে আফ্রিকায় প্রত্যাবর্তন করিলেন, কিন্তু পর বৎসর (নভেম্বর, ১০৯০) তিনি পুনরায় স্পেনে পদার্পণ করিলেন এবং একে একে গ্র্যানাডা, সেভিল ও অন্যান্য শহর অধিকার করিলেন। সারাগোসা ব্যতীত সম্পূর্ণ মুসলিম স্পেন তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। মুতামিদ বন্দী হইয়া মরক্কোতে নীত হইলেন এবং রানী ইতিমাদ ও কন্যাগণের সহিত বহু কষ্টে দিন কাটাইলেন। একবার একদিন মুতামিদ দেখিলেন যে, লোকেরা মিছিল করিয়া বৃষ্টির জন্য নামাজ পড়িতে যাইতেছে। ইহা দেখিয়া তাঁহার কবি মন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি নীচের কয়েকটি বেদনাতুর পঙক্তি রচনা করিলেন:

"আল্লা পানি দেরে" মিনতি করিয়া অযুত কণ্ঠে কয়,
আমি বলি "মোর অশ্রু সায়রে বন্যার পরাজয়"।
তারা ডেকে কয় "তোমার অশ্রু প্রচুর বলিয়া মানি,
কিন্তু তাহাতে নিঙ্গাড়িয়া আসে তোমার রক্ত জানি।" *

মুরাবিতগণ: মুরাবিতগণ প্রথমে ছিল একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। সিনিগালের একটি নির্জন দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত একটি রিবাতে (সুফীর

---

* গ্রন্থকার কর্তৃক অনূদিত

আস্তানা) তাহারা বাস করিত। ইহাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহারা যুগপৎ সুফী ও যোদ্ধা ছিল। তাহারা বহু লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে এবং উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে। ইউসুফ ইবন তাফশীন ১০৬২ খ্রীস্টাব্দে মারাকেশ (মরক্কো) নগরীর পত্তন করেন। তখন হইতে মরক্কো তাঁহার ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদেব রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হয়। স্পেনে কর্ডোভার পরিবর্তে সেভিলে মুরাবিতগণের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপিত হয়। মুরাবিত শাসকগণ 'আমীরুল মুসলিমীন' উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেও ধর্মীয় ব্যাপারে আব্বাসীয় খলীফার প্রাধান্য মানিয়া চলিতেন। অর্ধশতাব্দীর অধিককাল তাঁহারা উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা ও দক্ষিণ স্পেনে ক্ষমতাসীন ছিলেন। ইঁহারা জাতিতে বার্বার ছিলেন। লিওঁ ও ক্যাস্টিলের রাজা অষ্টম আলফনজো মুরাবিত মুদ্রা রীতি অনুকরণ করিয়া আরবীতে নামধাম লিখিতে থাকেন।

মুওয়াহ্হিদগণ : এই সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বার্বার বংশীয় মুহম্মদ ইবন তুমার্ত। তিনি ক্রমবর্ধমান অন-ইসলামী আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া তওহীদের (আল্লাহর একত্ব) উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। এই জন্য তাঁহার অনুসারীদিগকে মুওয়াহ্হিদ বলা হয়। তাঁহারই শিষ্য আবদুল মুনইম মুওয়াহহিদ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি খলীফা উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি মুরাবিত বংশের সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া ফাস, সিউটা, তাঞ্জির ও আগমাত দখল করিয়া মরক্কো অবরোধ করেন। এগার মাস অবরোধের পর মরক্কো অধিকার করিয়া তিনি ১১৪৬-৪৭ খ্রীস্টাব্দে মুরাবিত বংশের প্রাধান্য লোপ করেন। ১১৪৫ খ্রীস্টাব্দে আবদুল মুনইম স্পেনে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং পাঁচ বৎসর যুদ্ধ করিয়া সমগ্র মুসলিম স্পেন অধিকার করেন। ১১৫২ খ্রীস্টাব্দে আলজিরিয়া, ১১৫৮ খ্রীস্টাব্দে তিউনিসিয়া এবং ১১৬০ খ্রীস্টাব্দে ত্রিপলী অধিকৃত হয়। এইভাবে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর হইতে পূর্বে মিসরের সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র তীরভূমি আন্দালুসিয়ার সহিত সংযুক্ত হয়। এখন হইতে সমগ্র রাজ্যে আব্বাসীয় খলীফার নামের পরিবর্তে মুওযাহহিদ খলীফার নামে খুৎবা পাঠ করা হয়। আবদুল মুনইম ১১৬৩ খ্রীস্টাব্দে ইনতিকাল করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তাঁহার পৌত্র আবু ইউসুফ আল-মনসুর সুপ্রসিদ্ধ। সুলতান সালাহুদ্দীন তাঁহার দরবারে এক দূত প্রেরণ করেন। তবে সালাহুদ্দীন আব্বাসীয় খলীফার প্রাধান্য স্বীকার

করিতেন, সেই জন্য দূতের নিয়োগপত্রে তিনি খলীফা মনসুরকে 'আমীরুল মুমিনীনের পরিবর্তে 'আমীরুল মুসলিমীন' বলিয়া সম্বোধন করেন। সালাহুদ্দীন তাঁহার নিকট অনেক উপঢৌকন প্রেরণ করেন। প্রথমে তিনি এই সম্বোধনের ফলে কিছুটা অসন্তুষ্ট হইলেও পরে সালাহুদ্দীনকে ক্রুসেডারগণের সহিত যুদ্ধ করার জন্য ১৮০ খানা জাহাজ প্রেরণ করেন। খলীফা মনসুর স্থাপত্য শিল্পে, বিশেষতঃ মসজিদ, সুফীদের রিবাত ও হাসপাতাল নির্মাণে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। এই বংশীয় খলীফাগণ স্পেনে খ্রীস্টানদের সহিত যুদ্ধ করিয়া খ্রীস্টান শক্তির অগ্রগতি রোধ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মনসুরের পুত্র নাসির সম্মিলিত খ্রীস্টান বাহিনীর নিকট ১২১২ সালে শোচনীয়রূপে পরাজিত হইয়া মরক্কোতে ফিরিয়া আসেন। বিজেতাগণ মুসলিম স্পেনের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ দখল করিয়া লইলেন। কেবল গ্র্যানাডার বনু নাসর আরও কিছুকাল স্পেনে টিকিয়া রহিলেন।

বনু নাসর: এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুহম্মদ ইবন ইউসুফ ইবন নাসর। তিনি ইবনুল আহমার নামে সমধিক পরিচিত। স্পেনে মুওয়াহহিদ ক্ষমতা লুপ্ত হওয়ার পর মুহম্মদ খ্রীস্টানদের সহযোগিতায় গ্র্যানাডার আশেপাশে একটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেভিলের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে প্রয়াসী হন। এই বংশের লোকেরা আড়াই শতাব্দী যাবৎ ক্রমবর্ধমান খ্রীস্টান শক্তির সহিত মুকাবিলা করিয়া স্পেনে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করেন। ইবনুল আহমার গালিব (বিজয়ী) উপাধি ধারণ করিয়া গ্র্যানাডায় রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীরা ক্যাস্টিলের রাজার অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে করদান করিতেন।

আল-হামরা গ্র্যানাডা নগরী উত্তম পরিবেশে ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় অবস্থিত ছিল। ইহার চতুষ্পার্শ্বে বহু স্রোতস্বিনী-বিধৌত মনোরম সবুজ সমতল ভূমি অবস্থিত ছিল। নগরীর দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্বে গালিব বিশ্ব-বিশ্রুত 'আল-হামরা' প্রাসাদ নির্মাণ করেন। লাল চুনাবালির সাহায্যে নির্মিত এই প্রাসাদ গালিবের উত্তরাধিকারিগণ কর্তৃক সম্পন্ন হইয়া ইহার অপরূপ সাজ-সজ্জা এবং 'এরাবেস্ক' ফুল পাতার খোদাইয়ের জন্য আজিও দর্শকের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কিছুকালের জন্য বনু নাসর স্পেনের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হন। ইঁহাদের দরবারে বহু পণ্ডিত ব্যক্তির সমাবেশ ঘটে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে গ্রানাডা স্পেনের

সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হয়। খ্রীস্টানদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বহু মুসলমান গ্র্যানাডায় আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু স্পেনে মুসলমানদের পতনের আর বেশীদিন বাকী ছিল না।

১৪৬৯ খ্রীস্টাব্দে ক্যাস্টিল ও এ্যারাগন রাজ্য দুইটির একত্র সমাবেশ ঘটে। ঐ বৎসর এ্যারাগনের রাজা ফার্ডিনাণ্ডের সহিত ক্যাস্টিলের রানী ইসাবেলার বিবাহ হয়। এইভাবে এই রাজ্য দুইটির স্থায়ী মিলন ঘটায় স্পেনে মুসলিম শক্তির শেষ পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। গ্র্যানাডায় মোট একুশ জন সুলতান রাজত্ব করেন। ঊনবিংশ সুলতান আবুল হাসানের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য গ্র্যানাডার পতন ত্বরান্বিত হয়। তিনি ক্যাস্টিলের রাজ সরকারের দেয় রাজস্ব আদায় করিতে অস্বীকার করিয়া খ্রীস্টান রাজ্য আক্রমণ করেন। ফার্ডিনাণ্ড প্রতিশোধ স্বরূপ ১৪৮২ খ্রীস্টাব্দে আল-হাম্মা দুর্গ অধিকার করেন। আবুল হাসানের পুত্র আবদুল্লাহ এই সংকটময় মুহূর্তে মাতার প্ররোচণায় পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলেন এবং ১৪৮২ খ্রীস্টাব্দে আল-হামরা দখল করেন এবং গ্র্যানাডার সুলতান হইলেন। ইনি স্পেনে 'বোয়াবদিল' নামে সমধিক পরিচিত। তিনিও একটি ক্যাস্টিলীয় শহর আক্রমণ করিয়া খ্রীস্টানদের নিকট পরাজিত ও বন্দী হইলেন। আবুল হাসান কিছুদিন গ্র্যানাডার সিংহাসনে বসেন এবং পরে তাঁহার ভ্রাতা মুহম্মদ জাগালকে সিংহাসন ছাড়িয়া দেন। এক্ষণে ফার্ডিনাণ্ড ও ইসাবেলা তাঁহাদের বন্দী বোয়াবদিলকে অর্থ, সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য করিয়া আপন পিতৃব্যের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিলেন। বোয়ারদিল গ্র্যানাডা অধিকার করিলেন। খ্রীস্টানগণ মুহম্মদ জাগালকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য করে। গ্র্যানাডা নগর ব্যতীত সমুদয় রাজ্য তাহাদের অধিকারে আসিল। এখন ফার্ডিনাণ্ড ও ইসাবেলা বোয়াবদিলকে গ্র্যানাডা ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। বোয়াবদিল রাজী না হওয়ায় ১৪৯১ খ্রীস্টাব্দে ফার্ডিনাণ্ড দশ সহস্র অশ্বারোহী সহ গ্র্যানাডা আক্রমণ করিলেন। অবশেষে মুসলমানগণ নিম্নলিখিত শর্তে ১৪৯২ খ্রীস্টাব্দের ২রা জানুয়ারী আত্মসমর্পণ করে:

১। আবু আবদুল্লাহ (বোয়াবেদিল), তাঁহার কর্মচারী ও প্রজাগণ ফার্ডিনাণ্ড ও ইসাবেলার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিবেন।

২। আবু আবদুল্লাহ আল-বুশারায় একটি জায়গীর পাইবেন।

৩। মুসলমানগণ জান-মালের নিরাপত্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা উপভোগ করিবে।

৪। তাহারা আপন আপন আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও ভাষা রক্ষা করিয়া চলিবে।

৫। খ্রীস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে কোন বিবাদ হইলে মিশ্র আদালতে তাহার মীমাংসা হইবে।

৬। মুসলমানগণ মুসলমান রাজা-বাদশাহদিগকে যে রাজস্ব দিত, তাহাই তাহাদের উপর ধার্য হইবে।

৭। মুসলমান বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে।

৮। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহারা অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া স্পেন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে এই সম্পত্তির এক-দশমাংশ রাজসরকারে জমা দিতে হইবে।

৯। নও-মুসলিমগণকে তাহাদের পূর্বধর্মে ধর্মান্তরিত করা হইবে না, কিন্তু মুসলমানগণ খ্রীস্টানধর্ম গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহাদিগকে চিন্তা করার সময় দেওয়া হইবে এবং পরে একজন খ্রীস্টান ও একজন মুসলমান বিচারকের সম্মুখে তাহাকে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে হইবে।

সাত বৎসর পর এই সকল শর্ত অগ্রাহ্য করিয়া ফার্ডিনাণ্ড মরিস্কো (মুসলিম) নির্যাতন নীতি আরম্ভ করেন। ফ্রান্সিস্‌কো নামক একজন পাদ্রীকে মুসলমানদিগকে জোর পূর্বক ধর্মান্তরিত করার ভার দেওয়া হয়। এই পাদ্রী যাবতীয় আরবী পুস্তক সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া দেন। গ্র্যানাডায় এই সকল পুস্তকের এক বিরাট অগ্নিযজ্ঞ সাধিত হয়। এই সকল নির্যাতন ও ধর্মান্তরিত করণের ফলে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। মুসলমানদিগকে প্রথমে রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। তারপর তাহাদের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ দাবী করা হয়, অর্থ দিতে না পারিলে তাহাদিগকে পবিত্র পানি ছিটাইয়া খ্রীস্টান করা হয়। ইহার ফলে মুসলমানগণ বাহ্যতঃ নিজদিগকে খ্রীস্টান বলিয়া প্রকাশ করিত, কিন্তু গোপনে তাহারা ইসলামের আচার-পদ্ধতি পালন করিত। কেহ কেহ একবার খ্রীস্টান পদ্ধতিতে বিবাহ সারিয়া বাড়ীতে আসিয়া পুনরায় গোপনে মুসলিম পদ্ধতিতে বিবাহের পুনরাবৃত্তি করিত। তাহারা প্রকাশ্যে খ্রীস্টান নাম গ্রহণ করিত, আবার গোপনে একটি আরবী নামও রাখিত। ১৫০১ খ্রীস্টাব্দে ক্যাস্টিল ও লিওঁতে এই মর্মে একটি রাজকীয় ফরমান জারী করা হয় যে, মুসলমানগণ হয় ধর্মত্যাগ করিবে, না হয় স্পেন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। এই ফরমান কড়াকরি

মরিস্কো নির্বাতন ও নির্বাসন

ভাবে কার্যকরী করা হয়নি। ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে এ্যারাগনের মুসলমান-গণকেও অনুরূপ আদেশ দেওয়া হয়। ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় ফিলিপ্ আরও একটি কড়া অনুশাসন জারী করিয়া মুসলমানগণকে অবিলম্বে তাহাদের ভাষা, ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান ত্যাগ করিতে নির্দেশ দেন। তিনি স্পেনের যাবতীয় হামামখানাগুলিকে অধার্মিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলার আদেশ দেন। ইহার ফলে গ্র্যানাডায় পুনরায় বিদ্রোহ দেখা দেয়, কিন্তু এই বিদ্রোহ কঠোরতার সহিত প্রশমিত হয়। তৃতীয় ফিলিপ ১৬০৯ খ্রীস্টাব্দে সর্বশেষ বহিষ্কার আদেশ জারী করেন। স্পেনের সকল মুসলমানকে জোর পূর্বক বাহির করিয়া দেওয়া হয়। এই সকল মুসলমান প্রথমে আফ্রিকায় ও পরে অন্যান্য মুসলমান দেশে চলিয়া যায়। গ্র্যানাডার পতন হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রায় ত্রিশ লক্ষ মুসলমান স্পেন হইতে নির্বাসিত হয় কিংবা মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলিম স্পেনের দান :

জ্ঞান-বিজ্ঞানে আন্দালুসিয়ার অবদান মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। অষ্টম ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে আরব-গণ কেবলমাত্র ইউরোপেই আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত রাখে নাই, বরং তাহারা ঐ সময় সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞানালোকের দিশারী ছিল। মুসলমানদের নিকট হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপে গৃহীত হয় এবং ইহার ফলেই ইউরোপে রেনেশাঁ বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনর্জন্ম হয়। স্পেনে সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাম ইবন আবদ রাব্বিহ। তিনি তৃতীয় আবদুর রহমানের সভা-কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত 'ইকদুল ফরীদ' আগানীর পরেই সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী। স্পেনের মুসলমান চিন্তাবিদদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মৌলিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন আলী ইবন হাজম।

সাহিত্য

তাঁহাকে বিভিন্ন বিষয়ে চারিশত গ্রন্থের রচয়িতা বলা হয়। তন্মধ্যে তাঁহার লিখিত, 'আল-ফাস্‌ল ফিল-মিলাল ওয়াল-আহওয়া ওয়ান-নিহাল' তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে প্রথম গ্রন্থ। তাঁহার বিখ্যাত কবিতা গ্রন্থ 'তওকুল-হামামাহ্' (ঘুঘুর হার) প্রেমের কবিতার সংগ্রহ।

উমাইয়াগণের পতনের পর আঞ্চলিক রাজবংশ সমূহের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য আরও উন্নতি লাভ করে। সেভিল, টলেডো ও গ্র্যানাডা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসাবে কর্ডোভাকে নিষ্প্রভ করিয়া দেয়। গ্র্যানাডা

হইতে মোজারাগণ (আরব ভাষা ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত খ্রীস্টানগণ) মুসলিম স্পেনের ভাষা ও সাহিত্যকে সুদূর উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে লইয়া যায়। আরবী গল্প ও উপাখ্যান ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপের সাহিত্যকেও প্রভাবিত করে। 'কালিলা ওয়া দিমনা'র গল্প 'গুনী আল-ফাজজো' বলিয়া কথিত ক্যাস্টিল ও লিওঁ রাজার জন্য ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। স্পেনের উপন্যাস সাহিত্যে আরবী 'মকামা' গল্প পদ্ধতির ছাপ সুস্পষ্ট। মুসলিম স্পেনের কবিদের মধ্যে ইবন জায়দুনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্পেনের আরবগণ স্থানীয় প্রভাবে নূতন নূতন কবিতা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তন্মধ্যে 'মুওয়াশশা' ও 'জজলের' নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

খলীফা দ্বিতীয় হাকামের সময়ে স্পেনে লেখাপড়ার উন্নতি সম্পর্কে বলা হইয়াছে। অন্যান্য মুসলমান দেশ অপেক্ষা স্পেনে সাধারণ শিক্ষার প্রসার খুব বেশী হইয়াছিল। স্পেনীয় মুসলমানেরা অনেকেই লেখা-পড়া জানিত। মেয়েদের মধ্যেও শিক্ষার মান খুব উঁচু ছিল। বড় বড় শহরে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান ছিল। এইগুলি আধুনিক কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তুলনীয়। কর্ডোভা, সেভিল, মালাগা ও গ্র্যানাডায় এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। কর্ডোভা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ফিক্‌হ, ধর্মতত্ত্ব ছাড়াও জ্যোতির্বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভাগ ছিল। হাজার হাজার মুসলিম, খ্রীস্টান ও ইহুদী এখানে অধ্যয়ন করিত এবং এখানকার পাশ-করা লোক রাজ্যে লাভজনক চাকুরীতে নিযুক্ত হইত। সপ্তম নাসরীয় সুলতান ইউসুফ আবু হাজ্জাজ গ্র্যানাডা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তোরণ-দ্বারে পাথরের সিংহ-মূর্তি শোভা পাইত। এখানে ধর্মতত্ত্ব, ফিক্‌হ, চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়ন, দর্শন ও জ্যোতির্বিজ্ঞান পড়ান হইত। স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে মাঝে মাঝে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইত। ইহাতে শিক্ষকগণ বক্তৃতা করিতেন কিংবা স্বরচিত কবিতাদি আবৃত্তি করিতেন।

শিক্ষা

স্পেনের প্রথম যুগের ঐতিহাসিকদের মধ্যে ইবনুল-কূতিয়া ও ইবন হাইয়ানের নাম উল্লেখযোগ্য। গ্র্যানাডার সুলতান ইউসুফ আবু হাজ্জাজের উজীর লিসানুদ্দীন ইবনুল-খতীব সর্বমোট ষাটটি বই লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে গ্র্যানাডার ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। বিখ্যাত মুসলিম মনীষী ইবন খলদুন স্পেন এবং

ইতিহাস

উত্তর আফ্রিকার বহু রাজবংশের অধীনে চাকুরী করেন। আরবদের মধ্যে পূর্বে বহু বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন, অনেকে ইবন খলদুন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও ছিলেন; কিন্তু ইবন খলদুন ছিলেন প্রথম আরব সমাজ-বিজ্ঞানী তথা পৃথিবীর প্রথম সমাজ বিজ্ঞানী। তিনি মুসলমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইতিহাস-দার্শনিক। মানবেতিহাসের জ্ঞান-সাগর মন্থন করিয়া তিনি আবহাওয়া, ভৌগোলিক অবস্থান, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি, ধারা ও নিয়মকানুন আবিষ্কারে প্রয়াসী হন। তাঁহার 'মুকাদ্দিমা' বা ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি ইতিহাস-দর্শনের বিস্তারিত আলোচনা করিয়া ইতিহাস পাঠের নূতন দিগন্ত উন্মোচন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভাবধারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তিনি ম্যাকিয়াভেলি, বোদিন, ভিকো এবং কম্‌তের পূর্বসূরী। তিনি ছিলেন "মানবীয় কার্যকলাপের একজন গভীর পাঠক এবং মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশ্যে অতীতকে বিশ্লেষণ করার জন্য উদ্‌গ্রীব।"

স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভৌগোলিক ছিলেন আল-ইদ্রিসী। তিনি নরম্যান রাজা দ্বিতীয় রোজারের অধীনে সিসিলিতে জ্ঞানচর্চায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'নুজহাতুল-মুশতাক'। তিনি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের জন্য একটি ভূগোলক ও একটি মানচিত্র তৈরী করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ ও বিজ্ঞানে স্পেনের মুসলমানগণের উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে। স্পেনের জ্যোতিষীদের মধ্যে আল-মাজরিতী আজ-জারকালী এবং নূরুদ্দীন আল-বিতরুজীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত জন গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। ইউরোপের ভাষায় জ্যোতিষ সম্পর্কিত বহু আরবী শব্দ প্রচলিত রহিয়াছে। অঙ্কে আরবগণ শূন্যের ব্যবহার ও সংখ্যার ব্যবহার প্রবর্তন করেন।

ভূগোল, জ্যোতিষ ও অঙ্ক

উদ্ভিদ বিজ্ঞানে আরবগণ বিশেষ উন্নতি লাভ করে। তাহারা গাছের বিভিন্ন প্রকারভেদ নির্ণয় করিয়া প্রত্যেক জাতীয় গাছপালার নির্দিষ্ট নাম দেয়। কর্ডোভার আল-গাফিকী স্পেন ও আফ্রিকার বিভিন্ন গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করিয়া ইহার প্রতিটিকে একটি আরবী, ল্যাটিন ও বার্বার নাম দেন এবং ইহাদের নিখুঁত বর্ণনা রাখিয়া যান। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবু জাকারিয়া ইবনুল-আওয়াম নামক একজন বিজ্ঞানী সেভিলে বাস করিতেন। তাঁহার কৃষি বিষয়ক

উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান

গ্রন্থ 'আল-ফিলাহা' কৃষি বিজ্ঞানে মধ্যযুগের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। এই পুস্তকে ৫৮৫ রকমের গাছ সম্পর্কে আলোচনা রহিয়াছে এবং পঞ্চাশের অধিক ফলের গাছের চাষের পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তকে গাছ-গাছড়ার রোগ ও উহার প্রতিবিধান, মাটির গুণাগুণ ও সার প্রয়োগ এবং কলম তৈরী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। মুসলিম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনুল রায়তার (মৃত্যু ১২৪৮ খ্রীঃ)। তিনি স্পেনের মালাগায় জন্মগ্রহণ করেন এবং আইয়ুবী সুলতান কামিলের অধীনে প্রধান উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন লতাপাতার ঔষধ হিসাবে ব্যবহার সম্পর্কে পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁহার ঔষধ সম্পর্কিত দুইটি বই আল-মুগনী ও আল-জামী বিখ্যাত। তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তকটি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। স্পেনের দার্শনিকগণ অনেকেই চিকিৎসা বিজ্ঞানেও পারদর্শী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ইবন রুশদ, ইবন মায়মুন ও ইবন তুফায়লের নাম করা যাইতে পারে। ঐতিহাসিক ইবনুল-খাতিবও একজন চিকিৎসক ছিলেন এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যাধির সংক্রমণ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করিয়াছেন। আরবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শল্য চিকিৎসক আবুল কাশিম আজ-জাহরাবী (মৃঃ ১০১৩ খ্রীঃ)। তিনি দ্বিতীয় হাকামের দরবারের চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার আত-তসরীফ নামক গ্রন্থে তিনি তৎকালীন শল্য চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞান সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আহত স্থানে তাপ প্রয়োগে চিকিৎসা (Canterization), মূত্রাশয়ের মধ্যে পাথর চূর্ণ করা, জীবিত জন্তুর অঙ্গচ্ছেদ ও শব ব্যবচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয় তিনি বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। শল্য বিদ্যা সম্পর্কিত তাঁহার পুস্তকের এই অংশ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। শল্য চিকিৎসায় আজ-জাহরাবী যেমন প্রসিদ্ধ, সাধারণ চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইবন জুহর তেমনি খ্যাতির অধিকারী। তিনি সেভিলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুওয়াহহিদ শাসক আবদুল মুনইমের চিকিৎসক ও উজীর ছিলেন। ১১৬২ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার রচিত ছয়টি পুস্তকের মধ্যে তিনটি এখনও বিদ্যমান। তন্মধ্যে 'তায়সীর' সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তাঁহার পরিবার ছয় পুরুষ ধরিয়া চিকিৎসক ছিলেন। মুসলিম জগতের পূর্বাঞ্চল হইতেও চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞান স্পেনে আমদানী হয় এবং বহু চিকিৎসা বিষয়ক আরবী গ্রন্থ ল্যাটিনে অনূদিত হয়। এই-ভাবে ইউরোপে সমগ্র আরবীয় চিকিৎসা জ্ঞান প্রসারিত হয়। এই সকল

তর্জমার মাধ্যমে অনেক আরবী শব্দ ইউরোপীয় ভাষায় স্থান লাভ করে; যেমন—জুলেপ (আরবী জুলাব, ফারসী গুলাব), সিরাপ (আরবী শারাব), সোডা (আরবী সুদা বা মাথা-ব্যথা), এ্যালকহল (আরবী আল-কুহল্) ও আল-কালী ইত্যাদি।

দর্শন

স্পেনের মুসলমানগণ দর্শনে প্রশংসনীয় অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁহাদের এবং পূর্বদেশীয় মুসলমানদের প্রধান কাজ ছিল ধর্ম ও যুক্তি এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন। বাগদাদ ও আন্দালুসিয়ার চিন্তাবিদদের বিশিষ্ট কীর্তি গ্রীক দর্শন ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া এই সমন্বিত ভাবধারা ইউরোপের নিকট উপস্থাপিত করা। এই ভাবধারার প্রবর্তন ইউরোপে 'অন্ধকার যুগের' অবসান ও মধ্যযুগীয় জ্ঞান-চর্চার প্রারম্ভ সূচিত করে। স্পেনের প্রাথমিক যুগের দার্শনিকদের মধ্যে বেন গাবরিওলের নাম করা যাইতে পারে। তিনি ইহুদী ছিলেন। তিনি গ্রীক ও ইসলামী দর্শন আরবী ভাষায় ইউরোপের নিকট উপস্থিত করেন। তাঁহার এই বই পরে ল্যাটিনে অনূদিত হয়। মুসলিম দার্শনিক ইবন বাজ্জা তাঁহার পুস্তকে মানবীয় আত্মার সহিত স্বর্গীয় মিলনের বিষয় বর্ণনা করেন। চিকিৎসক-দার্শনিক ইবন তুফায়ল (মৃঃ ১১৮৫ খ্রীঃ) তাঁহার 'হাই ইবন ইয়াকজান' গ্রন্থে পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভের পর্যায় বর্ণনা করেন। স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক ইবন রুশদ (মৃঃ ১১৯৮ খ্রীঃ)। ইউরোপীয়গণ তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক বলিয়া মনে করেন। তাঁহার বিখ্যাত চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থের নাম 'আল-কুল্লিয়াৎ'। ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, দুইবার কাহারও বসন্ত রোগ হয় না। দর্শনে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'তাহাফুতুত-তাহাফুত'। তাঁহার এই গ্রন্থের জন্যই তিনি ইউরোপে সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি এ্যারিস্টটলের ভাষ্য রচনা করেন। তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন এবং ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। তাঁহার গ্রন্থ আপত্তিকর অংশ বিশেষ বর্জিত হইয়া প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ইউরোপের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঠিত হইতে থাকে। ইহুদী দার্শনিক ইবন মায়মুন (মৃঃ ১২০৪) ও ইবন রুশদের মত চিকিৎসকও ছিলেন। তাঁহার 'ফুসুল' উন্নতমানের চিকিৎসা পুস্তক। 'দালালাতুল-হায়িরীন' তাঁহার দার্শনিক গ্রন্থ। ইহাতে তিনি গ্রীক দর্শনের সহিত মুসলিম-এ্যারিস্টটলবাদের তথা ধর্মের সহিত যুক্তির সমন্বয় বিধানের চেষ্টা করেন।

আরবী জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপে প্রসার লাভ করার পূর্বে স্পেনে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং এই অনুবাদ ও পরবর্তী পর্যায়ে ইউরোপে তাহার প্রচারের ক্ষেত্রে টলেডো বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগের মধ্যে স্পেনের মধ্যস্থতায় আরবী জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপে প্রবেশ লাভ করে। টলেডো হইতে পিরেনীজের মধ্য দিয়া ফ্রান্স, জার্মানী, মধ্য-ইউরোপ এবং ইংলণ্ডে এই জ্ঞানের বিস্তার ঘটে।

বিস্তারিত পাঠ্য তালিকা

হিট্টি, হিস্ট্রি অব দি এরাব্‌স্
এস. এম. ইমামুদ্দীন, এ পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব মুসলিম স্পেন
আমীর আলী, হিস্ট্রি অব সারাসেন্‌স্

৪২
ফাতিমীয় ও আয়ুইবী শাসকগণ

ফাতিমীয় বংশ :

ইসমাঈলী শীয়াগণ কর্তৃক গোপন প্রচারণার ফলে উত্তর আফ্রিকায় ফাতিমীয বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসমাঈলীগণ ইমাম জাফর আস-সাদিকের জ্যেষ্ঠপুত্র ইসমাঈলকে সপ্তম ও অদৃশ্য ইমাম বলিয়া মনে করে। পক্ষান্তরে ইসনা আশারীয়া শীয়া সম্প্রদায় ইমাম জাফরের দ্বিতীয় পুত্র মূসাকে ও তাঁহার বংশধরগণকে ইমাম মানিয়া থাকে। এই উভয় সম্প্রদায়ের মতে তাহাদের সপ্তম বা দ্বাদশ ইমাম লোকচক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্য রহিয়াছেন এবং তিনি মাহদী হিসাবে আবির্ভূত হইবেন। এইজন্য তিনি ইমাম মুন্তাজার (প্রতীক্ষিত)।

ইমাম মুন্তাজারের পক্ষে দায়ী বা মিশনারীগণ প্রচারণা চালাইয়া বিশ্বাসীদের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাবের আশা উজ্জীবিত রাখে। আব্বাসীয় খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে সুযোগ্য দায়ীগণ এই প্রচারণা চালাইতে থাকে। এইরূপ একজন দায়ী বা প্রচারক ছিলেন আবু আবদুল্লাহ আশ-শীয়ী। তিনি আফ্রিকার 'কিতামা' উপজাতির নিকট গুপ্ত ইমামের পক্ষে প্রচারণা চালাইয়া ইমামের আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে থাকেন। এই সময় উত্তর আফ্রিকায় সুন্নী আগলবী বংশ রাজত্ব করিতেছিল। আশ-শীয়ী যে ইমামের পক্ষে প্রচার কার্য চালাইতেছিলেন, তাঁহার নাম ছিল সাঈদ। শুভ মুহূর্তে আশ-শীয়ীর নিকট হইতে সংকেত পাইয়া ইমাম সাঈদ হিমসের নিকটে অবস্থিত ইসমাঈলী সদর দফতর সালামিয়া ত্যাগ করিয়া সওদাগরের ছদ্মবেশে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় চলিয়া যান। শেষ আগলবী সুলতান জিয়াদাতুল্লাহ্ একবার তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া কারাগারে বন্দী করেন। আশ-শীয়ী তাঁহাকে উদ্ধার করেন এবং ৯০৯ খ্রীস্টাব্দে আগলবী বংশের পতন ঘটাইয়া জিয়াদাতুল্লাহ্‌কে বিতাড়িত করেন। ইহার পর সাঈদকে ইমাম বলিয়া ঘোষণা করা হয়। তিনি উবায়দুল্লাহ্ আল-মাহদী নাম ধারণ করেন। হযরত মুহম্মদের (সঃ) দুহিতা ফাতিমার বংশধর হিসাবে এই বংশের শাসকগণকে ফাতিমীয় বলা হয়।

ইঁহারা ফাতিমার বংশোদ্ভূত কিনা, তাহা লইয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। যে সকল ঐতিহাসিক উবায়দুল্লাহকে ফাতিমার বংশধর বলিয়া স্বীকার করেন, তন্মধ্যে ইবনুল আসির, ইবন খলদুন ও আল-মাকরিজী প্রধান। আবার যাঁহারা এই মতবাদ গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের মধ্যে ইবন খাল্লিকান, ইবন ইজারী, আস-সুয়ূতী ও ইবন তাগরিবার্দি প্রধান। তবে ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, ষষ্ঠ ফাতিমীয় খলীফা আল-হাকিমের রাজত্বকাল পর্যন্ত হয় কেহ ইঁহাদের বংশ-তালিকা লইয়া মাথা ঘামায় নাই কিংবা তাঁহাদের ফাতিমীয় বংশের দাবী অস্বীকার করে নাই। কিন্তু আল-হাকিমের কার্যকলাপ এবং বাগদাদ ও উহার আশেপাশে তাঁহার চরদের গোপন প্রচারণা বাগদাদের খলীফা আল-কাদিরকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে একটি ঘোষণা প্রচার করিতে উৎসাহিত করে। খলীফা আল-কাদির ১০১১ খ্রীস্টাব্দে উবায়দী খলীফাদের ফাতিমীয় দাবী ভুল ও কৃত্রিম বলিয়া প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে উক্ত ঘোষণাপত্রে নেতৃস্থানীয় সুন্নী ও শীয়া সভাষদ ও আলিমদের দস্তখৎ গ্রহণ করিলেন। যাঁহারা দস্তখৎ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শরীফ আল-মুরতাদা ও আর-রাদীও ছিলেন। ইঁহারা হযরতের (সঃ) বংশধর ছিলেন।[১]

উবায়দুল্লাহ্ (৯০৯—৯৩৪) একজন যোগ্য শাসক ছিলেন। তিনি ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জানিতে পারিলেন যে, আশ-শীয়ী ও তাঁহাদের ভ্রাতা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন। তিনি আশ-শীয়ীকে হত্যা করেন, যেমন করিয়া প্রথম আব্বাসীয় খলীফা তাঁহার প্রধান উপদেষ্টা আবু সালামাকে হত্যা করিয়াছিলেন।[২] তিনি মরক্কো হইতে মিসর সীমান্ত পর্যন্ত ভূভাগ নিজের অধিকারে আনয়ন করেন। ৯১৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেন। তিনি সিসিলিতে একজন গভর্নর প্রেরণ করেন। স্পেনের বিদ্রোহী ইবন হাফসুনের সহিত তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি আগলবীদের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে একটি নৌবহর লাভ করিয়াছিলেন। এই নৌবহরের সাহায্যে তিনি ভূমধ্য-সাগরের বিভিন্ন দ্বীপাঞ্চলে তাঁহার শক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি তিউনিসিয়ার তীরবর্তী অঞ্চলে আল-মাহদিয়া নামক একটি নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি ৯২০ খ্রীস্টাব্দে এই নূতন রাজধানীতে বসবাস আরম্ভ করেন।

১. কবীর, বুওয়াইহিদ ডাইনাস্টি, পৃঃ ১১৭।

২. পূর্বে দেখুন।

উবায়দুল্লাহ্‌র পুত্র মুহম্মদ আল-কায়িম (৯৩৪—৯৪৬) নৌযুদ্ধে আরও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁহার নৌবহর দক্ষিণ ফ্রান্স ও ইটালীর উপকূল আক্রমণ করিয়া জেনোয়া ও লম্বার্ডির কিয়দংশ দখল করে। এই সকল বিজয় ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল। তাঁহার সময় একজন খারিজী শিক্ষকের নেতৃত্বে এক বিরাট বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহ আল-কায়িমের পুত্র আল-মনসূরের (৯৪৬—৫২) সময় পর্যন্ত চলিতে থাকে। মনসূর এই বিদ্রোহীকে কিতামার পার্বত্য অঞ্চলে অনুসরণ করিয়া হত্যা করেন।

মনসূরের পুত্র ও উত্তরাধিকারী মইজ (৯৫২—৭৫) এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়ী শাসক। তিনি এক শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করিয়া স্পেনে খলীফা আবদুর রহমান আল-নাসিরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। জওহর নামক তাঁহার এক সুযোগ্য সেনাপতি ছিল। জওহর উমাইয়া খলীফা আন-নাসিরের নিকট হইতে মরিটানীয়া ছিনাইয়া লন। এইভাবে উত্তর আফ্রিকায় মুইজের অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে সিসিলিতে ফাতিমীয় অধিকার স্থাপিত হয়। ইহার পর মিসর বিজয় ফাতিমীয়গণকে তাঁহাদের সমসাময়িক রাজা-বাদশাহদের নিকট সম্মানের আসন দান করে। ইখশীদী শাসক কাফুরের মৃত্যুর পর মিসরে গোলযোগ আরম্ভ হয়। মুইজ তাঁহার প্রধান সেনাপতি জওহরকে মিসর বিজয়ের জন্য একটি সুসজ্জিত বাহিনীসহ প্রেরণ করেন। ৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে জওহর প্রায় বিনা বাধায় মিসরের রাজধানী ফুসতাতে প্রবেশ করেন। অতঃপর জওহর কাহিরা নামক একটি নূতন শহরের পত্তন করেন। আল-কাহিরায় (কায়রো) ৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে ফাতিমীয় রাজধানী স্থাপিত হয়। নূতন রাজধানী স্থাপন করার পর জওহর ৯৭২ খ্রীস্টাব্দে ইহার প্রকাণ্ড জামি মসজিদ নির্মাণ করেন। খলীফা আল-আজীজের সময় এই মসজিদে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। জওহর হিজাজ দখল করিয়া মক্কা ও মদীনা শহরে আল-মুইজের নামে খুৎবা প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি কারমাতীগণকে পরাজিত করিয়া সিরিয়াও দখল করেন।

মুইজ ৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি জ্ঞানী, বিদ্যোৎসাহী ও সাহসী ছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বিজ্ঞান ও দর্শনে পারদর্শী ছিলেন। তিনি জ্ঞানী ও গুণীর সমাদর করিতেন। তাঁহার শাসনে জনসাধারণ সুখী ও সন্তুষ্ট ছিল। তিনি সুযোগ্য প্রশাসক শ্রেণীর সাহায্যে একটি সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন। তাঁহার সময় সেনা-

বাহিনী ও নৌবাহিনী সংগঠিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়। তিনি উপজাতীয় লোকদিগকে বশে আনিয়া তাহাদিগকে তাঁহার গোঁড়া সমর্থকে পরিণত করেন।

আবু মনসূর নিজার আল-আজীজের (৯৭৫—৯৬) সময় ফাতিমীয় রাজ্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাঁহার সময়ে সম্পূর্ণ সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার কিয়দংশ বিজিত হয়। "আটলান্টিকের তীর হইতে লোহিত সাগর পর্যন্ত এবং ইয়ামন, মক্কা, দামিস্ক, এমন কি একবার মসুলেও তাঁহার নামে খুৎবা পঠিত হয়। তাঁহার সময় মিসরের খলীফা আব্বাসীয় খলীফার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠেন। এই সময় আব্বাসীয় খলীফা শীয়ী বুওয়াইহী আমীরদের প্রভাবাধীনে সমস্ত ক্ষমতা হারাইয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। বুওয়াইহীদের ক্ষমতা আল-আজীজের সময় চরমে পেঁৗছে। বুওযাইহী আমীর আদুদুদ্দৌলাহ ও আল-আজীজের মধ্যে দূত বিনিময় হয়। আল-আজীজ বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের জন্য আদুদুদ্দৌলাহকে আহ্বান করিয়া পত্র লেখেন। স্পেনের প্রতিও আল-আজীজের দৃষ্টি ছিল, কিন্তু কর্ডোভার খলীফার নিকট লিখিত এক কড়া চিঠি লিখিয়া তিনি অপমান সূচক জবাব প্রাপ্ত হন।

আল-আজীজ

আল-আজীজ ফাতিমীয় খলীফাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও মহানুভব ছিলেন। তিনি জাঁকজমক পছন্দ করিতেন। তিনি কায়রো এবং ইহার আশেপাশে বহু নূতন মসজিদ, প্রাসাদ, পুল ও খাল নির্মাণ করেন। তাঁহার সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি হয়। তাঁহার সময় আল-আজহার মসজিদ একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষায়তনে পরিণত হয়। এই সময় খ্রীস্টানগণ নির্বিঘ্নে ও সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করিত। তিনি একজন রুশ মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী আল-হাকিম এই মহিলার পুত্র ছিলেন। মহিলার দুই ভ্রাতা আলেকজান্দ্রিয়া ও জেরুজালেমের ধর্মযাজক ছিলেন। আল-আজীজের উজীর ঈসা ইবন নাস্তুর একজন খ্রীস্টান ছিলেন।

আল-আজীজ আব্বাসীয় খলীফাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সেনাবাহিনীতে তুর্কী ও নিগ্রোগণকে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। এই সৈনিকদের অবিরত কলহ ও অবাধ্যতার ফলে ফাতিমীয়গণের পতন ত্বরান্বিত হয়। তুর্কী সৈনিক ও ক্রীতদাসগণ রাজ্যে সর্বেসর্বা হইয়া স্বাধীন রাজবংশ স্থাপন করে।

আল-আজীজের পুত্র ও উত্তরাধিকারী আবু আলী মনসুর আল-হাকিম (৯৯৬—১০২১) মাত্র এগার বৎসর বয়সে খলীফা হইয়াছিলেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ আল-হাকিমকে অব্যবস্থিতচিত্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সামান্য কারণে কর্মচারিগণকে কঠোর শাস্তি দিতেন। এই সকল ঐতিহাসিকের মতে তাঁহার এই অস্থিরচিত্ততা পরবর্তীকালে উন্মত্ততা ও জিঘাংসায় পরিণত হয় এবং ইহার ফলে তিনি তাঁহার কয়েকজন উজীরকে হত্যা করেন। পূর্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, ফাতিমীয় শাসকগণ খ্রীস্টান ও ইহুদীদের প্রতি উদার ও সহনশীল ছিলেন। কিন্তু আল-হাকিম সেই নীতি পরিবর্তন করিয়া খ্রীস্টানদের কয়েকটি গির্জা ধ্বংসের আদেশ দিয়াছিলেন; তন্মধ্যে জেরুজালেমের গির্জা প্রধান (১০০৯)। এই ঘটনা ক্রুসেডের অন্যতম প্রধান কারণ। তিনি খ্রীস্টান ও ইহুদীদের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতির প্রবর্তন করেন। তিনি তাহাদিগকে কালো পোশাক পরিয়া বাহির হইতে এবং খচচরে চড়িয়া বেড়াইতে আদেশ দেন। পরিশেষে তিনি স্রষ্টার অবতার বলিয়া দাবী করেন।

সহানুভূতিশীল লেখকদের মতে আল-হাকিমের উপরোক্ত আচরণ বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচ্য। ফাতিমী রাজ্য তখন নানা আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিল। বিভিন্ন দলের লোকদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চলিতেছিল। এই জন্য তিনি যাবতীয় ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করেন এবং বিরুদ্ধাচারীদিগকে কঠোর হস্তে দমন করেন। বহিঃশত্রু বাইজান্টাইনদের ক্ষমতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে তিনি খ্রীস্টানদের প্রতি পূর্ববর্তী সহনশীল নীতি পরিহার করেন। ইসমাঈলী প্রচারণার ক্ষেত্র সুপ্রশস্ত করার জন্য তিনি অবতারবাদের অবতারণা করেন। সমসাময়িক আব্বাসী খলীফা আল-কাদির ১০১১ খ্রীস্টাব্দে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া বলেন যে, আল-হাকিম ও তাঁহার পূর্বপুরুষগণ ফাতিমী বংশোদ্ভূত নহেন, ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ১০২১ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী রহস্যজনকভাবে আল-হাকিমের তিরোধান ঘটে। তিনি নির্জনতা ভালবাসিতেন এবং প্রায়ই কায়রোর নিকটবর্তী মুকাত্তাম পাহাড়ের নির্জন স্থানে চলিয়া যাইতেন। উপরোক্ত তারিখে দিবাগত রাত্রে তিনি দুইজন ভৃত্যসহ মুকাত্তাম পাহাড়ে আরোহণ করেন। পাহাড়ের পাদদেশ হইতেই ভৃত্য দুইজনকে বিদায় করিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর আর তিনি ফিরিয়া আসেন নাই। পরে অনুসন্ধান করিয়া দেখা

গেল যে, পাহাড়ের উপরে তাঁহার টাট্টু ঘোড়াটি দ্বিখণ্ডিত এবং তাঁহার পোশাক ছুরিকাহত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার দেহ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। দ্রুজ নামে অভিহিত একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা আল-হাকিমকে স্রষ্টার অবতার বলিয়া মনে করে। মুকাত্তাম পাহাড় হইতে তাঁহার অন্তর্ধান এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আর একটি বিশ্বাসের জন্ম দিয়াছে যে, আল-হাকিমকে হত্যা করা হয় নাই। তিনি অদৃশ্য হইয়াছেন মাত্র এবং সময়মত আবার আবির্ভূত হইবেন।

শান্ত ও সুস্থির মুহূর্তে আল-হাকিম বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দেন। ১০০৫ খ্রীস্টাব্দে খলীফা আল-মামুনের মত তিনি 'দারুল হিকমা বা 'বিজ্ঞান-ভবন' নামক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। ইসমাঈলী মতবাদ প্রচারই এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। খলীফার প্রাসাদের সহিত সংলগ্ন এই বিজ্ঞান ভবনে একটি পাঠাগার ও সভাসমিতির জন্য কয়েকটি কামরা ছিল। এখানে শিক্ষানবীশগণকে ধর্মীয় বিষয় ছাড়া জ্যোতি-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। খলীফা জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ পছন্দ করিতেন। তিনি মুকাত্তাম পাহাড়ে একটি মানমন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রত্যুষে উঠিয়া অশ্বারোহণে তিনি সেখানে যাইতেন। তাঁহার অন্তর্ধানের পূর্বে তিনি সেখানে হয়ত পর্য-বেক্ষণের জন্যই গিয়া থাকিবেন।

আল-হাকিমের দরবারে অনেক জ্ঞানী-গুণী লোকের সমাবেশ হইয়া-ছিল। মিসরের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী আলী ইবন ইউসুফ তাঁহার দরবার অলংকৃত করিয়াছিলেন। বিখ্যাত মুসলিম পদার্থ-বিজ্ঞানী ও আলোক বিজ্ঞানী আবু আলী আল-হাসান ইবনুল হায়সাম (ল্যাটিন আল-হাজেন) কিছুদিন তাঁহার দরবারে ছিলেন। ইবনুল হায়সাম ৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে বসরায় জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি নীলনদের বন্যা প্রতিরোধ করিবেন বলিয়া আল-হাকিমকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু যখন চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইলেন, তখন খলীফার প্রকোপ এড়াইবার জন্য পাগলামির ভান করেন এবং পালাইয়া আত্মগোপন করেন। তাঁহাকে গণিত, জ্যোতিষ, দর্শন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে অন্যূন একশতটি গ্রন্থের রচয়িতা বলা হয়। আলোক বিজ্ঞানে তাঁহার লিখিত বিখ্যাত পুস্তক 'কিতাবুল-জানাজির'। ইহার মূল আরবী কপি এখন আর পাওয়া যায় না, তবে ল্যাটিন তরজমা এখনও বিদ্যমান। মধ্যযুগের আলোক বিজ্ঞানে এই গ্রন্থের প্রভাব অপরিসীম।

তিনি চক্ষুর দৃষ্টি সম্পর্কিত টলেমী ও ইউক্লিডের মতবাদের বিরোধিতা করেন। তাঁহার কয়েকটি পরীক্ষার সাহায্যে তিনি বিবর্ধনকারী কাচের (Magnifying lenses) নীতি আবিষ্কারের কাছাকাছি পেঁৗছিয়াছিলেন।

আল-হাকিমের মৃত্যুর পর হইতে ফাতিমীয়গণের পতন আরম্ভ হয়। উজীরদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চলিয়া যায়। অষ্টম খলীফা মুস্তানসিরের আমলে (১০৩৫—৯৪) মিসর সমৃদ্ধ ছিল। তাঁহার পরেই এই বংশের অধোগতি ত্বরান্বিত হয়। বিভিন্ন দল-উপদলের অন্তর্দ্বন্দ্বে খলীফার ক্ষমতা লোপ পায়। ক্রুসেডারগণও কয়েকবার মিসর আক্রমণ করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বীর কেশরী সালাহুদ্দীন ১১৭১ খ্রীস্টাব্দে শেষ ফাতিমীয় খলীফা আল-আজীজকে পদচ্যুত করিয়া এই বংশের অবসান ঘটাইয়াছিলেন।

ফাতিমীয় যুগে মিসরে সুখ-সমৃদ্ধি বিরাজমান ছিল। আল-মুইজ, আল-আজীজ ও আল-হাকিমের পরে অবনতি আরম্ভ হইলেও অষ্টম খলীফা মুস্তানসিরের আমলেও মিসর ধনৈশ্বর্যে ও শিক্ষা-দীক্ষায় বিশেষ উন্নত ছিল। ইসমাঈলী প্রচারক ও প্রখ্যাত পর্যটক নাসির-ই-খসরু ১০৪৬—৪৯ খ্রীস্টাব্দে মিসর ভ্রমণ করেন এবং মিসরের অবস্থা সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। খলীফার প্রাসাদে ৩০ হাজার লোক বসবাস করিত। ইহাদের মধ্যে ১২ হাজার ছিল ভৃত্য এবং এক হাজার ছিল অশ্বারোহী ও পদাতিক প্রহরী। খলীফা আল-মুস্তানসির ধনাঢ্য ছিলেন এবং তাঁহার নিজের বিশ হাজার বাড়ী ছিল। এইগুলির অধিকাংশই ইটের তৈয়ারী এবং পাঁচ-ছয় তলা উঁচু ছিল। রাজধানীতে খলীফার সমান সংখ্যক দোকানও ছিল। কায়রোর প্রধান রাস্তাগুলি ছাদ দ্বারা আবৃত ছিল এবং প্রদীপালোকিত ছিল। দোকানদারেরা নির্ধারিত মূল্যে বিক্রী করিত। অসাধু ব্যবসায়ীকে উটের পিঠে করিয়া রাস্তায় ঘুরান হইত; ঘন্টা বাজাইয়া লোক জড় করা হইত এবং সে তাহার দোষ স্বীকার করিত। শহরে আইন-শৃঙ্খলা এত সুচারুরূপে রক্ষা হইত এবং সাধারণ লোকের সততা এত প্রশংসনীয় ছিল যে, জহুরীদের দোকান ও সাররাফদের (যাহারা টাকা-পয়সা ভাঙ্গাইয়া দেয়) দোকানেও তালা দেওয়ার প্রয়োজন হইত না। ফুসতাত শহরে সাতটি প্রকাণ্ড মসজিদ ছিল, কায়রোতে ছিল আটটি। রাজ্যের সুখ-সমৃদ্ধি এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা দেখিয়া নাসির অবাক-বিস্ময়ে মন্তব্য করিয়াছিলেন, "আমি ইহার ধন-সম্পদের পরিসীমা বা পরিমাপ করিতে

পারি নাই এবং এখানে আমি যেমন দেখিলাম, এমন সমৃদ্ধি আর কোথাও দেখি নাই।" মুস্তানসির সীমাহীন আরাম-আয়েশে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রীর মধ্যে দামী পাথর, স্ফটিক পাত্র, স্বর্ণখচিত রেকাবী গজদন্ত ও আবলুস কাঠের কলমদান, তৈলস্ফটিক পাত্র, লোহার ফ্রেমে আঁটা মুকুর, স্বর্ণ ও রৌপ্যের পায়া বিশিষ্ট ছাতি, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ঘুটিসহ দাবার বোর্ড, মণিমুক্তা খচিত ছোরা ও তরবারি এবং এ্যাম্ব্রয়ডারী কাপড় প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। এই খলীফাই ১০৭০ খ্রীস্টাব্দে অভাবের তাড়নায় তাঁহার কন্যা ও মাতাকে বাগদাদে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ফাতিমীয়দের আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে কায়রো বাগদাদ কিংবা কর্ডোভার সমকক্ষ হইতে না পারিলেও খলীফাগণ জ্ঞানী ও গুণীদের কদর করিতেন এবং তাঁহারা বহু শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শিল্পকলায় মিসরের ফাতিমী খলীফাগণ বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। জওহর কর্তৃক নির্মিত কায়রোর মসজিদ ফাতিমীয় মিসরের সর্বপ্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন। ইহাতে ইরানী স্থাপত্যের প্রভাব বিদ্যমান। আল-হাকিম অপর একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন; তাহাতে পাথর ব্যবহার করা হইয়াছিল। পরবর্তী যুগের কমর মসজিদে ইটের পরিবর্তে পুরাপুরি পাথর ব্যবহার করা হইয়াছিল। ফাতিমীয়গণ কায়রোতে অনেকগুলি ফটক নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই যুগের মৃৎপাত্র বিশেষ নিপুণতার পরিচয় বহন করে। কাঠের গায়ে, মৃৎপাত্রে কিংবা তামার পাত্রে এই যুগের শিল্পিগণ বিভিন্ন প্রাণীর মূর্তি ব্যবহার করিয়াছে। এই যুগের মিসরীয় 'বয়ন' শিল্প বিখ্যাত ছিল।

মিসরের ও সিরিয়ার আইয়ুবী শাসকগণ

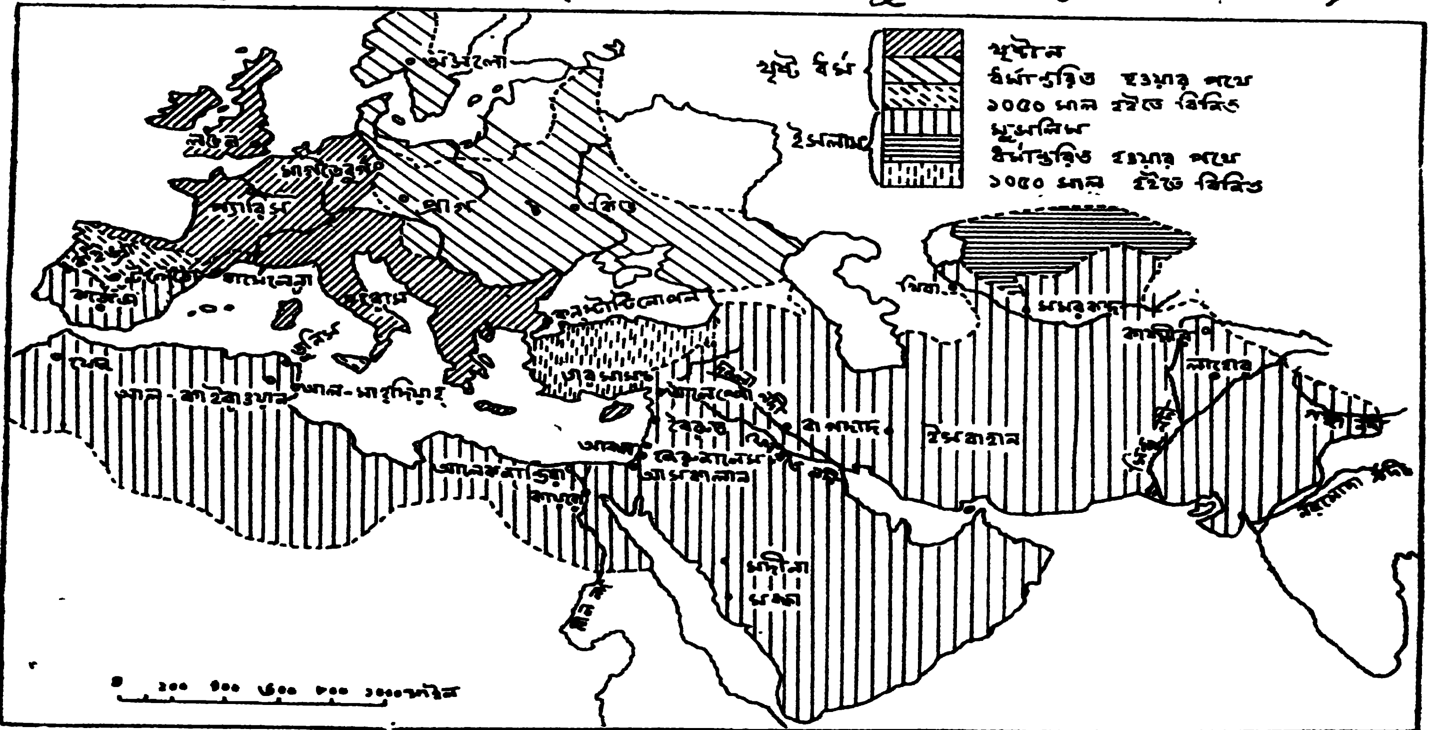
বিশ্ববিশ্রুত মুসলিম বীর সালাহুদ্দীন আইয়ুবী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। সালাহুদ্দীনের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযানের কথা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু সালাহুদ্দীন কেবল যোদ্ধা কিংবা সেনাপতিই ছিলেন না, তিনি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার সভায় বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তিনি বহু মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি বহু খাল খনন করিয়াছিলেন ও বাঁধ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুইজন

উজীর বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের নাম আল-কাজীউল ফাজিল এবং ইমামুদ্দীন আল-কাতিবুল ইসপাহানী। তাঁহার কর্মসচিব ইবন শাদ্দাদ তাঁহার জীবনী বচনা করিয়া গিয়াছেন। মুসলমানদের নিকট তিনি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা ও গাজী, কিন্তু খ্রীস্টানগণও তাঁহাকে প্রকৃত বীর বলিয়া মনে করে। নীলনদের তীর হইতে দাজলার তীর পর্যন্ত তাঁহার ক্ষমতা বিস্তৃত ছিল। এই অঞ্চলে তিনি ইসলামের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে এবং তাঁহার বংশধরগণ ইহার বিভিন্ন অংশে স্বাধীনভাবে শাসন করিতে থাকেন। মিসর, দামিস্ক, মেসোপটেমিয়া, হিম্‌স্‌, হামা এবং ইয়ামনে ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের উদ্ভব হয়। আইয়ুবীগণের প্রধান শাখা মিসরে শাসন করিতে থাকে। সালাহুদ্দীনের ভ্রাতা আল-আদিল সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় মিসরের কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আল-আদিলের পুত্র আল-কামিল ১২১৮ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১২৩৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মিসর শাসন করেন এবং ক্রুসেডারদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে ডামিয়েটা হইতে বিতাড়িত করেন। তিনি সেচ ব্যবস্থা ও কৃষির উন্নতি বিধানে যত্নবান ছিলেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তাঁহার শাসনে তাঁহাব খ্রীস্টান প্রজাগণ সুখে-শান্তিতে বসবাস করিত। ১২২৯ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের সহিত তাঁহার সন্ধির কথা বলা হইয়াছে। এই সন্ধি অনুসারে তিনি খ্রীস্টানগণকে জেরুজালেম ও প্যালেস্টাইনের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। শেষ আইয়ুবী সুলতান ছিলেন আল-মালিকুস সালিহ। ১২৪৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পত্নী শাজারুদ্দুর নিজেকে রানী বলিযা ঘোষণা করেন। তিনি আশি দিন যাবৎ উত্তর আফ্রিকা শাসন করেন, নিজের নামে খুৎবা পড়ান এবং নিজের নাম মুদ্রায় অঙ্কন করেন। মিসরের মমলুকগণ (দাসগণ) সৈন্যবাহিনীতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাহারা অতঃপর নিজেদের মধ্য হইতে ইজ্জুদ্দীন আইবাক নামক একজনকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করে। রানী শাজারুদ্দুর ইজ্জুদ্দীনকে বিবাহ করেন। ১২৫০ খ্রীস্টাব্দে মিসরে মমলুক বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার চল্লিশ বৎসর পূর্বে পাক-ভারতে মমলুক বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং দশ বৎসর পূর্বে ঐ বংশের সুলতানা রাজিয়ার মৃত্যু হইয়াছিল।

বিস্তারিত পাঠ্যসূচী

আমীর আলী, হিস্ট্রি অব সারাসেন্‌স্
হিট্টি, হিস্ট্রি অব দি এরাব্‌স্
P. J. Vatikiotis, The Fatimid Theory of State



মুসলিম ও খৃষ্টান রাজ্য (ক্রুসেডের প্রাক্কালে)

৪৩

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংঘাত: ক্রুসেড

পটভূমি

মুসলিম জগতের বিরুদ্ধে খ্রীস্টান জগতের ব্যাপক যুদ্ধাভিযানকে ক্রুসেড নামে অভিহিত করা হয়। নানাবিধ ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, এমন কি, মনস্তাত্ত্বিক কারণে খ্রীস্টান প্রতীচ্য মুসলিম প্রাচ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। ক্রুসেডের পটভূমিকা খুঁজিতে হইলে দশম শতাব্দীর গোড়ার দিকে মুসলিম ও খ্রীস্টজগতের পারস্পরিক অবস্থানের কথা মনে রাখিতে হইবে। মুসলমানগণ সিসিলি, সার্ডিনিয়া এবং বালিয়ারী দ্বীপপুঞ্জ দখল করিয়া ভূমধ্যসাগরে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করিতে সক্ষম হয়। ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ ও পূর্ব তীরবর্তী অঞ্চল পূর্বেই তাহাদের করতলগত হইয়াছিল। ইহার পর মুসলমানগণ শান্তিতে বসবাস করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সীমান্ত স্বাভাবিক প্রান্তে পৌঁছাইবার পূর্বে তাহাদের অগ্রাভিযান থামিয়া গিয়াছিল। এই অস্বাভাবিক সীমান্ত অপরপক্ষের হাত হইতে বিনাযুদ্ধে রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। স্পেনে তাহাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও পিরেনীজ পর্যন্ত অঞ্চল তাহাদের দখলে আসে নাই। সিসিলি তাহাদের অধিকারে থাকিলেও ইটালী তাহাদের অধীন ছিল না। বিজয়ের এই অসম্পূর্ণতা এবং সীমান্তের এই অরক্ষণীয়তা খ্রীস্টানদের পুনরাক্রমণ সহজসাধ্য করিয়াছিল। স্পেনে দশম শতাব্দীতেই খ্রীস্টানগণ এই প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করে। কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে খ্রীস্টধর্মের পূর্ণাঙ্গ হামলার জন্য দুইটি ঘটনা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ, ১০৩১ খ্রীস্টাব্দে স্পেনে উমাইয়া শাসনের অবসান ঘটে এবং আন্দালুসিয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের উদ্ভব হয়। ইহার ফলে স্পেনে খ্রীস্টান আক্রমণ জোরদার হয়। উত্তর-স্পেনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খ্রীস্টান রাজগণের সহায়তায় পোপগণ আগাইয়া আসেন। তাঁহারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড আহ্বান করেন এবং ফ্রান্সের নাইটগণকে এই ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। এইভাবে ক্রুসেডের প্রারম্ভ স্পেনেই হইয়াছিল। ক্যাস্টিলের রাজগণকে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে যাইতে

আহ্বান করা হইলে তাঁহারা বলিলেন, "আমরা সর্বদা এখানে ক্রুসেডরত; সুতরাং আমরা আমাদের কাজের অংশটুকু সম্পন্ন করিয়া যাইতেছি।" দ্বিতীয়তঃ, ১০৯২ খ্রীস্টাব্দে মালিক শাহের মৃত্যুর পর সলজুক শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িলে বাইজান্টাইন সম্রাট আলেক্সিয়াস্ কমনেনাস্ ১০৯৪ খ্রীস্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় উরবানের নিকট মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। ইহার ফলে পশ্চিমাঞ্চলের ক্রুসেড পূর্বাঞ্চলে প্রসার লাভ করে। ক্রুসেড বলিতে সাধারণতঃ পূর্বাঞ্চলে খ্রীস্ট-মুসলিম যুদ্ধকেই বুঝান হয়। ক্রুসেডের প্রধান কারণ বাহ্যতঃ ধর্মীয়। সলজুক শক্তি যখন দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল, তখন আলেক্সিয়াস কমনেনাস আশা করিয়াছিলেন যে, তিনি এই সুযোগে সলজুকদের হাত হইতে বাইজান্টাইনদের অধিকৃত রাজ্য ছিনাইয়া লইবেন, কিন্তু তিনি একাকী তাহা করিতে পারিতেন না। সেইজন্য তিনি ধর্মের নামে সমগ্র প্রতীচ্যকে মুসলিম প্রাচ্যের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিতে চাহিলেন। এই কাজের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন পোপ। পাশ্চাত্য জগতের উপর তাঁহার প্রভাব ছিল অপরিসীম। পাশ্চাত্যকে তখন শুধু ধর্মের নামেই উত্তেজিত করিয়া তোলা সম্ভব ছিল। পোপের নিকট যখন বাইজান্টাইন সম্রাটের আবেদন পৌঁছিল, তখন তিনি তুর্কীদের হাত হইতে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য রক্ষার কথা ভাবেন নাই। তিনি গ্রীক ধর্মমতের সহিত রোমের ধর্মমতের পুনর্মিলনের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। খ্রীস্টজগতে জেরুজালেমের তীর্থযাত্রীদের প্রতি তুর্কীদের দুর্ব্যবহারের কথা নানাভাবে অতিরঞ্জিত হইয়া প্রচারিত হইল। কিন্তু এইটিও খ্রীস্টানদের ধর্মোন্মাদনা জাগাইবার একটি কৌশলমাত্র। কারণ সপ্তম শতাব্দীতে আরবগণ কর্তৃক সিরিয়া-প্যালেস্টাইন বিজয় কিংবা ১০৭০ খ্রীস্টাব্দে সলজুকদের জেরুজালেম বিজয় তীর্থযাত্রাকে গুরুতররূপে ব্যাহত করে নাই। মুসলমান রাজা-বাদশাহদের মোটামুটি সহনশীল শাসনে তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীতে ছয়বার, দশম শতাব্দীতে ষোলবার, একাদশ শতাব্দীতে একশত সত্তর বার এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে নয়বার তীর্থযাত্রিগণ 'পবিত্রভূমি'তে আসিয়াছিল। প্রথম ক্রুসেডের পূর্বে বাম্বার্গের বিশপের নেতৃত্বে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ তীর্থযাত্রীদল জেরুজালেমে আসে এবং অন্যূন সাত হাজার জার্মান এই দলভুক্ত ছিল। এন্টিয়ক ও জেরুজালেম তুর্কীদের অধিকারে আসায় ইউরোপের লোকেরা বড় একটা বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

তীর্থযাত্রার ব্যাপারে এই ঘটনায় কোন ইতরবিশেষ হওয়ার কারণও ছিল না। কিন্তু পোপ কর্তৃক যাবতীয় প্রচারণা ও বাগ্মিতা প্রয়োগের ফলে তাহারা উত্তেজিত হইল। তাহাদিগকে বলা হইল যে, বিধর্মী তুর্কীরা ধর্মস্থানকে অপবিত্র করিয়াছে, তাহারা খ্রীস্টানগণকে জোরপূর্বক খৎনা করাইয়াছে, খ্রীস্টানগণকে হত্যা করিয়া তাহাদের নাভিচ্ছেদ করিয়াছে কিংবা নাড়িভূঁড়ি বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। পুণ্যভূমি জেরুজালেমকে বিধর্মীদের হাত হইতে রক্ষা করিয়া তাহারা অশেষ পারত্রিক, এমন কি জাগতিক কল্যাণের অধিকারী হইবে। কারণ খ্রীস্টানদের ধর্মপুস্তকে লিখিত আছে যে, ইহা পৃথিবীর নাভিস্থল, এখানে 'দুধ ও মধু বহিয়া যায়।' খ্রীস্টানদের ধর্মীয় উন্মাদনা এবং পোপের অসাধারণ ক্ষমতা এই ধর্মযুদ্ধ সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু কেবলমাত্র ধর্মীয় উন্মাদনা কিংবা পোপের প্রভাব দ্বারাই ক্রুসেড সম্ভব হইত না। ইউরোপের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা এই যুদ্ধের অনুকূল ছিল। ইউরোপে তখন জাতীয় রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে নাই। খ্রীস্টান ধর্ম তখনও রাজনৈতিক ভিত্তিতে বিভক্ত হইয়া পড়ে নাই। পোপের নেতৃত্বেই মিলিত হওয়া তাহাদের পক্ষে বেশী স্বাভাবিক ছিল। অধিকন্তু, ইউরোপে তখন নাইটদের সামন্তবাহিনী শক্তিশালী ছিল। এইজন্য অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের প্রশ্ন ছিল না। ইহারা সামরিক বাহিনী হিসাবে জায়গীর দ্বারা প্রতিপালিত হইত। ধর্মযুদ্ধের জন্য নূতন করিয়া সৈন্যবাহিনী গঠনের কিংবা অর্থ সংগ্রহেরও প্রয়োজন ছিল না। রাজারা প্রধানতঃ ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন নাই। সম্রাটের ত কথাই নাই, কারণ তিনি ছিলেন পোপের শত্রু। কাজেই যে-সকল দেশে সামন্তপ্রথা বেশী শক্তিশালী ছিল, সে-সকল দেশ হইতেই ক্রুসেডের জন্য সৈন্য সংগ্রহ হইয়াছিল বেশী। ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও ইটালী এই সকল দেশই ক্রুসেডে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। ইউরোপের সামন্তপ্রথা, নাইট ও শিভালরী ব্যতীত ক্রুসেড অভিযান কল্পনাই করা যায় না। ক্রুসেড-আন্দোলন মূলতঃ সৈনিকদের আন্দোলন, ইহা নিরস্ত্র ধর্মপ্রাণ তীর্থযাত্রীদের আন্দোলন ছিল না। নিরস্ত্র লোকেরা দল বাঁধিয়া যুদ্ধের জন্য পুণ্যভূমিতে পদার্পণ করিলে তুর্কীদের হাতে তাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। ইউরোপের আত্মকলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব হইতে বিখ্যাত যোদ্ধৃজাতি ফ্রাঙ্ক ও নরম্যানদের মনোযোগ ইউরোপের বাইরে নিবিষ্ট করাই ছিল এই আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

নানা প্রকার জাগতিক প্রলোভন বহু লোককে নানাভাবে ক্রুসেডে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করিয়াছিল। নূতন রাজ্য জয়ের বাসনা, প্রচুর অর্থ আত্মসাতের লালসা, প্রাচ্যদেশীয় নানা বিলাস সামগ্রী, বিগত জীবনের পাপ ও অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি কারণেও নানা লোক ক্রুসেডের আহ্বানে সাড়া দিয়াছিল। ক্রুসেডারগণকে বহু সুযোগ-সুবিধার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল। তাহাদের ভূ-সম্পত্তি গির্জার তত্ত্বাবধানে থাকিবে। এইগুলির ব্যাপারে কোন মামলা-মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবে না। তাহাদের ঋণের উপর কোন সুদ ধার্য হইবে না। নাইটদের জন্য দুঃসাহসিক অভিযানের পুলক-রোমাঞ্চ, ধনিকের জন্য পুণ্য সঞ্চয় ও পরকালে অনন্ত সুখ-সম্ভোগ, বণিকদের জন্য বাণিজ্য প্রসার, দাগী-অপরাধীদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং দরিদ্রের জন্য সাময়িকভাবে ভোগ-বিলাসের আশা ক্রুসেডের উৎসাহকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিল।

সাময়িক উত্তেজনা ও সাম্প্রতিক ঘটনাকে ক্ষণকালের জন্য দৃষ্টির বাহিরে রাখিয়া দিলে ইতিহাসের ঘটনাবলীর সামগ্রিক বিচারে ক্রুসেডকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দ্বন্দ্ব হিসাবে বিচার করাই ঠিক হইবে। এই দ্বন্দ্বে কখনও প্রতীচ্য আক্রমণাত্মক ভূমিকা আর প্রাচ্য আত্মরক্ষার ভূমিকায়, আবার কখনও প্রাচ্য বিজয়ীর বেশে এবং প্রতীচ্য বিজেতার বেশে দেখা দিয়াছিল। প্রাচীন ট্রয়ের যুদ্ধ এবং পারসিক যুদ্ধ হইতে ইহার প্রারম্ভ এবং আধুনিক কালে পশ্চিম ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাজ্য বিস্তারে ইহার চরম পরিণতি। বস্তুতঃ "ক্রুসেড পশ্চিম ইউরোপের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিস্তারের একটি পর্যায়, ইহা সাম্রাজ্যবাদের মধ্যযুগীয় অধ্যায়।"*

১০৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর পোপ উরবান ক্লারমন্টে তাঁহার বিখ্যাত ভাষণ দান করেন। পৃথিবীতে খুব কম বক্তৃতাই ইহা অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ হইয়াছিল। অভিজাত শ্রেণী, নাইট ও অভিযাত্রীরা পোপের আহ্বানে সাড়া দিল। প্রথম ক্রুসেডে কোন রাজা-বাদশাই আগাইয়া আসেন নাই; ইংলণ্ডের উইলিয়ম রাফাস, ফ্রান্সের প্রথম ফিলিপ অথবা জার্মানীর চতুর্থ হেনরী কেহই এই যুদ্ধে শরীক হন নাই। ফ্রান্সের নোবল-নাইটগণ এই যুদ্ধে অধিক সংখ্যায় যোগদান করেন। তিনটি প্রধান বাহিনী কনস্টান্টিনোপলের

প্রথম ক্রুসেড (১০৯৬-১১০৯)

* Thompson and Johnson, An Introduction to Medieval Europe, পৃষ্ঠা, ৫২৩।

দিকে যাত্রা করিয়াছিল। লথারিঙ্গিয়া হইতে একটি বাহিনী গডফ্রের নেতৃত্বাধীনে জার্মানী ও হাঙ্গেরীর মধ্য দিয়া, উত্তর-ফ্রান্সের লোকেরা নরম্যাণ্ডির ডিউক রবার্ট, ব্লয়েসের কাউন্ট স্টিফেন, ভার্মাণ্ডয়েসের কাউন্ট হিউ, এবং ফ্লাণ্ডার্সের রবার্টের অধীনে ইটালীর পথে নরম্যানদের সহিত যুক্ত হইয়া তাহাদের নেতা বোহেমাণ্ডের সহিত এবং দক্ষিণ-ফ্রান্সের লোকেরা টুলোর কাউন্ট রেমণ্ডের অধীনে দক্ষিণ ইটালী হইয়া যাত্রা করিল। ১০৯৬ খ্রীস্টাব্দে তাহারা দলে দলে কনস্টান্টিনোপলে গিয়া উপস্থিত হইল।

ইতিমধ্যে পোপের প্রচারণায় অনুপ্রাণিত হইয়া সন্ন্যাসী পিটার (Peter the Hermit) ফ্রান্সের কৃষক ও নগরবাসীদিগকে যুদ্ধে যোগদানের জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। ইহার ফলে গ্রামের পর গ্রাম খালি হইয়া গেল। উত্তর-পূর্ব ফ্রান্স ও পশ্চিম-জার্মানী হইতে অগণিত লোক পথিমধ্যে ইহুদীদিগকে লুন্ঠন করিয়া হাঙ্গারী হইয়া কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছিল। যেখানে তাহারা যাইত, সেখানেই লুট-তরাজ করিয়া বেড়াইত। বাইজান্টাইন সম্রাট কখনও এইরূপ অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ইহাদিগকে অবিলম্বে জাহাজে করিয়া এশিয়া মাইনরে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সেখানে পৌঁছামাত্র তাহাদের অধিকাংশ লোক তুর্কীদের হাতে কাটা পড়িল। পিটার দি হার্মিট ও কিছুসংখ্যক লোক রক্ষা পাইল।

ক্রুসেড বাহিনী কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছিলে সম্রাট আলেক্সিয়াস কমনেনাস তাহাদের নিকট হইতে এই মর্মে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলেন যে, তাহারা তাঁহার সাম্রাজ্যের যে যে অংশ তুর্কীদের হাত হইতে উদ্ধার করিবে, তাহা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবে। ক্রুসেড যোদ্ধাগণ রুমের সলজুক সুলতানের রাজধানী নাইসিয়া অধিকার করিল (১০৯৭খ্রীঃ)। ইহা তাহারা বাইজান্টাইন সম্রাটের হাতে সমর্পণ করিল। ইহার পর ক্রুসেডারগণ সিরিয়ার দিকে যাত্রা করিল। পথিমধ্যে বল্ডউইন মূলবাহিনী হইতে সরিয়া পড়িলেন। এডেসার আর্মিনীয় খ্রীস্টান শাসক তাঁহাকে ডাকিয়া পালক পুত্র করিয়া লইলেন এবং এডেসা নগরী তাঁহাকে দান করিলেন। বল্ডউইন একজন আর্মিনীয় যুবরানীর পাণি গ্রহণ করিয়া এডেসায় বসতি স্থাপন করিলেন। তাঁহার জন্য ক্রুসেডের এইখানেই পরিসমাপ্তি। তবে 'এডেসার কাউন্টি' প্রথম ল্যাটিন রাজ্য হিসাবে তুর্কীদের সিরিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে বিরাট প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ক্রুসেডারগণ সিরিয়ার ন্যূনাধিক একশত পঁয়ষট্টি সিরীয় শহর ও দুর্গ দখল করিয়া লইল। তাহারা

সাত মাস যাবৎ এন্টিয়ক অবরোধ করিল। অবশেষে বোহেমাণ্ডের সেনাবাহিনী ১০৯৮ খ্রীস্টাব্দের ৩রা জুন নগরে প্রবেশ করে। বোহেমাণ্ডের অধীনে এখানে ক্রুসেডারদের দ্বিতীয় স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হইল। অতঃপর রেমণ্ডের নেতৃত্বে অবশিষ্ট ক্রুসেডারগণ সিরিয়ার উপকূল অঞ্চল ধরিয়া প্রায় বিনা বাধায় অগ্রসর হইয়া চলিল। অবশেষে তাহারা ১০৯৯ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে জেরুজালেমের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহাদের সহিত সহযোগিতায় রত জেনোয়ার একটি নৌবহরের সাহায্যে ১৫ই জুলাই জেরুজালেম অধিকৃত হইল। ইতিপূর্বে জেরুজালেম তুর্কীদের হাত হইতে মিসরের ফাতিমীয়গণের হাতে চলিয়া গিয়াছিল। মিসরীয় বাহিনীর হাত হইতেই ক্রুসেডারগণ জেরুজালেম দখল করে। পবিত্রভূমি অধিকারের উন্মাদনায় ক্রুসেডারগণ এক আসুরিক নরমেধ যজ্ঞের অবতারণা করিল। নারী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, নির্বিশেষে এই নিধনযজ্ঞের শিকার হইল। মানুষের রক্তে রাস্তা-ঘাট ভাসিয়া গেল। 'সলোমনের উপাসনালয়' রক্তে রক্তাক্ত হইয়া গেল। অবাধ লুট-তরাজ চলিল। খ্রীস্টানগণ হাঁটু পর্যন্ত রক্ত লইয়া মন্দিরে উপাসনারত হইল। মানুষের মৃতদেহে জেরুজালেম নগরী পরিপূর্ণ হইল। কর্তিত শির, হাত, পা স্তূপাকৃতি পড়িয়া রহিল। অচিরেই পূতিগন্ধে নগরীর আকাশ-বাতাস দূষিত হইয়া উঠিল। ইহার এক মাস পরে মিসরীয়গণ জেরুজালেম উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া আসকালানের নিকট পরাজিত হয়। এইভাবে ক্রুসেডারগণ কর্তৃক তৃতীয় ল্যাটিন রাজ্য স্থাপিত হইল। রেমণ্ডকে ইহার কর্তৃত্ব দেওয়া হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। গডফ্রেকে গির্জা ও নগরীর কর্তৃত্ব দান করা হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা এডেসার বল্ডউইন জেরুজালেমের রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। ইহার পর সিরিয়ার উপকূলস্থ বন্দরগুলি দখল করা অপরিহার্য হইয়া পড়িল। এই ব্যাপারে ইটালীর জেনোয়া, পিসা ও ভেনিসের সওদাগর ও বণিকসম্প্রদায় রণতরী সরবরাহ করিয়া ক্রুসেডারগণকে সাহায্য করিল। তাহারা ইহার বদলে এই সকল স্থানে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা লাভ করিল। ১১০৯ খ্রীস্টাব্দে ত্রিপলি অধিকৃত হয়। এখানে ক্রুসেডারদের চতুর্থরাজ্য স্থাপিত হয়। এই চারিটি রাজ্য—এডেসা, এন্টিয়ক, জেরুজালেম ও ত্রিপলি ইউরোপীয় সামন্ত প্রথার ভিত্তিতেই গঠিত হয়। জেরুজালেমে দুইটি সন্ন্যাসী সম্প্রদায় নানাভাবে ক্রুসেডার-

জেরুজালেম উদ্ধার, ১৫ই জুলাই, ১০৯৯

গণকে সাহায্য করে। তাহারা সেবা-শুশ্রূষা হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্মের জন্য অসি ধারণ পর্যন্ত সকল কাজ করিতে পারিত। ইহারা টেম্পলার (Templars) ও হস্পিটলার (Hospitallers) নামে পরিচিত। প্রথমোক্ত-দল ক্রুসেডে যোগদানের জন্য জেরুজালেমে আসিয়া সলমোনের মন্দিরের (Temple) নিকট বসতি স্থাপন করে। এই বাসস্থান হইতে তাহাদের নাম হয় Templar. তাহারা সাদা পোশাকে শরীর আবৃত করিয়া উহাকে লাল ক্রুশ দ্বারা সজ্জিত করিত। হস্পিটলারগণ ক্রুসেডের পূর্বেই জেরুজালেমে তীর্থযাত্রীদের সেবার জন্য একটি হাসপাতাল স্থাপন করে। অচিরেই তাহারা পুণ্যভূমি রক্ষার্থে টেম্পলারদের মত অসি ধারণ করিতে আরম্ভ করে। ইহারা কাল পোশাকে সাদা ক্রুশ ধারণ করিত।

মসুলের আতাবেগ ইমামুদ্দীন জঙ্গীর অভ্যুদয় ক্রুসেডের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরাইয়া দিয়া মুসলমানদের জন্য অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিল।

ইমামুদ্দীন জঙ্গী ও দ্বিতীয় ক্রুসেড, ১১৪৭-১১৪৯

তিনি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম বীর, যিনি ক্রুসেডারগণকে প্রতি-আক্রমণ করিয়া শ্রেষ্ঠ মুসলিম বীর সালাহুদ্দীনের বিজয়ের পথ সুপ্রশস্ত করেন। ১১৪৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি এডেসা পুনরধিকার করেন। ইউরোপে তখন দ্বিতীয় ক্রুসেডের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। এইবার সেন্ট বার্নার্ড নামক একজন মঠাধ্যক্ষের প্রচারণায় দুইজন রাজা ক্রুশ ধারণ করিতে রাজী হইলেন। ফ্রান্সের সপ্তম লুই ও জার্মানীর তৃতীয় কনরাডের নেতৃত্বে ফরাসী ও জার্মান বাহিনী কনস্টান্টিনোপল হইয়া জেরুজালেম পৌঁছিল। টেম্পলার ও হস্পিটলারদের সহযোগিতায় এবং জেরুজালেম রাজ্য কর্তৃক প্রদত্ত এক সৈন্যবাহিনীসহ তাহারা দামিস্ক অবরোধ করিল। কিন্তু অকৃতকার্য হইয়া অবরোধ তুলিয়া লইল। ইমামুদ্দীনের সুযোগ্য পুত্র ও উত্তরাধিকারী নূরুদ্দীন ১১৫৪ খ্রীস্টাব্দে অপর মুসলিম শাসকের নিকট হইতে দামিস্ক অধিকার করেন। তিনি এডেসা রাজ্যের বিজয় সম্পূর্ণ করেন এবং এন্টিয়কের কিয়দংশ দখল করেন। এই উভয় রাজ্যের শাসকদ্বয়কে তিনি বন্দী করিয়া লইয়া যান। পরে উভয় শাসককে মুক্তি মূল্যের বিনিময়ে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

নূরুদ্দীনের একজন সুযোগ্য সহকারী ছিলেন শিরকুহ। ১১৬৪ খ্রীস্টাব্দে নূরুদ্দীন শিরকুহকে একটি সৈন্যদল লইয়া মিসরে চলিয়া যাইতে আদেশ করেন। মিসরে তখন শেষ ফাতিমীয় খলীফা আল-আদিদ রাজত্ব

করিতেছিলেন। শিরকুহ মিসরে গিয়া যুযুধান সামরিক দলের কোন একটিকে হাত করিয়া কয়েকটি সামরিক ও কূটনৈতিক বিজয়ের পর খলীফা কর্তৃক উজীর নিযুক্ত হন (১১৬৯)। জেরুজালেমের রাজাও খ্রীস্টান-মুসলিম দ্বন্দ্বে মিসরের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া শিরকুহের প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন। উজীর হইবার অল্প পরেই শিরকুহের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহুদ্দীন (Saladin) উজীর হইলেন।

সালাহুদ্দীনের অভ্যুত্থান

আল-মালিকুন নাসির সুলতান সালাহুদ্দীন ১১৩৮ খ্রীস্টাব্দে দাজলার তীরবর্তী তাক্রিত নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আতাবেগ জঙ্গীর একজন সেনানায়ক ছিলেন। তিনি ১১৬৪ খ্রীস্টাব্দে পিতৃব্য শিরকুহের সহিত মিসরে আগমন করিয়া সেখানে উজীর পদে উন্নীত হন। তাঁহার জীবনে দুইটি উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, প্রথমটি হইল মিসর অধিকার করা এবং দ্বিতীয়টি ফাঙ্কদের (ক্রুসেডারগণকে মুসলমানগণ এই নামে অভিহিত করিত) বিরুদ্ধে জিহাদ করা। ফাতিমীয় খলীফার শোচনীয় অবস্থা দর্শনে তিনি মর্মাহত হইলেন। তিনি সুন্নী মতাবলম্বী ছিলেন। তাই ১১৭১ খ্রীস্টাব্দে ফাতিমীয় খলীফাকে পদচ্যুত করিয়া তিনি মিসরে আব্বাসীয় খলীফার নামে খুৎবা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহার তিন বৎসর পর (১১৭৪) তাঁহার প্রভু (তাঁহার পিতা ও পিতৃব্যের প্রভু) নূরুদ্দীনের মৃত্যু হইলে তিনি মিসরের সুলতান হইলেন। তিনি নূরুদ্দীনের পুত্রের নিকট হইতে সিরিয়া দখল করেন। ১১৭৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁহারই অনুরোধে বাগদাদের খলীফা তাঁহাকে মিসর, মাগরিব, নুবিয়া, পশ্চিম-আরব, প্যালেস্টাইন এবং মধ্য-সিরিয়ার কর্তৃত্ব প্রদান করেন। দশ বৎসর পরে তিনি মসুলও দখল করেন। এইভাবে তিনি ফুরাত হইতে নীলনদের তীর পর্যন্ত অঞ্চলে অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খ্রীস্টান রাজ্যগুলিকে দমন করিতে উদ্যত হইলেন।

সালাহুদ্দীন

কিন্তু খ্রীস্টান শক্তির মোকাবেলা করার পূর্বে সালাহুদ্দীন ঘাতক সম্প্রদায় (Assassins) কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ইহারা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল লোকের প্রাণহানি করিত। ১১৭৬ খ্রীস্টাব্দে সালাহুদ্দীন তাহাদের নেতা রশীদুদ্দীন সিনানের দুর্গ অবরোধ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি আদায় করিলেন। সালাহুদ্দীনের নেতৃত্বাধীনে যখন মুসলিম শক্তি সম্মিলিত হইল, তখন জেরুজালেম রাজ্য

উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হইতেছিল। এই সময় চ্যাটিলনের রেজিনাল্ড নামক একজন দুঃসাহসিক ফরাসী সর্দারের নিষ্ঠুর ও জঘন্য আচরণে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। তিনি জেরুজালেমের অধীনে কারাক নামক দুর্গের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি ছিলেন। ল্যাটিন নেতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন ন্যায়-অন্যায় জ্ঞানশূন্য এবং বর্বর-প্রকৃতির। তিনি হিজাজের উপকূলবর্তী অঞ্চলে নৌ-অভিযান প্রেরণ করিয়া হজযাত্রিগণকে হত্যা করিতেন এবং মুসলমান বাণিজ্য-কাফেলা লুন্ঠন করিতেন। পরিশেষে সালাহুদ্দীনের সহিত শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করিয়া তিনি একটি মিসরীয় কাফেলা লুন্ঠন করিলেন। এই কাফেলা নাকি সালাহুদ্দীনের ভগ্নীকে পাহারা দিয়া লইয়া যাইতেছিল। সুলতান সালাহুদ্দীন প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এই দুর্বৃত্তকে তিনি নিজ হাতে হত্যা করিবেন। ১১৮৭ খ্রীস্টাব্দে টাইবেরিয়াস অবরোধ করিয়া সালাহুদ্দীন উহা দখল করিলেন (১লা জুলাই)। ইহার পর তিনি হিট্টিনের যুদ্ধে (৩—৪ জুলাই) খ্রীস্টানগণকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং হাজার হাজার লোককে বন্দী করেন। জেরুজালেমের রাজা গাই দি লুসিগনান বন্দী হইয়া সালাহুদ্দীনের নিকট উপস্থিত হইলে সুলতান তাঁহাকে বন্ধুজনোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। কিন্তু দস্যু রেজিনাল্ড তাঁহার নিকট ভিন্ন ব্যবহার প্রাপ্ত হইলেন। বিশ্বাসঘাতক সালাহুদ্দীনের হাতে নিহত হইলেন। এক সপ্তাহ অবরোধের পর পবিত্র নগরী জেরুজালেম আত্মসমর্পণ করিল (২রা অক্টোবর, ১১৮৭)। খ্রীস্টানগণ ১০৯৯ খ্রীস্টাব্দে যে নগরীকে মানুষের শব ও শোণিতস্রোতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল, সালাহুদ্দীনের জেরুজালেম প্রবেশের সময় সেখানে কোন নরহত্যাই সংঘটিত হয় নাই। গ্রীক ও সিরীয় খ্রীস্টানগণকে পূর্ণ নাগরিক অধিকারসহ নগরে থাকিবার অনুমতি দেওয়া হইল। ফ্রাঙ্ক সৈন্যগণকে চল্লিশ দিনের ভিতর মুক্তি মূল্য দিয়া নগর ত্যাগ করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। যখন ধনাঢ্য খ্রীস্টানগণ নিজ নিজ মুক্তি সম্পন্ন করিয়া দরিদ্র লোকদিগকে ফেলিয়া যাইতেছিল এবং যখন জেরুজালেমের প্যাট্রিয়ার্ক নিজের ধনসম্পদ, গির্জার মূল্যবান পেয়ালা-বাসন ও টাকা-পয়সা লইয়া দ্রুত নগর ত্যাগ করিলেন, তখন সদাশয় সালাহুদ্দীন প্রায় দশ সহস্র লোকের মুক্তি মূল্য স্বয়ং দান করিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা সাইফুদ্দীন আরও সাত সহস্র লোকদের মুক্তি দান করিলেন। ১১৮৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে জেরুজালেম রাজ্য সমেত প্রায় সমগ্র লাটিন অধিকৃত অঞ্চল সালাহুদ্দীনের

অধিকারে আসে। কেবল ত্রিপলি, টায়ার ও এন্টিয়ক এবং আরও দুই-একটি ছোটখাট শহর লাটিন অধিকারে থাকিল।

জেরুজালেমের পতন তৃতীয় ক্রুসেডের ডঙ্কা বাজাইয়া দিল। এই ক্রুসেডে রাজা-সম্রাটগণ যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে 'রাজাদের ক্রুসেড' বলা হয়। জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বার্বারোসা ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড কোর ডি লায়ন (শার্দুল হৃদয়) এবং ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস তৃতীয় ক্রুসেডে যোগদান করেন। সম্রাট প্রথমে যাত্রা করিয়াছিলেন কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবার পূর্বেই তিনি সিলিসিয়ায় নদীগর্ভে নিমজ্জিত হন। ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড পথিমধ্যে সাইপ্রাস দখল করেন। তাঁহার মধ্যে এবং ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাসের মধ্যে কোন মতের মিল ছিল না। ক্রুসেডারগণ আক্কা (Acre) অবরোধ করিল। জেরুজালেমের রাজা গাই (Guy) আক্রমণে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। ফ্রান্সের রাজা তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন। রিচার্ড ইহার পরে পৌঁছিলেন। তাঁহার আগমনে খ্রীস্টানদের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল। এখন উভয় পক্ষে দুই প্রধান বীর রিচার্ড ও সালাহুদ্দীনের নেতৃত্বে যুদ্ধ পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হইল। প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া অবরোধ চলিল (২৭ আগস্ট ১১৮৯—১২ জুলাই ১১৯১)। নৌ-বহর এবং আগ্নেয়াস্ত্রের জন্য খ্রীস্টানদের বিশেষ সুবিধা হইল। সালাহুদ্দীনের একক নেতৃত্ব তাঁহার সুবিধার কারণ ছিল। সালাহুদ্দীন খলীফার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া নিরাশ হইলেন। অবশেষে মুসলমানগণ দুইটি শর্তে নগর সমর্পণ করিল; তাহারা আক্কায় পবিত্র ক্রুস পুনঃ সংস্থাপন করিবে এবং ২00,000 স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে আক্কার মুসলিম সেনাবাহিনী মুক্তি লাভ করিবে। কিন্তু এই অর্থ দিতে দেরী হওয়ায় রিচার্ড সাতাইশ হাজার বন্দীকে অন্যান্য মুসলমানদের সম্মুখে হত্যা করিলেন। তাঁহার এই ব্যবহার জেরুজালেমের পতনের পর সালাহুদ্দীনের উদার ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল।

তৃতীয় ক্রুসেড ১১৮৯-৯২

আরও কিছুকাল যুদ্ধ চলার পর তৃতীয় ক্রুসেড ফুরাইয়া আসিল। ফিলিপ অগাস্টাস সৈন্যবাহিনী রাখিয়া দেশে চলিয়া গেলেন। রিচার্ড বহু চেষ্টা করিয়াও জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করিতে ব্যর্থ হইলেন। তিনি সালাহুদ্দীনের সহিত সন্ধি স্থাপনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পরস্পর আলাপ-আলোচনা চলিতে লাগিল। রিচার্ড সালাহুদ্দীনের ভ্রাতা

সাইফুদ্দীনকে একবার এক আলোচনায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। রিচার্ড একবার প্রস্তাব করিলেন যে, সালাহুদ্দীনের ভ্রাতার সহিত তাঁহার (রিচার্ডের) ভগ্নীর বিবাহ হউক এবং বর-কনেকে উপঢৌকন স্বরূপ জেরুজালেম ছাড়িয়া দেওয়া হউক। ইহার ফলে খ্রীস্টান ও মুসলমান-দের বিরোধ স্থায়িভাবে মিটমাট হইয়া যাইবে। কিন্তু পাদ্রীরা এই প্রস্তাব মানিতে রাজী হইল না। পরিশেষে ২রা নভেম্বর ১১৯২ সালে শান্তি স্থাপিত হইল। এই সন্ধি অনুসারে সিরিয়ার উপকূল অঞ্চল জেরুজালেমের রাজার হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। মুসলমানগণ খ্রীস্টানগণকে জেরুজালেমে অবাধ প্রবেশাধিকার দান কারবে। সালাহুদ্দীন এই শান্তির ফল ভোগ করিবার জন্য বাঁচিয়া ছিলেন না। পর বৎসর ১২৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তাঁহার মৃত্যু হয়। সালাহুদ্দীনের স্বপ্ন ছিল ল্যাটিন রাজ্যগুলি দখল করা। তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। এন্টিয়ক, ত্রিপলি এবং জেরুজালেম রাজ্যের কিয়দংশ খ্রীস্টানদের হাতেই রহিয়া গেল, কিন্তু তিনি জেরুজালেম শহর পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন।

পোপ তৃতীয় ইন্নোসেন্ট ১১৯৮ খ্রীস্টাব্দে যখন আরেকবার ধর্মযুদ্ধ আহ্বান করিলেন, তখন তাঁহার বাগ্মিতা ও আকুল আবেদন ক্লেরমন্টে এক শতাব্দী পূর্বেকার পোপ উরবানের বাগ্মিতার কথাই স্মরণ করাইয়া দিল। কিন্তু তাঁহার আবেদন যে ক্রুসেডের জন্ম দিল, তাহা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হইয়া খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইল। সুতরাং ইহাকে ক্রুসেড বলিলে সত্যের অপলাপই হইবে। এই ক্রুসেডে কোন রাজাই যোগদান করেন নাই। ফ্রান্সের ফিলিপ ও ইংলণ্ডের জন পরস্পর কলহে লিপ্ত হইলেন। জার্মানীতে গৃহবিবাদ শোচনীয় রূপ পরিগ্রহ করে। প্রথম ক্রুসেডের মতই ফ্রান্সের নোবল-নাইটগণই প্রধানতঃ ইহাতে যোগদান করিল। ভেনিশিয়ার বণিকদের নিকট ক্রুসেডারগণ খাদ্য ও জাহাজ চাহিল। বণিকরা পঁচাশি হাজার মার্ক দাবী করিল, তদুপরি বিজিত রাজ্যের ও সম্পত্তির অর্ধেকও দাবী করিল। অর্থগৃধ্নু ভেনিশীয়গণ এই যুদ্ধকে লুটতরাজের উছিলা হিসাবে ব্যবহার করিল। ক্রুসেডারগণ প্রথমে মিসর অধিকার করিতে চাহিল। কিন্তু ভেনিশীয়গণ মিসরের সহিত তাহাদের প্রাচীন ব্যবসায় হারাইতে রাজী ছিল না। অধিকন্ত তাহারা তাহাদের পাওনা পুরাপুরি দাবী করিয়া বসিল। তাহাদের পরামর্শে প্রথমে হাঙ্গারীর রাজার

চতুর্থ ক্রুসেড
১২০২-১২০৪

অধীনস্থ জারা শহর আক্রমণ করা হইল। তারপর তাহারা কনস্টান্টিনোপলে অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে সেদিকে যাত্রা করিল। তাহারা এই নগরী লুণ্ঠন করিল। পবিত্র গির্জা সান্টা সোফিয়ার পবিত্রতা নষ্ট করিল; ইহার মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠন করিল; নগরীর গলিতে গলিতে তাহারা লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চালাইয়া মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী আত্মসাৎ করিল; নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিল; পাঠাগারের মূল্যবান পুঁথি-পুস্তক বিনষ্ট করিল। দুষ্প্রাপ্য শিল্পদ্রব্যগুলি তাহাদের পৈশাচিক বর্বরতায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের তীর সংলগ্ন অঞ্চল ও কয়েকটি দ্বীপ ভেনেশীয়দের অধিকারভুক্ত হইল। কনস্টান্টিনোপলে একটি ল্যাটিন রাজ্য স্থাপিত হইল। ফ্লাণ্ডার্সের কাউন্ট বল্ডউইন সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইলেন। ১২০৪ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১২৬১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কনস্টান্টিনোপলে কোন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ছিল না। ইহার পর গ্রীকগণ পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে।

ছোটদের ক্রুসেড (১২১২)

একটি বার বৎসর বয়স্ক ফরাসী বালক প্রচার করিতে আরম্ভ করিল যে, প্রভু যীশু তাহাকে একদল বালক লইয়া জেরুজালেমের গির্জা উদ্ধার করিতে যাইবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। এই আহ্বানে সাড়া দিয়া হাজার হাজার ছেলেমেয়ে সমুদ্রের দিকে যাত্রা আরম্ভ করিল। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পুণ্যভূমির দিকে সমুদ্রের উপর দিয়া তাহাদের জন্য রাস্তা হইয়া যাইবে। জার্মান ছেলেমেয়েরা বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া রোমে পৌঁছিলে পোপ তাহাদিগকে বুঝাইয়া সুজাইয়া দেশে পাঠাইয়া দিলেন। প্রায় ত্রিশ হাজার ফরাসী বালক-বালিকা মার্সাই বন্দরে পৌঁছিয়া হতাশ হইয়া দেখিল যে, সমুদ্র তাহাদের জন্য কোন পথ করিয়া দিতেছে না। ইহাতে নিরাশ হইয়া অনেকেই বাড়ী ফিরিয়া আসিল। দুইজন বণিক পাঁচ-ছয় হাজার ছেলেমেয়েকে বিনা পয়সায় প্যালেস্টাইনে পৌঁছাইয়া দিবার অঙ্গীকারে তাহাদিগকে জাহাজে পুরিয়া দাস হিসাবে বিক্রী করিয়া আসিল।

ছোটখাটো ক্রুসেড

অবশিষ্ট ক্রুসেড ছোটখাট রকমের ছিল। পঞ্চম ক্রুসেড ১২১৯ খ্রীস্টাব্দে সংঘটিত হয়। ক্রুসেডারগণ মিসর আক্রমণ করিয়া ডামিয়েটা দখল করে। কিন্তু মিসরের আইয়ুবী সুলতান আল-কামিল দুই বৎসর যাবৎ যুদ্ধ করিয়া খ্রীস্টানগণকে তাড়াইয়া দেন। ১২২৭ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক কর্তৃক ষষ্ঠ ক্রুসেডের আয়োজন করা হয়। সুলতান আল-কামিল আভ্যন্তরীণ কলহে ব্যাপৃত

থাকায় তিনি ফ্রেডারিকের সহিত এক শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ক্রুসেডারগণ বিনা রক্তপাতে জেরুজালেম ফিরাইয়া পাইল। কিন্তু মোঙ্গল চেঙ্গিজ খানের আক্রমণে বিতাড়িত হইয়া খাওয়ারিজমশাহের তুর্কীগণ পুনরায় জেরুজালেব দখল করে। ফ্রান্সের রাজা সেন্ট লুইয়ের নেতৃত্বে সপ্তম ক্রুসেড পরিচালিত হয়। তিনি ডামিয়েটা দখল করিয়া মিসরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে তাঁহাব সৈন্যদল মুসলমানদেব হাতে বিধ্বস্ত হয় এবং তিনি স্বয়ং বন্দী হন (১২৫০)। একমাস বন্দী অবস্থায় থাকার পব তিনিও তাঁহার সঙ্গীয় লোকেরা মুক্তি-মূল্য দিয়া খালাস পাইলেন। ১২৭০ খ্রীস্টাব্দে লুই পুনবায় অষ্টম ক্রুসেড পবিচালনা করিয়া কার্থেজে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার পর একে একে ল্যাটিন রাজ্যগুলি মুসলমানের দখলে আসে। সর্বশেষে ১২৯১ খ্রীস্টাব্দে আক্কা (Acre) অধিকৃত হয়। এই সঙ্গে জেরুজালেমেব লাটিন রাজ্যের অবসান ঘটে। এইভাবে দুই শতাব্দীর প্রাচ্য ও প্রতীচ্যেব দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে।

ক্রুসেডের ফল

ইউরোপে শক্তিশালী রাজতন্ত্র গঠনে ক্রুসেড সহায়তা করিয়াছিল। দুই শতাব্দী ধরিয়া সামন্ত অভিজাত শ্রেণী তাহাদের অর্থসম্পদ লইযা এই যুদ্ধে যোগদান করে। ইহার ফলে অভিজাত শ্রেণী দুর্বল হইয়া পড়ে। যেহেতু ফ্রান্সের সম্ভ্রান্ত শ্রেণী অধিক সংখ্যায ক্রুসেডে যোগদান করিযাছিল, সেইজন্য ইহার প্রতিফল ফ্রান্সেই বেশী দেখা দেয়। অভিজাত শ্রেণী তাহাদের সম্পত্তি বিক্রয় কবিল কিংবা বন্ধক রাখিল। ইহাদের

রাজনৈতিক

মধ্যে যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইল কিংবা প্রাচ্যে বসবাস আরম্ভ করিল, তাহাদের সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইল। যাহারা ফিবিয়া আসিল, তাহারা ক্রুসেডেব ব্যয় নির্বাহ করিতে গিয়া বহু সম্পত্তি হারাইল এবং তাহাদের পূর্বাবস্থা আর ফিরিয়া আসিল না। অন্যপক্ষে সম্ভ্রান্ত লোকগণ প্রাচ্যদেশেব বিলাসব্যসনে অভ্যস্ত হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিলে এই সকল বিলাস সামগ্রীর ব্যয় নির্বাহ করিতে গিয়া তাহাবা বিব্রত বোধ করিল। এইভাবে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর ক্ষমতা খর্ব হওয়ায় রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল। আবার যে সকল রাজা ক্রুসেডে যোগদান করিয়াছিল, তাহারা জরুরী খচর মিটাইতে নূতন নূতন কর ধার্য করার সুযোগ পাইল।

ফ্রান্সের ফিলিপ অগাস্টাস এবং ইংলণ্ডের দ্বিতীয় হেনরী ক্রুসেড উপলক্ষে ইউরোপে সর্বপ্রথম সরাসরি ট্যাক্সপ্রথা চালু করেন।

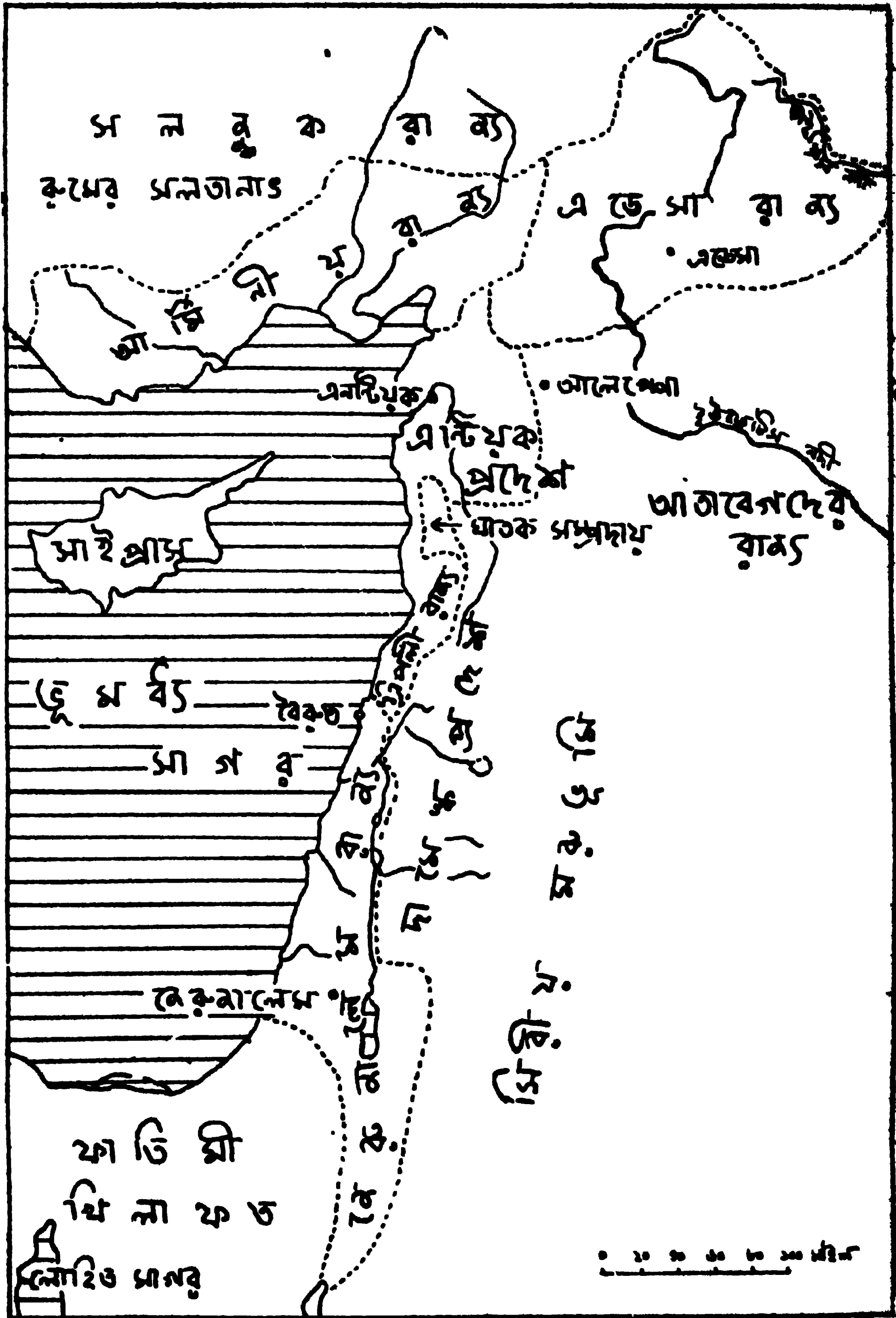
সিরিয়া প্যালেস্টাইনের লাটিন রাজ্যে দুই শতাব্দী ধরিয়া খ্রীস্টানগণ পার্শ্ববর্তী মুসলমানদের সহিত পাশাপাশি বাস করিতে থাকে। এই প্রথম তাহারা বুঝিতে পারিল যে, আরব সভ্যতা ও বাইজানটাইন সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতা অপেক্ষা অনেক উন্নত। ক্রুসেডের মাধ্যমে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যোগাযোগের ফলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বহু জিনিস পাশ্চাত্যে পরিচিত হয়। তাহারা প্রাচ্য দেশীয় আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্যরীতি প্রভৃতি অনুকরণ করিতে আরম্ভ করে। দাঁড়ি রাখা, আলখেল্লা পরা প্রাচ্যের দেখাদেখি পাশ্চাত্যেও ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইল। ইউরোপের লোকেরা মসলিন ও অন্যান্য কাপড়, কম্বল, কার্পেট, নূতন রং, নীল (Indigo), ঔষধপত্র, মসলা, সুগন্ধি দ্রব্য, মুসব্বর, লবঙ্গ, চন্দন-কাঠ, পাউডার, আয়না ইত্যাদি এবং মাটি, কাচ, স্বর্ণ, রৌপ্য ও এনামেলের তৈয়ারী শিল্পদ্রব্য প্রভৃতি জিনিস বেশী পরিমাণ আমদানী করিতে থাকে। চিনির চাহিদাও ইউরোপে বাড়িয়া যায়। এই সকল দ্রব্যের চাহিদার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য বহু পরিমাণে বাড়িয়া যায়। ইটালীর বন্দরসমূহ বহু সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। ক্রুসেডের ফলে ভূমিদাসদের অবস্থার পরিবর্তন হয়। ভূম্যধিকারিগণ ক্রুসেডে যোগদান করার পূর্বে অর্থের বিনিময়ে অনেক ভূমিদাসকে মুক্তিদান করে। কেহ কেহ ভূম্যধি-কারীদের অনুপস্থিতির সুযোগে তাহাদের দাসত্ব বন্ধন ছিন্ন করে। নূতন শহর ও শিল্প গড়িয়া উঠার ফলে দাসগণ ম্যানর হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শহরে কলকারখানায় যোগদান করে। এই সকল পরিবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

সামাজিক

ক্রুসেডের ফলে পশ্চিম ইউরোপের নগরীকরণ (Urbanisation) ঘটে। ইটালীর ভেনিস, জেনোয়া, পিসা ও অন্যান্য নগরী এবং ফ্রান্সের মার্সাই ও অন্যান্য সামুদ্রিক বন্দর এই সময় ব্যবসা-বাণিজ্যে ফুলিয়া-ফাঁপিয়া উঠে। পশ্চিম ইউরোপে প্রাচ্যদেশীয় জিনিস-পত্র একবার পরিচিত হইলে ইউরোপে এই সকল পণ্যদ্রব্যের চাহিদা শতগুণ বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে ইউরোপের অন্যান্য স্থানে যেমন জার্মানী, ফ্রান্স ও ফ্লাণ্ডার্সে বহু নগর ও বন্দর গড়িয়া উঠে। ভেনিস ও জেনোয়া হইতে অগণিত জাহাজ ইউরোপ ও সিরিয়ার মধ্যে

অর্থনৈতিক

ক্রুসেডের যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী সিরীয় রাজ্যসমূহ ১১৪০খ্রীঃ



ক্রুসেডের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সিরীয় রাজ্যসমূহ ১১৪০ খ্রীঃ

চলাচল করিতে থাকে। তাহাদের সাদা পালে সমস্ত ভূমধ্যসাগর ভরিয়া যায়। মুসলমানদের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে ক্রুসেডারগণ স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করে। ইহার ফলে সিসিলির ডুকাট (Ducat), ফ্লোরেন্সের ফ্লোরিন (Florin) এবং ভেনিসিয়ার সিকুইন (Sequin) চালু হয়। ধর্মযোদ্ধাগণ নগদ টাকা-পয়সা বহন করিয়া নেওয়ার অসুবিধা বোধ করে। ব্যবসায়িগণ দূরদেশে টাকা-পয়সা লইয়া আসা-যাওয়া করিতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ইহার ফলে আরবদেব নিকট হইতে তাহারা ব্যাঙ্ক প্রথা গ্রহণ করে এবং চেক ইত্যাদি দেওয়ার প্রথা চালু হয়। ইটালীতে এই সময় বহু ব্যাঙ্কার পরিবার এই কাজে আত্মনিয়োগ করে। অবশ্য ক্রুসেড না হইলেও ইউরোপে নগর-বন্দর গড়িয়া উঠিত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করিত। কিন্তু ক্রুসেড এই সকল কাজ বহুগুণে ত্বরান্বিত করিয়া দেয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প

এই কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, আরব জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপে প্রসার লাভ করার ফলে রেনেসাঁর অগ্রগতি দ্রুততর হয়। কারণ প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশেষতঃ গ্রীক এবং হেলেনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আরবগণের হাতে সংরক্ষিত ও সমপ্রসারিত হয়। এই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান স্পেন এবং সিসিলির মাধ্যমে ইউরোপে পরিচিত ও প্রচলিত হয়। এই ব্যাপারে ক্রুসেডের কি অবদান রহিয়াছে, তাহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রহিয়াছে। ক্রুসেডের সময় আরবীয় সভ্যতা অবনতির পথে নামিয়া যাইতেছিল। এই কথা অনস্বীকার্য যে, ফ্রাঙ্কগণ ও অন্যান্য ক্রুসেডারগণ আরবদের তুলনায় জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনগ্রসর ছিল। আরবদের চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত ধরনের ছিল। তাহারা বহু হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছিল। ইউরোপে দ্বাদশ শতাব্দী হইতে হাসপাতালের উদ্ভব ও প্রসার ক্রুসেডের প্রত্যক্ষ ফল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। খ্রীস্টানগণ হাম্মামখানার বিরোধী ছিল। ইউরোপে সর্বসাধারণের স্নানাগার প্রবর্তন ক্রুসেডের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। এই সময় সিরিয়া হইতে ‘কালিলা ওয়া দিমনা’ এবং ‘সহস্র ও এক রজনী’র উপাখ্যান ইউরোপে নীত হয়। ক্রুসেডের ফলেই ইউরোপীয় মিশনারিগণ আরবী এবং অন্যান্য ইসলামী ভাষায় মনোযোগী হয়। যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে আরবদের প্রভাব সুস্পষ্ট। তীর-ধনুকের ব্যবহার, নাইটগণের ভারী যুদ্ধপোশাক, বর্মের নীচে তুলার গদির ব্যবহার ক্রুসেডের প্রত্যক্ষ ফল। সংবাদ আদান-

প্রদানের জন্য কবুতরের ব্যবহারও তাহারা আরবদের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করে। ইউরোপের 'শিভালরী' সিরিয়ায় পূর্ণতা লাভ করে। সৈনিকদের ঢাল, পতাকা, বিশেষ চিহ্ন (Badge) ও বর্মের উপর কুলচিহ্ন বা পরিচয় চিহ্ন (Heraldicdevia) অঙ্কন আরবদের নিকট হইতে এই সময় ইউরোপে প্রসার লাভ করে। বড় সুরক্ষিত দুর্গের ব্যবহার এবং অবরোধের কলাকৌশলও তাহারা আরবগণের নিকট হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। ইউরোপে বায়ুতাড়িত কলের (Windmill) ব্যবহার ক্রুসেডারগণ আমদানী করে। জেরুজালেমের গির্জা. ও সিরিয়ার বিভিন্ন মসজিদ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন ও জার্মানীর বহু গির্জার স্থপতি শিল্পকে প্রভাবিত করিয়াছিল।

ভৌগোলিক অনুসন্ধান, ভ্রমণ ও নৌবিদ্যা

ক্রুসেড বহু ইউরোপীয় নাগরিকের ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিধি সম্প্রসারিত করে এবং তাহাদের সাধারণ জ্ঞানের পরিসীমা বৃদ্ধি করে। দুই শত বৎসর ধরিয়া হাজার হাজার ইউরোপীয় প্রাচ্যে সফররত ছিল। ইহার ফল সহজে অনুমেয়। ইউরোপীয়দের ভ্রমণ ও সমুদ্রযাত্রা ক্রুসেডের অবশ্যম্ভাবী ফল। আরবগণের নিকট হইতে তাহারা নৌ-বিদ্যায় সুশিক্ষা লাভ করে এবং কম্পাস ও এ্যাস্ট্রলেবের ব্যবহার জানিতে পারে।

বিস্তারিত পাঠ্য তালিকা

টম্পসন এণ্ড জনসন, এ্যান ইনট্রোডাকশন টু মেডিয্যাভাল ইউরোপ
হেনরী পিরেন, এ হিস্ট্রি অব ইউরোপ
হিট্টি, হিস্ট্রি অব দি এ্যারাবস্

নির্ঘণ্ট